সংখ্যা] [৬ষ্ঠ বর্ষ

সাহিত্যরচনায় রস ও রূপ

গত বারে আমি সাহিত্য-বিচারে matter ও form লইয়া কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি ; এই আলোচনা সম্যক আলোচনা ত নহেই, য়ত যথোপযুক্তও নহে। কারণ বিষয়টি সাহিত্য-বিচারের একটা ড় বা মূল কথা ; আধুনিক সাহিত্য-সমালোচনায় পাশ্চাত্ত্য রসিক সমাজে হার আলোচনা অতিশয় পুরানো হইয়া আসিলেও আমাদের দেশে য ধরণের সাহিত্য-বিচার আজ পর্য্যন্ত চলিয়াছে তাহাতে এ বিষয়ের আলোচনা গোড়া হইতে করিতে হয়, এমন কি, সাহিত্য-আলোচনার রীতিই আমূল সংশোধন করিতে হয়। এজন্য আমার এই আলোচনা একটা প্রসঙ্গ মাত্র, ইহা সবিস্তার বা সম্যক-বিচার নহে। আমাদের সাহিত্য-বিচারে আজও পর্য্যন্ত গ্রন্থ বা নিবন্ধ বা কাব্য—সর্ব্ববিধ রচনায়—form বা প্রকাশভঙ্গির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সমালোচকের

কোনও ধারণার পরিচয় পাওয়া যায় না—সাধারণতঃ matter অথবা ভাষাগত বাহ্যিক কয়েকটি গুণ লইয়া নিন্দা বা প্রশংসার কারণ দেখানো হয়। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য-সমালোচক এবিষয়ে গভীরতর তত্ত্বের সন্ধান পাইয়াছেন; তাঁহারা সাহিত্য-বিচারে যে প্রণালী অবলম্বন করেন তাহার তুলনায় আমাদের পদ্ধতি নিতান্ত ছেলেমানুষী বলিয়া মনে হয়। অতিশয় আধুনিক কালে ও দেশে সাহিত্য-তত্ত্ব ও সমালোচনা-নীতি এতদূর অগ্রসর হইয়াছে—কবিপ্রতিভা, কাব্যসৃষ্টির রহস্য, সত্য-সুন্দরের তত্ত্ব—এমন গভীর গবেষণার বিষয় হইয়াছে যে, সাহিত্যতত্ত্ব একটি অভিনব জ্ঞানযোগের পন্থা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বর্ত্তমান প্রসঙ্গে আমি সেরূপ কোন সূক্ষ্ম আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব না। কেবল সাহিত্য-বিচারে, রচনার উৎকর্ষ-প্রমাণে যে মুখ্য লক্ষণটির সম্বন্ধে আমরা ভুল করিয়া থাকি, তাহারই একটু সবিস্তার উল্লেখ আমার অভিপ্রায়।

গতবারে আমি সাহিত্যিক রচনা মাত্রেরই অর্থাৎ যে গ্রন্থ সাহিত্য বলিয়া গণনীয় তাহার form বা রূপ বলিতে কি বুঝায়, এবং সেই রূপ-ই যে তাহার প্রধান লক্ষণ সে সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি। কোনও রচনা তখনই সাহিত্য-পদবাচ্য হইয়া উঠে, যখনই বিষয়কে অতিক্রম করিয়া লেখকের চিন্তার ছাপ বা মনের ছাঁচ তাহার বৈশিষ্ট্য সম্পাদন করে; রচনার মাহাত্ম্য যখন আর ঠিক বিষয়টির উপরে নির্ভর করে না—বক্তার ব্যক্তিত্ব, ভাবচিন্তার মৌলিকতা, তাহার অনুরূপ ভঙ্গিতে তাহাকে এমন একটি রূপে রূপান্তরিত করে, যে তাহা আর কেবল তথ্য বা তত্ত্বহিসাবেই মূল্যবান নহে; পরন্তু রচনা হিসাবেই উপাদেয়। বিষয়টি যাহাই হোক, রচনার নাম যে গুণেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করুক—পাঠকালে আমরা একটা নূতন দৃষ্টি, নূতন ভাবনাভঙ্গি, জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে মানবীয় জিজ্ঞাসার

একটা নূতন দিক, [illegible] পরিচয়ে মুগ্ধ হই। 'মুগ্ধ হই'; কথাটার তাৎপর্য্য আছে,—সে রচনা আমাদের গভীরতর চেতনাকে স্পর্শ করে, এক ব্যক্তির সত্তা আর এক ব্যক্তির সত্তার সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে যেন একটা আধ্যাত্মিক তৃপ্তি ও আশ্বাস লাভ করে। অতএব বিষয়টি এখানে গৌণ, মানুষের সঙ্গে মানুষের পরিচয় সাধন হইতেছে —গ্রন্থগত সকল বিচার, বিশ্লেষণ, যুক্তি ও পাণ্ডিত্য ছাপাইয়া এমন একটি কিছু জাগিয়া উঠে যাহা যুক্তি, তথ্য, পাণ্ডিত্য অপেক্ষা অনেক বড়; বিষয়কে অবলম্বন করিয়া একটা বড় ব্যক্তির বড় সত্তা আত্মপ্রকাশ করে—ইংরেজিতে তাহাকেই বলে style। এই ষ্টাইলই রচনার সাহিত্যিক রূপ। এই style যে রচনায় নাই তাহা সাহিত্য নহে। যে রচনায় style যত বড়, যত উদার গভীর ও সুস্পষ্ট—অর্থাৎ রচনার ভিতর দিয়া যে ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাই, তাহা যত গভীর উদার সত্য সুন্দর বলিয়া প্রতীতি হয়, সে রচনা তত উৎকৃষ্ট। কিন্তু সব চেয়ে বড় লক্ষণ ইহাই নয়—সকল সাহিত্যিক-উৎকর্ষের প্রমাণ—মৌলিকতা। এই কথাটি ভাল করিয়া বুঝিয়া লইতে হইবে। এ মৌলিকতা নূতন তথ্য-আবিষ্কার বা তত্ত্বচিন্তার মৌলিকতা নয়—ওই যে রচনারূপ, বা styleএর কথা বলিয়াছি, তাহারই মৌলিকতা। এ মৌলিকতার কারণ আর কিছুই নয়—লেখকের অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব। লেখা পড়িবামাত্র বুঝিতে পারি—এ এক নূতন, সম্পূর্ণ অপরিচিতপূর্ব্ব ব্যক্তির সঙ্গে পরিচয় হইতেছে, এ দৃষ্টি, এ ভঙ্গি, এ ভাষা আর কোথায়ও নাই। এই মৌলিকতাই সাহিত্যের প্রাণ—যেখানে এ বস্তু আছে, সেখানে রস-সংবেদনা অনিবার্য্য—সকল সাহিত্য-সৃষ্টির ইহাই মূল রহস্য। ব্যক্তির নিজস্ব ভাব-দৃষ্টি যে রচনায় প্রতিফলিত হয়, বিষয় বা matter যেমনই হৌক, তাহাই এমন

একটি রূপ গ্রহণ করে যাহা বিষয়-নিরপেক্ষ একটা অতিরিক্ত বস্তু—এই বস্তুরই নাম form—কোনও রচনায় এই form না থাকিলে তাহা সাহিত্য-পদবাচ্য হয় না।

*   *   *

এই জন্যই দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধও সাহিত্যগুণযুক্ত হইতে দেখা যায়। জ্ঞান যখন তথ্যগত না হইয়া ব্যক্তির সমগ্র অনুভূতি বা বোধি-সত্তায় উজ্জ্বল হইয়া উঠে, তখন জড় বিষয়-বস্তুতে যেন লেখকের চিৎ-শক্তি অনুপ্রবিষ্ট হয়, প্রকৃতির সহিত পুরুষের উদ্বাহ ঘটে; তাহারই ফলে যাহা উৎপন্ন হয়, তাহা আর কেবল জড়-বিদ্যার পরিধি-বিস্তার নয়—আত্মদৃষ্টির অভিনব সৃষ্টি, চিত্তচমৎকারী ও প্রাণবন্ত। বাংলা ভাষায় এইরূপ প্রবন্ধ-সাহিত্য বেশি নাই—তার কারণ, জ্ঞানী সাহিত্যিক অপেক্ষা কবি সাহিত্যিকের সংখ্যাই এ পর্যন্ত অধিক দেখা যায়। বিষয়-বস্তুর উপরে পরিপূর্ণ জ্ঞানদৃষ্টি-সম্পন্ন ব্যক্তি—যাহার জ্ঞান স্বকীয় বোধিসত্তায় উজ্জ্বল হইয়া উঠে, কেবল মনের কৌতূহল নয়, আত্মার সুগভীর আকুতির বশে সকল জ্ঞান সত্যের রস-রূপের জন্য বাক্‌ব্রহ্মের শরণাপন্ন হয়—এমন মনীষী আমাদের মধ্যে বিরল। তাই জ্ঞানী ও সাহিত্যিক এই দুয়ের মিলন একের মধ্যে প্রায় দেখা যায় না। কেবল একজন মহাত্মার নাম করা যাইতে পারে যাঁহার রচনার অনেক স্থলে জ্ঞান ও প্রেমের সাহিত্যিক-মিলন ঘটিয়াছে—ব্যক্তির নিগূঢ় সত্তা রচনার বিষয়বস্তুকে, তথ্য ও তত্ত্বের অফুরন্ত সমাবেশ সত্ত্বেও, form বা রূপরসে উজ্জ্বল করিয়াছে। আমি স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের কথা বলিতেছি। তাঁহার জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধগুলির মধ্যে যে সত্যসন্ধানী আত্মার ছাপ প্রায় সর্ব্বত্র দেখা যায়—তাহাতে একটি [illegible] ব্যক্তিচরিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে—তাহাই রচনার style বা

সাহিত্যগুণ; রচনাগুলির অন্তরালে সেই যে একটি পিপাসু অথচ আত্মসমাহিত পুরুষ—জ্ঞানের সাগর শোষণ করিয়াও যাঁহার তৃপ্তি নাই, যিনি কখনও এমন কথা বলেন না যে, "আমি সব পাইয়াছি সব দেখিয়াছি" অথচ যাঁহার হৃদ্‌দেশে সম্যক-প্রস্ফুটিত বোধিসত্তার শান্ত আনন্দ আস্তিক্য-বুদ্ধিকে অটল রাখিয়াছে। এমনই একটা ব্যক্তিত্ব তাঁহার রচনাগুলিতে পূর্ণ প্রতিফলিত হওয়ায় ভাষা ও ভঙ্গির যে বিশিষ্ট form বা রূপ দাঁড়াইয়াছে তাহাতেই সেই দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক বিচারণমূলক রচনাও সাহিত্য-পদ লাভ করিয়াছে।

* * *

আর একটি রচনা মনে পড়িতেছে—ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অভয়ের কথা'। বাংলা গদ্য সাহিত্যে, জ্ঞানপরিবেশন-বিভাগে, এমন রচনা বোধ হয় আর নাই। অনেকেই, বিশেষতঃ বাংলাসাহিত্য-সমালোচক বা উক্ত সাহিত্যের ইতিহাস লেখকেরা, বোধ হয় বইখানির নামও শুনেন নাই, পড়া ত দূরের কথা। এই লেখক ঐ একটি লেখাই লিখিয়াছিলেন, সাহিত্যক্ষেত্রে খ্যাতি লাভের সৌভাগ্য তাঁহার হয় নাই। তিনি গণিতশাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতেন—বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ও কৃতী ছাত্র, এবং শেষে সুনিপুণ শিক্ষকরূপে সেকালের ছাত্রসমাজে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। এই পুস্তকখানিতে যে অপূর্ব রচনা-রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহার কথাই বলিব। বেদান্ত দর্শনের ভূমিকা অথবা সারতত্ত্বব্যাখ্যাচ্ছলে এই নিবন্ধ রচিত হইয়াছিল; পাঠক হয়ত বিষয়টির কথা শুনিয়াই ভয় পাইবেন, পাইবারই কথা—সাহিত্যামোদী রসিক ব্যক্তির পক্ষে বেদান্ত-ব্যাখ্যা ফুলবনে মত্তহস্তী দর্শনের মত। কিন্তু এমন করিয়া এমন পদ্ধতিতে এত স্বল্প পরিসরে এত বড় তত্ত্বকথাকে হৃদয়গ্রাহী করিয়া, বেদান্তব্যাখ্যার মুখে

সাহিত্য রচনা করিতে, বোধ হয় আর কেহ পারে নাই—অন্ততঃ বাংলা সাহিত্যে এমন রচনা আর নাই—এই একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থে বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্য ধন্য হইয়াছে। সাহিত্য-বিচারে আমি যে formএর কথা বলিয়াছি তাহার এমন প্রকৃষ্ট উদাহরণ আর নাই। গণিতচর্চ্চায় যে মেধার উন্মেষ হইয়াছিল, দার্শনিক চিন্তাকে হজম করিবার শক্তি তাহার পক্ষে আদৌ আশ্চর্য্যজনক নয়। কিন্তু বিষয়টিকে এমন করিয়া 'রূপ' দিবার ক্ষমতা আসিল কোথা হইতে? বেদান্তের জীব-ব্রহ্মের তত্ত্ব—এই জগৎ-প্রপঞ্চের কারণ-জিজ্ঞাসা—কবি ও কাব্য-ঘটিত কাহিনীর মত শুনিতে হয় কেমন করিয়া? সর্ব্বোপরি বক্তাকে যেন চোখের সম্মুখে দেখিতেছি; এমন বিশ্রব্ধ আলাপ, এমন সহমর্ম্মিতা, এমন প্রাণময় রসিকতা এবং সেই সঙ্গে sincerity ও seriousness রচনার ছত্রে ছত্রে পাঠককে অভিভূত করে যে মনে হয়, এ যেন একাধারে [illegible], বন্ধু ও বয়স্যের মুখে জীবনের পরমতম আশ্বাসবাণী শুনিতেছি—একটি মানুষ যে বাণী নিজ হৃদয়ে উপলব্ধি করিয়াছে, সেই বাণী-ব্রহ্মকে আপনা-সহ অপরকে নিঃশেষে দান করিতেছে। বাণীর মধ্য দিয়া ব্যক্তিটিকে এমন সুস্পষ্ট ভাবে দেখিতে পাই যে সেই মূর্ত্তিটি গ্রন্থসংলগ্ন মৃত গ্রন্থকারের চিত্রটির সহিত বার বার মিলাইয়া দেখিতে ইচ্ছা হয়। লেখক ইহার পূর্ব্বে কখনও লেখনী ধারণ করেন নাই তাই তাঁহার ভাষার একটি বিরূপ ভঙ্গী আছে—কিন্তু একবার অভ্যস্ত হইয়া গেলে বুঝা যায় ঐ ভঙ্গিই যথার্থ, উহাই লেখকের style। Matter ও form—রচনার বিষয় ও রচনার রূপ-সম্বন্ধে আমি যে আলোচনা করিয়াছি তাহার প্রসঙ্গে এই রচনাটি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য; এখানে রচনার বিষয়-গৌরব অল্প নহে, তথাপি বিষয়ের মাহাত্ম্যই এই রচনার মাহাত্ম্য নহে; লেখক যে তত্ত্বটিকে বুঝাইতে চাহেন, সে

তত্ত্ব যেমন পুরাতন, তেমনই বহু মনীষীর বহুতর ব্যাখ্যান, সুবিস্তার ও সুনিপুণ আলোচনায় তাহা জীর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এই বহু পুরাতন ও বহু আলোচিত বিষয়টির অন্তর্নিহিত সত্য একজন নূতন ব্যক্তির বোধিসত্তাকে যে ভাবে স্পর্শ করিয়াছে এবং তাহার ফলে যে নূতন ভঙ্গিতে তাহা প্রকাশ পাইয়াছে—রচনাগত সেই রূপই ইহার বিশেষ মূল্য, এবং সেই মূল্য অল্প নহে। এই জন্যই স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের মত পণ্ডিত ব্যক্তিও এ লেখা পড়িয়া চমকিত হইয়াছিলেন। গ্রন্থের ভূমিকায় লেখক ও লেখার সম্বন্ধে তিনি যে কয়টি কথা বলিয়াছেন তাহার কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া এই অখ্যাত অথচ অমূল্য গ্রন্থখানির পরিচয় সমাপ্ত করিব।

> "ক্ষেত্রমোহন রিপণ কলেজে গণিতের অধ্যাপনা করিত। অবসর মত কেবলই নবেল পড়িত—ইংরেজী নবেল। হঠাৎ নবেল ছাড়িয়া বৈষ্ণব ভক্তিশাস্ত্র পড়িতে লাগিল—হাতে দেখিলাম ললিতমাধব উজ্জ্বল নীলমণি ইত্যাদি। পরে দেখিলাম, বেদান্ত গ্রন্থ পড়িতেছে। যাহা যখন পড়িত তন্ময় হইয়া পড়িত। আমার হাসি পাইত—ক্ষেত্র আবার ভক্তিশাস্ত্র পড়িতেছে—বেদান্ত পড়িতেছে!
>
> একদিন কথা প্রসঙ্গে ধরিয়া ফেলিলাম—ক্ষেত্র বেদান্ত হজম করিয়া আত্মসাৎ করিয়া ফেলিয়াছে। দেখিলাম ক্ষেত্র আমার গুরুগিরি করিবার অধিকারী হইয়াছে। * * *
>
> একদিন 'অভয়ের কথা'র নমুনা লইয়া আমার নিকট উপস্থিত। নমুনা দেখিয়া আমার চমক লাগিল। যে কখনও কলম হাতে করে নাই, সে একেবারে এমন লিখিবে ইহা মনেও

ভাবি নাই। সে কি অপূর্ব্ব ভাষা, বুঝাইবার সে কি অপরূপ ভঙ্গী! বাঙ্গালা সাহিত্যে ইহার জোড়া দেখি নাই।

* * *

পৃথিবীতে আনন্দ বরিষণ করিতে সে আসিয়াছিল—কোন দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া মাথা তুলিয়া দম্ভের সহিত পা ফেলিয়া সে পথে চলিত—আনন্দের স্রোত তার সঙ্গে সঙ্গে চলিত; যেখানে দুই দণ্ড বসিত আনন্দের তুফান উঠিত। পরব্যোমে স্থিত আনন্দঘন পুরুষের আনন্দ-কণিকা যেন ঘনীভূত হইয়া মর্ত্তভূমে আসিয়াছিল। এইরূপ মাঝে মাঝে আসে, নতুবা মর্ত্ত্যভূমিতে মানুষ টিকিতে পারিত না।"

* * *

আমার প্রসঙ্গের পক্ষে এই পুস্তকখানির এতখানি পরিচয় অবান্তর মনে হইতে পারে—তাহা আমিও স্বীকার করি। কিন্তু প্রসঙ্গক্রমে উদাহরণস্বরূপ যে রচনাটির উল্লেখ অত্যাবশ্যক হইল—তাহার সম্বন্ধে, ও তাহার লেখকের সম্বন্ধে কিছু কর্ত্তব্যও এই সঙ্গে পালন করিয়া বাংলা সাহিত্যিকের পাপ মোচন করিবার আকাঙ্ক্ষা দমন করিতে পারিলাম না। বাংলা সাহিত্যের একশত শ্রেষ্ঠ পুস্তকের যে তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে এ পুস্তকের নাম থাকিবার কথা নয়—কারণ সেই তালিকাকার ততটা পুণ্যবান নহেন। কিন্তু তাহাই একমাত্র কারণ নয়, যেহেতু এ পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছিল, কিন্তু সু-প্রকাশিত হয় নাই। শহরের ফুটপাথে পুরাতন পুস্তকের আবর্জ্জনা-রাশি হইতে ইহাকে সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল; এখন বোধ হয় সেখানেও আর পাওয়া যাইবে না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এমন গ্রন্থের খোঁজ কেহ করিল না; বাংলা সাহিত্যের যাঁহারা ভাণ্ডারী,

যাঁহারা সেই সাহিত্যের বিজ্ঞ বিচারক ও গবেষক, তাঁহাদের কাহাকেও ইহার পরিচয় দিতে দেখিলাম না। অথচ রামেন্দ্রসুন্দরের কথা বেদবাক্যের মতই সত্য—"বাঙ্গালা সাহিত্যে ইহার জোড়া দেখি নাই।" বাংলা সাহিত্যের কপাল! জোড়া মেলে না বলিয়াই "শ্রেষ্ঠ পুস্তকের" তালিকায় ইহার স্থান কখনই হইবে না—যে সকল পুস্তকের অসংখ্য 'জোড়া' পথেঘাটে ছড়াইয়া থাকে, তাহাদেরই এক একখানি লইয়া বঙ্গসরস্বতীর কণ্ঠে পদকের মালা গাঁথা হয়। সাহিত্যবিচারে matter ও formএর কথা! গোরুর মুখে ফুল ও পাতা দুইই সমান!

* * *

সাহিত্য রচনার উৎকর্ষ হিসাবে যে লক্ষণের কথা—এবং তাহার দৃষ্টান্ত আলোচনা করিয়াছি—form বা রূপ বলিতে এখানে যে উৎকৃষ্ট গুণের উল্লেখ করিয়াছি—তাহাই রচনাকে খাঁটি সাহিত্যের পর্য্যায়ে তুলিয়া ধরে; কিন্তু ব্যাপক অর্থে form বলিতে এতটা বুঝাইবার প্রয়োজন নাই, সে কথা আমি পূর্ব্ববারের আলোচনায় বলিয়াছি। সাধারণতঃ গ্রন্থের গ্রন্থনসৌষ্ঠবই তাহার form; বক্তার সে বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা থাকার জন্য রচনার যে বিন্যাস-কৌশল এবং ভাষার যে প্রসাদগুণ বিষয়টিকে উজ্জ্বল করিয়া তোলে তজ্জন্য লেখকের নিজস্ব ভাব-চিন্তা পাঠকের চিত্তে সহজ-প্রবেশ লাভ করিয়া যে একটি সম্পূর্ণ আকার ধারণ করে তাহাই সাধারণতঃ রচনার form. ইহাতে আমরা লেখকের মানস-প্রকৃতির, তাঁহার ভাব-চিন্তার মৌলিকতার সুস্পষ্ট পরিচয় পাই; অধিকাংশ রচনার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট। এই টুকু না থাকিলে রচনার কোনও মূল্যই নাই। কিন্তু কিছু পূর্ব্বে আমি যে formএর কথা বলিয়াছি, তাহা আর এক ধাপ উপরের কথা; ইহার

উপরকার ধাপ কাব্যের রসরূপ—এইবার সেই সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

* * *

পূর্ব্ব প্রবন্ধে আমি একটি কথা বলিয়াছি—এখানে তাহার পুনরুল্লেখ করিব। কথাটি এই—"কোনও লেখকের সম্বন্ধে—what he has thought and how he has thought—এই দুইটা কথাই বিচার-যোগ্য। কোথায়ও বা প্রথম প্রশ্নটাই বড়, কোথায়ও বা শেষের প্রশ্নটিই বড়। রচনার প্রকৃতি অনুসারে এই দুই প্রশ্নের যেটি অপরটির অপেক্ষা যত গুরুতর বলিয়া মনে হইবে, তাহারই উপরে রচনার জাতিনির্ণয় নির্ভর করিবে। যে রচনার সম্পর্কে প্রথম প্রশ্নই গুরুতর সে রচনা রচনা-হিসাবে উৎকৃষ্ট নয়; যে রচনায় উভয় প্রশ্নই সমান, তাহা মধ্যম; কিন্তু যে রচনায় এই প্রশ্ন-দ্বন্দ্ব আর থাকে না, what ও how এক হইয়া গিয়াছে, বস্তু বস্তুত্ব হারাইয়া রসে পরিণত হইয়াছে, তাহাই উৎকৃষ্ট রচনা।" এই কথাটার বিস্তারিত আলোচনা এখানে করিব। মনে রাখিতে হইবে আমি এবার খাঁটি সাহিত্যের—কাব্য নাটকাদির—উৎকর্ষ বিচারের কথা বলিতেছি। রচনা মাত্রেরই উৎকর্ষ-বিচারে যে লক্ষণটি বিশেষ করিয়া ধরিতে হইবে—সেখানে form বলিতে কি বুঝিতে হইবে, তাহার আলোচনা এতক্ষণ করিয়াছি। এক্ষণে, যাহাকে রচনার রসরূপ বলে, তাহারই সম্বন্ধে কিছু বলিব। What এবং how এই দুই প্রশ্ন যেখানে নির্দ্বন্দ্ব হইয়াছে, সেখানেই রসের উদ্ভব। কাব্যে ইহাই হইয়া থাকে। সেখানে whatএর পরিবর্ত্তে howটাই যেন বড় হইয়া উঠে—বস্তু অপেক্ষা লেখকের কল্পনা-ভঙ্গিই সে রচনার সর্ব্বস্ব। কারণ, কাব্য কোনও চিন্তা-বস্তু নয়, জ্ঞান বিজ্ঞানের তথ্য বা তত্ত্বঘটিত কোনও নূতন অর্থবাদের উপর

কাব্যের উৎকর্ষ নির্ভর করে না। হয় ত সর্ব্বতথ্য বা তত্ত্বের সার-সঙ্কেত সেখানে আছে—কিন্তু তাহা চিন্তাশীল সত্যসন্ধানীর পিপাসার বস্তু নয়—তাহা মানুষের বিতর্কবুদ্ধির গ্রাহ্য নহে। এই জন্যই what প্রশ্ন সেখানে নাই বলিলেই চলে; অথবা what সেখানে how-এর দিব্যানুভূতি বা চিত্ত-চমৎকারের মধ্যে লীন হইয়া আছে। যাঁহারা রসবোধের উচ্চাধিকারে পৌঁছিতে পারেন নাই, তাঁহারাই কাব্যে what-কে ত্যাগ করিতে পারেন না—বিষয়কে অতিক্রম করিয়া বিষয়োদ্ধৃত যে রূপ তাহার সম্বন্ধে সম্যক সচেতন হইতে পারেন না। এই যে বিষয়-সাপেক্ষ, অথচ বিষয়াতিরিক্ত একটি স্বতন্ত্র সামগ্রী—কায়া নহে কায়ার কান্তি, মুখ নহে মুখের লাবণ্য—ইহাই কাব্যের রস-রূপ; এই formই কাব্যের সর্ব্বস্ব। এই 'রূপ'কেই expression বলা হইয়া থাকে—কবিতা মাত্রেই এক একটি বাঙ্ময়ী মূর্ত্তি। রসিকের রস-দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে সেই প্রকাশ-সুষমার উপর; সেই কান্তি বা লাবণ্যই রস-চেতনার উদ্রেক করে; বস্তু বা বিষয় যতক্ষণ চেতনাকে অধিকার করিয়া থাকে, ততক্ষণ রসিকের চিত্তে কাব্যের চরম প্রকাশ ঘটে নাই বুঝিতে হইবে। সেই কান্তি সেই ছায়া কায়াকে গুণ্ঠিত করে—তাই কাব্যবিচারে বা রসাস্বাদে what ও how এই দুয়ের দ্বন্দ্ব আর থাকে না।

* * *

এই expression কথাটিই লওয়া যাক। খাঁটি সাহিত্য-সৃষ্টি বলিতে আমরা যাহা বুঝি, এ কালের রসজ্ঞ ব্যক্তিরা তাহার সর্ব্বপ্রধান গুণ বা লক্ষণ ধরিয়াছেন—expression; সাহিত্যে এই expressionই সব। আমি এতক্ষণ যে form-এর কথা বলিতেছিলাম, কাব্যবিচারে সেই form-এর মূল তত্ত্ব এই expression। Expressionএর সহজ

আমার কথা ছিল এই যে—কবিতার সর্ব্বস্ব তাহার এই বাণীরূপ; কাব্যবিচারে সব চেয়ে বড় কথা এই রূপ-সৃষ্টি; কবির কৃতিত্ব বিচার করিতে হইবে এই বাণীর 'উৎকর্ষ-লক্ষণে। এই বাণীরচনাই যে কবিতার যাদুশক্তি, এবং তাহার কারণ কি, একটি সামান্য উদাহরণ সাহায্যে তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিব। বাড়ীর বারান্দায় দাঁড়াইয়া বনভূমির দিকে চাহিয়াছিলাম; বর্ষার আকাশ ঘন-ঘোর হইয়া উঠিয়াছে, বর্ষণ-স্নাত বৃক্ষগুলির কান্তি উজ্জ্বলতর হইয়াছে, তাহার উপর মেঘচ্ছায়া-ধূসর স্তিমিত আলোক পড়িয়া বড় অপূর্ব্ব দেখাইতেছে। তৎক্ষণাৎ মনে মনে আবৃত্তি করিতে লাগিলাম "মেঘৈর্ম্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈঃ"—যতই আবৃত্তি করি ততই সম্মুখের ওই দৃশ্য আরও সত্য হইয়া উঠে, উহার মধ্যে একটা চিরন্তন সৌন্দর্য্যের আভাস পাই। পর মুহূর্ত্তেই মনে হইল কবিতার মধ্যে ত কিছু নাই—বর্ষার এ দৃশ্য অতি সাধারণ, শ্লোকটির মধ্যেও বর্ণনার কোনও চাতুরী নাই—দুইটি বিশেষণ ও বাকী কয়টি বস্তুর নাম—ইহাতেই রস উছলিয়া উঠে কেন? বুঝিলাম ইহাই বাণীর যাদুশক্তি। সম্মুখে যাহা দেখিতেছি তাহা অতি সাধারণ বটে; কিন্তু তাহার অন্তর্নিহিত যে চিন্ময় ব্রহ্ম-বিভূতি, যাহা জড়সৃষ্টির মধ্যে নানা ক্ষণে নানা রূপে উদ্ভাসিত হইতেছে, তাহার একটি বাণীরূপ এই শ্লোকে যথাযথ প্রকাশ পাইয়াছে। শব্দগুলি অভিধানে আছে, সমার্থ বোধক শব্দও অনেক আছে—কিন্তু যে বিশেষ ধ্বনিচ্ছন্দে এই বিশেষ শব্দগুলি কবির কণ্ঠে আসিয়া ধরা দিয়াছে, তাহাতে যে অখণ্ড রূপটি ফুটিয়া উঠিয়াছে—বর্ষাস্নাত বনভূমির একটি সাধারণ দৃশ্য তাহাতেই অসাধারণ হইয়া উঠিয়াছে। আশ্চর্য্য এই যাহা মূলে জড়-পিণ্ডের সমষ্টি তাহাই রূপ পাইয়াছে, শব্দের ধ্বনি-দেহে। শব্দ মাত্রেরই অবশ্য অর্থ আছে—কিন্তু এখানে বাচ্যার্থই প্রকট না হইয়া তাহা ধ্বনি-

ব্যঞ্জনার সহায়তা করিতেছে—এখানে যে রসরূপের সৃষ্টি হইয়াছে তাহার মূলে আছে এই ধ্বনির ইন্দ্রজাল। সমস্ত সৃষ্টিই যে বাঙ্ময়, বস্তু সকলের স্বরূপ যে ধ্বন্যাত্মক এই ঋষিমন্ত্রের তাৎপর্য্য যেন কাব্যসৃষ্টির রহস্যে রসিকচিত্তে পরিস্ফুট হইয়া উঠে। কবিতার অর্থ আছে, কিন্তু বাচ্যার্থই তার প্রমাণ নয়; এই বাচ্যার্থকেই আশ্রয় করিয়া, বিষয় বা contentকে আচ্ছাদিত করিয়া, সৎ-চিৎ-আনন্দের যে ইঙ্গিত নানা রূপে উদ্ভাসিত হয় তাহাই কাব্য-সৃষ্টি; যে বাক-ব্রহ্ম হইতে জগৎ-সৃষ্টি হইয়াছে, কবিগণ যেন পুনশ্চ বাক্যেরই সাহায্যে সেই মূল রসরূপের প্রতিষ্ঠা করেন। 'মেঘৈর্মেদুরমম্বরং' এই শ্লোকের আবৃত্তি-কালে আকাশ ও বনভূমির দিকে চাহিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারি, বাহিরের ওই দৃশ্য তাহার গভীরতর রসরূপে—যে রূপে রসিকচিত্ত আকুল হয় সেই রূপে স্বরময় হইয়া উঠিয়াছে; যাহা চিত্র তাহা বাঙ্ময় হইয়া উঠিয়াছে—যেন প্রতিফলিত না হইয়া প্রতিধ্বনিত হইতেছে। অতএব কাব্যের expression বলিতে এই বাঙ্ময়ী মূর্ত্তিই বুঝিতে হইবে। কাব্যের উৎকর্ষ ভাব অর্থ বা চিন্তা-বস্তুর উপর নির্ভর করে না—কবি যাহার সন্ধান দেন তাহা আর-কিছু, তাহা রূপসৃষ্টি, এবং তাহা বস্তু নয়, তাহা expression।

* * *

আমি একটা অতি সামান্য দৃষ্টান্তের দ্বারাই এই অপেক্ষাকৃত গুরুতর কথাটি বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি—গীতিকাব্যের একটি ক্ষুদ্র শ্লোকার্দ্ধ লইয়াই এত কথা বলিলাম—তার কারণ, বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ নাই। তথাপি মূল তত্ত্বটি মোটামুটি বুঝিবার পক্ষে যে-কোনও দৃষ্টান্ত লওয়া যাইতে পারে। সর্ব্ববিধ কাব্যের—নাটক, কাহিনী বা মহাকাব্যের—form বা expression মূলে ওই একই

বস্তু। কল্পনার বিস্তার সর্ব্বত্র সমান নহে, তাই কাব্যের বহিরঙ্গ সরল বা জটিল হইয়া থাকে। দেশ কালের পরিধি বিষয়গত, বিষয় অনুসারে কবিকল্পনাকে অল্প বা অধিকদূর ভ্রমণ করিতে হয়; কিন্তু সকল কাব্যের রূপ-পরিণাম—রসিকচিত্তে তাহার সংক্রমণ—দেশ বা কালের দ্বারা পরিমিত নহে; তাই কাব্যের বিষয়গত সরলতা বা জটিলতা, কল্পনাপরিধির ক্ষুদ্র বা বৃহৎ আয়তন, রসবিচারে অনেকেই অবান্তর বলিয়া মনে করেন—ইঁহারা বিষয়-গৌরব আদৌ মানেন না। অপর সম্প্রদায় এই রসরূপকেই কাব্যের একমাত্র অভিপ্রায় বলিয়া স্বীকার করিলেও, এই রূপের অবলম্বন বা আশ্রয়ভূত যে বিষয় তাহার বিস্তার, জটিলতা ও গভীরতা অর্থাৎ কবি-কল্পনার বিচরণ-ক্ষেত্রের মাহাত্ম্যও স্বীকার করেন, এবং সেই হিসাবে কাব্যকে good poetry ও great poetry এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করিবার পক্ষপাতী। কিন্তু সে আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক। আমি কেবল expression-তত্ত্বটাই বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি—ছোট বা বড়, সকল কবিতার পক্ষেই তাহা প্রযুজ্য। এই expressionই কবিতার সর্ব্বস্ব; তাহা মূলে বাঙ্ময়; সেই বাক্‌বাচ্যার্থ-নিরপেক্ষ না হইলেও, তাহাকে অতিক্রম করিয়া রূপ-সৃষ্টি করে; বিষয়গত খণ্ডতা এই বাক্-মন্ত্র বলে অখণ্ড হইয়া উঠে—সেই অখণ্ডতাই সকল রসরূপের গূঢ় লক্ষণ। এই জন্যই কাব্যে কবির কৃতিত্ব বিষয়-বস্তুগত নহে, ওই বাঙ্ময় expressionই—বাণী-সৃষ্টিই কবিত্ব।

* * *

আমাদের দেশে এখনও বিষয় ও তাহার এই রসরূপ সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা আছে। রসবোধ অনেকেরই আছে, কিন্তু রসজ্ঞান নাই, অর্থাৎ কাব্যরস-আস্বাদনের শক্তি আছে, কিন্তু তাহার স্বরূপ উপলব্ধি

করিবার মত সজ্ঞানতা নাই। বিষয়বস্তুর রস-পরিণাম যখন ঘটে তখনই কাব্যের জন্ম হয়—বিষয়বস্তুটা সেই রসের আধার মাত্র—সে আধার ক্ষুদ্র বা বৃহৎ হইতে পারে; তাহা কবির নিজস্ব সম্পত্তিও না হইতে পারে—কিন্তু তাহাকেই অবলম্বন করিয়া কবি যাহা সৃষ্টি করেন, তাহার উপাদান সেই বিষয় বস্তুই বটে, কিন্তু যে রূপ বা expression ব্যতীত তাহা কাব্য হইয়া উঠিত না, তাহা কবির নিজস্ব। তাহা ওই বিষয়বস্তুর মধ্যেই ছিল, এমন কি তাহারই জন্য ওই রসরূপ সম্ভব হইয়াছে, অতএব বিষয় বস্তুই মূল, এবং কবির কৃতিত্ব অনেক পরিমাণে তাহারই উপরে নির্ভর করে বলিয়া যাঁহারা মনে করেন, তাঁহারা কাব্যকেও যেমন পূরাপূরি স্বীকার করেন না, কবি-শক্তিকেও তেমনই সম্যক সম্মান করেন না। ইহার জন্য কাব্যবিচারে অবান্তর প্রশ্নের অবতারণা হয়—রসিকেরও রস-গ্রহণে নানা বাধার সৃষ্টি হয়। এই বিষয়বস্তুর উপরেই অতিরিক্ত ঝোঁক দেওয়ার ফলে কবি ও কাব্য উভয়েরই মর্য্যাদা খর্ব্ব করা হয়। আমি বিষয়বস্তুকে একেবারে উড়াইয়া দিয়া নির্ব্বিশেষ রস-তত্ত্বের আলোচনাকেই কাব্য-বিচারে প্রশ্রয় দিবার পক্ষপাতী নই। এই জন্যই কাব্যের শুধু রস নয় রসরূপের কথাই বারংবার বলিয়াছি—রূপ একটা কিছুর রূপ না হইয়া পারে না; এই রসরূপের উৎকর্ষ-লাভ করিতে হইলে বিষয়বস্তুর বিস্তার ও গভীরতার মধ্যে কল্পনার অবকাশ চাই তাহা না হইলে কাব্য good poetry হইতে পারে, কিন্তু great poetry হইতে পারে না, ইহা আমিও মানি। কিন্তু বিষয় হইতে সেই রূপের উদ্ভাবনী, এমন কি, বিষয়ের গভীরতা, অথবা সীমার সীমাহীনতাকে প্রকাশিত করা—তুচ্ছকে উপাদেয়, ক্ষুদ্রকে বৃহৎ, সামান্যকে অসামান্য করিয়া তোলা—বস্তুর বস্তুত্বকে রূপান্তরিত করা—কবির কাজ, এবং তাহা সম্ভব হয়

কবির সেই অলৌকিক শক্তিরই বলে—যাহাকে বাণী-প্রতিভা বলে। অতএব সকল কবিত্ব এই বাণী-সৃষ্টির মধ্যেই আছে—বর্ত্তমান প্রসঙ্গে ইহাই আমার প্রধান বক্তব্য।"

* * *

এ বিষয়ে ভ্রান্ত ধারণার কথা বলিয়াছি, তাহার একটা সুলভ দৃষ্টান্ত আছে। Fitzeraldএর Omar Khyyam লইয়া কাব্য-রসিক ও সমালোচক মহলে আজও পর্য্যন্ত নানা মন্তব্য ও গবেষণার অন্ত নাই। যেহেতু Fitzerald-এর কাব্যখানি একখানি অনুবাদ-গ্রন্থ, মূল Omar Khyyamএর রুবাই গুলির সংখ্যানুক্রমিক অনুবাদ—সেই হেতু পণ্ডিত সমাজে এই ফার্সী কবিকে লইয়া, তাঁহার মূল রচনা, তাঁহার ধর্ম্মমত, ও দার্শনিক মনোভাব প্রভৃতির সম্বন্ধে, পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা নিরন্তর বাড়িয়া চলিয়াছে। ওমার এতদিন অখ্যাত ছিলেন; তিনি যে জাতির কবি, যে সাহিত্যে তাঁহার স্থান, সেই জাতির মধ্যে ও সেই সাহিত্যে তিনি কবি হিসাবে বিশেষ উচ্চ আসন লাভ করিতে পারেন নাই। ঊনবিংশ শতাব্দীর একজন ইংরেজ কবি তাঁহার রুবাই গুলির মধ্যে নিজ ভাবকল্পনার উদ্দীপন-বস্তু লাভ করিলেন, তাঁহার নিজস্ব ভাব-দৃষ্টির সাহায্যে ওমারের কবিতার চক্ষে তিনি এমন একটি কটাক্ষ-ভঙ্গি দেখিলেন যে তাঁহার নিজের কবি-চৈতন্য জাগ্রৎ হইয়া উঠিল; ওমারের কবিতাগুলির উপরে দাগা বুলাইবার ছলে তিনি যাহা রচনা করিলেন, তাহা যে কাব্য হিসাবে একটা স্বতন্ত্র নিজস্ব সৃষ্টি—রসজ্ঞ পাঠক সমাজে সে বিষয়ে কোনও তর্কই উঠিতে পারে না। অনুবাদ যতই সঠিক হউক, তাহা মৌলিক সৃষ্টি নহে, অতএব [illegible] সাহিত্যিক মূল্য যত বাহাই হোক তাহাতে সেই দিব্যবাণী-[illegible], যাহা কবির স্বতন্ত্র ও স্বাধীন ব্যক্তিত্ব হইতেই সম্ভব হয়।

Fitzeraldএর কাব্যে সেই দিব্য প্রেরণার যাদুমন্ত্র আছে—যাহাকে আমি expression বলিয়াছি তাহাই পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান, সেই অনির্ব্বচনীয়তার বাঙ্ময় কটাক্ষ প্রতি ছত্রে স্ফুরিত হইতেছে। ইহার কারণ, ওমারের রুবাইগুলিকে উপাদান বস্তুরূপে আশ্রয় করিয়া কবি এমন এক রস-রূপের সৃষ্টি করিয়াছেন যাহা তাঁহারই মানসসরোবরের সামগ্রী—যে ভাব, যে জাতি ও যে যুগের প্রচ্ছন্ন গূঢ় প্রবৃত্তি তাঁহার ব্যক্তি-চৈতন্যের ভিতর দিয়া প্রকাশপথ খুঁজিতেছিল, ঘটনাক্রমে তাহার বিষয়-উপাদান যোগাইল, এক দূর কাল ও দূর দেশের অখ্যাত কবির কতকগুলি শ্লোক। তবে কি ওমার যে কথাটা যে ভাবে বলিতে গিয়া ভালো করিয়া বলিতে পারেন নাই, সেই কথাটা তাঁহারই মত করিয়া অথচ আরও সুপরিস্ফুট করিয়া একালের কবি প্রকাশ করিয়াছেন? তাহাও নহে; Fitzeraldএর কাব্যের রসরূপ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র—সে রূপ তাঁহারই কবিচিত্তের নিজস্ব expression—ওমারের কাব্যের সহিত তাহার চিন্তাগত সাদৃশ্য থাকিলেও—তাহার রূপ-সাদৃশ্য নাই; রসের ক্ষেত্রে যদি এক চুলও বৈসাদৃশ্য ঘটে তবে তাহা যে আকাশপাতালের মত প্রভেদ, একথা রসজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন। এই জন্যই মূল Omarএর কবিতায় যে মনোভঙ্গির পরিচয় আছে, ইংরেজী কাব্যে ঠিক তাহা নাই—ইহার কারণ বিস্মৃত হইয়া অরসিক পণ্ডিতেরা যাঁহারা Fitzerald অপেক্ষা ওমারকেই মৌলিক ও সেই হেতু শ্রেষ্ঠতর মনে করেন—তাঁহারা ওমারের ধর্ম্মমত ও দার্শনিক মতবাদের গবেষণায় মাতিয়া উঠেন। ওমারের মূল ফার্সী আমি পড়ি নাই অতএব তাঁহার রুবাইগুলির রসরূপ কেমন তাহা জানি না—কোনো অনুবাদের সাহায্যেই তাহা জানা সম্ভব নয়, কারণ কাব্যের expression একেবারে মূল ভাষার মধ্যে আবদ্ধ থাকে।

তথাপি ইহা জানি যে আধুনিক সাহিত্য-জগতের রসিক সমাজ Fitzeraldকেই ওমার খৈয়াম বলিয়া জানেন—Fitzeraldএর কাব্যে সরস্বতীর সেই ইংরেজী বাগ্‌-বিভূতিই তাঁহাদের রস-পিপাসা তৃপ্ত করিয়াছে—মূল Omar Khyyamএর সঙ্গে প্রায় কাহারও পরিচয় নাই। যদি মূল ওমারের কবিতা উপভোগ করিতে হয় তাহা স্বতন্ত্র ভাবেই করিতে হইবে, এবং তাহার যদি কোনও রসরূপ থাকে তবে তাহাও স্বতন্ত্র।

* * *

কিন্তু তাহা কেহ মনে করেন না। Fitzeraldএর কবিতায় যে রস আছে তাহাই আরও নির্ম্মল ও খাঁটি হইয়া বিরাজ করিতেছে মূল ফার্সী কবিতাগুলির মধ্যে—Fitzerald যাহার অনুবাদ করিয়াই এমন রস পরিবেশন করিয়াছেন, না জানি তাহার অবিকৃত রূপ আরও কত সুন্দর—এইরূপ একটা রসজ্ঞানহীন ধারণার বশে, ওমার খৈয়ামকে লইয়া বড়ই মাতামাতি পড়িয়া গিয়াছে। কাব্যের form যে কি বস্তু, ভাষার বিশিষ্ট বাণীবিগ্রহ যে কাব্যরসের আদি ও শেষ অবলম্বন—এই অতিশয় প্রাথমিক তত্ত্বটি না বুঝিয়া যে সকল পণ্ডিত কাব্যবিচার করিয়া থাকেন তাঁহাদের দ্বারা কবির প্রতি যে কতদূর অবিচার হইতে পারে—Fitzeraldএর কাব্য লইয়া এইরূপ বিতর্ক ও গবেষণা, ইংরেজী কবিতাগুলিকে উল্লঙ্ঘন করিয়া ফার্সি কবিতার প্রতি অত্যধিক পক্ষপাত, এবং Fitzeraldকে মাত্র অনুবাদক হিসাবে কিঞ্চিৎ গৌরবদান—তাহারই একটি জলন্ত দৃষ্টান্ত। কবির মৌলিক প্রতিভা, তাঁহার নিজস্ব রস-কল্পনা যে কত বস্তুকে কত ভাবে আশ্রয় করিয়া অভিনব কাব্যসৃষ্টি করিয়া থাকে, তাহার দৃষ্টান্ত সাহিত্যের ইতিহাসে সুপ্রচুর। ওমারের মূল ফার্সি-শ্লোকগুলিকে সম্পূর্ণ গ্রাস করিয়া Fitzerald

তাহার উপরে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাষায়, ভিন্ন ঝঙ্কারে যে বাণী-রূপের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, সেই রূপ, সেই বাণী তাঁহার নিজস্ব; ওমারের কবিতা যদি এখানে দেহরূপেও বিরাজ করিয়া থাকে, তবে সেই দেহের লাবণ্য Fitzerald-এর দান; ওমারের কাব্য-দুহিতাকে যেন এই আধুনিক কবি কোন এক পরমক্ষণে কি এক ভাবের বশে বরণ করিয়া, তাহার চক্ষে আপন স্বপ্ন পরাইয়া দিয়াছেন—চক্ষু সেই চক্ষু বটে, কিন্তু যে অঞ্জন-শোভা ও কটাক্ষ-গুণে সে আজ রসিকজনের চিত্ত হরণ করিতেছে—তাহা যে Fitzeraldএর কীর্ত্তি, ওমারের নহে—কারণ কাব্যে form বা expression যে রসের মূলাধার—এ কথা কোন রসিক ব্যক্তি অস্বীকার করিবেন? ওমারের মূল ফার্সী কবিতাগুলির সম্বন্ধে জোর করিয়া কিছু বলিবার ক্ষমতা আমার নাই—সে কবিতার যদি কোনও উৎকৃষ্ট রসরূপ থাকে, তবে তাহা স্বতন্ত্র—তাহা উপভোগ করিতে হইলে মূল ফার্সীতেই করিতে হইবে—তাহার ভাব-অর্থ ভাষান্তরিত করিয়া Fitzeraldএর ইংরেজীর পাশে দাঁড় করাইলে তাহার কোন মর্য্যাদাই থাকিবে না—অনুবাদ অপেক্ষা মূলের মূল্য অধিক বলিয়া অতিশয় বেরসিকের মত কলরব করিলে তাহা প্রকৃত রসিকের নিকটে হাস্যকর হইবে। Fitzeraldএর কাব্য যদি অনুবাদমাত্র হইত, যদি তাহার মধ্যে মৌলিক রস-প্রেরণার যাদুমন্ত্র না থাকিত, তাহা হইলে জগতের সাহিত্যে সে কাব্য এমন স্থান লাভ করিত না—যে সকল অনুবাদ-কাব্য অনুবাদ হিসাবেই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে Fitzeraldএর কাব্য সে জাতীয় নহে। তাহা ফার্সীর অনুবাদ বলিয়া নহে—আধুনিক যুগের একখানি খাঁটি ইংরেজী কাব্য—তাহার expression বা বাণী-রূপ তাহারই; সে রূপ আর কোনও কবি সৃষ্টি করিতে পারিতেন না, সে বাণীভঙ্গি ঐ

ইংরেজী ভাষা ভিন্ন আর কোনও ভাষায় সম্ভব নহে। এই জন্যই তাহা মৌলিক সৃষ্টি, অনুবাদ নহে। পূর্ব্বে বলিয়াছি, অনেক উৎকৃষ্ট কাব্যের উৎকৃষ্ট অনুবাদ আছে—যে পরিমাণে মূলের ভাব অক্ষুন্ন রাখিয়া বিশুদ্ধ ও সুললিত ভাষায় তাহা সম্পন্ন হইয়াছে, সেই অনুসারে তাহার মূল্য নিরূপণ হইয়া থাকে। ইংরেজীতে হোমার, দান্তে, গ্যেটে প্রভৃতির একাধিক উৎকৃষ্ট অনুবাদ আছে—এক একটি এক এক দিক দিয়া ভালো হইয়াছে; কিন্তু তাহাদের কেহ মূল কাব্যের উপরে বা পাশে দাঁড়াইতে পারে এমন ধারণাও বাতুলেরই সম্ভব। এখন যে কেহ কোন নূতন অনুবাদ করিবেন তাঁহাকে মূল কবির আরাধনা করিতে হইবে। কিন্তু ওমারের সম্বন্ধে একথা খাটে না—অনুবাদ করিতে হইলে Fitzeraldএর ইংরেজী হইতেই করিতে হইবে; যিনি তাহা করিবেন না তিনি পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিতে পারেন, কিন্তু রচনায় রসসঞ্চার করিতে পারিবেন না। যদি আর কোনও কবি, Fitzeraldএর মত, সেই মূল কবিতা গুলিকে অবলম্বন করিয়া আরও কোনও ভাষায় নূতন রসরূপ সৃষ্টি করিতে পারেন—সে কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু এ পর্য্যন্ত আর কেহ তাহা পারেন নাই, এবং পারিবেন না, ইহাও নিশ্চয়। এপর্য্যন্ত Fitzeraldই ওমার, অন্ততঃ কাব্যের ক্ষেত্রে আর কোনও ওমার নাই। দেখিয়া আশ্চর্য্য হই নাই যে বাংলা ভাষায় Fitzeraldএর যে তর্জ্জমা গুলির সংখ্যা ক্রমেই বাড়িয়া চলিতেছে তাহাদের মূল Fitzerald—ফার্সী বা ফার্সীর ইংরেজী 'অনুবাদ' নহে; কিন্তু ইতিমধ্যেই এই নকল ওমার-খৈয়ামকে ত্যাগ করিয়া আসল ওমার খৈয়ামের উদ্দেশে ধাওয়া-করা সুরু হইয়াছে। Fitzerald [illegible]ক দিয়াছেন, মাত্র কয়েকটি রুবাই লইয়া কি. হইবে? [illegible]-এর সংখ্যা আরও কত বেশি! তা' ছাড়া, Fitzerald

ওমারের ভাব ঠিক ধরিতে পারেন নাই। অতএব এক্ষণে মূল ওমারের (অনুবাদের) অনুবাদ করিয়া পুস্তকের স্থূলত্ব সম্পাদনে ও ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে সাড়ম্বর বিজ্ঞাপনের সুবিধা হইয়াছে। অনুসন্ধিৎসু পণ্ডিত ব্যক্তির নিকট এইরূপ গ্রন্থের মূল্য থাকিতে পারে; কিন্তু ইংরেজী কাব্যখানি যে কারণে যে আদর পাইয়াছে তাহার যে রসরূপ একালের রসিক সমাজের মনোহরণ করিয়াছে, ওমারের যে পরিচয় তাহাতে আছে—মূল, মূলের অনুবাদ, অথবা অনুবাদের অনুবাদে তাহা অবশ্যই নাই, একথা বলাই বাহুল্য।

* * *

Fitzeraldএর ওমার খৈয়াম প্রকাশিত হওয়ার পরে আজ পর্য্যন্ত এই পারসীক কবির মূল কবিতা, তাঁহার জীবন-কাহিনী ধর্ম্মমত ও দার্শনিক মতবাদ সম্বন্ধে আলোচনা ও গবেষণার অন্ত নাই তাহাতে Fitzeraldএর কাব্য নিরতিশয় ক্ষুদ্র হইয়া গিয়াছে। অর্থাৎ, যে কাব্যখানি ওমারের নামটিকে বিস্মৃতির গহ্বর হইতে তুলিয়া আনিয়াছে, এবং যে কাব্যের বাহিরে কবি হিসাবে ওমারের অস্তিত্ব নাই বলিলেও চলে—কারণ, মূল ফার্সী-কাব্য বিশ্বসাহিত্যে এখনও সেই স্থান অধিকার করে নাই—সেই কাব্য অপেক্ষা এই সকল গবেষণা মূল্যবান হইয়া উঠিয়াছে। Fitzeraldএর কাব্যেই যে কবিজীবন, কবিচিত্ত বা কবি-মানস একটি অপূর্ব্বরূপে বিশ্ববাসীর মনোহরণ করিয়াছে—তাহার জন্মস্থান ও বাসভূমি যে ঐ কাব্যের বাহিরে অন্যত্র কোথায়ও অনুসন্ধান করার প্রয়োজন নাই—কাব্যরসপিপাসুর পক্ষে এইরূপ ধারণাই স্বাভাবিক। কিন্তু যাহারা কাব্যরস আস্বাদনে অসমর্থ, তাহারা কাব্যাতিরিক্ত অবান্তর বস্তু সম্বন্ধেই অধিকতর উৎসাহ প্রকাশ করিয়া থাকে—সকল কালে সকল কবির কাব্য সম্বন্ধেই এরূপ ঘটিয়া

থাকে। রস অপেক্ষা তথ্য ও তত্ত্ব, কবির কবি-পরিচয় অপেক্ষা তাঁহার জীবনেতিহাস, কাব্যবিশেষের রূপ-সৃষ্টি অপেক্ষা সেই কাব্যের বিষয়-সংক্রান্ত নানা কাহিনী, ও কাহিনী-সংক্রান্ত অশেষ বাদ-প্রতিবাদ এই সকলই পণ্ডিতগণের পাণ্ডিত্যের খোরাক জোগাইয়া থাকে। ঠিক এই কথাটি বহুদিন পূর্ব্বে একজন মহামনীষী সমালোচক বলিয়াছেন—

It is most laughable the way the public reveals its liking for matter in poetic works; it carefully investigates the real events or personal circumstances of the poet's life which served to give the motif of his works; nay, finally, it finds these more interesting than the works themselves, it reads, more about Goethe than what has been written by Goethe, and industriously studies the legend of Faust in preference to Goethe's Faust itself.

অর্থাৎ যাহারা অরসিক তাহারা কাব্যের রস-আস্বাদনে বঞ্চিত হয় বলিয়া নানাবিধ গবেষণার দ্বারা আত্মপ্রসাদ লাভ করে। তাহাদের নিকটে রস-রূপের মূল্য নাই বলিয়া অন্যবিধ মূল্যের প্রয়োজন হয়। Goethe-এর Faust পড়িয়া তাহাদের তৃপ্তি হয় না; Faust সম্বন্ধে যত কাহিনী ও কিম্বদন্তী আছে, কবি তাঁহার কাব্যের জন্য কোথা হইতে কি উপায়ে মাল মসলা আহরণ করিয়াছেন, তাহারই গবেষণায় তাহারা পরস্পরের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। তাহারা মনে করিতেই পারে না যে, গোটের Faust গ্যেটেরই সৃষ্টি, সে Faust আর কোথায়ও নাই, তাহার সমগ্র রস-রূপ ঐ কাব্যখানিরই বাণী-দেহে বিরাজ করিতেছে—গ্যেটে যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা যদি উৎকৃষ্ট কাব্য [illegible] হইয়া থাকে, তবে তাহার আদি ও শেষ ঐ কাব্যের মধ্যেই আছে,

তাহার বাহিরে কিছুই নাই, কারণ সকল সৃষ্টির মত সাহিত্যের সৃষ্টিও অভিনব, তাহার দোসর নাই—আর কিছুকে দিয়া তাহার যাচাই হয় না। Fitzeraldএর কাব্য সম্বন্ধেও ওই একই কথা; কারণ তাহাতেও সত্যকার কাব্য-সৃষ্টি হইয়াছে; তাহার মূল কোথায়, কোন প্রাচীনতর কবির রচনা হইতে তিনি তাঁহার কাব্যের বিষয়-বস্তু সংগ্রহ করিয়াছেন, —সেই উপাদান তিনি কি পরিমাণে কি প্রকারে ব্যবহার করিয়াছেন, সেখানে কি ছিল এখানে কি নাই, এ কাব্যের অন্তর্গত ভাব-চিন্তার জন্য আধুনিক কবি প্রাচীন কবির নিকট কতখানি ঋণী—কাব্য-বিচারে এ সকল কথাই অবান্তর; কেন অবান্তর, তাহা যদি এখনও বুঝাইতে হয়, তবে এ ধরণের আলোচনা পণ্ডশ্রম মাত্র। কাব্যে বিষয়বস্তু অপেক্ষা তাহার রসরূপই বড়, রসবিচারে আর কিছুই বিবেচনার যোগ্য নহে—এই কথাটাই এতক্ষণ ধরিয়া সাধ্যমত বলিতে চেষ্টা করিয়াছি। পূর্ব্বোক্ত মনীষীর কথাই উদ্ধৃত করিয়া এই দীর্ঘ আলোচনা সমাপ্ত করি।

The preference for matter to form is the same as a man ignoring the shape and painting of a fine Etruscan vase in order to make a chemical examination of the clay and colours of which it is made. The attempt to be effective by means of the matter used, thereby ministering to this evil propensity of the public, is absolutely to be censured in branches of writing where the merit must lie expressly in the form; as, for instance, in poetical writing.

এ প্রসঙ্গে আমার আর কিছু বলিবার নাই। আমাদের নব্য সাহিত্যের বয়স এখনও একশত বৎসর পূরে নাই, সমালোচনা-

সাহিত্যের জন্যই হয় নাই। রবীন্দ্রনাথ যেটুকু চেষ্টা করিয়াছিলেন তরুণ-আন্দোলনে তাহাও ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; রসের কোনও আদর্শই আর নাই; রসবোধ একটা ব্যাধি বলিয়া উপহাসের বিষয় হইয়াছে। 'চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী', তার উপর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি-ধারী দিগ্‌গজেরা যেরূপ শুণ্ড আস্ফালন করিতে সুরু করিয়াছেন, তাহাতে সাহিত্যের অরাজক শীঘ্র ঘুচিবে বলিয়া মনে হয় না।

ডাক্তার—আপনি কি অত্যধিক ধূমপান করেন?

রোগী—জীবনে কখনো ধূমপান করি নাই।

ডাক্তার—আমার মনে হইতেছে আপনি বড় বেশি মদ্যপান করিতেছেন।

রোগী—আমি চিরদিন মদ্যপানের বিরোধী।

ডাক্তার—অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত বাহিরে কাটান?

রোগী—প্রতি রাত্রে ঠিক দশটাতেই শয্যাগ্রহণ করি।

ডাক্তার—তবে কিসের জন্য বাঁচিতে চান?

বাংলা ভাষার নূতন বিপদ—শহরে বেরিবেরি হওয়ার দরুন যে সব বাঙালী ভাত বন্ধ করিয়া রুটি খাইতেছে—শুনা গেল তাহাদের অধিকাংশই হিন্দি বলিতে আরম্ভ করিয়াছে।

পলিটিক্যাল প্রেম

১

মোটা আর বেঁটে, কুচ্‌কুচে কালো, খোঁচা খোঁচা গোঁফ দাড়ী
তাহাদের যবে আমল দিল না যুবতী রূপসী নারী,
মেলিয়া দশন জুটিল তখন পরিয়া সেলিম জুতো
রোগা ও লম্বা ফর্সা-কান্তি কামানো যুবক-যুথ!
যুবতীরা মৃদু হেসে
তাদেরও কহিল,—"কল্কে পাবে না! মিছিমিছি আর এসে
সময় নষ্ট করিও না রাত দিন!"
রোগা-মোটা-বেঁটে-লম্বা-ফর্সা-কালো-গুঁফো-গোঁফহীন
চীৎকার করি তর্জ্জনী তুলি' কহিল, "আচ্ছা, বেশ!
Anti-যুবতী 'movement' করি' জাগাব আমরা দেশ!"

২

স্বপ্নে শুনিনু হাটে মাঠে বাটে চেঁচাইছে কংগ্রেস্—
"যুবতীর মোহ আজি হতে হায় হউক বিনিঃশেষ
চাহিনাক ষোল, চাহিনা সতেরো, চাহিনা উনিশ, কুড়ি
ভাল আমাদের সেকেলে ঠান্‌দি—পাকা, খানদানি বুড়ী!
যুবতী নয়ন-শর
হইতে রক্ষা কর কর দেশ!—ধর মোহ-মুদ্গর!"

স্বপ্নে দেখিনু হুজুকে যুবকদল
বুড়ীদের সাথে প্রণয় করিয়া ঘামিছে অনর্গল !
এবং ভাবিছে স্বদেশের তরে মহাত্যাগ করিয়াছে
প্রণয় ব্যাপারে যুবতী ছাড়িয়া বৃদ্ধারে বরিয়াছে !

৩

কিন্তু হায় রে জব্দ হল না চপল যুবতী দল
প্রতিটি অঙ্গে আছে যে তাদের মনোহরণের ছল !
মনের মানুষ আসিল তাদের রঙীন ফানুসে দুলে
তন্বী-নয়ন-বহ্নিতে প্রাণ সঁপিতে সকল ভুলে !
হুজুকে যুবক গণ
জীর্ণ বুড়ীর শীর্ণ গালেতে যত করে চুম্বন
কিছুতেই যেন জমে না প্রণয় হায় !
হৃদয় তাদের যুবতীরই গায়ে লুটায়ে পড়িতে চায় !
অমনি আসিয়া ঠান্‌দির দল—অহিংস ঠোনা তুলি
চুম্‌কুড়ি দিয়া শোনায় তাদের গীতার মামুলি বুলি !

*　　*　　*　　*

ঘুম ভেঙে দেখি ঘামে ভিজে গেছে খদ্দরের ফতুয়াটি
পকেটেতে ছিল কাঁচি সিগারেট তাও হয়ে গেছে মাটি !
তবু ধরাইয়া তাই
স্বপনের কথা ভাবিতে ভাবিতে ভুলিতে লাগিনু হাই !

———

চলচ্চিত্র

Primary Education in the City

(Direct Method)

কলিকাতা শহরে প্রাথমিক শিক্ষার বন্দোবস্ত

শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা

"হরিজন লাগি—"

অন্তর এবং বাহির যদি এক হইত

বৈষ্ণব শ্রীমধুসূদন

অন্তর এবং বাহির যদি এক হইত

মিঃ আই. সি. ব্যানার্জ্জি (অব. বীরসিংহ)

বরষা-বিদ্ধ

গগন ছাইল মেঘে পবন বহিছে বেগে
আসরেতে নেমেছে আষাঢ়,
গুরু গরজন হয় মনেতে ঘনায় ভয়,
ওদিকে যে আমার বাসার
চালেতে নাহিক খড়, বৈশাখীর কাল ঝড়
করে গেছে সেথা মহা রণ,
ঘরেতে ঢুকিবে জল, বাতায়ন অনর্গল,
প্রাচীরেও ধরেছে ভাঙন !
পাশেই পুকুর পানা উপচিয়া তার কানা
আসিবে যা' নহে তা' অমিয় !
পাড়া গাঁয়ে করি বাস না করিয়া পরিহাস
ওহে বন্ধু, আমারে ক্ষমিও।
'ডেলি প্যাসেঞ্জার' ভাই চাকুরি করিয়া খাই
মাহিনাও গিয়াছে কমিয়া
আষাঢ়ের সমাগমে ওরে ভাই তাই ক্রমে
অতিশয় গিয়াছি দমিয়া।

কালিদাস পড়িয়াছি এম-এ পাশ করিয়াছি,
জানি বর্ষা-মঙ্গলের গান ;
আষাঢ়ের মেঘোৎসবে অশনির ঘন রবে
প্রাণও মোর করে আনচান।

কিন্তু সে ভাবে নয় যে ভাবে করিলে হয়
স্থমার্জ্জিত কবিতা পোষাকী—
হেরি ঘোর মেঘোদয় প্রেম নয়, জাগে ভয়
কহ সখা, করিছ গোসা কি ?
ইন্দ্রনীল মণিময় শৈল-বিহারিণী নয়
কেরানী-ঘরণী মোর প্রিয়া
নাহি লীলা শতদল (শতমুখী তার বল !)
কভু বাম পদাঘাত দিয়া
ফোটায় নি অশোকেরে, সোহাগিয়া বকুলেরে
মুখমদে করেনি বিকাশ ।
খায় দায় চুল বাঁধে ছেলে পোষে, ভাত রাঁধে
অস্থখেতে ভোগে বারমাস !
আসন্ন-প্রসবা প্রিয়া সাতটি সন্ততি নিয়া,
বক্ষে বহি দুঃখ অগণন,
যে ভাবে কাটায় কাল তার ছন্দ লয় তাল
মেঘদূতে করেনি বর্ণন !
প্রেয়সীর কথা স্মরি' মরমে যেতেছি মরি
হয়ত সে এতখন উঠে,
ভারাক্রান্ত দেহটারে আস্ফালিয়া চারি ধারে
ছুটে ছুটে সামালিছে ঘুঁটে !

*   *   *

*   *   *

২

আকাশে ঘনায় মেঘ কমিছে ট্রেনের বেগ
'মশা গ্রাম' পড়িল আসিয়া,
ছুটি ক্রোশ এ বাদলে যেতে হবে পায়দলে
তবে বাড়ী পঁহুছিব গিয়া।
ষ্টেশন হইয়া পার দেখিলাম আঁধিয়ার
চারিধার কালো মেঘে ঢাকা।
ক্ষেত-ভরা কচি ধান করে যেন ধারা-স্নান
মেলিয়া সবুজ কচি পাখা।
দেখি কিছু দূর গিয়া উঠিয়াছে শিহরিয়া,
কদম্ব তরুটি ফুলে ফুলে ;
কেতকী সুরভি নিয়া বায়ু বহে পূরবীয়া
বাঁশবন ওঠে দুলে দুলে !
আঁধার ঘনায়ে আসে ঝিল্লীরব আশে পাশে,
ডাকে দূরে উন্মাদ দাদুরি ;
সামালিয়া সিক্ত বাসে মোরে হেরি মৃদু হাসে
ছুটে চলে ধোপানী 'আদুরি'।
গাধাটি তাড়ায়ে তার, পিছু ফিরে আর-বার
মোর পানে দেখিল তাকায়ে
আকাশে বিজলী-রেখা কালো মেঘে কি যে লেখা
লিখে গেল আঁকায়ে বাঁকায়ে !

* * *

* * *

আনিতে ভুলেছি ছাতা চলিয়াছি খালি মাথা,
জল ঝরে মুষল ধারায় ;
ধুয়ে মুছে গেল সব মনে হল কি উৎসব,
—কেরানীরও পরাণ হারায় !
মনে হল দারিদ্র্যের 'চিত্রকূটে', বিরহের
তমসায় রয়েছি একাকী ;
আষাঢ়ের মুগ্ধ হিয়া পড়িতেছে বিগলিয়া
দয়িতার মিলিবে দেখা কি ?
সহসা পড়িল মনে যৌবনের শুভক্ষণে,
একদিন মেঘের আশায়
কবি সত্যেন্দ্রের সাথে গলা মিলাইয়া ছাতে,
অমাদের মেসের বাসায়—
ঢালি দিয়া প্রাণ মন 'যক্ষের নিবেদন'
তার স্বরে করেছিনু পাঠ—
"পিঙ্গল বিহ্বল ব্যথিত নভতল কই গো কই মেঘ উদয় হও
সন্ধ্যার তন্দ্রার মূরতি ধরি আজ, মন্দ্র-মন্থর বচন কও !"

* * *

একদিন এ কবিতা স্বপ্নময় প্রথম যৌবনে
বহু বর্ষ আগে
উদ্বোধিত করেছিল উচ্ছ্বসিত কত আকুলতা
মুগ্ধ অনুরাগে।
ব্যথিত গগন পরে বিছাইয়া শ্যাম স্নেহ-স্তর
আজিও এসেছে ওই আষাঢ়ের নব জলধর
দিগন্ত ব্যাপিয়া,

কেতকী-কদম্ব বনে আজও দেখি আমার অন্তর
মরিছে কাঁপিয়া !

রিম্ ঝিম্ রিম্ ঝিম্ রিম্ ঝিম্ রিম্ ঝিম্
ধ্বনিতেছে বর্ষণের সুর,
পারাইয়া মাঠ বন চলিয়াছি আনমন
অলকা পুরী সে কত দূর ?

"বনফুল"

শেষ শ্রাদ্ধ

১৩

শিবনাথের রীতিমত একটা চিকিৎসার বন্দোবস্ত করা দরকার বিবেচনা করিয়া, কি করিলে ভাল হয় যুক্তি করিবার জন্য আশুবাবু পরদিন হরেন্দ্র রাজেন্দ্র প্রভৃতিকে ডাকাইয়া আনিলেন, অজিত ও কমল ঘরেই ছিল। আশুবাবু সর্ব্বাগ্রে কমলকে বলিলেন, "শিবনাথের ভার তোমাকেই নিতে হয়, নিজের স্বামীকে যদি না দেখ আমি যে মারা যাই। হতভাগা মেয়েটাও হয়েছে শিবনাথের এমনি ন্যাওটা যে একতিল ছাড়তে চায় না, দিনরাত রুগীর বিছানায় শুয়ে আছে। শরীরটাও ওর গেল ঐ করে, যাই হোক ওষুধ পত্রের খরচা না হয় আমি দেব—"

কমল বাধা দিয়া বলিল, "থামুন, একটা কথা আগে পরিষ্কার হওয়া দরকার। শিবনাথ নামে এই লোকটি যে আমার স্বামী তা আপনাকে

বললে কে? যতদিন দু'জনের ভালবাসা ছিল ততদিন হয়ত এক সঙ্গে কাটিয়েছি, এইমাত্র। সে সব সুখের স্মৃতিগুলো যদিও আজ মনের মধ্যে এক একটি হীরের টুকরার মত অত্যন্ত সাবধানে লুকিয়ে রেখেছি, বর্ত্তমানে লোকটার প্রতি আমার মন বিতৃষ্ণায় ভরে গেছে, ঘৃণা ব্যতীত এখন আর কিছুই দেবার নেই। যে সব গুণগুলি আনন্দ দিয়েছিল তাদিগে সুখের পায়রার মত বুকের বাসায় পূরে রেখেছি, এই যা।"

আশুবাবু কহিলেন, "না না, এই সামান্য কারণে তুমি স্বামী ত্যাগ করবে! সে কি হয়?"

ঈষৎ হাসিয়া কমল বলিল, "বাইরে যদি আলো জ্বলে তবুও পিছন ফিরে ঘরের অন্ধকারের পানে তাকিয়ে থাকতে হবে? কিন্তু বোধ করি এ প্রশ্ন আশুবাবুর কানে গেল না, তিনি নিজের ঝোঁকেই বলিতে লাগিলেন, "আজকাল নারীদের স্বাতন্ত্র্যের নাম দিয়ে বিলাতের অনুকরণ করাটা ফ্যাশান হ'য়ে দাঁড়িয়েছে বটে। কিন্তু ওতেই মরণ হবে তোমাদের তা বুঝতে পারছি,—" বস্তুতঃ তাঁহার রোখ চাপিয়া গিয়াছিল, "ওদের ভাবনা কি বলনা, মা-ই কি বাপই কি, পক্ষান্তর গ্রহণ করলেই পূর্ব্বপক্ষের ছেলে মেয়েগুলির কত রকম ব্যবস্থাই না ওরা করে ফেলে, তা ছাড়া ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে মেয়েরা ওসবের হাত এড়াবার জন্য কত রকম কৌশলই না করেচে, এখানে ত সে সব সহজে হবে না, কতকগুলো চোর ছেঁচড়, বদমায়েস, দাগাবাজের জন্ম দেওয়া বই আর কিছুইত হবে না!"

অজিত স্তব্ধ হইয়া রহিল, সতীশ ও হরেন্দ্রের বিস্ময়ের পরিসীমা নাই। এই সাহেবী চালচলনের লোকটি আজ বলে কি? আশুবাবু কমলের দিকে ফিরিয়া কহিলেন,—

"বুঝলে ত এইবার কেন তোমাকে এ অনুরোধ করেছিলাম?"

"না!"

"না? না কেন?"

"বিলাতের ব্যবস্থাগুলো পরিত্যাগ করে মান্ধাতার আমল থেকে যা চলে আসছে তাই গ্রহণ করবার কথা বলছিলেন। স্ত্রীলোক একটি মাত্র পুরুষ ছাড়া ভাল বাসতে পারবে না এই ব্যবস্থাই যদি মান্ধাতার যুগ থেকে চলে এসে থাকে, তাই বলে কি সেটা যুক্তিযুক্ত হ'য়ে যাবে, না সেই পচা জিনিষকে চালাবার চেষ্টা করলেই সেটা স্বদেশ প্রেম হবে? তা হবে না, বরং ওতে দেশের কল্যাণের দেবতা ক্ষুন্ন হবেন। যদি আপনার কাঁধে এমন একটি জাতের দাদ জন্মে থাকে যা আর কারও কাঁধে জন্মায় নি, তবে আপনার শরীর রক্ষার কি এই ধর্ম্ম হবে যে সেই দাদটিকে যত্নে পুষে রাখা? একটি নারীর একটি মাত্র স্বামী এই যে ব্যাধিটি সমাজের দেহে জন্মেছে সেও ওই দাদের মত দুর্গন্ধ আর বোধ করি তেমনিই দুরারোগ্য!"

আশুবাবু ব্যাকুল হইয়া কহিলেন, "তোমাকে তো বুঝতে পারলাম না কমল!"

"বোঝবার কথাও নয় আশুবাবু, এমনিই হয়। কিন্তু রাত্রি হ'ল বোধ করি, এইবার আমি উঠি।"

"যেয়ো না কমল, আমার আর একটা কথার জবাব দিয়ে যাও।"

সে সত্যসত্যই চলিয়া যায় দেখিয়া হরেন্দ্র একটু তফাৎ হইয়া দাঁড়াইল, তাহার আশঙ্কা হইতেছিল কমল এরূপ ক্ষেত্রে একটা dramatic move করিবেই, তবে তাহা অদ্য ঠিক কিরূপ আকারটি ধারণ করিবে তাহার নিশ্চয়তা কিছু ছিল না। ছেলেবেলায় হরেন্দ্র শুনিয়াছিল ভূত ছাড়িবার সময় একটা কোনো নিকৃষ্ট বস্তু সঙ্গে লইয়া যায়, যাহা অবশ্য

সামনে পড়ে। বস্তুত সে অপেক্ষা আর নিকৃষ্ট বস্তু পৃথিবীতে কি আছে? আজ কলিক, কাল মাথাধরা, পরশু কোষ্ঠবদ্ধ ইত্যাদি একটা না একটা ব্যায়রাম ত তাহার লাগিয়াই আছে। যাই হোক, তাহার ফাঁড়া কাটিল, কমল হঠাৎ রাজেন্দ্রের দুটি হাত ধরিয়া মুচকি হাসিয়া বলিল, "চল না ভাই আমায় পৌঁছে দেবে।" বলিয়া যেমন ধরিয়াছিল তদ্রূপই তাহার হাত দুইটি দক্ষিণ বাহুর বগলে চাপিয়া রাজেন্দ্রকে সে এক প্রকার পিছনে পিছনে টানিয়া লইয়া গেল।

পথে আসিয়া কমল রাজেন্দ্রকে বলিল, "দেখ, শুনেছি তুমি বিপ্লব-পন্থী, তাই যদি হয় তোমার বন্ধুত্ব অক্ষয় হবে!" পূর্ব্বেই বলিয়াছি যাহা আয়াসসাধ্য তাহারই উপর রাজেন্দ্রের বিরাগ, কমলের সহিত তাহার ইতিপূর্ব্বে মোটেই আলাপ হয় নাই অথচ পথে বাহির হইয়াই সে পিরীত জমাইতে চাহিল, ইহাতে রাজেন্দ্রের মন চটিয়া গেল। সে রুক্ষ স্বরে বলিল, "মেয়ে মানুষের বন্ধুত্বটা যে কি কাজে লাগবে তাই ভাবছি, না পারবে দৌড়তে, না পারবে গাছে চড়তে, না পারবে দোতলার ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়তে।" কমল বুঝিল ইহার অকলঙ্ক পুরুষ-চিত্ততলে আজিও কোন নারীর প্রকৃত স্বরূপ ছায়াপাত করে নাই, কহিল, "দেখ, যাকে চোনো না তাকে অশ্রদ্ধা করে' নিজেকে খাটো কোরো না। দরকার হলে আমরা সবই পারি।"

কিন্তু এ অনুযোগে লোকটি কুণ্ঠিত হইল না, বলিল, "তা হয়ত হতে পারে, কিন্তু সেটা পরীক্ষা সাপেক্ষ।" এই বলিয়া সে কমলকে চিন্তা করিবার অবসর না দিয়াই দৌড়িল। কমলের ন্যায় বুদ্ধিমতী নারীর পক্ষে বুঝিতে দেরী হইল না যে ইহা কেবল তাহাকে পরীক্ষা করিবার জন্যই। অগত্যা তাহাকেও দৌড়িতে হইল, সেও ছুটিতে পারিত মন্দ নয়। রাজেন কিয়দ্দূর গিয়া একটি বৃক্ষের অন্তরালে কমলের

জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। কমল সেখানে পৌঁছিতেই হঠাৎ লাফাইয়া আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া রাজেন বলিল, "শিবানি!"

"আমার এ নামটাও তুমি জানো না কি?"

রাজেন হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, "জানি। কর্ম্মের জগতে মানুষের ব্যবহারের মিলটাই বড়, হৃদয়ের নয়। দু'টো মনের কথা দু'জনে কইতে পারলেই বন্ধুত্ব হয় না, বরং এই যে একসঙ্গে দু'জনে এতটা দৌড়ে এলাম এতেই আমাদের বন্ধুত্ব পাকাপাকি হ'ল।" কমলও হাঁপাইয়া পড়িয়াছিল, জড়িতস্বরে বলিল, "সেদিন আমাদের বিবাহের অনুষ্ঠানে ফাঁকি ছিল, কিন্তু ফাঁক ছিল না, ভাবলাম এ ভালই হ'ল, ইচ্ছা করলেই একটা কাটান-ছেঁড়ান হয়ে যাবে, কোন বাঁধাবাঁধি রইল না!" রাজেন জিজ্ঞাসা করিল "এ কথার মানে?"

"মানে নেই, এম্‌নি!"

১৪

ইতিমধ্যে অনেক ব্যাপার ঘটিয়া গিয়াছে। আগ্রা শহরে ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারীরূপে দেখা দিয়াছে। হাওয়া বদলের নাম করিয়া শিবনাথ ও মনোরমা আশুবাবুর নিকট কতকগুলি টাকা লইয়া মাসকয়েক হইল ফেরার হইয়াছেন। আশুবাবু পুলিসে সংবাদ দিয়া উভয়ের ফোটো কাগজে ছাপাইয়া দিয়াছিলেন, যদি টাকাগুলো কোন প্রকারে উদ্ধার হয়। কিন্তু সি, আই, ডি বিভাগ হইতে সম্প্রতি সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাঁহারা উভয়ে কিছুদিন পূর্ব্বে কান্দাহারের এক হোটেলে কাবুলী স্ত্রীপুরুষ সাজিয়া হিং বিক্রয় করিতেছিলেন, তারপর সেই হোটেলের অনেক জিনিষপত্র লইয়া কোথায় পলাইয়াছেন তাহার

খবরাখবর নাই, তবে এ সম্বন্ধে আফগানিস্থান, পারস্য ও সুদূর চীন-দেশের পুলিসবিভাগে সংবাদ প্রেরণ করা হইয়াছে, তারপর ফলাফল সম্পূর্ণ ভগবানের উপর নির্ভর করিতেছে।

আশুবাবুর একটি অতি সৌখীন নেটের মশারি ছিল। বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি কমল সুচিবিদ্যায় অত্যন্ত পারদর্শী ছিল, কলিকাতার বড় বড় কারিগর তাহার নিকট হার মানিত। সে যে কোথাও কাহারও নিকট থাকিয়া এই বিদ্যা শিখিয়াছিল তাহা নহে, তাহার সকল বিদ্যার ন্যায় এই বিদ্যাটিও স্বোপার্জ্জিত, একদিন হঠাৎ কি করিয়া শিখিয়া ফেলিয়াছিল, তাহা কিছুই বলা যায় না। যাহা হউক, আশুবাবুর অনুরোধে তাঁহার পঞ্চষষ্ঠী গর্ভবাসোৎসব উপলক্ষে কমল এই মশারিটি স্বয়ং তৈয়ারী করিয়া তাহার উপর উপযুক্ত সুচিকার্য্য করিয়া তাঁহাকে উপহার দিয়াছিল। এখানে একটি কথা বলিয়া রাখা প্রয়োজন। গর্ভবাসোৎসব কথাটি বোধ করি অনেকেই বুঝিতে পারিতেছেন না। আশুবাবু জন্মোৎসবের পরিবর্ত্তে এই অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন করিতেন। তাঁর ধারণা ছিল মানুষের জন্মোৎসবটা কিছু নয়, বস্তুতঃ ওটা নিয়ে হৈ-চৈ করাটা নিতান্ত মূর্খামি, আসলে যেদিন তিনি মাতৃগর্ভে ধৃত হইলেন সেই দিনই তিনি জগতে পদার্পন করিলেন। হইলই বা তাহা অজ্ঞান ও অন্ধকারের যুগ, সৃষ্টির গোড়ায় ত সকলই অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল। সেকারণ তাঁহার actual জন্মদিবসের পূর্ব্বে দশ মাস দশ দিন হিসাব করিয়া একটি দিন ঠিক করিয়াছিলেন, এই দিন তাঁহার গর্ভবাসোৎসব হইত।

বলিতে পারি না কি ভাবিয়া শিবনাথ ও মনোরমা আশুবাবুর উক্ত সখের মশারিটি তাঁহার অজ্ঞাতেই লইয়া পলাইয়াছিলেন। এই

ব্যাপারটি আশুবাবুর মুখে অবগত হইয়া কমল অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহা মশারিটি চুরি যাওয়ার জন্য নয়; সে অনুমান করিয়াছিল, বোধ করি তাহার স্মৃতির একমাত্র চিহ্নস্বরূপ শিবনাথ এটি সঙ্গে লইয়াছেন। তাহার সহিত এতদিনের সংসর্গে শিবনাথ কি শেষে এই শিক্ষা করিলেন? ইহার চেয়ে তিনি তাঁহাকে দু'ঘা মারিয়া গেলেন না কেন? তাহা সহ্য হইত, কিন্তু এ অপমান সে সহিবে কি করিয়া? একটা কেন অমন বিশটা মনোরমা তিনি সঙ্গে লইয়া যান তাহাতে ক্ষতি নাই, বরং তাঁহার জীবনে যুগপৎ একাধিক সূর্য্য উঠিতেছে মনে করিয়া কমল তাহাতে খুশীই হইবে, কিন্তু এই গলিত কুষ্ঠের ন্যায় মৃত প্রেমের স্মৃতি তিনি আজীবন বহন করিবেন কি বলিয়া?

মশারিটার জন্য আশুবাবুরও অত্যন্ত আফশোস হইয়াছিল, বন্ধু বান্ধবের কাছে প্রায়ই বলিতেন "ছোঁড়াছুঁড়ি গেল গেল, আমার সখের মশারিটা নিয়ে গেল হা।"

এদিকে কমল রাজেনকে লইয়া মাতিয়া উঠিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যাহা অনায়াসলভ্য তাহারই প্রতি রাজেন্দ্রের বিরাগ। কমলের উপরও সে বীতস্পৃহ হইয়া উঠিল, বস্তুতঃ তাহার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য সে মুচিপাড়ায় আশ্রয় লইল। সেখানে ব্যায়রামে অসংখ্য লোক মরিতেছিল, রাজেন্দ্র এক প্রকার তাহাদের মুদ্দাফরাসের কার্য্যে নিযুক্ত হইল; রোগীর সেবা করিয়া তাহাকে ভাল করা অপেক্ষা সে মরিলে তাহাকে টানিয়া ফেলিতেই রাজেন্দ্রের আনন্দ বেশী। কমলও বাধ্য হইয়া রাজেন্দ্রের সান্নিধ্যলাভের জন্য দিবারাত্র মুচিপাড়ায় কাটাইতে লাগিল। কিন্তু বেশী দিন টিকিয়া থাকা সম্ভব হইল না, দিন কয়েকেই ভয়ে তাহার দেহের রক্ত শুকাইয়া উঠিবার উপক্রম হইল। বস্তুতঃ

প্রেমরিপু অপেক্ষা ভয়রিপুর শক্তি অধিক তাহা অজিতের ক্ষেত্রেও দেখা গিয়াছে, কমল তাহা হাড়ে হাড়ে বুঝিল। যাই হোক সে শেষ চেষ্টা দেখিবে মনস্থ করিয়া আরও দুই এক দিবস রহিয়া গেল। এমন সময় কিন্তু একটি ব্যাপারে তাহাকে চলিয়া আসিতে বাধ্য হইতে হইল! সে কয়দিন যাবৎ বাসায় আসিয়া ভাত রান্না করিত ও থালায় করিয়া তাহা লইয়া গিয়া রাজেনকে খাওয়াইয়া আসিত। কোন মুচিবাড়ীর কাঁদালে দাঁড়াইয়া রাজেন ভাত কয়টি মুখে দিত। সেদিন রাজেনের শরীরটা ভাল বোধ হইতেছিল না, তা ছাড়া মড়া ঘাঁটিয়া ঘাঁটিয়া তাহার দুই হাত অপরিষ্কার, কোথাও এক ফোঁটা জল নাই যে হাত ধুইয়া লয়, খাইয়া না হয় কাপড়ে হাত মুছিয়া লইবে, অধিকাংশ দিনই ত তাহাই করিয়া ক্ষান্ত হইতে হয়; কিন্তু হাত না ধুইয়া সে খাইবে কি করিয়া? কমল বলিল, "আমি না হয় তোমায় খাইয়ে দিচ্চি।"

অগত্যা রাজেন সম্মত হইল। কিন্তু সেই মোটর দুর্ঘটনায় রাত্রি হইতে কমলের ডান হাতটি খোঁড়া, সে বাম হস্তেই রাজেন্দ্রকে খাওয়াইতে লাগিল। প্রথমটা রাজেন লক্ষ্য করে নাই, খাওয়া প্রায় শেষ হইয়াছে আর মাত্র দুই এক গ্রাস বাকী আছে এমন সময় হঠাৎ তাহার জ্ঞান হইল যে জলশৌচ করিবার হাতেই কমল কার্য্যোদ্ধার করিতেছে। তাহার গা-টা কি রকম করিয়া উঠিল, সে হুড় হুড় করিয়া থালার উপর ও কমলের গায়ে বমি করিয়া দিল। কমলের ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙিল, সে বাসায় আসিয়া গভীর রাত্রে কাপড়ে সাবান ঘসিতে ঘসিতে এই কথাই ভাবিতেছিল—অবশেষে কি না রাজেন্দ্র বমি করিয়া দিল। ব্যাপারটা তাহার ইচ্ছাকৃত কি না তাহা অবশ্য কমলের জানা ছিল না, সে চলিয়া আসিবার সময় বলি বলি করিয়াও সে প্রশ্নটি

রাজেনকে জিজ্ঞাসা করে নাই, ভাবিয়াছিল থাকৃগে, তাহার লাভ কি হইবে জানিয়া ? কিন্তু প্রেমের বাজারে সম্পূর্ণ দেউলিয়া হইয়া ঘরে ফিরিবার প্রাক্কালে রাজেন্দ্র তাহাকে বার বার বলিয়াছিল, "এমন নির্ভীকতা আমি জন্মে দেখি নি। ভাগ্যে আপনি এসেছিলেন তাই মুচিগুলোও বাঁচল, আমিও বাঁচলাম, কিন্তু এবার আপনি যান, আর না। আমি বরং যাবার সময় এদের বলে' কয়ে' আপনার জন্য এক জোড়া মজবুত চটিজুতো নিয়ে যাব, বড্ড খালি পায়ে ঘোরাঘুরি করছেন।"

কমল এ কথার জবাব খুঁজিয়া পায় নাই, শুধু "হুঁ" বলিয়া চলিয়া আসিয়াছিল, বস্তুতঃ ইহা ছাড়া তাহার আর বলিবার ছিল কি ?

(ক্রমশ)

—শ্রীপূর্ণগ্রাস

সংবাদ-বৈচিত্র্য

পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন দৈনিক সংবাদ-পত্র—Tching Pao নামক চীনদেশীয় পত্রিকা। ইহা ১০২২ বৎসর আগে প্রকাশিত হয় এবং এখনও হইতেছে। কর্ত্তৃপক্ষের আপত্তি-জনক প্রবন্ধ প্রকাশ করার অপরাধে এই দৈনিকের ভূতপূর্ব্ব ৮১০ সম্পাদকের শিরশ্ছেদ করা হইয়াছিল।

বাংলাদেশে ইহাদের ভিতরে কয়জনের পুনর্জন্ম হইয়াছে ?

প্রত্যেকটি চুম্বনে অন্ততঃ ৪০০০০ বীজাণু সংক্রামিত হয়।
আরো বেশি হইলে উহা আরো মধুর হইত।

—

দীর্ঘতম বিশুদ্ধ ইংরেজি কথা—
Antiinterdenominationalistically (৩২টি অক্ষর)
শুনিলাম অ্যামেরিকা ইহার চেয়ে বড় শব্দ নির্ম্মাণ করিতেছে।

—

সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন ভাসমান রণতরী—"H. M. S. Victory"। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ইহা ভাসমান আছে।

সমগ্র পৃথিবী কবে ভাসিবে বোধ হয় সেই জন্যই অপেক্ষা করিতেছে।

—

ফরাসীর অন্তর্গত Bretagne নগরবাসিনী Mlle. Therese Vening তাঁহার প্রণয়ী নাবিকের প্রত্যাবর্ত্তনের আশায় ৫৮ বৎসর সমুদ্র-তীরে দাঁড়াইয়া ছিলেন (১৮৪২—১৯০০)। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে দয়িত ফিরিলে ৭৯ বৎসর বয়সে ইহার বিবাহ হয়।

ইহার পর তাঁহারা উভয়েই শুইয়াছেন—কখনো উঠিবেন কিনা কেহ বলিতে পারে না।

—

অষ্ট্রিয়ার Graz নগরের ভৈষজ্য-বিক্রেতা Munsch নামক ব্যক্তি তাঁহার স্ত্রীকে পিঠে লইয়া প্যারিসের বিরাট প্রদর্শনী দেখাইতে ৭২০ মাইল পদব্রজে গিয়াছিলেন। (Graz হইতে Paris ৭২০ মাইল)।

বাঙালী স্বামীর কাছে ইহা নূতন নয়—সে সমগ্র জীবনপথ এই ভাবেই অতিক্রম করে।

Minneganewashaka নামক রাণী Anemoosagoochakafuela নামক উপত্যকার অন্তর্বর্তী Powafuchswowitchahavagganeabba নামক স্থানে থাকিতেন।

তাঁহারা যেথায় মারা গিয়াছেন বোধ হয় তাহার নাম ভাঙিয়াই ইংরেজি ডিকশনারি তৈরী হইয়াছে।

—

Nero বিষপ্রয়োগে হত্যা করিয়াছিলেন তাঁহার পিতাকে, ভ্রাতাকে, ও দুইটি মাতৃস্থানীয়া আত্মীয়াকে; স্বহস্তে বধ করিয়াছিলেন তাঁহার মাতাকে, ভগ্নীকে, দুইটি সন্তানকে, তিনটি পত্নীকে, এবং পত্নীর প্রথম দুইটি স্বামীকে। তাঁহার দ্বিতীয় পত্নী Poppeaর প্ররোচনাতেই তিনি মাতৃহত্যা করিয়াছিলেন।

বাংলা দেশে মাতৃ ভাষাকে হত্যা করিতে কাহারো প্ররেচনা দরকার হয় না।

—

স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ও ভ্রাতা সমেত Tshaka নামক Zulu রাজা ১৮:০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮২৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ২০ লক্ষ লোক বধ করিয়াছিলেন।

প্রত্যেকটি পুরুষ বৎসরে কত লক্ষ মানুষের সম্ভাবনাকে বধ করে?

—

দক্ষিণ আমেরিকার Orinoco নদীর তীরস্থ অধিবাসীগণের অতি উপাদেয় খাদ্য কর্দ্দম। বন্যা হইলে ইহাদের বড় আনন্দ হয়।

আদিশূরের কোনো বংশধর ইহাদের পাঁচ জনকে ভারতবর্ষে আনিলে উত্তম কাজ করিতেন।

—

Mount Athos নামক গ্রীক্ আশ্রমে ৯০০০ ব্রহ্মচারী থাকেন। গত ৯০০ বৎসরের ভিতর কোনো স্ত্রীলোককে বা কোনো মাদী জানোয়ারকে ঐ আশ্রমের সীমানা পার হইতে দেওয়া হয় নাই।

কে আইন করিয়া ইহাদিগকে ব্রহ্মচারী করিয়াছে ?

—

Shrimp মাছ লম্বভাবে দণ্ডায়মান হইয়া সাঁতার কাটে। African cat fish চিৎ হইয়া সাঁতার দেয়। Mackerel মাছ ঘুমন্ত অবস্থায় জলের ভিতর চলা ফেরা করে।

আমরা সমগ্র জাতি ঘুমাইয়া সাঁতার কাটি।

—

Sardine বলিয়া কোনও মাছ নাই। যে সব মাছ ঐ নামে টিনে প্যাক হইয়া আসে সেগুলি হয় Pilchards নতুবা Herrings না হয় Sprats কিম্বা Anchovies।

ঠিক হিন্দুজাতির মত।

—

দক্ষিণ আমেরিকায় এক জগতের মৌমাছি আছে যাহাদের মধু বিষাক্ত।

আমরা কাহারো বিষ মধুময় বলিয়াও শুনি নাই।

—

অনেকেই জানেন যে তাড়া করিলে উটপাখী বালির মধ্যে মাথা গুঁজিয়া দিয়া নিজেকে নিরাপদ মনে করে। এই ধারণাটি সম্পূর্ণ অমূলক।

যাক্—উট পাখী সম্বন্ধে শেষ মোহটিও আমাদের কাটিয়া গেল !

—

আমেরিকার United States এ Worcester county র অন্তর্গত Webster সহরে একটি দেড় বৎসরের শিশু (নাম—Elecia Inchande) তদ্দেশীয় এই হ্রদটির নাম উচ্চারণ করিতে পারে—

Chargoggagoggmanchauggagoggchaubunagunggamaugg:

এই অমৃত-হ্রদে পড়িলে মক্ষিকা গলিবে। মাইকেল মধুসূদন দত্ত ইহার নাম জানিতেন না।

ক্যালেণ্ডারের ট্র্যাজেডি *

বুধের সঙ্গে সোমের বিবাহ হ'ল,
মাথা ও ল্যাজেতে জুড়িয়া হইল বুম,
আশা-লতা তার ধূলায় পড়িল ছিঁড়ে
মাঝরাতে আজ টুটিল কি তার ঘুম ?

বুধের সঙ্গে শনির বিরোধে কেঁদে
বুধের চরণে যে নারী বিকালো মাথা—
সোম সে আসিয়া বধূর মেক্-আপ্ পরি'
বন্ধ করিল সে হতভাগীর ভাতা।

এই দুনিয়ার মহাসমুদ্রে ডুবে
আজ-তক কেহ পাইল না হায় থৈ,
"যার ধন তার ধন নহে"—খাঁটি কথা ;
কোণে বসে, দেখ, নেপোয় মারিছে দৈ !

---

* গত চন্দ্রগ্রহণ উপলক্ষ্যে রচিত।

প্রজাপতির পক্ষপাত

(চতুরঙ্ক নাটক)

তৃতীয় অঙ্ক

১

নবকান্ত। উঃ ঘোল খাইয়ে ছাড়লে, বাবা একটা মেয়েকে বশ করতে গিয়ে প্রাণটা যায় আর কি ! মেয়ে নয়ত জ্যামিতির প্রবলেম্— নাকের জলে চোখের জলে এক করে ছাড়লো। পালিয়ে এসে যে বাঁচব তার উপায় নেই—এদিকে জগত্তারণবাবু তাঁর আধ্যাত্মিক অঙ্কুশ উঁচিয়ে বসে আছেন—খোঁচা দিয়ে ফিরে পাঠান। সেখানে ক্ষণিকা, এক পাশে প্রদোষ—অন্য পাশে অসীম আমি এই চারটা দেয়ালে ক্যারাম বোর্ডের ঘুঁটির মত ক্রমাগত rebound হয়ে ফিরছি। সে কখনো হাসে—কখনো কাঁদে—কখনো কথা বলে—কখনো চুপ করে থাকে। এক একবার মনে হয় বুঝি ভালবাসে—একবার মনে হয় বুঝি হাস্‌ল, তার পরেই মনে হয় সেটা বিদ্রূপ—কাজ নেই আমার এমন বিয়ে করে ! ঘরের মধ্যে এই গোলক ধাঁধা নিয়ে শেষে মারা যাই আর কি !

(যোগজীবনের প্রবেশ)

যোগজীবন। কি নবকান্তবাবু এমন হাঁপাচ্ছেন কেন ?

নবকান্ত। আর বল কেন বাপু—সেই মেয়েটা অস্থির করে তুলেছে।

যোগজীবন। আপনার মত একটা ফার্ষ্ট, গ্রেড, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটকেও?

নবকান্ত। পিনাল কোডে কি আর এ সম্বন্ধে কিছু লেখা আছে? যদি শেষের দিকে এ সম্বন্ধে একটা চ্যাপ্টারও যোগ করে দিত!

যোগজীবন। আসল কথা কি জানেন—মেয়ে জাতটা তলোয়ারের মত—খাপের মধ্যে থাকলেই সুবিধা—বেশি কাছে আন্‌লে তার ধারে বিপদ হ'তে পারে।

নবকান্ত। ধার বলে ধার! কথায় ধার—চোখে ধার—হাসিতে ধার—চালে ধার—চলনে ধার—তলোয়ারের তো বড় জোর দুই দিকে। এখন বেরোতে পারলে বাঁচি।

যোগজীবন। এ হচ্ছে অভিমন্যুর ব্যূহের মত, প্রবেশ করা সহজ—বের হওয়াই কঠিন।

নবকান্ত। কিন্তু প্রদোষটা কি করে এতদিন এ ব্যবসা চালাচ্ছে?

যোগজীবন। দেখুন, ব্রহ্মাস্ত্রের প্রয়োগ যে জানে—সে অতি সহজে সেটা ব্যবহার করতে পারে। আনাড়ি সেটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে গেলেই বিপদে পড়ে। মেয়েরা ব্রহ্মাস্ত্র জাতীয় কি না? কিন্তু আপনার সেই লাট সাহেবের চিঠি আনাতে কোন কাজই হ'ল না?

নবকান্ত। আরে সেইটার জন্যই তো মুস্কিলে পড়েছি। একদিন ক্ষণিকা সেটা আগ্রহ করে দেখতে নিয়ে এখন বাক্সে বন্ধ করে ফেলেছে। কিছুতেই দিচ্ছে না।

যোগজীবন। তবে তো বড় মুস্কিল। ওটার ডুপ্‌লিকেট নেই?

নবকান্ত। তখন কি জানি ছাই এত হবে? তা হলে একখানা নকল করিয়ে রাখতাম। যাই যদি এখন সেটা কোনো রকমে হাতে

পায়ে ধরে আদায় করে আনতে পারি এবার আর এখানে নয়—কলকাতা ছেড়ে পালাবো। (প্রস্থান)

(গোবর্দ্ধনের প্রবেশ)

গোবর্দ্ধন। কি ভায়া আমার বোনের কথাটা ভুলেই গেলে দেখছি।

যোগজীবন। এই মাসের মধ্যে প্রদোষবাবুর সঙ্গে তোমার বোনের বিয়ে দিয়ে না দিতে পারি—তবে আমার নাম যোগজীবন নয়।

গোবর্দ্ধন। বল কি প্রদোষবাবুর সঙ্গে!

যোগজীবন। কেন তাতে দোষ দেখলে কি!

গোবর্দ্ধন। তিনি তো বলেন এখন তাঁর বিয়েতে মত নেই।

যোগজীবন। আরে ফাঁসীর আসামী কি বলে তার মরতে খুব ইচ্ছে। জোর করে দিতে হয়। ফাঁসি আর বিয়ে দুটা এক ধরনের জিনিষ—একবার হয়ে গেলে বরাবরের জন্য কায়েমী।

গোবর্দ্ধন। কিন্তু উপায় কি?

যোগজীবন। তোমার অচলা ভক্তি আর আমার অভিনয় শক্তি। সে তোমাকে খুব ভালো বলেই তো জানে।

গোবর্দ্ধন। তা আর বলতে! একেবারে তার প্রধান শিষ্য। তারপরে সেদিন প্রতিজ্ঞা করেছি যে আমার পরিবারের মধ্যে অসবর্ণ বিবাহ চালাবো।

যোগজীবন। তবে আর ভয় নেই—আমিও সব কাজ গুছিয়ে রেখেছি এই দেখ—

[পকেট হইতে খবরের কাগজ বাহির করিয়া পাঠ—]

এই দেখ দুর্দ্দশা কাগজে কি লিখেছে—

"মোগল পাঠান হদ্দ হ'ল—ফার্সি পড়ে তাঁতি।" 'কত বড় বড় নেতা যেখানে দাঁড়াইতে পারিল না সেখানে আজি উপস্থিত

শ্রীপ্রদোষকুমার মুখোপাধ্যায়। অভিধানে প্রদোষ অর্থ যাহাই হউক—আমরা তাহার নূতন অর্থ আবিষ্কার করিয়াছি—প্রদোষ কিনা প্রকৃষ্টরূপে দোষ আছে যাহাতে।

"শুধু মুখে অসবর্ণ বিবাহ প্রচার করিলেই হয় না—দেশের লোককে দৃষ্টান্ত দেখান্—নতুবা তাঁহার কথা কে বিশ্বাস করিবে? কিন্তু তাঁহার ইচ্ছা থাকিলেই হয় না—কন্যা দিবে কে? আমাদের আশা আছে—সনাতন হিন্দুসমাজের এখনো এমন দুর্দ্দশা হয় নাই যে কোনো কন্যার পিতা এমন অশাস্ত্রীয় কার্য্যে সাহায্য করিবেন।"

গোবর্দ্ধন। ভায়া এত বুদ্ধিও তোমার পেটে!

যোগজীবন। চল এখন—যাওয়া যাক।

(উভয়ের প্রস্থান)

২

প্রদোষের গৃহ

প্রদোষ। কই এখনো অসীম এলো না তো। সময়জ্ঞান জিনিষটা আমাদের বড় কম। কথা ছিল—সে দুটার সময় আসবে—চারটে বাজে। ছুটির দিনটা এমনি করেই মিছে গেল। ওই যে পায়ের শব্দ—বোধ হয় এলো।

(যোগজীবন ও গোবর্দ্ধনের প্রবেশ)

প্রদোষ। Oh, misfortune never comes alone! একেবারে দুইজন।

উভয়ে। নমস্কার—প্রদোষবাবু।

প্রদোষ। তারপরে খবর কি ?

যোগজীবন। প্রদোষবাবু—যখন আপনার প্রতিভার কাছে আসি তখন অন্য সব দুঃখের কথা, অপমানের কথা, নৈরাশ্যের কথা ভুলে যাই।

প্রদোষ। কিসের এত নৈরাশ্য যোগজীবনবাবু ?

গোবর্দ্ধন। কি জানেন ! দেশের লোক এখনও আপনাকে বুঝলো না।

প্রদোষ। না—ই বুঝলো ? ক্ষতি কি ?

যোগজীবন। ক্ষতি কি ?

গোবর্দ্ধন। ক্ষতি কি ? দেখুন আমি যদি দেশের রাজা হতুম—তা হ'লে—উঃ পারছি না—বল না যোগজীবন।

যোগজীবন—এই দেখুন "দুর্দ্দশা" কি লিখেছে।

(কাগজ পাঠ করিয়া)

প্রদোষ। এ তো আমি আগেই দেখেছি।

যোগজীবন। আপনি হাস্‌তে পারেন প্রদোষবাবু। আপনার আদর্শ মহান্, জীবন পবিত্র, অন্তর উদার, প্রাণ তেজস্বী, মন প্রশস্ত, প্রতিভা উজ্জ্বল, ক্ষমা অগাধ, তৃপ্তি অশেষ—কিন্তু আমরা…

প্রদোষ। সাধারণ লোকের কথা কানে না আনাই উচিত।

গোবর্দ্ধন। তারা আপনাকে জানে না—তাই দোষ দেয়—কিন্তু তাদের দেখিয়ে দেওয়া উচিত—আপনার মুখে কাজে এক।

যোগজীবন। আপনি কেন একটা অসবর্ণ-বিবাহ করে নিন্দুকের মুখ বন্ধ করে দিন না। আমরা আবার মস্তক উন্নত করে" কণ্ঠ উচ্চ করে, লোচন উন্মুক্ত করে ঘুরে বেড়াই।

প্রদোষ। দেখুন, এখন আমার বিয়ে করবার ইচ্ছে নেই।

যোগজীবন। সে ত আমরা জানি। আপনার মত যাঁদের আদর্শ

উন্নত তাঁরা বিবাহ করেন না। তবু দেশের জন্য এই তুচ্ছ কাজটা আপনাকে করতেই হবে।

প্রদোষ। কিন্তু মেয়ে দিচ্ছে কে?

যোগজীবন। বাইরের কেউ না-ই দিলো। আপনার সমিতির এমন কোনো সভ্য কি নেই যে আপনাকে আত্মীয়তা সূত্রে বদ্ধ করে ধন্য হবে?

গোবর্দ্ধন। যদিও আমরা কোনো অংশে প্রদোষবাবুর যোগ্য নই—তবু কেবল দেশের উন্নতির জন্য ধৃষ্টতা প্রকাশ করতে যাচ্ছি—প্রদোষবাবু যদি অনুগ্রহ করে আমার বোনকে পদতলে স্থান দেন...

যোগজীবন। ধন্য গোবর্দ্ধন, ধন্যতর ভারতবর্ষ, ধন্যতম প্রদোষবাবু। আছে—আছে আজো দেশের উন্নতির আশা।

প্রদোষ। এসব আপনারা কি বলছেন! আমি নিতান্ত অযোগ্য। গোবর্দ্ধনবাবুর ভগ্নীর নিতান্ত অনুপযুক্ত আমি...

যোগজীবন। কি বিনয়!

গোবর্দ্ধন। প্রদোষবাবু সর্ব্বগুণে বিভূষিত—কোনো গুণেরই অভাব নেই।

প্রদোষ। গুণের কথা হচ্ছে না—আমি নিতান্ত অযোগ্য।

যোগজীবন। আমাদের কাছে লজ্জা কিসের প্রদোষবাবু?

প্রদোষ। না, না, লজ্জা নয়।

যোগজীবন। এই যে লজ্জা নয় বলছেন—এটাও একটা লজ্জার চিহ্ন।

প্রদোষ। আপনারা বুঝছেন না যোগজীবনবাবু, এ আমার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব।

যোগজীবন। আজ যা অসম্ভব মনে হচ্ছে—কাল তা সম্ভব হবে।

আমি আজই খবরটা সংবাদপত্রে দিচ্ছি—নিন্দুকের মুখ বন্ধ হয়ে যাক। চল গোবর্দ্ধন আর দেরী নয়।

গোবর্দ্ধন। নিশ্চয়। শুভস্য শীঘ্রং। (উভয়ের দ্রুত প্রস্থান)

প্রদোষ। থামুন, থামুন। উঃ কী Rascal !

(অসীমের প্রবেশ)

প্রদোষ। এসো ভাই।

অসীম। বড় দেরী হয়ে গেল। চল আজ তোমাকে আমাদের সঙ্গে যেতে হবে—কতকগুলো জিনিষ কিনতে।

প্রদোষ। বেশ তো। আমার ব্যবসা বুদ্ধির উপর সকলের সমান বিশ্বাস নয় দেখছি। আচ্ছা চলো। কিন্তু জিনিষটা কিন্‌বে তুমি।

অসীম। ক্ষণিকাও যাবে যে—

প্রদোষ। বড় দেরী হয়ে গেছে—শীগ্‌গির চলো।

(উভয়ের প্রস্থান্‌)

৩

আদিনাথবাবুর গৃহ

(জগত্তারণবাবুর প্রবেশ)

জগত্তারণ। আগেই বলেছি এসব কেবল flirting ! একি আর উল্টো দীঘি সমাজের ছেলে ! যে কথা সেই কাজ। এখন দেখুন ব্যাপারখানা—ছিঃ ছিঃ।

আদিনাথ। ব্যাপার কি জগত্তারণবাবু ! বসুন, বসুন।

জগত্তারণ। আর বসুন ! এই দেখুন দুর্দ্দশা কাগজ কি লিখছে !

(পাঠ করিয়া)

আদিনাথ। তাই তো দেখছি।

অসীম। এ কখনই সত্য নয়।

জগত্তারণ। কেন সত্যি নয়! ছাপার ভুল এ তো নয়—স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে প্রদোষকুমার মুখোপাধ্যায়।

অসীম। ছাপার ঠিক থেকেও আগাগোড়া তো মিথ্যা হ'তে পারে।

আদিনাথ। মিথ্যা হবে কেন? আমাদের পক্ষে এটা দুঃখের কথা হ'তে পারে কিন্তু এতো প্রদোষের সাহসের পরিচয়।

জগত্তারণ। মিথ্যা কেন—স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে গোবর্দ্ধন রায়ের বোনের সঙ্গে প্রদোষের আগামী ১৪ই তারিখ শুভ বিবাহ।

অসীম। তা হোক—এর আগাগোড়াই বানানো।

জগত্তারণ। হায় অবিশ্বাসী—তিনি যেন তোমাকে রক্ষা করেন।

(প্রদোষের প্রবেশ)

প্রদোষ। কি অসীম তুমি আজ আমাদের ওখানে যাওনি যে।

অসীম। না।

আদিনাথ। প্রদোষ তোমার এই সাহসে আনন্দিত হলাম।

জগত্তারণ। তোমার এই ছলনায় তিনি না জানি কি মনে করছেন!

প্রদোষ। ব্যাপার কি?

আদিনাথ। এতে লজ্জার কিছু নেই।

জগত্তারণ। আর ছলনা করা উচিত নয়।

প্রদোষ। আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

জগত্তারণ। বাংলা ভুলে না গিয়ে থাকলে বুঝতে পারবে—কাগজখানা পড়ো। যাই ততক্ষণ ক্ষণিকাকে নবকান্তের কথা একটু বলে আসি। (প্রস্থান)

প্রদোষ। মিথ্যা কথা, সমস্ত মিথ্যা কথা। এসব বুঝি আপনারা বিশ্বাস করেছেন।

অসীম। আমি তখনই বলেছি বাবা।

আদিনাথ। না, না, এতে লজ্জিত হ'বার কিছু নেই।

প্রদোষ। লজ্জা নয়। এ সব যোগজীবন আর গোবর্দ্ধন নামে দুটো রাস্কেলের কাজ। আমি যাচ্ছি দুর্দ্দশা আফিসে—সম্পাদককে একটু শিক্ষা দিয়ে আসি। (প্রস্থান)

অসীম। চলো—আমিও যাচ্ছি জুতোটা পায় দিয়ে।

(অসীম ও আদিনাথের প্রস্থান)

(জগত্তারণের প্রবেশ)

জগত্তারণ। এবার একটা আদর্শ পরিণয় হবে দেখছি। কিন্তু সংবাদটা এখনি ক্ষণিকাকে দিতে হবে। ও আবার দরজা বন্ধ করে কি করছে। কি করা যায়। একটা জানলা খোলা আছে বটে কিন্তু সেটা এত উঁচুতে যে নাগাল পেলাম না। হায় তিনি যদি তাঁর আদর্শ প্রচারের জন্যই আমাকে পাঠালেন তবে আর একটু লম্বা করে দিলেন না কেন?

আরে, এই যে অতুল, শোনো, শোনো।

(অতুলের প্রবেশ)

অতুল। আমি যাই জেঠামশায়, আমার ময়না উড়ে গেছে।

জগত্তারণ। আরে শোনো, শোনো একটা গল্প বলব।

অতুল। সে গল্প শুন্‌বো না।

জগত্তারণ। বেশ তো যে গল্প তোমার ভালো লাগে তাই বলব। একটা মজার খবর আছে—আগে বলতো তোমার দিদি কি করছে।

অতুল। চিঠি লিখছে।

জগত্তারণ। কাকে ?

অতুল। প্রদোষদাকে। আমি বলবো না আমাকে বলতে বারণ করেছে।

জগত্তারণ। এই তো বললে।

অতুল। বললাম কই ? আপনি তো জিজ্ঞাসা করলেন।

জগত্তারণ। কেমন করে জানলে যে প্রদোষদাকে ?

অতুল। বাঃ রে আমাকে নিয়ে যেতে বলেছে যে।

জগত্তারণ। উঃ এ যে moral ডুব-সাঁতার। শোনো অতুল, তোমার দিদিকে গিয়ে একটা খবর দাও দেখি খুব খুশী হবে।

অতুল। কি জেঠা মশাই।

জগত্তারণ। তোমার প্রদোষদার বিয়ে আগামী ১৪ই তারিখে—গোবর্দ্ধনবাবুর বোনের সঙ্গে—বলতে পারবে ?

অতুল। খুব পারবো। খু—ব।

জগত্তারণ। শুনলে তোমার দিদি খুব খুশী হবে—না ?

অতুল। আমি যাই জেঠা মশাই। (প্রস্থান)

জগত্তারণ। শুধু ছেলে মানুষের উপর বিশ্বাস করা চলে না। এক কাজ করা যাক—সেই জানলাটা দিয়ে এই কাগজখানা গলিয়ে ফেলে দেওয়া যাক—তবে আর কোনো সন্দেহের কারণ থাকবে না।

অবার নবকান্তকে নিয়ে একটু লাগতে হচ্ছে।

(প্রস্থান)

৫

পথ

(নৃত্যগোপালের প্রবেশ)

নৃত্যগোপাল। সেদিন জগত্তারণবাবুর প্রতি বড় অন্যায় করেছি। দেখা হ'লে একবার মাপ চেয়ে নিতাম। কিন্তু তাঁর সংবাদ কেউ দিতে পারে না।

জগত্তারণ। নবকান্ত গেল কোথায়? এবার তার পথ পরিষ্কার—শুধু ছিপ ফেললেই মাছ উঠবে। কিন্তু তাকে যে কোথাও খুঁজে পাইনে।

নৃত্যগোপাল। এই যে জগত্তারণবাবু শুনুন, শুনুন।

জগত্তারণ। ওই রে আবার সেই লোকটা! কেবল তার কাছে থেকে পালিয়ে ফিরছি—আর তো পারি নে—পা যে চলে না—

নৃত্যগোপাল। শুনুন, আপনার প্রতি বড় অন্যায়—

জগত্তারণ। এই রে এসে পড়ল, এই গলিটার মধ্যে ঢুকে পড়ি—তিনি কি এসব দেখেও দেখেন না। (প্রস্থান)

নৃত্যগোপাল। হায় হায় আবার কোথায় গেলেন! আমাকে দেখলেই পালান। যাক্ বিশেষ দুঃখ নেই—দেশের জন্যই এ কষ্ট টুকু দিয়েছি। (প্রস্থান)

৪

ক্ষণিকার কক্ষ

ক্ষণিকা। এখনো হয়নি ভাই—আর একটু পরে এসে নিয়ে যাস্। কিন্তু কাউকে যেন দেখাস না।

অতুল। কথ্খনো না।

ক্ষণিকা। কেউ দেখতে চাইলে কি বলবি ?

অতুল। বলবো যে দিদি দেখাতে বারণ করে দিয়েছে।

ক্ষণিকা। যদি জিজ্ঞাসা করে কেন, তবে কি বলবি ?

অতুল। তখন—তখন—তখন বলবো—বলে দাওনা দিদি ভাই, কি বলব ? ঠিক বলবো যে প্রদোষদাকে লিখেছে কিনা তাই।

ক্ষণিকা। দূর বোকা—তা হলে তো বলেই ফেললি।

অতুল। কেমন করে বললাম। জেঠামশায় জিজ্ঞাসা করল বলে তো বললাম যে তুমি প্রদোষদাকে চিঠি লিখছ।

ক্ষণিকা। বলেছিস ?

অতুল। বলিনি—সে যে জিজ্ঞাসা করল।

ক্ষণিকা। আচ্ছা এখন যা—আর একটু পরে আসিস।

অতুল। দিদি একটা মজার খবর আছে।

ক্ষণিকা। কি খবর রে আমার সেই হারানো চিঠিটা পেয়েছিস বুঝি। ফিরিয়ে দে তোকে এক কৌটো লজেন্স দেবো।

অতুল। ঠিক দেবে বল।

ক্ষণিকা। হাঁরে ঠিক্ দেব।

অতুল। চিঠি নয় দিদি –প্রদোষদার বিয়ে।

ক্ষণিকা। দূর।

অতুল। দূর কি—কি বাবুর বোনের সঙ্গে।

ক্ষণিকা। যা—যা, বাজে বকিসনে।

অতুল। সত্যি।

ক্ষণিকা। আচ্ছা যা। (অতুলের গালে চড় মারিল)

অতুল। রাগলে কেন, জেঠা মশাই বললে তুমী খুশী হবে।

ক্ষণিকা। খুব খুশী হয়েছি—তুই যা। (পুনরায় চড়)

অতুল। জেঠা মশাই বললে তুমি খুশী হবে—আড়ি, আড়ি!

(প্রস্থান)

(জানলা দিয়া কাগজ খানি পড়িল ; ক্ষণিকা তাহা পাঠ করিয়া—)

ক্ষণিকা। বেশ. বেশ. বেশ। (চিঠি ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে প্রস্থান

আদিনাথের কক্ষ

আদিনাথ। ডাক্তারবাবু—ওটা তো হিষ্টিরিয়া।

ডাক্তার। লোকে ওকে হিষ্টিরিয়াই বলবে।

আদিনাথ। আপনার কি মনে হয়?

ডাক্তার। মনে হওয়া তো নয়। Symptom যে মিলে গেছে—বুঝলেন কি না আদিনাথবাবু, হোমিওপ্যাথিতে হচ্ছে Symptom। এই Symptom মিলে গেলে শিশুতেও ঔষধ দিতে পারে। দেখুন না কেন যেই ইগ্‌নেসিয়া ৩০ দিয়েছি—অমনি।

আদিনাথ। এখন তো আর ভয়ের কিছু নেই—কি বলেন।

ডাক্তার। এখন অবশ্য কিছু নেই—তবে ভবিষ্যতে যে আর কিছু হবে না তা বলা যায় না—কারণ ডাক্তার হিউজ বলেছেন—

আদিনাথ। আচ্ছা হঠাৎ কেন এমন হ'ল বলতে পারেন?

ডাক্তার। সেই কথাই তো বলছি। ডাক্তার হিউজ বলেন হঠাৎ কোনো কারণে মাথায় বেশি রক্ত উঠে গেলে—যাক কোনো

চিন্তা নেই। ওটি আপনার মেয়ে বল্লেন না? দেখুন হঠাৎ উত্তেজিত করে তুলতে পারে এমন কোনো বই বা লোক যেন রোগিণীর কাছে না যায়। হঠাৎ কোনো অজ্ঞাত কারণে অত্যন্ত shock পেয়েছেন। আর এই দুই পুরিয়া ওষুধ রেখে দিন, বুঝলেন। বেশি কিছু হলে ডাকবেন। (প্রস্থান)

(ক্রমশ)

কো-এডুকেশন

কো-এডুকেশন কথাটির বাংলা যাহাই হউক, বাংলাদেশে ইহা যে একান্ত প্রয়োজনীয় এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। পুরুষ এবং মেয়ে একত্র অধ্যয়ন করিলে পরস্পর প্রতিযোগিতার বাসনা প্রবল হওয়াতে দুই পক্ষেরই মানসিক উৎকর্ষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। দেশে কো-এডুকেশন প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে পুরুষেরা শিক্ষায় কতদূর উন্নত হইয়াছিল তাহার পরিমাণ করিবার উপায় নাই, কেননা তখন একমাত্র পুরুষেই শিক্ষা লাভ করিত এবং মেয়েরা শিক্ষাবিষয়ক প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র হইতে দূরে ছিল। তর্ক উঠিতে পারে মেয়েদের শিক্ষার পৃথক ব্যবস্থা হইলেও ত পুরুষের সঙ্গে তাহাদের শিক্ষার তুলনামূলক বিচার চলিতে পারে, তবে কো-এডুকেশনের প্রশ্ন উঠে কেন?

—

ইহার উত্তর দিতেছি। মেয়েপুরুষের শিক্ষার জন্য পৃথক ব্যবস্থা থাকিলে উভয়ের উন্নতি অবনতি জানিবার একমাত্র উপায় হয় বিশ্ব-

বিদ্যালয়ের পরীক্ষা। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার মুহূর্ত্তে কে কিরূপ লিখিতে পারিল ইহা লইয়া সমগ্র বৎসরের বিদ্যার বিচার চলিতে পারে না। একত্র অধ্যয়ন করিলে প্রতিদিনের বিচার চলে। প্রতি দিনের প্রতিযোগিতা না থাকিলে প্রকৃত উন্নতি সম্ভব নহে বলিয়াই যে কো-এডুকেশন দরকার ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন।

—

অন্যায় প্রতিযোগিতা ব্যবসা বাণিজ্যে চলিতে পারে, খেলাধূলায় চলিতে পারে কিন্তু শিক্ষায় চলে না। সেইজন্য শিক্ষাক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা যতই প্রবল হউক তাহা অন্যায়ের সীমানায় কখনই যাইতে পারে না। প্রতিযোগিতাই স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতাই উন্নতি। প্রতিযোগিতায় যেখানে অন্যায় চলে সেখানে প্রতিযোগিতা ছাড়িয়া দিতে হইবে এমন কথা নাই। অন্যায়টা ছাড়িলেই হইল।

—

পূর্ব্বে মেয়েদের শিক্ষাই ছিল না। যখন শিক্ষা আসিল, ভেদ ঘুচিল না, এখন ভেদ ঘুচিয়াছে কিন্তু সমালোচনার অন্ত হইল না। যাহা হউক শত্রুর মুখে ছাই দিয়া কো-এডুকেশন ত চলিল, কিন্তু এডুকেশন মানে কি শুধুই বই পড়া? জীবনের সর্ব্ববিভাগের জন্য আমাদের এডুকেশন দরকার। আমরা অধিকাংশ ব্যক্তিই আদর্শ মানুষ হইতে কত নিম্নে অবস্থিত। আমরা প্রচুর খাইতে পারি না—প্রচুর পরিশ্রম করিতে পারি না—প্রচুর ঘুমাইতেও পারি না। ধরুন যদি ইহার প্রতিকারার্থ আমরা সর্ব্বক্ষেত্রেই 'Co' প্রচলিত করি তাহা হইলে আমাদের কল্যাণের পথ সুগম হইবে।

—

এইরূপে co-play, co-lodging! co-boarding, co-sleeping প্রভৃতি চালাইতে পারি তাহা হইলে আমাদের জাতীয় উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। এমন একটা প্রতিষ্ঠান হইল যেখানে সহ-নিদ্রার ব্যবস্থা আছে। একই ঘরে বহু পুরুষ এবং বহু নারী পাশাপাশি বিছানায় শুইয়া ঘুমাইবে। এই স্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতায় ঘুম খুব গাঢ় এবং স্বপ্ন-হীন হইবে। যাঁহারা নিদ্রাহীনতায় কষ্ট পাইতেছেন তাঁহাদের পক্ষে ইহা ঔষধ এবং যাঁহারা সাধারণ নিদ্রা উপভোগ করেন তাঁহাদের পক্ষে ইহা পথ্য স্বরূপ হইবে। Co-eating প্রচলিত হইলে শুধু মানুষের দেহের নহে বাজারের হোটেল গুলিরও খুব উন্নতি হওয়া সম্ভব। এখানে যে প্রতিযোগিতা হইবে তাহা একটু অন্যজাতীয়। কে কত বেশি দামের ভাল ভাল জিনিষ খাইতে পারে ইহাই হইবে co eating প্রতিযোগিতার মূলমন্ত্র। বাঙালী যে ভাল খায় না তাহার কারণ co-eating নাই। একমাত্র যেখানে থাকিবার কথা সেখানে "non-co." স্ত্রী স্বামীর সামনে অধিকাংশ স্থানেই খাইতে লজ্জা বোধ করে। প্রসঙ্গত বলা যায় যে অনেক স্বামী ইহার একটি আধ্যাত্মিক অর্থও করিয়া লইয়াছেন। তাঁহারা বলেন নিজের স্ত্রীকে হয়ত লোভী ভক্ষণকারিণীর মূর্ত্তিতে দেখিলে নারী সম্বন্ধে রহস্যের ভাবটা মন হইতে দূর হইয়া যাইতে পারে।

—

কিন্তু সে কথা যাক। সহ-যোগিতা বাঙালী এখনো শেখে নাই। গত অসহযোগ আন্দোলনের পর হইতে এই সহযোগিতার ভাব একটু একটু দেখা দিয়াছে, এখনো ইহার পূর্ণরূপ প্রকট হয় নাই। Co-picketing হওয়াতে অসহযোগ আন্দোলন প্রায় সফল হইয়াছিল। অনেকের ধারণা "কো" কথাটি ইংরেজি। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা

নহে। ইহা আমাদের দেশে বহুদিন হইতেই প্রচলিত আছে। "কোলাহল" "কোন্দল" প্রভৃতি শব্দে স্ত্রীপুরুষের মিলিত কার্য্য বুঝায়। "কোজাগর" রাত্রিতে স্ত্রীপুরুষ সম্মিলিত ভাবে জাগিয়া থাকে।

—

আমাদের জনৈক বন্ধু কিছুদিন পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন কো-এডুকেশনে "এডুকেশন"-এর চেয়ে "কো"-এর দিকেই ঝোঁকটা পড়ে বেশি। ইহা দুঃখের বিষয় নহে। এডুকেশন ত অনেক দিন হইতেই ছিল—কিন্তু তাহাতে ঝোঁক ছিল না। "কো"-এর উপর ঝোঁক দিবার জন্যই এত বড় ঝক্কি ঘাড়ে লওয়া হইয়াছে। কিন্তু এসব বিষয় সাবধানে আলোচনা করা উচিত। উচ্ছ্বসিত ভাবে কোনো কিছুর গুণ বর্ণনা করিতে গেলে লোকে কথার গুরুত্ব বিষয়ে সন্দিহান হয়, মনে করে ঠাট্টা করিতেছে। কিন্তু আর যাহাই হউক কো-এডুকেশন ঠাট্টা নহে।

———

—আপনার সর্দ্দি কেমন ?

—কিছুতেই দমিতেছে না।

—আপনার স্ত্রী কেমন ?

—প্রায় একই রকম।

—

—আপনি কখন বিবাহ করিবেন মনে করিতেছেন ?

—সর্ব্বদা।

—

মনজুয়ান

স্কট টমসন লিখিত

কলিকাতা শহরের দক্ষিণ পাড়ায়
(বেলতলা রোড হতে পশ্চিমেতে স্থিতি)
কবি ও আর্টিষ্ট সেথা পাইবে ভাড়ায় ;
কুষ্টির আড়ং আছে একটি সমিতি ;
ভাবুকেরা জোটে সেথা প্রাণের তাড়ায়
এবং তবিলে যবে টাকা কম ইতি ।
দশচক্রে শুনিয়াছি ভগবান ভূত
রসচক্রে কিন্তু ভাই ঈশ্বর অদ্ভুত ॥

সত্যিই অদ্ভুত ভাই, প্রেসিডেণ্ট যিনি
ইয়া বুক, ইয়া ছাতি, ইয়া দুই কান !
সমাগত কবিদের (পরব্রহ্ম জিনি)
হাসিয়া করেন কত বাক্য বরদান ।
অবাক্ হইয়া সবে ভাবে প্রতিদিন-ই
কেমনে বাড়িছে তাঁর জ্ঞান ও গর্দ্দান ।
কেবল অভাব তাঁর দেশোয়ালি গোঁফ
বাণীর দুয়ারে তিনি জাহাঙ্কোসা তোপ ॥

সমিতির সেক্রেটারি, সে আরো সরস !
যত বলো তবু তার কিছু বাকি রয়,
সত্য কথা, একাধারে তিনি সর্ব্বরস
কালী-তুলি-তম্বুরার সর্ব্ব সমন্বয়।
এক কালে এ সভায় ছিল রূপ যশ,
(কি ছার সে সভা হায় যারে তুমি ময়—)
এখন দুজন সভ্য ধ'রে মধ্যে তারি
মহামান্য প্রেসিডেণ্ট আর সেক্রেটারি।

একদিন এই সভা করিত উজ্জ্বল
জমিদার কবি তার টাকের দ্যুতিতে ;
খদ্দরের মাঝে যেন দামী মখমল,
অপরূপ সমাবেশ জরি ও সুতিতে ;
সম্প্রতি পাটের দর হ'য়ে গিয়ে জল,
কাব্য রসে যায় তার চক্ষু দুটি তিতে।
লেখা পড়া আজি তার দাঁড়ায়েছে মোট
সুদের হিসাব আর সহি হ্যাণ্ডনোট ॥

রাজা ও উজীর-মারী অনেক লেখক
রসচক্রে রয়েছেন, অর্থাৎ ছিলেন।
রাজা ও উজীর বধ নয় এ রূপক,
সত্যকার রাজা মেরে গ্রন্থ লিখিলেন :
আসিত সে কবি, যিনি হংস মধ্যে বক ;
(রাজা ও প্রজার মাঝে বিরাট খিলেন) ॥

সাহিত্যের তরে তাঁর ছিল যে সাধনা
তবিল মারার লাগি সেটা কুবাসনা ॥

আর আসে গীততন্ত্রী বীরবলী অপ-
ভ্রংশ কিনা দেহে মনে এখনো সবুজ ;
ভারতীয় কলাবনে যুগন্ধর অব-
তংশ যেন ফল মধ্যে লক্ষ্ণৌ খরমুজ ;
ললিত কলার ভাগ্যে এ কৃতান্ত নব
—কংস যেন গোকুলের সমাজে অবুঝ।
নাম করিব না তাঁর, যেন সে ধূর্জ্জটি
আলোচনা সাহিত্যের নিছক কুজ্ঝটি ॥

সকলে সুন্দর, শুধু বিদ্যার ব্যত্যয়,
বঙ্গ সাহিত্যের ঘরে কাটিতেছে সিঁধ।
বিপরীত বিহারের (ভূমিকম্পে নয়)
ইঁহাদের গ্রন্থগুলি জলন্ত রসিদ।
ইঁহাদের গ্রন্থ খোলা (ভয়ে কি নির্ভয় ?)
নীবী-গ্রন্থী খোলা যেন, চক্ষে আসে নিদ।
সত্যই সৌন্দর্য্য আহা, সংক্ষেপে—কী-ই-টুস
দুঃখতপ্ত এ জীবনে লণ্ঠন সে ভীটুস ॥

কত না সুন্দর আহা, যবে শরতের
সোনার দিগন্ত হ'তে একখানি ছায়া
সুবর্ণের রশ্মি হাতে মানস রথের
বহে আনে তপ্ত গন্ধ, শেফালির মায়া,

উদ্ভিজ্জ নিঃশ্বাস স্পর্শ প্রৌঢ় আমনের,
চড়ুয়ের চিকি চিকি, স্বপ্ন স্বচ্ছ কায়া।
পতঙ্গের পাখে পাখে আলোর কণিকা,
গোধূলির তারাটিরে মুমূর্ষু মণিকা॥

দ্বিতীয় সুন্দর দেখ, নীলাভ পদ্মার
পীতাভ বালুর তটে স্বপন-প্রয়াণ,
কুণ্ডলিত ধূমশয্যা পউষ সন্ধ্যার
পল্লীপথে মন্দগতি শেষ-গাড়ী ধান।
চতুর্থ সুন্দর যবে বৈশাখী ঝঞ্ঝার
দুর্ব্বাসার অতর্কিত বজ্র অভিযান।
সুন্দরের লীলা খেলা কত কব তার
এ যে দেখি সৌন্দর্য্যের দশ অবতার॥

মানস-কমল-বন-মধু রক্তছবি
বৃদ্ধ রাজহংস সম নিশান্তের শশী ;
মাধবীর দ্বিপ্রহরে মন্ত্রশ্বাস লভি
ব্যাকুল বিতানে যবে পুষ্প পড়ে খসি ;
সুন্দর এদেরো চেয়ে, যবে মুগ্ধ কবি
আঙুলে গুনিয়া শব্দ, মিল খোঁজে বসি।
সৌন্দর্য্যের মূলাধার কুঁড়িটি কুন্দর
কিন্তু তারো চেয়ে, প্রভো, পরস্ত্রী সুন্দর॥

পরস্ত্রী মহিমা কিছু করিব কীর্ত্তন,
অতএব পাঠকেরা হোন সাবধান।

জাঁনি-তঁবু-বঁলিবনা হেন কোন জন
থাকিলে ছাড়িয়া দাও এই বইখান।
তা বলে করোনা বন্ধ 'সাবস্ক্রিপশন',
আগামী সংখ্যায় দেখো থাকিবে মহান্
পরস্ত্রী সোদর তত্ত্ব, বেদান্তেরে জিনি
(শ্যালক নহে গো) পরব্রহ্মের কাহিনী ॥

আপাতত পরস্ত্রীতে সন্তুষ্ট থাকহ,
চিরদিন আছো জানি ; মন কি তা মানে !
পথে ঘাটে ট্রামে বাসে যা খুসি তা কহ,
কিন্তু তা না ওঠে যেন গৃহিণীর কানে !
এ বই নিয়োনা গৃহে, এ মূর্ত্ত বিরহ
বাঁচিবারে চাও যদি ধনে মানে প্রাণে।
অবশ্য লইতে পারো চাদর-আড়ালে
ব্রাহ্ম সমাজের স্পীচ শুনিবার কালে ॥

নিজ স্ত্রীর পরিচিত পটভূমিকায়
পরস্ত্রীর মোহনীয় রহস্য অগাধ ;
পরস্ত্রীর উচ্ছ্বসিত সাগর বেলায়
নিতান্তই নিজ স্ত্রীর শুষ্ক শিলা বাঁধ ;
যে উচ্ছ্বাসে দোলে চিত্ত জোয়ার-ভাঁটায়
পরপত্নী তার হায় একমাত্র চাঁদ ;
পত্নী পারাবার তীরে মনে জাগে খেদ
মুহুর্মুহু ভুলে যাই আত্মপর ভেদ ॥

পরা ও অপরা দুই বিদ্যার মতন
আত্ম পর ভেদে, ভাই, পত্নী দু'প্রকার।
তন্মধ্যে সর্ব্বতো ভাবে (অবশ্য যখন
নিরাপদে পাও তারে, নতুবা আবার
আইনের গোল আছে) পরাস্ত্রী রতন।
এ বিষয়ে মতদ্বৈধ আছে বল কার।
ভাবিও না উপেক্ষিত আপনারটাই
সেও তো অন্যের কাছে পরা পত্নী, ভাই॥

প্রেম আর পিপীলিকা উভয়ে সমান ;
মাটিতে, অন্তরে করে গোপনে বিহার।
পিপ্‌ড়ের পাখা কেন ওঠে দুই খান
রহস্যের ভেদ বল কে করে ইহার ?
সেই মত একদিন প্রেমিকের প্রাণ
অকারণে করে বসে প্রস্তাব বিয়া'র।
প্রেমের সমাধি পরে বিবাহের ঘটা
বিবাহিত সুখী নর এ জগতে ক'টা ?

একেবারে নাই তাহা কেমনে বা বল
সন্ধানে মিলিতে পারে দুই চারি জন।
বেশি দূর নয়, এই হাওড়াতে চল,
স্বামী-সুখী পত্নী আছে (ভূতপূর্ব্ব বোন্)।
কবিতায় সুরু তাহা এখনো সচল,
কদাচিৎ হ'য়ে থাকে সম্ভব এমন।

সব তা'তে সুখী, ছাড়া গোঁফের ত্রিশূল
নিয়মের ব্যতিক্রমতা প্রুভস্ দি রুল ॥

সাহিত্য মানেই ভাই চর্চ্চা পরস্ত্রীর
সব রস তত্ত্ব এই কহিনু সংক্ষেপে।
বিল শোধে অসমর্থ-কল্পনা-মিস্ত্রির
কত দেশে গেছে কত লক্ষ জন ক্ষেপে।
নাম জানিবারে চাও, আছে বঙ্গশ্রীর
বর্ণানুক্রমিক দীর্ঘ সূচীপত্র ব্যেপে।
সব চেয়ে বড় ফাঁকি প্লেটোনিক প্রেম
দাম্পত্য সুখের সেটা গিল্‌টিত ফ্রেম ॥

বাজে কথা যাক্ ভাই; তবু মাঝে মাঝে
বাজে তত্ত্ব না কহিয়া নেহাৎ পারি না।
বাজে কথা এবং যে তন্‌খাটি বাজে
এরাই পরম সত্য, অচল তা বিনা।
বেদবাক্য, মেকি টাকা মৌন রহে লাজে;
মূক মুদ্রা দিয়ো ভাই ডাক্তারে দক্ষিণা,
বেদবাক্য চালাইয়ো ব্রাহ্মের সমাজে
শোক সভা, কংগ্রেসেতে মন্দিরে নমাজে ॥

একদিন বসেছিল রসচক্রী দল
গীতার্থনীতিক সেথা পঁহুছিল দ্রুত,
সমস্ত মস্তকে তার একটি কুন্তল
চুল-চেরা সীঁথি তাহে প্রবাদে-বিশ্রুত।

কুন্তল একটি বটে, বুদ্ধির সম্বল
তেতোধিক কম আহা, অর্থাৎ অভূত।
পরীক্ষিয়া তিনি বঙ্গ কাব্য-করোতোয়া
দিলেন দরাজ নিম্নলিখিত ফতোয়া॥

"কাব্য লিখেছিল বটে কবি মাইকেল
আজো কেহ অর্থ তার নারিল করিতে ;
রবির কবিতা গুলো যেন সাইকেল
অভ্যাস ব্যতীত কেহ না পারে চড়িতে ;
নবীনের কাব্যগ্রন্থ যেন বাইবেল
দেখিলে সম্ভ্রমে মাথা না চায় নড়িতে,
হেমচন্দ্র লিখেছিল বৃত্রের সংহার
আজো তাহা করে কত ছাত্রের সংহার॥

"কুমুদ মল্লিক কাব্য বনের তুলসী
গেঁয়ো-নাসা ভিন্ন তাহে না পায় সৌরভ,
প্রাণী বিশেষের মন তোলে তা উলসি ;
কালিদাস কাব্যে আছে যা কিছু গৌরব,
কবির শরীরে তাহা, যদি তা তুলসি।*
সত্যেন্দ্রের কবিতা সে ভাষার রৌরব—
বুঝিবেনা বঙ্গবাসী বিশ্ব ভাষা বিনা
আর্বী, ফার্সি, হিব্রু, আর ইঙ্গ, রুশ, চীনা॥

* তৌল কর যদি।

"প্রথমে কাজীর কাব্যে ছিল শুধু ধ্বনি
অর্থ বোধ হইত না কবি ও পাঠকে ;
কবি চিত্তে অর্থ বোধ হইল যেমনি
পত্র পাঠ বীরবাহু তিলার্দ্ধ না ঠ'কে
সার্থক করিল কাব্য মুহূর্ত্তে অমনি।
(কত রূপ ধরে কাজী জীবন নাটকে)
কাব্য-লঙ্কা উজলে কি হায় অগ্নি বিনা!
সে বহ্নি এনেছে বীর, দেখ সত্যি কি না?

ম্লেচ্ছের সৃষ্টি যাহা সকলি জারজ
কাকের বাসায় যেন কোকিলের ডিম ;
সিঁড়ি-ভাঙা ছন্দে ওই দীর্ঘ বিশ গজ
ও শুধু দৈলিপী কাব্য দুর্ব্বোধ্য ও 'সীম।*
আকারে করেনা পশু করে সে মগজ ;
পাশবিক কাব্য তার কিমাশ্চর্য্য কিম্!
জসীমের গ্রন্থে পাবে অশুদ্ধি নানান্
সে নহে ছাপার ভুল, নিজেরি বানান॥"

অনর্গল বলে গেল, যেন তানসেন
আলাপ করিল আহা খেয়াল ধ্রুপদ,
উদয় শঙ্কর (যিনি বঙ্গে আনছেন
নব নৃত্য কলা) যেন অতি দ্রুতপদ

* 'সীম = অসীম (দৈলিপী প্রয়োগ)।

স-সীম্‌কি নাচিয়া গেল ; কিম্বা রান্‌ছেন
ভাজা, টক্‌, ঝোল, ঝাল নন্দিনী-দ্রুপদ।
শুনিয়া সভ্যেরা, সব প্রাণে প্রাণে গিঁঠো
অতএব দিল সবে প্রতিবাক্যে ditto ॥

এমত সময়ে উঠি রসবিশ্বপতি
(হেমেন্দ্র মজু'র যেন ছবি এক খান্‌)
সুরেন্দ্রের নাম লয়ে কহিল শপথি
"সহজ ভাষায় রস করিব ব্যাখ্যান।
আমার এ রসতত্ত্ব কাব্য মনোপ্যাথি
বুঝিতে পারিবে যদি ত্যজ কাণ্ডজ্ঞান",
প্রমাণ করিল বৎস—রস ও চরস
এক ভাণ্ডে জন্মে দোঁহে, সমান সরস ॥

"ব্রহ্ম হ'তে রসগোল্লা এক সুরে বাঁধা,
জগৎ-ঢাকের কাঠি কামিনী-কাঞ্চন ;
ব্রহ্ম সে ঢাকের বাঁয়া যত সব হাঁদা।
তাহারে বাতিল করে' খুসী মনে, মনে।
রসো বৈ সস্তিনি (—মানে কি না ধাঁধা)
তাঁহারে মাথায় রাখি ভুঞ্জ এ জীবনে।
যে যেমনে চাহে তাঁরে মেটে তার আশ
নস্যরূপে মোর কাছে তাঁহার প্রকাশ ॥"

উঠিলেন কালিদাস, পূর্ব্ব খ্যাতি তরে
কলম চালনে যিনি হয়েছেন দড়।

এই পরিশ্রম আহা হ'লে ক্ষেত্রান্তরে
শ্যামলা বাংলা হ'ত সুশ্যামলতর।
বাংলা মানে দেশ, ভাষা—দুই হয়, ওরে,
হে বঙ্গীয় কবিদল, ভুল কেন কর!
কালিদাস নাম লাখ্ টাকা মরা হাতি
বঙ্গবাণী শিরে তিনি দর্দ্দুরের ছাতি॥

"কবিতা লেখে না বল কে দেখি কৈশোরে,
(আজ এসো করা যাক্ সঙ্গীত সাধন,)
প্রথম প্রেমের মত মৌখিক সে ওরে
যেমন মৌখিক আহা প্রথম চুম্বন,
(অবশ্য পলায় তাহা বিংশতির পরে)
যেমন মৌখিক আহা মেচেতা ও ব্রণ,
পরস্ত্রী ধনুক ভঙ্গে আমি রে শ্রীরাম
চিরঞ্জীব যৌবনের অব্যর্থ serum॥

"ওপারে বেথুন এপারে স্কটিশ্
মাঝে হেদুয়ার জল,
ওপারে লটিরা এ পারে লটীশ*
মাঝখানে হলাহল।

---

* লটি+ঈশ (উপক্রমণিকা দেখহ)।

দূরবীক্ষণে করিনু ফোকাস্
নব বিস্ময়ে হইল প্রকাশ,
বাতায়ন পাশে কোন্ অজানার
শাড়িকার অঞ্চল গো ॥

নব হার্শেল সম ঘুরি মোরা
দূরবীক্ষণ করে,
পাশের বাড়ির উঠিবেন ওঁরা
কখন ছাদের 'পরে।
চিত্ত-আকাশে নব গ্রহ নয়
কত জন তার সংখ্যা না হয়,
দূরবীক্ষণে কাছে টেনে আনি
অনুবীক্ষণি পরে গো ॥

তস্কর ব্রতে নারি কোনো মতে
তারা গেল কংগ্রেসে,
বিজন-হৃদয় পথে ও বিপথে
ঘুরি সাহিত্য বেচে।
তাহারা দেশের ধন-তস্কর
আমরা দেশীর মন-তস্কর
সরল ভাষায় চোর ও ছ্যাঁচড়
এই রূপে আছি বেঁচে গো ॥"

গাহিল সকলে গান ; কবি কালিদাস
কহিল "আমরা সব বাঁধা মনে মনে
অন্তরের এ বন্ধন দৃঢ় নাগপাশ
কোনোক্রমে টুটিবে না, দেহে প্রাণে ধনে ;
আমরা সকলে এক ; এ দীন আবাস
তোমাদেরি বলে বন্ধু জেনো জনে জনে !"
কহিল ফুলের কবি, "যেতে হবে ঢাকা
চট্ করে আনো দেখি গোটা কুড়ি টাকা ॥"

এহেন কাব্যের শিরে হেন বজ্র কভু
পড়েছে কি কোনোখানে, বাল্মীকি ও ব্যাসে ?
ভাষায় প্রকাশ্য নয়, খানিকটা তবু
এ দুঃখ যায় রে বলা ফুটকি ও ড্যাশে—
অধিকাংশ দুর্ভাগ্যই জগতে স্বয়ম্ভূ,
হায় কবি কালিদাস কি করিলে শ্যাষে* ?
হেন কাব্য, হেন সভা নাহি হয় রোজ,
চূড়ান্ত ভাবের শিরে প্রাণান্ত bathos ॥

স্বখাত সলিল ভ্রাত ! ঘুরিতেছে মাথা ?
কঠিন পীড়ায় বল আর কে গো সাথী ?
করিও না মুষ্টিযোগ, কিম্বা ভাই যা তা
এ সময়ে একমাত্র সেব্য এলোপ্যাথি।

* পদ্মার পূর্ব্ব তীরের উচ্চারণ ; শেষে।

ডাক্তারখানায় চল, গায়ে দিয়ে কাঁথা,
সাথে নিয়ো বহু কেলে এলোমেলো ছাতি,
তোমার দেহটি কবি সম্পদ জাতীয়
সে আশায় বাঁচে আজো সব ভারতীয় ॥

আমি তো ডাক্তার নহি, মোর প্রেস্ক্রপ্সেনে
আর যাই হোক তুমি মরিবে না প্রাণে।
পটাসম ব্রোমাইড নিয়ে বিশ গ্রেনে
তথামাত্রা সোডিয়াম ব্রোমাইড মানে,
তদর্দ্ধ ক্লোঃ হাইড্রেট দিয়ো তাতে এনে
'অ্যাকোয়া' মিশায়ে নিয়ো যত চাহে জানে ॥
মধুরিতে দিয়ো তাতে সিরাপ সে 'রোজ'
বিনা ফিসে বলে দিনু ওষুধের ডোজ ॥
ইতি সপ্তম সর্গ।

• মাতা (ছোট ছেলেকে): কেঁদোনা, লক্ষ্মী, মাণিক, তোমার বাবা মরেনি—দাবার আড্ডায় যোগ দিয়েছে।

—

এক রাত্রি

বৈশাখ আসিবার সঙ্গে সঙ্গে প্রায় প্রতিদিন কাল বৈশাখীর আবির্ভাব ঘটিতেছে। সন্ধ্যা হইতে না হইতে উত্তর-পশ্চিমাকাশ ঘন মেঘে আচ্ছন্ন হইয়া যায়, বায়ু ক্ষণকালের জন্য নিশ্বাস বন্ধ করিয়া থমকিয়া দাঁড়ায়। নদীতীর হইতে শাদা বকের শ্রেণী কালো মেঘের গায়ে অপরূপ মালা গাঁথিয়া সোঁ সোঁ শব্দ করিতে করিতে কুলায়ে ফিরিতে থাকে।

ঐ যে দিগন্তব্যাপী কালো মেঘ একটা বিরাট শক্তিশালী দৈত্যের মত ধীরে ধীরে মাঠের প্রান্তে মাথা তুলিতেছে, এখনি যাহার গর্জ্জন বর্ষণরূপ প্রলয় নৃত্যে জলস্থল কম্পিত করিয়া তুলিবে, উহা প্রতিদিনের নহে বলিয়াই এত চমৎকার। সূর্য্য প্রতিদিনের মেঘ সাময়িক। কিন্তু সেকথা এখন থাক।

এমন দিনে কিছু ভাল লাগে না। ডি-এচ লরেন্সের বইখানা খুলিয়া তিরিশটি 'অনুভাব' শেষ করিয়া একত্রিংশ সংখ্যায় হাত দিব এমন সময় আকাশের এই ষড়যন্ত্র। এমন সময় কি লিখিব? প্রতিদিনের সূর্য্যালোকিত দিবসের অথবা প্রশান্ত রাত্রির পরিচিত ঘুমন্ত পৃথিবীর কাহিনী বহু লিখিয়াছি! সুবিধা হয় নাই। ডি-এচ লরেন্স সকল গণ্ডগোলের মাঝখানে যখন ত্রাণকর্ত্তা রূপে আবির্ভূত, ঠিক সেই সময় মেঘে মেঘে আকাশ ছাইয়া গেল, চেনা জগৎ চোখের সম্মুখ হইতে কোথায় সরিয়া গেল আর তাহাকে খুঁজিয়া পাই না। সুতরাং কাল-বৈশাখী দিয়াই গল্প আরম্ভ করিলাম।

মেঘের উপর মেঘ জমিয়া রাত্রির গাঢ় অন্ধকার গাঢ় হইতে

গাঢ়তর হইয়া উঠিতেছে। বিরাট প্রান্তর, উত্তর দিক হইতে প্রবল ঝড় উঠিয়া আসিল। বিদ্যুৎ আকাশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সহস্র শাখা প্রশাখা লইয়া জ্বলিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছে। বিপুল মেঘ গর্জ্জন, গুরু গম্ভীর গর্জ্জন—বিদ্যুতের আলোতে যতদূর দেখা যায়, জনমানবের চিহ্ন নাই। প্রবল বেগে বৃষ্টি নামিয়া আসিল। ঝড়ে বৃষ্টিতে বজ্রধ্বনিতে প্রলয়ের লীলা চলিতেছে। অন্ধকার যেন কঠিন হইয়া পৃথিবীর বুকের উপর চাপিয়া বসিয়াছে—চারিদিকে কিছু নাই, কেবল অন্ধকার, বজ্রে বিদ্যুতে আহত অন্ধকার, ঝড়ে বৃষ্টিতে আর্ত্ত অন্ধকার।

একটি যুবক ইহারই মধ্যে সেই বিরাট প্রান্তরের মাঝখানে একা, —প্রাণপণ শক্তিতে ছুটিয়া চলিয়াছে, কোথায় সে যাইবে, তাহার লক্ষ্যস্থল কোথায় কেহ বলিতে পারে না। পথহীন প্রান্তরে তাহার শঙ্কিত গতি দেখিলে তাহার নিজেরই কোনো লক্ষ্য আছে কি না সন্দেহ হয়। বৃষ্টিতে সর্ব্বাঙ্গ ভিজিয়া গিয়াছে, বৃষ্টির তীক্ষ্ণ ধারা তীরের মত তাহার মুখে চোখে আসিয়া বিঁধিতেছে। তাহার এক হাতে প্রকাণ্ড একখানা খাতা, তাহারই লেখা কতকগুলি গল্প, কবিতা এবং একটি নভেলের পাণ্ডুলিপি—অন্য হাতে এক জোড়া স্যাণ্ডেল।

পথের চিহ্ন নাই পথে সে চলিতেছে না। যে-কোনো দিকে হউক যে-কোনো একটি আশ্রয় না পাইলে এই ভয়ঙ্কর দুর্য্যোগের হাত হইতে তাহার বাঁচা অসম্ভব। ঝড়ের প্রবল বেগ তাহাকে অনির্দ্দিষ্ট দিকে ঠেলিয়া লইয়া চলিল। কতক্ষণ চলিল সে খেয়াল তাহার নাই। ঝড় ক্রমশ বাড়িয়াই যাইতেছে। ঝড়ের বিরুদ্ধে দুই খানি পায়ের ক্ষীণ প্রতিবাদ চলে না—সে হতাশ হইয়া ঝড়ের নিকট আত্মসমর্পণ করিল।

ঐ যে অন্ধকার এবং বৃষ্টির শব্দ ভেদ করিয়া "প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে" গানটি শুনা যাইতেছে উহা ঐ যুবকই গাহিতেছে। অত্যন্ত ভয়ে সে গান ধরিয়া দিয়াছে, ইহা ছাড়া আর কোনো উপায় তাহার ছিল না। এক হাতে খাতা অন্য হাতে জুতা লইয়া যুবক দৌড়াইতেছে আর গাহিতেছে—"প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে।"

ছুটিতে ছুটিতে যখন তাহার ছুটিবার সামর্থ্য নষ্ট হইয়া গেল, পা আর চলে না তখন হঠাৎ বিদ্যুতের আলোতে সে দেখিতে পাইল সম্মুখে একখানি কুটীর। ঈশ্বর কি তাহাকে দয়া করিলেন? যুবক, ঈশ্বরকে মনে মনে ধন্যবাদ দিয়া নিঃসঙ্কোচে কুটীরের বারান্দায় গিয়া উঠিল। বিদ্যুতেব আলোতে দেখা গেল কুটীরের দরজা বন্ধ। তাহার আর দরজা ঠেলিবার প্রবৃত্তি হইল না। মনে হইল পাছে তাহাকে চোর কিংবা ডাকাত মনে করিয়া কুটীরস্বামী তাহার সহিত অসদ্ব্যবহার করে। সে যে আশ্রয়টুকু দৈব-কৃপায় লাভ করিয়াছে, অতিরিক্ত লোভ করিয়া তাহাকে সে নষ্ট করিবে না। সে বারান্দার উপরেই বসিয়া পড়িল। ছুটিবার সময় সে যে গানটি ধরিয়াছিল অতিরিক্ত ভয়ে তাহার সুর তাল সমস্তই গোলমাল হইয়া গিয়াছিল—তাই কুটীরে পৌঁছিয়া গানটি আর একবার উত্তম করিয়া গাহিবার ইচ্ছা তাহার হইয়াছিল, কিন্তু ঐ একই কারণে এ প্রবৃত্তিটিও সে সংযত করিল।

যুবক শক্তিশালী কিন্তু সে বর্ব্বর নহে! বর্ব্বর হইলে সে এতক্ষণ কুটীরের দরজায় ধাক্কা দিয়া কুটীরবাসীকে জাগাইয়া আশ্রয় দাবী করিত। ফলে হয়ত উভয় পক্ষে মারামারি হইত। কিন্তু সেরূপ করিবার ইচ্ছা তাহার হইল না। সে বারান্দায় বসিয়াই ঝড় বৃষ্টির আঘাত সহ্য করিতে লাগিল।

এরূপ অবস্থায় কি কি ঘটিতে পারে কল্পনা করা যাউক। যুবকটিকে এত কষ্ট সহ্য করাইয়া বিরাট মাঠের প্রান্তে একটি কুটীরে আনিয়া হাজির করা গিয়াছে। তাহার এত ক্লেশ কি ব্যর্থ হইবে? গল্প কি এই পর্য্যন্ত আসিয়া থামিয়া যাইবে? কলমের একটি আঁচড়ে ঝড় বৃষ্টি থামাইয়া দিয়া রাত্রির অন্ধকার বিদায় করিয়া দিব? যুবকটি ভোরের আলোয় গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়া ট্যাঁক হইতে চারি আনা পয়সা বাহির করিয়া নিকটস্থ বাজার হইতে একটি ইলিশ মাছ কিনিয়া বাড়ি ফিরিবে? বাস্তবক্ষেত্রে ইহাই হয় ত স্বাভাবিক, কিন্তু এরূপ করিতে পারিলাম না। এমন একটি দুর্লভ রাত্রি ইহাকে ইলিশ মাছ দিয়া শেষ করিতে কষ্ট হয়।

সমস্ত দৈব দুর্য্যোগ এখন একটি মাত্র পরিণামের দিকে ঈঙ্গিত করিতেছে। এখনি ঐ বদ্ধদ্বার কুটীর হইতে একটি তরুণী বাহির হইয়া আসিয়া হঠাৎ যুবককে দেখিয়া চমকিয়া উঠিবে, এবং তাহাতে যুবক ততোধিক চমকিত হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিবে, ভয় পাইও না দেবী, আমি ঝঞ্ঝাতাড়িত আশ্রয়হীন পথিক, এখানে একটু আশ্রয়ের আশায় আসিয়া পড়িয়াছি, অন্ধকার দূর হইলেই চলিয়া যাইব।

তরুণী বলিবে—তোমার পরিচয় চাই।

যুবক—ক্ষণিকের অতিথি আমি, আমার বিশেষ কোনো পরিচয় নাই, তবু যতটা সম্ভব দিতেছি।

আমি একাধারে কবি, গল্পকার, উপন্যাস লেখক, ব্যায়াম-সমিতির সভ্য এবং ইনশিওর‍্যান্সের এজেন্ট। আমি বিবাহ করিতে চাই, কিন্তু পারি না। আমি কবিতা লিখিতে জানি একথা শুনিয়া এক পাল ন্যাকা মেয়ে আমার পিছু লইয়াছে—জীবন অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল। মেয়েদের সম্বন্ধে আমার আর কোনো মোহ নাই, বিশেষ

করিয়া 'কবিদাদা' 'কবিদাদা' করিয়া যাহারা গায়ে ঢলিয়া পড়িতে চায় তাহাদের সম্বন্ধে। বিশ্বাস কর না? ঠিক এই রকমেরই এক দল মেয়ে আছে তাহারা অত্যন্ত নিরেট নির্বোধ—এক মিনিটও সহ্য করা যায় না—তাহাদের হাত হইতে বাঁচিবার জন্য আমি নিরুদ্দেশ যাত্রা করিয়াছি—পথে এই ঝড় আর বিপদ। কিন্তু হে দেবী, আমাকে রাখিতে চেষ্টা করিও না। অজ্ঞাতকুলশীলকে আশ্রয় দিতে নাই, তুমি ত আমাকে চেন না।

তরুণী—তুমি দেবতা, তোমাকে আমি চিনি, কয়েক বৎসর ধরিয়া চিনি।

এই সময়ে বিদ্যুতের আলোয় উভয়ে উভয়কে দেখিল। কেহ কাহাকেও পূর্ব্বে দেখে নাই। কিন্তু তবু সেই মেঘ বিদ্যুৎ ঝড় ঝঞ্ঝার অপরূপ উন্মত্ততার মধ্যে তাহাদের মনে হইল সমস্ত পরিচিত স্পষ্ট পৃথিবী লুপ্ত হইয়া গিয়াছে কেবল তাহারাই একটা অনির্দ্দিষ্ট অস্থির জগতের মধ্যে অবস্থিত একমাত্র নরনারী। তাহাদের কোনো পরিচয় থাকিবার দরকার করে না, দুই জনে যে দৈবাৎ আসিয়া মিলিত হইয়াছে ইহাই তাহাদের এই মিলনের একমাত্র কৈফিয়ৎ। কুটীর খানি যেন পদ্ম-পত্র;—সমস্ত পৃথিবী ডুবিয়া গিয়াছে—সমস্ত অতীত নিঃশেষে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, দুটি বিন্দু অশ্রুর মত তাহারা যেন সেই পদ্মপত্রের উপর টলমল করিতেছে।

ধূমায়মান অন্ধকার জগতের মধ্যে যেন দুইটি মাত্র অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, আপন হৃদয় তাপে জ্বলিতেছে। স্রোতের মত বহমান নীহারিকাপুঞ্জ হইতে দুইটি নরনারী যেন এইমাত্র রূপ গ্রহণ করিয়াছে—অতীতের ক্রোড় হইতে ছিন্ন করিয়া অনন্ত ভবিষ্যৎ তাহাদিগকে তাহার রত্নমঞ্জুষার ভিতরে আবৃত করিয়া রাখিল।

এসব হয়ত কিছুই সত্য নয়, কিন্তু তথাপি যুবকের আশা করিবার, বিশ্বাস করিবার অধিকার আছে। দেহের শক্তি যাহার অটুট, মনের স্বাস্থ্য যাহার নষ্ট হয় নাই, সে চিরকাল বিশ্বাস করিবে, হতাশ হইয়া জড়ের মত গৃহকোণে পড়িয়া থাকিবে না। যুবক ব্যায়াম সমিতির সভ্য—বাইসেপস্ ট্রাইসেপস্ নাচাইয়া লোককে বিস্মিত করে, তাই সে বিশ্বাস করিল কুটীরের ভিতর হইতে তাহার আহ্বান আসিবে। সে ভুলিয়া গেল মাঠের প্রান্তের একটি মাত্র কুটীরে একটি মাত্র রাজকন্যা বা ঐ জাতীয় কোনো কন্যা কাহারো জন্য রাত্রি জাগিয়া বসিয়া থাকে না। এদিকে ঝড় এলোমেলো ভাবে বহিতে সুরু করিয়াছে, আকাশ হইতে মেঘ গর্জ্জনের একটি দীর্ঘ ধারা অবিরাম বহিয়া যাইতেছে, যে কোনো স্বপ্ন সত্য হইয়া উঠিবার এই ত উপযুক্ত সময়।

যুবকের ভাবোন্মাদনা আসিল। এই বাংলার বুকে চৈতন্যদেবের একদিন এমনি ভাবোন্মাদনা আসিয়াছিল। যুবকের পার্থিব দৃষ্টি লুপ্ত হইয়া অন্তর্দৃষ্টি ফুটিয়া উঠিল। তাহার সম্মুখ দিয়া গুরুসদয় দত্ত মহাশয় নাচিতে নাচিতে চলিয়া গেলেন। তারপর নলিনীরঞ্জন সরকার মহাশয় একখণ্ড Finance Review বাজাইতে বাজাইতে আসিয়া বলিলেন, কি হে ছোকরা তাল বোঝ? ধা-ধিন্-ধিন্-তা, তা-ধিন্-ধিন্-তা? যদি না বোঝ আজ হইতে বুঝিবার চেষ্টা কর—তালে তালে পা ফেলিয়া চলিলে তুমি একদিন কলিকাতার মেয়র হইতে পারিবে।

বলিতে বলিতে নলিনীরঞ্জন অদৃশ্য হইলেন, ইহার পরে আসিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। গায়ে নামাবলী, হাতে মেঘনাদবধ কাব্য—কণ্ঠে মা মা ধ্বনি। মাইকেল বলিলেন—ছোকরা, হরিনাম কর, উদ্ধার হইবার আর কোনো পথ নাই। এমন সময় দূরে চীৎকার শোনা গেল, "মাইকেল মাইকেল।" পরক্ষণেই বিদ্যাসাগর মহাশয় চৌরঙ্গী

হইতে নূতন suit পরিহিত হইয়া ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে আসিয়া বলিলেন I am totally disgusted with these unbending Hindoos.—I am nonplussed—must have recourse to legislation—no help. বলিয়া ফস্ করিয়া পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া সুদীর্ঘ ললাটদেশ মার্জ্জনা করিতে করিতে মাইকেলের সঙ্গে চলিয়া গেলেন।

এ যেন রঙ্গমঞ্চে অভিনয় হইতেছে, অভিনেতারা আসিয়া নিজ নিজ পার্ট আবৃত্তি করিয়া যাইতেছে। যুবক বসিয়া বসিয়া অর্দ্ধ-নিমীলিত নেত্রে এ সব উপভোগ করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে কখন বাউল বেশে রবীন্দ্রনাথ এবং বৃদ্ধ বঙ্কিমচন্দ্র উপস্থিত হইয়াছেন। বঙ্কিমবাবু বলিতেছেন—চলহে রবি, হেদুয়াতে চল, endurance সাঁতার কখনো দেখি নাই, দেখিতে হইবে। রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, ব্যস্ত হইবেন না—হেদুয়া এই খানেই আনাইতেছি। রবীন্দ্রনাথের কথায় সত্যই সেখানে হেদুয়ার আবির্ভাব হইল। দেখা গেল একটি মেয়ে হাত পা বাঁধা অবস্থায় জলে ভাসিতেছে। সে নাকি গত পঞ্চাশ ঘণ্টা ধরিয়া এই অবস্থায় আছে। রবীন্দ্রনাথ ইহা দেখিবামাত্র গান ধরিয়া দিলেন —"শুধু ভাসা—শুধু ভাসা।" ইহাতে বঙ্কিমবাবু অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া "কেষ্ট, কেষ্ট" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। মুহূর্ত্তের মধ্যে কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় মহা হল্লা করিতে করিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখা গেল, তিনি তিন চারি জন লোকের সঙ্গে তুমুল তর্ক আরম্ভ করিয়াছেন, মেয়ের বয়স আঠারোর উপরে কি নীচে—সাঁতারে তাহাকে প্রলুব্ধ করা হইয়াছে না তাহার নিজের consent আছে, এ সব বিষয় পরিষ্কার না করিয়া আমি এখান হইতে এক পা নড়িব না। ফলে তুমুল গোলমাল আরম্ভ হইল এবং গোলমালের মধ্যে

সমস্ত দৃশ্য এবং লোকজন মিলাইয়া গেল—যেন সমগ্র নাটক শেষ হইয়া যবনিকাপাত হইল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই যুবকটি হঠাৎ কাহার যেন ক্রন্দন ধ্বনি শুনিতে পাইল। তাহার সত্যই মনে হইল ঝড় দানবটা সমুদ্র পারের কোনো রাজকন্যাকে লুণ্ঠন করিয়া আনিয়া এই কুটীরের ভিতর বন্দী করিয়া রাখিয়াছে, তাহারই হাতে আজ সে মুক্তি পাইবে। তাহার নিশ্চিত আরাম, তাহার সুখ-শয্যা হইতে ছিন্ন করিয়া তাহাকে দুঃখের সঙ্গে মুখামুখী দাঁড় করাইয়া দিয়া ঝড়-দৈত্যটা আজ নিষ্ঠুর আনন্দে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। দৈত্যের হাত হইতে আজ তাহাকে উদ্ধার করিতেই হইবে। মনে হইতেই রাজকন্যা মুহূর্ত্ত মাত্রও আর তাহার কল্পনায় আবদ্ধ হইয়া রহিল না, একেবারে বাস্তবরূপে অন্ধকারের নিকষে কাঁচা সোনার রেখা অঙ্কিত করিয়া চারিদিকে সুরভি ছড়াইয়া যুবকের সম্মুখে আসিয়া ব্যাকুল কণ্ঠে কহিল, আমাকে বাঁচাও, দেখিতেছ না, আমাকে একটা গোদা গোছের লোক বন্দী করিয়া রাখিয়াছে?

রাজকন্যার রূপের অপরূপ জ্যোতিতে, তাহার সুগন্ধ নিশ্বাসে তাহার সঙ্গীতময় কণ্ঠস্বরে যুবক একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িল। তাহার দেহমনের শক্তি এখন কোথায়? তাহার আর উঠিয়া দাঁড়াইবার সামর্থ্য রহিল না, সে বসিয়া বসিয়াই রাজকন্যার দিকে হাত বাড়াইয়া দিয়া কহিল, তুমি আমার অন্তরে প্রবেশ কর আমি সেখানে তোমাকে কিছু কাল রক্ষা করিব। লক্ষ্য করিয়া দেখ, তোমার রূপের মাদকতায় আমি বিহ্বল, তোমাকে বাঁচাইব কি, তুমি আমাকে বাঁচাও। Give and take ছাড়া উপায় নাই।

যুবক হঠাৎ যেন জাগিয়া উঠিয়া বল সঞ্চয় করিবার জন্য ডন দিতে লাগিল, কিন্তু হাত পা তাহার আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছে দুই চারিটি ডন

দিতেই সে মাটির উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া গেল আর উঠিতে পারিল না। অসহায় ভাবে শুইয়া শুইয়াই বলিতে লাগিল—আমার ক্ষণিকের মোহকে ক্ষমা করিও, তুমি আমার কেহ নহ।

রাজকন্যা আহত হইল। তাহার আয়ত দুটি চক্ষু হইতে অশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল, কিন্তু যুবক তাহা দেখিতে পাইল না। রাজকন্যা যুবকের কাছে বসিয়া পড়িয়া তাহার পা জড়াইয়া ধরিয়া সেই পায়ের উপর তাহার রাত্রির মতই ঘনকৃষ্ণ কেশরাশি লুটাইয়া দিয়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল—তোমার মোহ মিথ্যা হউক, কিন্তু তোমার করুণা হইতে আমাকে বঞ্চিত করিও না।

প্রলয় রাত্রির গভীর অন্ধকার কালো চুলের রূপ ধরিয়া যুবকের পায়ে লুণ্ঠিত হইল। কিন্তু যুবক সেই সর্ব্বগ্রাসী আঁধারের প্রভাব হইতে মুক্ত হইবার জন্য পা দিয়া তাহার মস্তক ঠেলিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

রাজকন্যা অভিমান-আহত হইয়া চকিতে দূরে সরিয়া গিয়া কহিল—তোমাকে ধিক্, তুমি দেবতা নহ, তুমি সনাতনী ভূত।

আকাশ ভাঙিয়া অবিরল ধারায় বৃষ্টি ঝরিয়া পড়িতেছে, দমকা হাওয়া বৃষ্টির ধারা গুলিকে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া চারিদিকে সজোরে বহিয়া বেড়াইতেছে—চোখ ধাঁধাইয়া দিয়া বিদ্যুতের চমক খেলিয়া গেল। সেই আলোতে যুবক হঠাৎ দেখিতে পাইল তাহার সম্মুখে সেই তরুণী দাঁড়াইয়া—তাহার চেহারা কি সুন্দর! চোখে চশমা, চুলের পাতা ডানদিকের কপাল ঢাকিয়া যমুনার ঢেউয়ের মত কালো ঢেউ তুলিয়া কানের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে। কিন্তু তাহার ললাটে ও কি সিঁদুরের চিহ্ন? বিদ্যুতের আলোকে ভাল করিয়া লক্ষ্য করিতেই যুবক বুঝিতে পারিল সিঁদুর নহে একটি ক্ষত চিহ্ন—সেখান হইতে রক্তের একটি ক্ষীণ ধারা প্রবাহিত হইতেছে।

যুবক জিজ্ঞাসা করিল, তোমার ললাটে ও কি ?

তরুণী বলিল, এ আমার আশীর্ব্বাদ।

যুবক বলিল, ইয়ার্কি রাখ, সত্য করিয়া বল, ও কিসের আঘাত।

তরুণী বলিল, পুরুষের নিকট হইতে নারী ত চিরকাল এই আশীর্ব্বাদই লাভ করিয়াছে তাহা কি তুমি জান না ?

যুবক বুঝিল তরুণী শরৎ-সাহিত্য পড়িয়াছে এখন আর অন্য উপায় নাই, তথাপি সাহস করিয়া বলিল—কাপুরুষের আঘাতকে আশীর্ব্বাদ বলিও না, তোমাদের আত্মবোধ জাগ্রত হউক, হইলে তোমাকে এক খণ্ড অনামী উপহার দিব।

তরুণী কাঁদিয়া বলিল—দেবতা, আমার কিছুরই দরকার নাই, আমি কিছুই বুঝিতে চাহি না। তোমার মধ্যে আমাকে চিহ্নহীন করিয়া ডুবাইয়া দাও, আমাকে বার বার দূরে ঠেলিয়া দিও না। আমি অনেক হাত ঘুরিয়া তোমার কাছে আসিয়াছি।

যুবকের মস্তিষ্কের মধ্যে কে উত্তপ্ত ছুরি দিয়া কাটিয়া কাটিয়া লিখিয়া গেল, ঐ ক্ষত চিহ্ন—কাপুরুষ—তুমিই একদিন পায়ের আঘাতে উহার ললাটে আঁকিয়া দিয়াছ, আজ কি তাহা ভুলিয়া গেলে ?

যুবক সহসা দুই হাত বাড়াইয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—দেবী, আমি তোমাকে বিবাহই করিব—আমাকে ক্ষমা কর। আমাকে—

প্রচণ্ড বজ্রধ্বনির মধ্যে কথা মিলাইয়া গেল আর বলা হইল না।

* * *

ঝড় বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে। যুবক চোখ রগড়াইয়া চাহিয়া দেখিল সূর্য্যোদয়ের আর বেশি বিলম্ব নাই। তাহার কাপড় জামা তখনো

সিক্ত। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল—বাড়ি ফিরিতে হইবে—রাত্রির অন্ধকারে কি ঘটিয়াছিল তাহা আর মনেই আসিল না, কিন্তু একটু বুঝিল তাহাকে বিবাহ করিতে হইবে। কোথায়? হয় সাতারায় না হয় সাঁতরাগাছিতে।

দিনের আলোয় দিনের পৃথিবীর জাগরণ, সেখানে রাত্রির স্থান নাই। নীচে নামিয়া যুবকের কুটীর খানি একবার দেখিবার ইচ্ছা হইল। চারিদিকে ঘুরিয়া যুবক দেখিতে পাইল—জনপ্রাণী দূরের কথা কুটীরের পিছন দিকে বা পাশে কোনো বেড়াই নাই, তিন দিক একেবারে খোলা। সম্মুখের দিকে একটি মাত্র বেড়া এবং তাহারই সঙ্গে একটি মাত্র দরজা, পিছন দিক হইতে বন্ধ। এটা পূর্ব্বে বুঝিতে পারিলে সে অনায়াসে ঘরের মধ্যে গিয়া বসিতে পারিত এবং তাহাতে বৃষ্টির ছাঁটও গায়ে অপেক্ষাকৃত কম লাগিত।

কিশোরী

তরুণি, তোর মন কোথা আজ বল্‌ লো!
কোন ঠিকানায় হৃদয়খানি উধাও ছুটে চল্‌লো।
কিসের রঙে অধর হল রাঙা
মন্দ মৃদু চলন ভাঙা-ভাঙা
লুকিয়ে বুকে হান্‌বি কাহার কঠিন ভুরু-ভল্ল?

চাউনিটি যে যায়না ধরা, চপল-চোরা দৃষ্টি—
পলকপাতে কাহার মাথে করলি সুধা-বৃষ্টি !
সরম দিয়ে রাখলি ঢেকে মন
হাসিটি ত রইল না গোপন—
লাজুক হাসি—করলে সারা ভুবন মধু-মিষ্টি।

হাসিটি তোর চাহনি তোর বলছে ওলো বল্‌ছে,
ধরণী তোর চরণ তলে সুধা-মগন টল্‌ছে।
কূলে কূলে বান ডেকেছে তোর ;
ভাসিয়ে দুকূল বইছে জোয়ার জোর,
তীর ছাপিয়ে লাবণ্যেরি বন্যা নেচে চলছে।

এখন কেন লজ্জা তবে, সরম কেন সই লো ?
না হয় আজি চরণ তলে বসন পড়ে রইল।
না হয় নিলাজ মধু-সমীর এল
দুলিয়ে অলক করলে এলোমেলো
পাপিয়া তোর মনের কথা সবার কানে কইল।

নয়ন কথা হাসির পিছে রাখিস নে আর শান্ত্রী
সরল চোখে মুখ তুলে দেখ প্রিয়ের কমকান্তি
হাস্‌বি যদি হাস অকপট হাসি
মুখ ফুটে বল—'বন্ধু ভালবাসি'
আকাশ জোড়া আলোর মাঝে মুক্ত করে প্রাণটি।

"লুব্ধক"

প্রসঙ্গ-কথা

"Education may wait but Swaraj cannot" বলিয়া গান্ধীজি একদা দেশবাসীকে প্রলুব্ধ করিয়াছিলেন। সেদিন আমরা দলে দলে এডুকেশনকে অগ্রাহ্য করিয়া মহা হুল্লোড়ে স্বরাজরূপ চাঁদ স্পর্শ করিতে গিয়াছিলাম। ফলে যাহা হইবার তাহা হইয়াছে। গান্ধীজির উদ্দেশ্য ছিল সাধু কিন্তু গণনায় ছিল ভুল। সাধুতার সহিত ডিপ্লোম্যাসির যে সন্ধি কখনো হয় না, সেই সন্ধি গায়ের জোরে করিতে গিয়া সবই ব্যর্থ হইল। স্বরাজ পাইলে এডুকেশনের ভাল ব্যবস্থা করা যায় ইহা অত্যন্ত সত্য কথা, কিন্তু এডুকেশন না পাইলে স্বরাজ পাওয়া যায় কি না সে কথা গান্ধীজি আজ পর্য্যন্ত খুলিয়া বলিলেন না। নীতিশাস্ত্রে বলে, মানুষের কোনো উদ্যমই ব্যর্থ হয় না। আধ্যাত্মিক নীতি-ধর্ম্মের দোহাই দিয়া আমরা আজও এই সান্ত্বনাই লাভ করিতেছি যে আমাদের সেই আপাতব্যর্থ উদ্যম নিষ্ফল হয় নাই; হয়ত পঞ্চাশ কি একশত বৎসর পরে ইহার ফল বুঝা যাইবে।

—

কবি গাহিয়াছেন—

যে ফুল না ফুটিতে
ঝরেছে ধরণীতে
যে নদী মরুপথে
হারালো ধারা
জানিহে জানি তাও হয়নি হারা!

ইহা উচ্চস্তরের দার্শনিক তত্ত্ব, ইহার বিরুদ্ধে তর্ক করা চলে না। তাই আমরা ধ্রুবকে পরিত্যাগ করিয়া যে অধ্রুবের পশ্চাতে ছুটিয়াছিলাম তাহাতে আমাদের নিন্দার কিছু নাই। অধ্রুবের পশ্চাতে ছুটিয়া চলাতেই জাতীয় প্রাণের পরিচয়। কিন্তু এই খানে অন্যান্য জাতি হইতে আমাদের কিছু পার্থক্য আছে। ধরা যাউক দেশে ভয়ঙ্কর ম্যালেরিয়া দেখা দিয়াছে। বহু লোক মারা যাইতেছে। এ অবস্থায় যদি রুগ্ন মুমূর্ষু দিগকে ফেলিয়া দেশ হইতে ম্যালেরিয়া উচ্ছেদের কাজে আত্মনিয়োগ করি, তাহা হইলে, তাহাতে নিষ্ঠুরতা থাকিলেও নিন্দার কিছু নাই। রোগের মূলোৎপাটন করিতে পারিলেই কৃতিত্ব বেশি, ইহার জন্য কিছু লোক যদি মারা যায় অনেক সময়ে তাহাও সহ্য করা উচিত। অন্যান্য দেশে ধ্রুবকে ত্যাগ করিয়া অধ্রুবের পশ্চাতে যদি কেহ ছুটিয়া থাকে তবে সে এইরূপই করিয়াছে।

—

কিন্তু দেশ ম্যালেরিয়ায় মারা যাইতে বসিয়াছে, আমরা সে দিকে গ্রাহ্য না করিয়া যদি জাতিগত ভাবে শৃগাল মারিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতে থাকি তাহা হইলে সে কাজকে প্রশংসা করা যাইবে না। আমাদের পক্ষে ধ্রুব ত্যাগ করিয়া অধ্রুবের পশ্চাদ্ধাবন অনেকটা এই প্রকারই দাঁড়াইয়াছে। গান্ধীজি বলিয়াছেন অস্পৃশ্যতার পাপে বিহারে ভূমিকম্প হইয়াছে ; বিহারে এবং আসামে যে বন্যা হইয়াছে তাহার কারণও সম্ভবত ইহাই। তাই গান্ধীজি এই বর্ত্তমান বিপদকে অগ্রাহ্য করিয়া ইহার "মূল কারণ" অস্পৃশ্যতা দূর করিবার কাজে লাগিয়াছেন। বিহারে বাংলায় বা আসামে, বন্যা বা ভূমিকম্পের দরুন আজ সহস্র সহস্র লোকের সর্ব্বনাশ হইয়াছে—কিন্তু গান্ধীজি ধ্যান দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন যে এরূপ অবস্থাতেও তাহারা কেহ

কাহাকেও স্পর্শ করিতেছে না। সুতরাং বন্যা বা ভূমিকম্প মায়া, অস্পৃশ্যতাই সত্য। কাজেই এই দরিদ্র দেশকে নিজের মহাত্মা-উপাধির জোরে শোষণ করিয়া সেই টাকা দিয়া "বুড়ি ছোঁয়া" খেলা খেলিতেই হইবে।

—

হৈ হৈ করিয়া কার্য্যোদ্ধার করিবার বাসনা non-co-operationএর যুগে প্রকট হইয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে। আমরা ভাবী যুগের কথা বলিতেছি না, ভবিষ্যতে ইহার মূল্য হয়ত বুঝিতে পারা যাইবে, কিন্তু বর্ত্তমানে যে হয় নাই ইহা সকলেই জানি। এই হরিজন আন্দোলন আবার সেই ভুল পথেই চালিত হইতেছে। কত হরিজন আন্দোলন এদেশের বুকের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু অস্পৃশ্যতা যায় নাই। যদি কিছু যাইয়া থাকে তাহা আন্দোলনে নহে, শিক্ষা ও যুগধর্ম্মের প্রভাবে। হৈ হৈ করিয়া আজ লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হইবে লক্ষ লক্ষ লোক অস্পৃশ্যকে স্পর্শও করিবে, কিন্তু ঐ টাকা যেদিন ফুরাইবে সেই দিন আবার যাহা ছিল তাহাই হইবে। ইহা আজ গান্ধীজি মানিতে না পারেন, কেন না যুক্তি দ্বারা কিছু মানা তাঁহার স্বভাবগত নহে, কিন্তু এই অত্যন্ত স্পষ্ট সহজ সরল জিনিসটি অন্যের দৃষ্টি এড়াইবে না।

অস্পৃশ্যতা পরিহার—ইহা ত মহৎ কাজ। কিন্তু শিক্ষা দ্বারা নহে, আন্দোলন দ্বারা দেশ হইতে ব্যাধি দূর করিব, এত বড় নির্ব্বুদ্ধিতার অনুষ্ঠান গরিব দেশের লক্ষ লক্ষ টাকার শ্রাদ্ধ করিয়া করিতে হইবে ইহার অর্থ আমরা বুঝিতে পারি না। ইতিমধ্যে শিক্ষার অভাবে ভারতবর্ষ আর্ত্তনাদ করিতে থাকুক—বন্যায় ভূমিকম্পে দুর্ভিক্ষে সহস্র

সহস্র নরনারীর মর্ম্মভেদী হাহাকার আকাশ বিদীর্ণ করিতে থাকুক, আমরা সেদিকে কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, হরিজন আন্দোলনের জন্য নৃত্য করিতে থাকিব। প্রায় লক্ষ টাকা বাংলা দেশ হইতে বাহির হইয়া গেল—সে টাকায় একদিন ঘটা করিয়া স্পর্শভীরু হিন্দুগণ অস্পৃশ্যকে স্পর্শ করিবে, ক্ষণিকের মোহে, হৈ হৈ গণ্ডগোলের মধ্যে। সে দিন তাহার জানিবার প্রয়োজন নাই যে মানুষ সর্ব্বত্রই মানুষ, তাহার বুঝিবার প্রয়োজন নাই যে মানুষকে পশুর অধম বলিয়া বিবেচনা করা এবং তাহার স্পর্শ সর্ব্বতোভাবে এড়াইয়া চলা চরম দুর্নীতি,—তাহার জানিবার দরকার নাই যে মানুষে মানুষে জাতিগত, জন্মগত কোনো ভেদ নাই, সে শুধু জানিবে কতকগুলি মানবরূপী পশুকে সে দয়া করিয়া স্পর্শ করিল!

—

জগতের শ্রেষ্ঠ মানবের আজিকার এই অধঃপতন সমগ্র জাতির লজ্জা। তিনি দেশকে কোন্ ক্ষেত্রে টানিয়া লইয়া যাইতেছেন তাহা বুঝিবার মত সামর্থ্যও তাঁহার আজ নাই। দেশের নরনারী—কেহবা টাকা, কেহবা অলঙ্কার অকাতরে তাঁহার চরণে নিবেদন করিল, কিন্তু কেন করিল তাহা কেহ ভাবিয়া দেখিল না। জোড়া তালি দিয়া মহৎ কোনো জিনিসকে গড়িয়া তোলা যায় না। বাহির হইতে খুব খানিকটা সদিচ্ছা হইলেই কোনো জিনিস মনের মত হইয়া উঠে না, ইহা গান্ধীজির মত ব্যক্তির না বুঝিবার কথা নহে। দেশীয় সমাজনীতির সঙ্গে বিদেশী রাজনীতির খিচুড়ি পাকাইয়া এদেশে কোন বৃহৎ জিনিসই গঠিত হইবে না। বাহিরের চেষ্টায় পরিবর্ত্তন সাধন করিব, ইহা রাজনীতির শিক্ষা—গান্ধীজি এই দুইটি নীতিতে গোল পাকাইয়াছেন।

—

যে শিক্ষায় পুরুষকে পুরুষত্বে উদ্বোধিত করে, নারীকে নারীত্বে জাগ্রত করে সেই শিক্ষাই দেশের পক্ষে প্রয়োজন। পূর্ণ মনুষ্যত্বের উদ্বোধন হয় নাই বলিয়াই দেশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে এত গলদ এত আবর্জ্জনা পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছে। ইহার প্রতিকারের জন্য চাঁদা তুলিয়া মানুষের চামড়ার সঙ্গে মানুষের চামড়ার স্পর্শ ঘটাইয়া দিলেই সকল কর্ত্তব্য শেষ হইল বা কিছুমাত্র কর্ত্তব্যও সাধিত হইল এরূপ যিনি মনে করেন তাঁহার ভ্রান্তি কিছুতে ঘুচিবে না।

—

যতক্ষণ আসাম ও উত্তর বিহার জলমগ্ন ততক্ষণ "Floods may wait but Harijans cannot" নীতির সার্থকতা আমাদের বোধগম্য হয় না। বাংলা দেশের প্রায় লক্ষ টাকার দান গ্রহণ করিয়া গান্ধীজি বাংলা ত্যাগ করিলেন, কিন্তু এই দানে আমরা দরিদ্রতর হইলাম; যাহাদের জন্য দান করা হইল তাহারাও ইহার ফল ভোগ করিবে না; ইহার যদি কিছু সার্থকতা থাকে তাহা হইলে তাহা গান্ধীজির স্বপ্ন-বিলাসকে আর একটু রঙীন করিয়া দেওয়ায় ছাড়া আর কিছুতে নহে। গান্ধীজি যদি বাঁচিয়া থাকেন তাহা হইলে এ ভুল ভাঙিতে তাঁহার দেরী হইবে না—তখন হয়ত দুই সপ্তাহ কি তিন সপ্তাহের একটি উপবাস দিলেই তাঁহার বিবেক কালিমামুক্ত হইবে, কিন্তু এই চির-দরিদ্র দেশের যে টাকাটা নষ্ট হইল তাহা আর ফিরাইয়া পাওয়া যাইবে না।

—

কোনো অজ্ঞাত আশার বা মহৎ ভাবের খাতিরে প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দেওয়া প্রাণধর্ম্মেরই পরিচায়ক। কিন্তু এই "হরিজন আন্দোলন"-এর ভিতর কোনো মহৎ ভাব বা আদর্শ নাই। ইহা জানিয়া শুনিয়াই

লোকে টাকা দিয়াছে। মানব-পূজা আরম্ভ হইলে তাহার শেষ ফল ইহাই। হিন্দু-বিবাহে বর কনে কেহ কাহাকে চেনে না, একদিন সম্প্রদানকর্ত্তা একের সঙ্গে অপরের হাত মিলাইয়া দেন, সেই দিন হইতে তাহারা পরস্পর এক হয়। কিন্তু হরিজনেরা কনে এবং ব্রাহ্মণেরা বর নহে, গান্ধীজিও সম্প্রদানকর্ত্তা নহেন। সমস্তটাই অভিনয় হইতেছে কেবল পণের টাকাটা অভিনয় নহে, বাস্তব।

আসল কথা, পা থাম্‌গানোর দল হইতে মুক্তি না পাইলে গান্ধীজির এই দুর্দ্দশা ঘুচিবে বলিয়া মনে হয় না।

নানারূপ খেলা দেখাইতে পারে এইরূপ একটি হাঁস লইয়া একটি লোক থিয়েটারের এজেণ্টের কাছে এই বলিয়া আবেদন করিল যে তাহার অবস্থা অত্যন্ত খারাপ—থিয়েটারে একটি চাকুরি দিলে সে ষ্টেজে রোজ হাঁসের খেলা দেখাইতে পারে। এজেণ্ট বলিলেন—বর্ত্তমানে চাকুরি দিবার উপায় নাই—তবে সুযোগ হইলেই তাহাকে জানানো হইবে।

কয়েক সপ্তাহ পরে সে এজেণ্টের টেলিগ্রাম পাইল। তহাতে বলা হইয়াছে—"আগামী সোমবারে কাজে যোগদান কর।" লোকটি প্রত্যুত্তর পাঠাইল, "উপায় নাই, অভাবে পড়িয়া হাঁসটিকে খাইতে হইয়াছে।"

—

Absent-minded professor, meeting his son: "Hello, George, how's your father?"

—

সংবাদ-সাহিত্য

রবীন্দ্রনাথের কাব্যে জীবন-দেবতা আবিষ্কার করিবার ভার মধ্যে মধ্যে যাঁহারা গ্রহণ করিয়া থাকেন, রবীন্দ্রনাথের জীবন-দেবতা যেন তাঁহাদিগকে ক্ষমা করেন। স্বয়ং কবির নিকট যে দেবতা ধরা দেন নাই, যে দেবতা আভাসে-ইঙ্গিতে, আড়ালে-আবডালে, চকিতে নিজেকে প্রকাশ করিয়াছেন, যাঁহার লুকোচুরির লীলা রবীন্দ্রকাব্যের প্রাণবস্তু, এই সব লেখকগণ সেই ক্বচিৎ-দৃষ্ট দেবতাকে, চিৎপুরে গুণ্ডায় যেমন নিরীহ ভদ্রলোককে চাপিয়া ধরে, তেমনি করিয়া চাপিয়া ধরিয়াছেন। জীবন-দেবতা জীবনের মায়া ত্যাগ করিয়া ক্যাঁক ক্যাঁক করিয়া শব্দ করিতেছেন।

—

রবীন্দ্রনাথ নিজের জন্য বিশেষ কোনো দেবতাকে জীবন-দেবতারূপে খাড়া করেন নাই। তিনি যাঁহার কাছে প্রার্থনা করিয়াছেন, যাঁহার কাছে আবেদন নিবেদন করিয়াছেন, যাঁহাকে প্রেম-ভালবাসার গান শুনাইয়াছেন, সেই দেবতা তাঁহার কাছে বিচিত্ররূপে বিচিত্ররূপ দাবী লইয়া আসিয়াছেন। তিনি বহুরূপ প্রকাশের মধ্যেও এক। তাঁহার খণ্ড মূর্ত্তি কবি কখনো দেখেন নাই। সেই এক, উপনিষদের এক। সেই এক, বিশ্বদেবতা। তিনি অর্ডার দিয়া 'জীবন-দেবতা' নামক কোনো পৃথক দেবতার আমদানি করেন নাই। ইহা লইয়া বহু কচলাকচলি পূর্ব্বে হইয়া গিয়াছে। জিনিসটা তিক্ত হইয়া উঠিয়াছে। এই চর্ব্বিতচর্ব্বণ আর কতকাল চলিবে জানি না কিন্তু রবীন্দ্রনাথের জীবন-দেবতারও বোধ হয় একটা সীমা আছে—সীমা নাই শুধু ভক্ত লেখকদের।

—

আমাদের বিশ্বাস বঙ্গ ভাষায় এ সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইয়া গিয়াছে, সেজন্য অ-বঙ্গ ভাষায় কিছু আলোচনা আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। তাই শ্রাবণের উদয়নের লেখক বলিতেছেন—

> রবীন্দ্রনাথের কাব্যসৃষ্টিতে 'বলাকা' একটি বিশেষ ঋতু আনিয়াছিল।

সৃষ্টিতে ঋতু আনা সম্ভব কিনা আমরা জানি না। আমাদের ধারণা কিন্তু অন্যরূপ। এক একটা ঋতুতে এক একটা সৃষ্টি। সৃষ্টির উপযুক্ত ঋতু আগে পরে সৃষ্টি। সৃষ্টির সঙ্গে ঋতু আসিলে নানরূপ চিন্তার কারণই ঘটে। মনে হয় শব্দটা আগে হইয়া গেল তারপর ফলটা পড়িল।

—

লেখক তারপর বলিতেছেন—

> ...কবির মনে এই নূতন ঋতুর আবির্ভাব একান্ত ভাবে আভ্যন্তরীণ হইতে পারে।

মনে যখন ঋতু দেখা দেয় তখন সেটা যে একান্তভাবে আভ্যন্তরীণ হইতে পারে এবিষয়ে দ্বিধা থাকিল কেন? যদি কোনো ডাক্তার বলেন internal haemorrhageটা একান্ত আভ্যন্তরীণই মনে হইতেছে, তাহা হইলে সেই ডাক্তারকে দৈবজ্ঞ বলিয়া সার্টিফিকেট অবশ্যই দিব না।

—

কিন্তু ব্যাপারটা এইখানেই শেষ হয় নাই। কারণ

> মনে হইল যেন "সোনার তরী" ও "চিত্রা"র ঋতু আবার ফিরিয়া আসিয়াছে।

লেখক Doctor উপাধিধারী—তাঁহার পক্ষে আর একটু সাবধান হইয়া লেখা উচিত।

অধ্যাপক কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত মহাশয় সাহিত্যক্ষেত্রে বহু দিন নীরব থাকিয়া এত দিন পরে প্রেরণা পাইয়াছেন। 'আমাদের বিচিত্রায় বাঙ্গালা সাহিত্যে একশত ভাল বইএর যে একটি তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে" সে সম্বন্ধে তাঁহার নাকি কিছু বক্তব্য আছে। তিনি যদি সমসাময়িক সাহিত্যের খবর রাখিতেন অথবা জ্যৈষ্ঠের শনিবারের চিঠির প্রথম প্রবন্ধটি পড়িতেন তাহা হইলে বুঝিতে পারিতেন নানা মাসিক পত্রে একশত করিয়া উৎকৃষ্ট বইএর তালিকা কেন বাহির হইতেছে। এ সম্বন্ধে আমাদের যাহা বলিবার তাহা একটু বিশদ করিয়া বলিতেছি।

—

অসীম বিশ্ব সম্বন্ধে আমাদের একটি সংজ্ঞা জানা আছে, তাহা এই— The universe is a circle of which the centre is everywhere but circumference nowhere. বাংলা সাহিত্যের ভাল বই সম্বন্ধেও এই সংজ্ঞাটি প্রযুজ্য। অর্থাৎ বাংলা ভাষায় এত অগণিত ভাল বই আছে যে যে-কোনো স্থানকে কেন্দ্র করিয়া যত বড় ইচ্ছা বৃত্ত অঙ্কিত হউক না কেন বাংলা ভাষার উৎকৃষ্ট বইএর ক্ষেত্রকে সেই বৃত্ত অতিক্রম করিতে পারিবে না। সুতরাং যে-কোনো মাসিক পত্রিকায় যত ইচ্ছা পৃথক তালিকা প্রকাশিত হইতে পারে, ইহার জন্য দুর্ভাবনা কেন?

—

কিন্তু যে মাসিকেই এই একশত ভাল বইএর বৃত্ত অঙ্কিত হউক না কেন তাহার কেন্দ্র কোথায় তাহার সন্ধান সাধু মাত্রেই জানেন।

প্রবাসীতে যখন তালিকাবৃত্ত প্রথম বাহির হয় তখন তাহার কেন্দ্র ছিল জীবনদোলা ও পরভৃতিকা। বিচিত্রায় যে বৃত্ত দেখিতেছি তাহার কেন্দ্র বিচিত্রা-সম্পাদক মহাশয়ের তিনখানি নভেল। And so on. সুতরাং কৃষ্ণবিহারীবাবু এবিষয়ে খুব গুরুগম্ভীর আলোচনা করিয়া হাস্যাস্পদ হইতেছেন কেন? তাঁহার নিজের কিংবা আত্মীয় স্বজনের গ্রন্থগুলিকে কেন্দ্র করিয়া তিনিও একশত ভাল বইয়ের তালিকা প্রস্তুত করুন, ইহাতে কেহই আপত্তি করিবে না। কাজ উদ্ধার করুন, মর‍্যালিষ্ট হইবেন না।

—

"বিচিত্রা"য় কয়েকখানি পুস্তক সমালোচনা উপলক্ষে সমালোচক শ্রীরমেশ দাস মহাশয় দেখাইয়াছেন যে তিনি Black Wood Magazine, Quarterly Review প্রভৃতির নাম জানেন। বাস্তবিকই অদ্ভুত, নহে কি? এরূপ কথার সঙ্গতি ও অর্থপারম্পর্য্যও বড় সহজে কোথাও চোখে পড়ে না। "বিরুদ্ধ প্রতিকূল সমালোচনায় কিছুই যায় আসে না" প্রভৃতি সান্ত্বনাবাক্য প্রয়োগ করিয়া সমালোচক বলিতেছেন— "স্ত্রীপুরুষ সকলেরই ত লিখিবার সাধ হয় কিন্তু সত্যিকারের কবি আছে কয় জন?" "আজকাল বাংলা কবিতা পড়িয়া এত দুঃখও হয়"— "বইএর মধ্যে এমন একটিও কবিতা দেখিলাম না যাহার প্রশংসা করা যায়"—"শুধু কথা ও প্রলাপের সমারোহ"—ইত্যাদি ইত্যাদি। ইহাই যদি বক্তব্য তবে ইংরেজ কবিদের এক গুষ্ঠীর নাম করা হইল কেন? কেন ব্ল্যাকউড ম্যাগাজিনের কথা উঠিল? এত কথা না বলিয়া এক কথাতেই ত সব বুঝাইয়া দেওয়া যাইত! রমেশবাবু বলিতে পারিতেন, তিনি গাল দিতেছেন বটে কিন্তু সকলেই বুঝিতে পারিবেন তাঁহার কথার কোনো মূল্য নাই—অর্থাৎ ইহা শুধুই প্রলাপ এবং ফষ্টিনষ্টি।

—

শ্রীযুক্ত অবনীনাথ রায় কিরূপ ভাবে "সরকারী কার্য্য" সাধন করেন তাহার কাহিনী নিজেই প্রকাশ করিয়াছেন। সরকার মুগ্ধ হইবেন কিনা তাহা জানি না কিন্তু আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। তিনি শুনিয়াছিলেন যে লেখিকা শ্রীঅপরাজিতা দেবী শিলং-এ থাকেন। অবনীবাবুও সরকারী কার্য্য উপলক্ষে শিলং যান। অপূর্ব্ব যোগাযোগ। কিন্তু তাঁহার সন্দেহ হয়—অপরাজিতা দেবী ও রাধারাণী দেবী একই ব্যক্তি। তাই তিনি লিখিতেছেন—

> মনে ক'রেছিলুম রাধারাণী দেবীকে ধরে ফেলার এই এক স্বর্ণ সুযোগ—।

এই মহৎ উদ্দেশ্যে তিনি মাস তিনেক গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া শিলংএর পথে পথে ঘুরিয়াছেন। বাস্তবিক এরূপ নিষ্ঠাবান সাহিত্য-সমালোচক বাংলা দেশে দুর্লভ। লেখা সমালোচনা করিতে হইলে লেখিকাকে ধরিয়া ফেলাও যে সমালোচনার একটা অপরিহার্য্য অঙ্গ ইহা ইতিপূর্ব্বে কে জানিত ?

—

বিচিত্রার 'বিতর্কিকা'র "২য়" অধ্যায়ে ডাঃ সুনীতি চট্টোপাধ্যায়ের নামের সঙ্গে আর আর একটি নাম দেখিলাম, তিনি কে ? লেখক বলিতেছেন—

> কিন্তু বিজয়রত্ন মহাশয় বলেন খৃঃ পূঃ সপ্তম শতকেও বঙ্গ ও বাঙ্গালা এই দুই শব্দের অস্তিত্ব পাওয়া যায়।

এই "বিজয়রত্ন মহাশয়" কি কোনো ঐতিহাসিক নামের fossilised অপভ্রংশ ? খ্রীষ্টীয় কোন্ শতকে ইঁহার জন্ম ?

—

কিন্তু দুর্ভাবনা সেজন্য ততটা নয়। আমরা ভাবিতেছি, বাংলা ভাষায় "ইকা"র অত্যাচার সম্বন্ধে। ইহা আর কত দিন সহ্য করিব ? Britannica, Indica প্রভৃতির অনুকরণে "চন্দ্রনিকা" "কণিকা"

"কণিকা" প্রভৃতি হইয়াছে কিনা জানি না—কিন্তু বাংলা-"ইকা" কবিত্বে আবদ্ধ না থাকিয়া পথে ঘাটে ছড়াইয়া পড়িতেছে। বিচিত্রার "বিতর্কিকা" এবং রাজশেখরবাবুর "চলন্তিকা" একথার সমর্থন করিবে। "চলন্তিকা" কোনো ওমনিবাস্-এর নাম না হইয়া বাংলা অভিধানের নাম হইল কেন তাহা বুঝি না। ইংলণ্ডে যদি কবি শেক্সপীয়র মার্চ্যাণ্ট অব ভেনিসিকা, হ্যামলেটিকা, কিং লিয়ারিকা বা টেম্পেষ্টিকা লিখিয়া যাইতেন তাহা হইলেও চলতি ভাষায় ইংরেজি অভিধানের নাম Currentica হইত কিনা সে বিষয়ে আমাদের ঘোরতর সন্দেহ আছে।

—

বিচিত্রার ১০৫ পৃষ্ঠার ব্যাপারটা বড় গোলমেলে ঠেকিতেছে। শ্রীনীলিমা দাসের "বিরহ-বিলাস" কবিতাটি পাইকা অক্ষরে ছাপাইয়া যে মার্জিনটুকু অবশিষ্ট আছে তাহাতে শ্রীসুধীর করের "অভিমানিনী" নামক কবিতাটি বর্জইস্ অক্ষরে ছাপা হইয়াছে কেন বুঝিলাম না। এক পাতার উপরে নীচে বা পাশাপাশি কবিতা ছাপা হয় জানি, কিন্তু ডান ধারের মার্জিনে এই প্রথম। প্রথমত মনে হইয়াছিল ইহা catechism জাতীয় কোনো রচনা হইবে। কেননা পাইকা—শ্রীনীলিমা দাস বলিতেছেন—

আজ তুমি কাছে নাই। বুঝি তাই নবমেঘে নভতল মলিন মেদুর
দেয়া ডাকে রহি' রহি'; কেয়াবনে বায়ুসুখে কাঁদি ফেরে
কুসুম কেশর

পাশে ভীরু, বর্জইস, শ্রীসুধীর কর বলিতেছেন—

বেলা কি আজ অমনি কেটে যাবে?
……নভ নীলিমা মেদুর ঘন মেঘে
যুথী অথিরা, বাদল ঝরে বেগে।

শেষে দেখিলাম তাহা নহে। ইহা এক জাতীয় রসিকতা দন নাই। বিচিত্রার পক্ষে নূতন।

—

দ বাহির

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কৃপায় জানিতে কাগজে যে রাজা রামমোহন রায় তাঁহার জন্মের তারিখ হইতে দুই বৎসর প৹ জন্মিয়াছিলেন। উক্ত ব্রজেনবাবু শ্রাবণের প্রবাসীতে দেখাইয়াছেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয় জন্মতারিখের এক বৎসর পূর্ব্বে জন্মিয়াছিলেন। জন্মতারিখ দুই বা এক বৎসর অগ্রপশ্চাৎ করিয়া দিয়া ব্রজেনবাবুর কি লাভ হইবে তাহা আমাদের মত কোষ্ঠী-বিচার-অনভিজ্ঞ লোকের পক্ষে বুঝা শক্ত, কিন্তু যেরূপ ব্যাপার দেখিতেছি তাহাতে ব্রজেনবাবু বাঁচিয়া থাকিলে বাংলাদেশের কোনো মহাপুরুষই যে ঠিক তারিখে জন্মগ্রহণ করেন নাই ইহা একদিন না একদিন প্রমাণিত হইবে। আমাদের অনুরোধ, যদি সাধ্যে কুলায়, তাহা হইলে দেশের জীবিতদের বয়স ব্রজেন বাবু কিছু কিছু কমাইয়া দিন। আমরা কিছুদিন প্রবীণদিগকে আবার নবীন মূর্ত্তিতে দেখিয়া নয়ন-মন পরিতৃপ্ত করি।

—

প্রাচীর-পত্রে দেখিলাম "পরিচয়"—সাহিত্য রত্নাকর। দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলাম। এই রত্নাকর বাল্মীকি না হওয়া পর্য্যন্ত জনসাধারণের উপর অত্যাচার করিতে পারে—ততদিন কোনো রকমে প্রাণ ও পকেট বাঁচাইয়া চলিতে পারিলে নিজেকে ধন্য মনে করিব।

—

"কণিকা" প্রভু শুভ ঠাকুর বেশ জমাইয়া তুলিয়াছেন—

আবদ্ধ না

"বিতর্কিকা"

"চলন্তিক

নাম হই

নিত্য নূতন Experiment
চলেছে জীবন নিয়ে—
ঈশ্বর মোর ! কি আবিষ্কার
করিবে আমায় দিয়ে।

অসীম লীলার টেবিলে তব
আমারে লইয়া গড়িবে নব
কত বড় ব্রেন কেমনে কব
ভরিবে আমার হিয়া ?

* * বৃথা দোষ গুণ বহিয়ে মোরে
তোমারি কার্য্য নিয়েছ কোরে
এ দেহ-মোটর তোমারি ঘোরে
ইসারা শুধু নিয়ে।

'অসীম লীলা' মানে 'অপারেশন'। ঈশ্বর অপারেশন টেবিলে কবিকে চিরিয়া একটি অজানা গুজনের ব্রেন কবির হৃদয়ে ঢুকাইবেন। হয়ত Frankenstein monsterএর সৃষ্টি হইবে, কিন্তু হিয়ার ভিতর ব্রেন ঢুকিবে কি করিয়া ? মানুষের পেটে হনূমান ঢুকাইবার গল্প শুনিয়াছি কিন্তু হৃদয়ে ব্রেন এই প্রথম। কবি যদি ব্রেন মানে brainy পুরুষ মনে করিয়া থাকেন তাহা হইলে আমরা আধুনিক কবিতা পড়া ছাড়িয়া দিব। শেষ ছত্রের "দেহ-মোটর" ধারণা করিতে পারিতেছি না। মোটরের অংশের সঙ্গে দেহের অংশগুলি মিলিতেছে না।

—

কিছুদিন পূর্ব্বে "সমাচার" জানাইয়াছিলেন—জাহান-আরা বেগম চৌধুরী সিনেমায় যোগ দিয়াছেন। কিছুদিন পরে "সমাচার"

জানাইলেন জাহান-আরা বেগম চৌধুরী সিনেমায় যোগ দেন নাই। এই ব্যাপারে আমাদের একটি ইংরেজি গল্প মনে পড়িতেছে।

একটি খবরের কাগজে মিঃ জন জোন্‌স্‌-এর মৃত্যু সংবাদ বাহির হয়, কিন্তু পরে জানা যায় তাঁহার মৃত্যু হয় নাই। পরদিন সেই কাগজে নিম্নলিখিত উক্তিটি বাহির হইয়াছিল—

"Yesterday this newspaper was the first to report the death of Mr. John Jones. To-day this newspaper is the first to deny the report. The Morning Star always leads with the news."

পৃথিবীর মৃত্তিকার আবরণ নাকি ক্রমাগত উত্তরের দিকে সরিয়া যাইতে চেষ্টা করিতেছে এবং ইহার ফলেই নাকি অনেক সময় ভূকম্পন ঘটিয়া থাকে। পৃথিবীর বহিস্তর সরিতেছে কি না তাহা বুঝি না—কিন্তু বাংলাদেশের কাব্যের অতি আধুনিক স্তরটি যে ক্রমশ উত্তরে সরিতেছে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। ভাবে ফাটল ধরিয়াছে, ছন্দে কম্পন হইতেছে এবং ফাটল দিয়া কর্দ্দম উৎক্ষিপ্ত হইতেছে।

—

উত্তরে সাইবেরিয়া পর্য্যন্ত সরিয়াছে ; প্রমাণ শুভ ঠাকুরের কবিতা—

ভগবান সে তো
স্নেহহীন যেন সাইবেরিয়া
হৃদয় তাহার
নির্ম্মম হিয়া বরফ নিয়া
অনত অচল আল্পসের মত রয়েছে পড়ে।

কিন্তু ভগবান যখন ট্রপিক্‌স্‌-এ ছিলেন তখন খুব সম্ভব তাঁহার রূপ ছিল এই প্রকার—

ভগবান সে তো
স্নেহহীন যেন জুগোরোগোরো,
হৃদয় তাহার
উম্-বুম্-বুম্-বু-এর ঝোড়ো
হাওয়ার মত উড়ে উড়ে ফেরে ক্রেটার লেকে।

—

শান্তির কৃপায় জানিতে পারিলাম, শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী মহাশয়ের সভাপতিত্বে শান্তি-অফিসে বর্ত্তমান তরুণ সাহিত্যের ধারা সম্বন্ধে একটি আলোচনা বৈঠক হইয়াছিল। উহাতে একদল বলিয়াছেন (শান্তি-সম্পাদক প্রভৃতি) বর্ত্তমান তরুণ সাহিত্যে রস নাই, ইহাতে জাতীয় জীবনের পরিচয় নাই। শান্তি সম্পাদকের মুখে এ কি কথা? আমরা কিন্তু বিস্মিত হইলাম। আর একদল বলিয়াছেন অশ্লীলতা থাকা উচিত ইত্যাদি। সভাপতি মহাশয় কি বলিয়াছেন উল্লেখ নাই। তিনি নীরব থাকিবার লোক নহেন, বরঞ্চ তিনি উপস্থিত থাকিতে আর কেহ কিছু বলিতে পারিয়াছেন কিনা সন্দেহ। খুব সম্ভব তিনি সব রকমই বলিয়াছেন এবং হয়ত কোনোটাই তাঁহার মত নহে। যাহা হউক সাহিত্যে অশ্লীলতা থাকা উচিত, শৃঙ্গার রস থাকা উচিত প্রভৃতি, সভায়-উপস্থিত মহিলাদের সম্মুখেই ত আলোচিত হইয়াছে? কিন্তু ইহা ভালই।

—

আমরা যে আজকাল তরুণ লেখকের লেখা বুঝিতে পারি না তাহা কাহার দোষ? আমাদেরই গোলমাল ঠেকিতেছে। শ্রীযুক্ত অমিয় কুমার চক্রবর্ত্তী বলিয়াছেন—

> বর্ত্তমান তরুণ সাহিত্যকে চারিদিক হইতে আক্রমণ করা হইতেছে, কিন্তু ইহার কোনো সঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাওয়া

> যায় না। তবে যাঁরা সাহিত্যকে শুধু optimistic রঙ্গিন চশমা দিয়া দেখেন তাঁহারা এই সাহিত্যকে নিন্দা করিবেন।

সভাপতি গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী মহাশয় ইহার অর্থ করিয়া দিতে পারিলে তাঁহাকে এক ডজন ফজলি আম উপহার দিব।

—

তিন চারিটি যুগ একই জীবনে দেখিয়া যাওয়া সৌভাগ্যের কথা। আমরা ঢাকার কৃপায় তাহাও দেখিলাম। "পূর্ব্বাচল" নামক একখানি মাসিক ঢাকায় সদ্য জন্মলাভ করিয়াই বলিতেছে "সে রবীন্দ্রযুগ এবং post-রবীন্দ্রযুগ পার হইয়া তৃতীয় যুগে আসিয়া পৌছিয়াছে।" এরূপ অগ্রগতি অবশ্য তাড়াতাড়ি সরিয়া পড়িবার পক্ষে খুবই প্রয়োজনীয়। প্রকৃতিদেবী এবিষয়ে কতকগুলি খুব চমৎকার আইন করিয়া রাখিয়াছেন. আমাদিগকে কিছুই ভাবিতে হইবে না।

—

আমরা শুনিতেছি—

> পূর্ব্বাচল আধুনিক নয়, অতি আধুনিক নয়, একটা নূতন কিছু। যার ডেফিনেশান (nation !) তৈরী হয়নি আজও। কারণ, আজ পর্য্যন্ত মানুষ যা কিছু পেয়েছে আগে তার ডেফিনেশান মানুষেরই জানা ছিল না। আগে পেয়েছে জিনিষ—তার পর এক দিন মানুষই তৈরী করেছে তার ডেফিনেশান—নিতান্ত প্রয়োজন বলেই।

"জিনিষ" পাইবার পূর্ব্বে অবশ্য আমরা ডেফিনিশন ঠিক করিতে পারি নাই, এরূপ পারাও যায় না। আমরা প্রথম সংখ্যা জিনিস পাইবার পরেই ডেফিনিশন তৈয়ারীতে মনোনিবেশ করিয়াছি—ফলাফল ভগবানের হাতে।

—

পূর্ব্বাচল জন্মিয়াই নেশাগ্রস্ত হইয়াছে—

> এই দারুণ দুর্দ্দিনের দিনে—দুভিক্ষের বুকে বসে মানুষকে হাসাবার একটা দুর্জ্জয় নেশা আমাদের পেয়ে বসেছে। এখানে দাঁড়িয়েই দেখবো নূতন প্রভাতে নূতন ক'রে সূর্য্যোদয়। দেখবো আর দেখাবো সকলকে।

যথার্থ, এই দুঃখের দিনে পয়সা খরচ করিয়া লোক হাসানো আত্ম-ত্যাগেরই একটা রূপ। তবে সূর্য্যোদয়ের একটা সুবিধা এই যে সকল জেলা হইতেই উহা দৃষ্টিগোচর হয়।

—

জন্ম তারিখ সম্বন্ধেও একটা আভিজাত্য আছে—

> রূপের বৈচিত্র্য—ভাবের গাম্ভীর্য্য—দৃষ্টির প্রসারতা নিয়ে পূর্ব্বাচল বিরাট ভাবে দাঁড়িয়ে আছে সৃষ্টির প্রথম প্রভাত থেকে। সেই থেকে কত প্রভাতকে আর কত সূর্য্যকেই না সে পরিচয় করেছে (!) আমাদের কাছে। সেই থেকে প্রতিদিন রাত্রিতে প্রসব বেদনায় সূর্য্যের স্বপন দেখন আর প্রভাতে সূর্য্যের জন্ম দেওয়নই হয়েছে পূর্ব্বাচলের পেশা।

জন্ম দেওয়া পেশা ইহা নূতন বটে। কিন্তু "দেখন" এবং "দেওয়ন" ত ঠিক হইল না! বাক্যটি এইরূপ হইবে—হুর্জের হপন দ্যাহন আর পের্ভাতে হুর্জের জনম দ্যাওন্-অই হইতে-আছে পুর্বাচলের পেশা।

—

কিন্তু পুরুষটি কে?

> এই প্রাণ, এই প্রেরণা এবং পিপাসা নিয়ে একটা বিরাট পুরুষ হু হু ক'রে ছুটে চলেছে আমাদের এই পূর্ব্বাচলের দিকে।

ইনি যেই হউন, হু হু করিয়া ঐ দিকেই ছুটিতেছেন দেখিয়া আমাদের যুগপৎ আশা এবং আশঙ্কা হইতেছে। চেহারার আর একটু বিবরণ দেওয়া থাকিলে পুরুষটিকে চিনিতে পারিতাম বলিয়া মনে হয়।

—

নূতন কাগজ বাহির করিয়া অনেকে ত অনেক প্রকার কৈফিয়ৎ দিয়া থাকেন কিন্তু পূর্ব্বাচলের কৈফিয়ৎ সকলকে ছাড়াইয়া গিয়াছে।

> কেন কাগজ বের করছি? আমাদিগকে এ প্রশ্ন করা আর এরোপ্লেন কেন আবিষ্কৃত হয়েছে, কেন New World আবিষ্কৃত হয়েছে? কেন মঙ্গল গ্রহে এবং গৌরীশৃঙ্গে (Mount Everest?) যাবার চেষ্টা হচ্ছে? কেন শেক্‌স্‌পীয়ার রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেছেন একথা জিজ্ঞাসা করাও এক। সুতরাং যে জন্যে এরোপ্লেন, New World আবিষ্কৃত হয়েছে, যে জন্যে মঙ্গলগ্রহ এবং গৌরীশৃঙ্গে (কবে?) যাবার চেষ্টা হচ্ছে এবং যে জন্যে শেক্‌স্‌পীয়ার, রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেছেন ঠিক সেই জন্যেই "পূর্ব্বাচল" বেড়িয়েছে (বেড়ে!)।

শেক্‌স্‌পীয়র রবীন্দ্রনাথের জন্মের সঙ্গে হিমালয় অভিযানের তুলনাটি খুব মনোজ্ঞ হইয়াছে। আমরা বুঝিলাম, পূর্ব্বাচল অকারণ-সম্ভূত; ইহা অবশ্যম্ভাবী, অনিবার্য্য এবং অপরিহার্য্যরূপে দেখা দিয়াছে. সুতরাং পূর্ব্বাচল কেন বাহির হইল সে প্রশ্ন করিব না।

—

কিন্তু গুণমণি, একটি প্রশ্ন যে না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না! 'জবাবদিহি' করা কি জন্মদাতার কাজ নহে?

> এর বেশি কিছু বলতে আমরা নারাজ। কারণ যে জিনিষ নিজেই সমাধান (সমাহিত ?) হয়ে আসে তা নিয়ে কোনো জিজ্ঞাসাবাদ চলে না। পত্রিকা বের করবার প্রয়োজন অনুভব করেছি অন্তরে সুতরাং বাইরে তার জবাব দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ স্রষ্টা শুধু সৃষ্টি করেই খালাস, জবাবদিহি করা তার কাজ নয়।

কথাটা প্রায় ঠিক, তবে খোরপোষের দাবীতে নালিশ হইলে এরূপ দায়িত্বহীন জনককে আদালতে যাইতে হয় ইহাই যা দুঃখের বিষয়।

—

এই নূতন কাগজখানি সম্বন্ধে আমরা অনেকখানিই বলিলাম, কেননা ইহা যে নূতনত্বের দাবী লইয়া উপস্থিত হইয়াছে সে দাবী করিবার ইহার অধিকার আছে। পূর্ব্বাচল বলিতেছে—

> জাতি যখন যেতেই বসেছে তখন ‘দেশ গেল’ ‘জাতি গেল’ বলে মায়া কান্না বাধিয়ে লাভ নেই।

অর্থাৎ ইহাই সুযোগ। দেশ ডুবিবার মুহূর্ত্তে একবার হরিনাম করিয়া যাই—“কান্না বাধাইবার” সুযোগ পরে পাওয়া যাইবে। ওরিজিন্যালিটি আরো আছে। পূর্ব্বাচল নাকি “লেখক হইয়াই জন্মিয়াছে” সুতরাং সে “দুর্ভিক্ষের দ্বারে বসিয়া মানুষকে হাসাইবার একটা দুর্জ্জয় নেশা”য় মাতিবে। দুই একটি মৃদু নেশা সম্বন্ধে আমাদের কিছু কিছু অভিজ্ঞতা আছে—কিন্তু লোক হাসাইবার দুর্জ্জয় নেশা কি তাহা জানিতাম না।

—

রবীন্দ্র পরবর্ত্তী তৃতীয় যুগের ভাষার বিস্তারিত নমুনায় বাঙালী-মাত্রেই কৃতজ্ঞ হইবে এবিষয়ে সন্দেহ নাই।

বৌদি দাত মাজে না···যে দেশে মেয়েরা দাত মাজে না ইত্যাদি।···সেই অশিক্ষিত পাড়াগেয়ে এমন মেয়ে-মাথলা মানুষ···শুধু মেয়েদের কথা ভাবন আর মেয়ের ছবি দেখন। বাপের বাড়ি যাওন···বৌদি যাইবে বাপের বাড়ি তার সঙ্গে সঙ্গে (লগে লগে?) যাওয়ন। কিন্তু শুধু যাওয়নই তার সার···আর অযথাই মেয়েগুলির দর বাড়াইয়া দেওয়ন। ফলে চন্দ্রলোকের জীব বলিয়া মেয়েদের মনে মনে ভাবন।··· এই সব মেয়েগুলিকে উঠাও উঠাও (!) পৃথিবী হইতে। হাসিতে হাসিতে তারাপদর লিভার ফাঁটিয়া (ফাঁ) যাউক।··· তারাপদর বৌদি তারাপদকে নষ্ট করিতে চায়। তারাপদর স্বাস্থ্য নষ্ট করিতে চায়···মরুক গিয়া তারাপদ (তারাপদ হালায় মরুক গিয়া?)। ঘড়িগুলির ত আর কাজ নাই কেবল বাজন আর বাজন। ঘড়িগুলি উঠাও উঠাও পৃথিবী হইতে···ঘড়ি ভাঙিয়া গুড়া (গুরা) হইয়া মিশিয়া যাক···

পূর্ব্বাচল বলিতেছে—"বাংলা সাহিত্যে (সাহিত্য?) শব্দের অভাব খুবই বেশি তাই আমরা ক্রিয়াপদকেই বিশেষ্যরূপে ব্যবহার ক'রে থাকি।···লেখক (উপরের লেখক) এই শব্দগুলোকে ব্যবহার ক'রে বাংলা সাহিত্যে যেমন gerund (জীর+অণ্ড—বাজীর+অণ্ড—অশ্বের+অণ্ড) এর উৎপত্তি করেছেন তেমনি বাংলা সাহিত্যের শব্দ সম্পদও বাড়িয়েছেন।" তারপর মধুরেণ সমাপয়েৎ—"জন্ম পদ্মাপারে বলে আজন্ম পদ্মাপারেই থেকে যাব।"—আমরাও বলি ভগবান আছেন।

—

ইংরেজি "rising" কথার অনুরূপ "উদীয়মান" কথাটি বাংলা ভাষায়

ব্যবহৃত হয়। উদীয়মান শিল্পী, উদীয়মান কবি—অর্থাৎ—শিল্পী বা কবি শিল্প বা কাব্যগগনে শীঘ্রই উদিত হইবেন, তাহার ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু "পুষ্পপাত্র" বলিতেছেন—

ডেপুটী-মেয়র—শ্রীযুক্ত বিনয়েন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী একজন উদীয়মান যুবক, তাঁহাকেও আমরা অভিনন্দন জানাইতেছি।

অর্থাৎ রায় চৌধুরী মহাশয় যৌবনাকাশে উদিত হইতেছেন—তিনি যে কৈশোর উত্তীর্ণ হইয়াছেন এবং হইয়াই যৌবন লাভ করিতেছেন ইহাই পুষ্পপাত্রের প্রতিপাদ্য। বাঙালী সন্তান কৈশোর পার হইয়াই বৃদ্ধ হইয়া পড়ে—যৌবন লাভ করে না, তদ্ধেতু আমাদের দেশে কিশোরী-ভজন প্রচলিত। যাহা হউক চৌধুরী মহাশয় যে উদীয়মান যুবক ইহাই তাঁহার পক্ষে চরম গৌরবের—তাঁহার আর কোনো সদ্‌গুণ আছে কিনা তাহার উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই।

—

পুষ্পপাত্রের মলাটের উপর নানারূপ ভাষা-ভঙ্গি দ্বারা সূচিপত্রের সারাংশ মুদ্রিত থাকে। শ্রীমতী সুজাতা ঘোষ নামক লেখিকার একটি প্রবন্ধ—নাম, "বিবাহ কি ব্যর্থ হইয়াছে?" ইহার একটি অন্বয় পুষ্পপাত্রই করিয়া দিয়াছেন। বিষয়টি এই ভাবে মুদ্রিত হইয়াছে :—

শ্রীমতী সুজাতা ঘোষের
বিবাহ কি ব্যর্থ হইয়াছে?

এই পর্য্যন্ত দেখিয়াই আর পড়িতে ইচ্ছা হইল না—কেননা ঘরোয়া আলোচনার স্থান মাসিকপত্র নহে। কিন্তু আমাদের একটি গল্প মনে পড়িল।

—

গ্রামোফোন রেকর্ডে একটি ইংরেজি গানের নাম "Kissed me in the moonlight." একটি মহিলা কলের গানের দোকানে গিয়া বিক্রেতা যুবককে জিজ্ঞাসা করিল—Have you Kissed me in the moonlight'? যুবক অত্যন্ত ভীতভাবে বলিল—"না না আমি নই, এ নিশ্চয় ঐ পাশে যে লোকটি রেকর্ড বিক্রয় করছে তার কাজ, আমি মাত্র তিন দিন হ'ল এখানে চাকুরি নিয়েছি।"

কথাগুলি যুৎসই হইলে এইরূপ কেলেঙ্কারি ঘটিতে পারে।

—

অতএব লেখিকারা সাবধান। শ্রীমতী ক্ষেমঙ্করী যদি 'উপপতি' নামক গল্প লেখেন তাহা হইলে সম্পাদক মলাটে "শ্রীমতী ক্ষেমঙ্করীর উপপতি" এই ভাবে রসিকতা করিতে প্রয়াস পাইবে। কিংবা শ্রীমতী শুভঙ্করী "জারজ সন্তান" লিখিলে তাহা "শ্রীমতী শুভঙ্করীর জারজ সন্তান" রূপে দেখা দিবে এবিষয়ে সন্দেহ নাই।

—

শ্রাবণের শান্তির প্রথম প্রবন্ধ "বাংলা সাহিত্যের গতি" আমাদের খুব ভাল লাগিয়াছে। এই সূত্রে যদি শান্তির "ক্রীড" বদলায় তবে উত্তম। অন্যথায় ইহার গুরুত্বে শান্তির "ব্যালান্স" নষ্ট হইয়া যাইবার আশঙ্কা আছে। কিংবা আশঙ্কা নাই। একদিকে এই প্রবন্ধ, অন্যদিকে "এক্সকিউজ মি স্যার"-এর গোঁফ-ওয়ালা লোকটি। ব্যালান্স রক্ষা পাইয়াছে।

—

নূতন লেখকদের পক্ষে কোনো কিছু প্রকাশ করিবার সময় আবেগ থাকা স্বাভাবিক, কিন্তু তাই বলিয়া আবেগের মুখে সাধারণ সত্যকে ভুলিয়া যাওয়া উচিত নহে। জনৈক লেখক বলিতেছেন—

ঘড়ির কাঁটা যেমন ঠিক সময় ঠিক জায়গায় থেকে আপনার

কাজ করে যায়—কোনো বাধা মানে না—প্রকৃতির নিষ্ঠুর ভ্রূকুটী মানুষের দুর্দ্দান্ত প্রতাপ সব তুচ্ছ করে আপনার মনে আপনার কর্ম্মের রথ ছুটিয়ে চলে আপনার পথে।

গ্রহ উপগ্রহ সম্বন্ধে যে কথা অনেকটা সত্য—ঘড়ির কাঁটা সম্বন্ধে তাহার চেয়েও বেশি বেশি বলিলে ঘড়ির কাঁটা সম্বন্ধে নানারূপ সন্দেহ হয়।

—

ভারতবর্ষের 'ডেইজি' গল্পের নায়ক বলিতেছে—

এজন্যে আমার বন্ধুদের মধ্যে কেউ কেউ আমায় ঠাট্টা ক'রে বলে 'বুক-লাভার'।

'বুক-লাভার' যে একটা ঠাট্টার কথা—ইহা পূর্ব্বে জানা ছিল না। কিন্তু এই 'ডেইজি' গল্পের শেষ পৃষ্ঠাটিতে যে ডিলীরিয়াম প্রকট হইয়া উঠিয়াছে ইহা কি-রোগের ডিলীরিয়াম? কোনো ডাক্তার বলিয়া দিবেন কি?

—

শ্রীসাহানা দেবীর "সমাধান" কিসের? ছন্দ-সমস্যার যদি হয়, তাহা হইলে শপথ করিয়া বলিতে পারি সমাধান হয় নাই।

তোমারেই চেয়েছি এ-জীবনে আমার যদি ওগো অন্তর্য্যামি
তবে মিছে কেন মোর ছোট সুখ বরি' আপনাতে আমি—

দুইটি ছত্র এক সঙ্গে পড়া যায় না। "ছোট ছোট সুখ" হইলে দ্বিতীয় ছত্রের চলিয়া যাইতে পারে। আর প্রথম ছত্র যদি এইরূপ পড়া যায়—

তোমারেই চেয়েছিএ জীবনেআ মারযদি ওগো অন্ত(র্)যামী

ইহাতেও অন্তর্য্যামীর "র" বাদ দিতে হয়। কিন্তু "র" বাদ দিলে কবিতার থাকে কি?

—

জন্মদাতা হওয়া, পিতা হওয়া প্রভৃতি প্রশ্ন আজকাল খুব আলোচিত হইতেছে। অন্যত্র বলিয়াছি—জন্মদাতার দায়িত্ব সামান্য নহে—কিন্তু আবার দেখিতেছি, ভারতবর্ষে প্রবোধ সান্ন্যাল বলিতেছেন—

জন্মদাতা হওয়া সহজ, পিতা হওয়া বড় কঠিন।

পোষ্যপুত্র গ্রহণকারীর নিকট ঠিক ইহার উল্টাটাই সত্য। সুতরাং কোনটা সহজ কোনটা কঠিন ইহা ফস্ করিয়া বলিয়া ফেলা ভাল নহে।

—

ভূমিকম্পের সময় ফরোয়ার্ডে ভূমিকম্পের ছবি হিসাবে কতকগুলি মিথ্যা ছবি ছাপা হইয়াছিল—কিন্তু ফরোয়ার্ডের এরূপ করিবার হেতু অনুমান করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব হয় নাই। সে সময় যে টাকা ভূমিকম্প সাহায্য ভাণ্ডারে দেওয়া উচিত, সেই টাকা অযথা নষ্ট করিয়া কতকগুলি ফোটো এবং ব্লক ছাপাইবার লোভ ফরোয়ার্ড দমন করিয়াছিলেন। কারণ, পুরাতন ব্লক ছাপাইয়াই যদি সাধারণের মনে করুণা জাগানো যায় তবে অনর্থক নূতন ব্লক তৈয়ারী করিবার কোনো প্রয়োজন নাই। ফরোয়ার্ড এটুকু উপলব্ধি করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজনই হইয়াছিলেন।

—

কিন্তু দেশ যখন কাঁপিতেছে না—করুণা সঞ্চার করাও যেখানে উদ্দেশ্য নহে, সেখানে এরূপ মিথ্যা ছবি ছাপাইবার কারণ আমরা কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। শ্রাবণের ভারতবর্ষের ৩১০ পৃষ্ঠায় "রাজদর্শনে সমাগত নরনারী বালকবৃদ্ধ" নামক ছবি দেখিয়া আমরা হতবাক হইয়াছি। সম্রাট অগষ্টাস্ যে ভক্তিভাজন এবং শ্রদ্ধাস্পদ ছিলেন একথা ত অস্বীকার করিবার মত সময় এখনো আসে নাই। তবে কেন 'রাজদর্শনে

সমাগত নরনারী বালক বৃদ্ধের” ছবি দেখাইয়া “ভারতবর্ষ” প্রমাণ করিতে চাহিতেছেন যে সম্রাট জনপ্রিয় ছিলেন ? তবু “ভারতবর্ষ” যদি মনে করিয়া থাকেন যে সম্রাট অগষ্টাসের গৌরব বৃদ্ধির জন্য তাঁহারা এরূপ কার্য্য করিয়াছেন তবে আমাদের বলিবার কিছু নাই। আশা করি সেরূপ উদ্দেশ্য থাকিলে তাহা এতদিনে সফল হইয়াছে, সুতরাং ছবিখানা প্রকৃতপক্ষে কাহাদের ছবি তাহা ভারতবর্ষ ভবিষ্যতে ব্যক্ত করিয়া আমাদিগকে বাধিত করিবেন।

—

দেশে কি হইল, কোনো কবিই মাত্রা ঠিক রাখিয়া চলিতে পারিতেছে না ! আবার টলিতে টলিতে সকলে কি একমাত্র ভারতবর্ষেই আসিয়া জড়ো হইতেছে ! ছন্দ-বৈরাগী দেশে অনেক আছে জানি, কিন্তু তাহারা কি সকলেই ভারত-পথিক ?

নিদ্রাহীন পৃথিবীর যৌবনের প্রথম উৎসবে,
মেলিয়া নিবিড় দুটি অনিমিখ নয়ন নীরবে
চেয়েছিল কার মুখ পানে, নাহি জানে কবি ;
আনন্দ-সঙ্গীতে কার ফুটিয়া উঠিল তব ছবি···

শহরের নানারূপ প্রাণান্তকর বেসুর শব্দের সঙ্গে ইহাও সহ্য করিতে হইবে !

—

কোনো তরুণের বলিবার উদ্দেশ্য ছিল—

যত ক্ষেত খামার আমার জমিদারিতে ছিল তাহার সকলই বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। তাহার ফসল কিছু সঞ্চিত ছিল, তাহাও যায় যায়। আমি মকদ্দমা করিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছি এই যে ফসল এ আমারি ক্ষেতের, কিন্তু আমার তাহাতে আর অধিকার নাই। আমার দুর্দ্দশা দেখিলে ? জানি

সকলই অদৃষ্ট। আমার দেহ ক্ষীণ, দুর্ব্বল, মনও তাই। কিন্তু তোমার সবই পুষ্ট। সুতরাং তোমার করুণ কান্না থামাও। উহা নিয়া আমি কি করিব? তোমার পুষ্ট সম্পদে আমাকে তুষ্ট কর।

—

কিন্তু এই কথাগুলি অনেক ফুট্‌কির সাহায্যে অনেক কথা বাদ দিয়া ইসারায় বলিলে যাহা দাঁড়ায় তাহা এই—

যত ক্ষেত মোর···
এই যে ফসল······
ফলেছে···দেখিলে···প্রিয়া—
সকলেই···জেনো—পুষ্ট তোমার···
···করুণ কান্না নিয়া··· !

উদয়নের "মরমিয়া"র আমরা এই অর্থই গ্রহণ করিলাম। অবশ্য আরো কয়েক রকম অর্থ হইতে পারে···কিন্তু তাহা পাঠকের "মুড"এর উপর নির্ভর করিতেছে।

—

উদয়নের "শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন" নামক ছবিতে দেখা যায় শ্রীকৃষ্ণ তর্জ্জনি খাড়া করিয়া সম্মুখে কাহাকে কি বলিতেছেন, পশ্চাতে অর্জ্জুন হতাশ হইয়া প্রায় কাঁদিয়া ফেলিবার উপক্রম করিয়াছেন। অর্জ্জুনের দুই হাতে ফ্র্যাকচার-ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। ছবিটির অর্থ এই—

পথে "চাই চিনেবাদাম ভাজা" হাঁকিয়া ফেরিওয়ালা যাইতেছিল। শ্রীকৃষ্ণ ডাকিলেন—"এই চিনে বাদাম!" ফেরিওয়ালা থামিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কেৎনা দেঙ্গে?" শ্রীকৃষ্ণ আঙুল দেখাইয়া বলিলেন, "এক পইসাকা দেও। ইহাতে অর্জ্জুন ক্ষুব্ধ হইয়া কাঁদো কাঁদো

ভঙ্গিতে ফেরিওয়ালাকে ইসারা করিতেছেন—"নে হি, দো পয়সাকা দেও।" অর্জ্জুন নিরুপায়, কেননা টাকার থলি শ্রীকৃষ্ণের হাতে।

প্রবাসীতে বিরহ যক্ষ দেখিয়াছিলাম, এইবার যক্ষপত্নীর পালা। বিরহ ভোগ করিয়া যক্ষপত্নীর নাক অসম্ভব লম্বা হইয়া গিয়াছে এবং ব্যাকব্রাশের দরুন চুলগুলি মাথার সঙ্গে চাপিয়া বসিয়াছে। ইহা ছাড়া আর কোনো পরিবর্ত্তন দেখা যায় না। নাক একটু খাটো হইলে ছবির নাম দেওয়া যাইত বিদ্যাধরী। শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরীর "নিবেদন" ছবিখানি প্রবাসীর বিচারে বোধ হয় প্রথম স্থান পায় নাই।

—

শ্রাবণের প্রবাসীর

"নিশীথে" নামক ছবিখানি কয়েক মাস পূর্ব্বে প্রবাসীতেই একজন মান্দ্রাজীর অঙ্কিত বলিয়া বাহির হইয়াছিল—এবারে ছবির নীচে নাম দেখিতেছি শ্রীকালীকিঙ্কর ঘোষ দস্তিদার। মান্দ্রাজ আর্ট স্কুলের চিত্র হিসাবে এবং মান্দ্রাজী ছাত্রের অঙ্কিত বলিয়া ছবিখানি পূর্ব্বে প্রশংসিত হইয়া এতদিন পরে যদি উহা বাঙালী ছাত্রের অঙ্কিত বলিয়া জানা গিয়া থাকে তাহা হইলে 'ভ্রম-সংশোধন' কথাটি উহার সঙ্গে উল্লেখিত হইলে প্রবাসীর কিছু ক্ষতি হইত না। তবু কালীকিঙ্করের ভাগ্যই বলিতে হইবে।

কিছুদিন পূর্ব্বে Readers Digest নামক বিখ্যাত মাসিক পত্রে নিম্নলিখিত ধাঁধাটি Brain Twisting Puzzle নামে প্রকাশিত

হইয়াছিল। ধাঁধাটি বেশ উপভোগ্য। মাথাও ঘামিবে। ইচ্ছা হইলে যুক্তি সহ উত্তর পাঠাইতে পারেন।

একটা গাড়িতে তিন জন "ক্রু" এবং তিন জন আরোহী। গাড়ীখানা শিকাগো হইতে নিউইয়র্কের মধ্যে যাতায়াত করে। ক্রু তিনজনের একজন এঞ্জিনীয়ার, একজন ফায়ারম্যান এবং একজন গার্ড। তাহাদের নাম স্মিথ, জোন্‌স্ এবং রবিন্‌সন। (যথাক্রমে লেখা নয়)। আরোহী তিন জনের নামও—স্মিথ, জোন্‌স্ এবং রবিন্‌সন। ইঁহাদিগ ক আরোহী-স্মিথ, আরোহী-জোন্‌স্ এবং আরোহী-রবিন্‌সন বলা হইবে।

আরোহী-রবিন্‌সন নিউইয়র্কে থাকেন। আরোহী-জোন্সের মাসিক আয় ৫০০০ ডলার। গার্ড শিকাগো এবং নিউ ইয়র্কের মধ্যপথে বাস করে। এবং তাহার মিতা-আরোহী শিকাগোয় থাকেন। আরোহী তিন জনের ভিতর একজন গার্ডের প্রতিবেশী এবং তাঁহার আয় গার্ডের আয়ের তিনগুণ।

স্মিথ ফায়ারম্যানকে বিলিয়ার্ড খেলার সময় প্রহার করে।

ধাঁধা :—এঞ্জিনীয়ারের নাম কি ?

An irate landlord wrote to a tenant asking whether he would "quit or pay," and insisted on a straightforward reply. The tenant replied, "Dear Sir, I remain, yours faithfully."

প্রাপ্তি-স্বীকার ও অভিমত

বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন প্রণীত, মূল্য দুই টাকা—প্রাপ্তিস্থান গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা।

বাংলা সাহিত্যে গদ্য কি ভাবে আধুনিক রূপ গ্রহণ করিয়াছে তাহার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এই পুস্তকের বিষয়বস্তু। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস সম্পর্কে বহু অনুসন্ধান এবং গবেষণা চলিতেছে, সুতরাং এবিষয়ে সুকুমারবাবুর এই আধুনিকতম গ্রন্থখানি যে তথ্য হিসাবে যথাসম্ভব পূর্ণাঙ্গ এবং প্রামাণ্য হইয়াছে একথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু শুধু ইহাই নহে, বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশ লেখক যেরূপ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সুচারুসম্বদ্ধ ভাবে দেখাইয়াছেন তাহা খুবই প্রশংসনীয়। তিনি রসবিচারের ভার গ্রহণ পূর্ব্বক ইতিহাসকে অযথা ক্ষুণ্ণ না করিয়া খাঁটি বৈজ্ঞানিক উপায়ে ভাষাভঙ্গি বিশ্লেষণপূর্ব্বক আধুনিক গদ্যের বিকাশ-ধারা অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন, ইহার ভিতর কোথাও ফাঁক বা ফাঁকির অবসর রাখেন নাই। মূল গদ্য-গ্রন্থসমূহ হইতে ধারাবাহিক ভাবে বাছা বাছা অংশ উদ্ধৃত করিয়া নিজের বক্তব্য পরিস্ফুট করিয়াছেন। মূল কথা, এই উদ্ধৃত অংশগুলির বিশ্লেষণেই সুকুমারবাবুর কৃতিত্ব বিশেষরূপে পরিস্ফুট হইয়াছে। লেখক ভূমিকায় বলিয়াছেন—"বিদ্যাসাগর মহাশয় হইতে আরম্ভ করিয়া রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত লেখক-দিগের হস্তে আধুনিক বাঙ্গালা গদ্য-ভঙ্গি অভূতপূর্ব্ব শ্রীলাভ করিয়াছে। বর্ত্তমান কালের অপরাপর ভারতীয় আর্য্যভাষাগুলির কথা দূরে থাকুক, অনেক প্রতিষ্ঠাপন্ন বিদেশী ভাষাতেও এইরূপ বৈচিত্র্যমণ্ডিত ও

ঐশ্বর্য্যশালী গদ্য-ভঙ্গি ও সাহিত্য নাই, একথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।" সুতরাং সুকুমারবাবুর গ্রন্থে আমাদের এই ঐশ্বর্য্যশালী গদ্য সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ইতিহাস পাঠ করিয়া সকলেই উপকৃত ও প্রীত হইবেন। এই গ্রন্থ ছাত্রদের পক্ষেও বিশেষ মূল্যবান হইয়াছে একথা বলাই বাহুল্য।

বিদ্যা-সুন্দর

"প্রাচীন আসামী হইতে" নামক বহু-খ্যাত কবিতা গ্রন্থের রচয়িতা, রসিক-কবি শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী প্রণীত। মূল্য বারো আনা, প্রাপ্তিস্থান গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা।

প্রমথবাবু গল্প অংশটি এই ভাবে গড়িয়া লইয়াছেন—

প্রথমেই মালিনী, বিদ্যার কক্ষ-গমনোন্মুখ সুন্দরকে সতর্ক করিয়া দিতেছে—

ফিরে এস ফিরে এস, ক্ষান্ত দাও রাত্রি আজিকার
আজিকে জাগ্রত পুরী ;···

কিন্তু সুন্দর কোনো বাধা না মানিয়া অগ্রসর হইয়া চলিল—

ছাড়ায়ে গোহাল-সীমা অবশেষে পঁহুছিল এসে
মধুপ-স্বপন-মুগ্ধ মালঞ্চের নির্জ্জন সভায় ;
সফেন মালতী পুষ্প সমর্পিল তার শির দেশে
রাশি রাশি শুভ্র দল ; ভৃঙ্গহারা চম্পা আজি হায়,

স্তাবকবিহীন ক্ষুব্ধ একাকিনী বিরহিণী প্রায়
নীরব গৌরবে মরি, রহি রহি তীব্র সৌরভের
হানিতেছে কটাক্ষ নিপুণ—মধুমন্থর কষায়
প্রথম যেন সে প্রেম। বিস্তারিয়া শুভ্র লাবণ্যের
স্নিগ্ধ আমন্ত্রণখানি নিশিগন্ধা প্রতীক্ষায় কোন্ পথিকের॥

সুন্দর চলিতেছে—

পার হ'য়ে পল্লীসীমা, পার হ'য়ে মহুয়ার বন
পৌঁছিল সুন্দর আসি, উপলিত তীরে ধানশ্রীর ;
ভাঙালো চমক তার শীত-তীব্র সিক্ত সমীরণ;
ছুটেছে ধানশ্রী ক্ষিপ্র, স্বচ্ছ লঘু ডুরে শাড়িটির
ভঙ্গে ভঙ্গে প্রকাশিয়া আপনার চঞ্চল অধীর
অপ্সরী-ঈপ্সিত ক্ষীণ ললিত সে সদ্য তনুখানি,
অতিদূর ব্রহ্মপুত্র লাগি !

এদিকে বিদ্যা নানারূপ আশঙ্কায় অস্থির হইয়া আ[illegible] করিয়া নানা ছলে সময় কাটাইতেছে। কখনো দর্পণে মুখ দেখিতেছে, কখনো চিন্তা করিতেছে, কখনো ঘুমাইবার জন্য বেশবাস উন্মোচন করিতেছে। বিদ্যা জানে, এমন জাগ্রতপুরীতে সুন্দর আজ আসিবে না—তাই তাহার একদিকে আনন্দ আর এক দিকে হতাশা।

কটিতে কনককাঞ্চী স্বর্ণউষা কণ্ঠ কলবাক্ ;
লাবণ্যমসৃণ দুটি বল্লরিত ব্যগ্র বাহুলতা
অঙ্গুলির সঞ্চালনে যেন আহা খেলিতেছে ফাগ
অদৃশ্য দয়িত সনে ; মুক্ত কুন্তলের অজস্রতা
নিঝরিছে নীড়গামী বলাকার পক্ষচ্যুত অন্ধকার যথা॥

সমস্ত পুরী যেন ষড়যন্ত্রে মাতিয়াছে। কোন্ মুহূর্তে কি ঘটে বলা যায় না। বীণার তার যেন টানিতে টানিতে ছিঁড়িবার মুখে আসিয়াছে আর একটু হইলেই ছিঁড়িয়া যাইবে। চারিদিক থম থম করিতেছে, শ্বাসরোধ করিয়া সকলে যেন কিসের প্রতীক্ষা করিতেছে।

নগরীর সিংহদ্বারে বাজে মধ্যরাত ; শাস্ত্রীগণ
হেঁকে যায় ;···
সশস্ত্র সমস্ত পুরী।

সুন্দর, প্রহরীকে এড়াইয়া ঘুমন্ত বিদ্যার কক্ষে প্রবেশ করিয়াছে। বিদ্যা স্বপ্নে বলিতেছে—

"ফিরে এস ফিরে এস, সুন্দর, আমারে
যেয়োনা ফেলিয়া একা।" "কোথা যাব, কোথা যাব, কোথা
শান্তি তোমারে ত্যজিয়া—চেয়ে দেখ, এসেছি বিদ্যা রে—
তোরি তরে উপেক্ষিয়া স্নেহময়ী মালিনীর কথা,
অ... ...্যা রাত্রি ভেদি, অবজ্ঞিয়া তীক্ষ্ণ-অসি জাগ্রত জনতা॥

তারপর—

দুঃসহ রভসবেগে সমুদ্রের তরঙ্গ যেমন
কণ্টকিয়া উঠিতেই টুটি লুটি পড়ে—অকস্মাৎ
দর্শনের অকুণ্ঠিত সুখ—তেমনি বিদ্যার মন
দিল ভয়ে ভরি।

অবশেষে সুন্দর বিদ্যাকে লইয়া প্রাসাদ ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল।

অতীতঅঙ্কিত জীর্ণ নগরের সিংহদ্বার ছাড়ি
সম্মুখে অনন্ত মাঠ, দিগন্তয়ে অন্ধকারে লীন

গাড়ো পাহাড়ের লেখা: উল্কাবেগে দেয় অশ্ব পাড়ি
ফলন্ত ভুট্টার ক্ষেত আবক্ষ-উন্নত ; জ্বলে জিন্
সপ্তর্ষির আলোপাতে ; তালে তালে বাজে ঝিন্‌ঝিন্
সাজের কনক-ঘণ্টা ; দুই পাশে আফিঙের বনে
দিবসের মউমাছি মধুমদে পক্ষগতিহীন
চমকে দুলন্ত ফুলে ; সে সুগন্ধি সুতীক্ষ্ণ পবনে
বিঁধিল বিদ্যার অঙ্গে, সুন্দরের শিরে শিরে,—কাঁপিলা
দু'জনে ॥

বিদ্যা, সুন্দর, অশ্বপৃষ্ঠে ছুটিয়া চলিয়াছে—আকাশে বিদ্যুৎ জ্বলিয়া উঠিল—

ক্ষণিক-আলোক লুপ্ত গাঢ়তর সুপ্ত অন্ধকারে
নভশ্চ্যুত স্বপ্নসম দুইজনা চলিল ছুটিয়া।

সমস্ত পরিমণ্ডলটি কল্পনার রঙীন আবেশে মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে। সুমধুর বাক্যবিন্যাস, সুসম্বদ্ধ ছন্দোরীতি এবং অপরূপ কবিত্বের মাদকতায় পাঠকচিত্ত বিহ্বল হইয়া পড়ে, পড়িতে পড়িতে মনে নেশা ধরিয়া যায়। ইহার অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করিলে সমগ্র কাব্যের প্রতি অবিচারই করা হয়। ইহার কোনো বিশেষ অংশ ভাল তাহা নহে—সমগ্র কবিতাটি অখণ্ডরূপেই অপূর্ব্ব।

চিন্তা-রেখা

নাগপুর প্রবাসী শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত প্রবন্ধ পুস্তক। প্রাপ্তিস্থান গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা—মূল্য এক টাকা।

গ্রন্থখানিতে পাঁচটি সুচিন্তিত ও সময়োপযোগী প্রবন্ধ আছে। প্রবন্ধগুলি পড়িয়া আমরা আনন্দ পাইয়াছি। ভাষা আরো একটু সংক্ষিপ্ত হইতে পারিত, কিন্তু সর্ব্বসাধারণের উপযোগী করিয়া লেখায় ইহার বিশিষ্টতা বৃদ্ধিই পাইয়াছে। লেখক চিন্তা করিতে করিতে অনেক স্থলে আবেগকেও মুক্তি দিয়াছেন এবং ভাষার সাবলীল গতিভঙ্গিতে তাহা সুখপাঠ্য হইয়াছে। সাধারণ লাইব্রেরি সমূহে এই জাতীয় পুস্তক থাকা বাঞ্ছনীয়।

যক্ষ্মা ও তাহার প্রতিকার

ডাঃ শ্রীউপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী এল-এম-এস প্রণীত। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত, মূল্য দুই টাকা মাত্র। ছাপা, বাঁধাই, কাগজ, চমৎকার।

রায় বাহাদুর বিদ্যাসাগর গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম-বি মহাশয় এই গ্রন্থের একটি ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন: বইখানি বাঙালী মাত্রেরই গৃহে স্থান পাইবার উপযুক্ত। বাঙালী-জীবনে সুখশান্তি বহুদিনই ঘুচিয়া গিয়াছে—এক দেহ ছিল, তাহাও যক্ষ্মাগ্রস্ত; এ অবস্থায় বাঙালীকে আসন্ন মৃত্যুর গ্রাস হইতে বাঁচাইবার জন্য যিনি যতটুকু চেষ্টা করিবেন তিনি ততখানি কৃতজ্ঞতার পাত্র। অপাঠ্য গল্প-উপন্যাস প্লাবিত দেশে এই জাতীয় গ্রন্থ কেহ চোখে দেখে না। মরণোন্মুখ জাতির পক্ষে ইহাই স্বাভাবিক। কিসে আমরা আমাদের জাতীয় জীবনের অতি বাস্তব শত্রুটিকে নষ্ট করিতে পারি তাহার যথাসম্ভব নির্দ্দেশ অতি সরল ভাষায়, মনোজ্ঞ ভঙ্গিতে এই গ্রন্থে দেওয়া হইয়াছে। যক্ষ্মাজীবাণুর

রঙীন চিত্রটি দেখিলে মনে হয় ঠিক যেন অণুবীক্ষণে চোখ লাগাইয়া দেখিতেছি।

বৈজ্ঞানিক কৌতূহল দূরের কথা, যদি পাশ ফিরিয়া শুইলে একটি নূতন তথ্য জানিতে পারা যায়, তাহা হইলেও বাঙালী আলস্য ত্যাগ করিয়া পাশ ফিরিয়া শুইবে না। যক্ষ্মারূপ এত বড় দুরন্ত দুর্দ্ধর্ষ ব্যাপক ব্যাধির সহিতও বাঙালীমনের কোনো সক্রিয় বিরোধিতা নাই। থাকিলে এই ধীরপন্থী ব্যাধিটি এরূপ উগ্রপন্থী হইবার সুযোগ পাইত না। ইহা কলেরা বসন্তের মত হৈ হৈ করিয়া আসে না—অতি ধীরে ধীরে মানুষের দেহকে ক্ষয় করিতে থাকে। সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে ইহার আক্রমণ প্রতিরোধ করা যে অসম্ভব নহে—তাহা উপেন্দ্রবাবুর গ্রন্থে বিশদরূপে জানা যাইবে। এরূপ মূল্যবান গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।
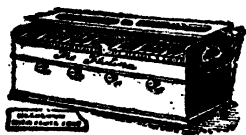
শ্রীপরিমল গোস্বামী এম-এ কর্ত্তৃক সম্পাদিত। ২৫।২ মোহনবাগান রো, শনিরঞ্জন প্রেস হইতে শ্রীপ্রবোধ নান কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১১শ সংখ্যা] ভাদ্র, ১৩৪১ [৬ষ্ঠ বর্ষ

মেঘদূত প্রসঙ্গ

মেঘদূত কালিদাসের শ্রেষ্ঠ কাব্য না হইলেও ইহা তাঁহার বিশিষ্টতম রচনা। বিদ্যাসাগর মহাশয় যথার্থই বলিয়াছিলেন যে কালিদাসের অপরাপর কাব্য নাটকাদি বিলুপ্ত হইয়া গেলেও এক মেঘদূতের গৌরবেই শাশ্বত কবিসমাজে কালিদাস স্বীয় গৌরব ও মহিমা অক্ষুন্ন রাখিতে পারিতেন। কালিদাসের কাব্যচতুষ্কের মধ্যে মেঘদূতের যে স্থান, তাঁহার নাটকত্রয়ীর মধ্যে অভিজ্ঞানশকুন্তলের স্থানও তাহাই। এই দুইটি রচনাই কালিদাসের কৃতির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা জনপ্রিয় হইয়াছিল। এই জনপ্রিয়তার ফলেই এই দুইটিতে পাঠান্তরের প্রাচুর্য্য এবং প্রক্ষিপ্তাংশের বাহুল্য বিশেষ করিয়া পরিলক্ষিত হয়।

মেঘদূতের কবিতাগুলিতে যে সকল পাঠান্তর দেখিতে পাওয়া যায় তাহা স্থূলতঃ পাঁচ শ্রেণীতে ফেলা যাইতে পারে।

(ক) পণ্ডিতমানী কর্ত্তৃক ব্যাকরণ ঘটিত সংশোধন।

(খ) তথাকথিত 'কবি-রসিকের' বাহাদুরী অথবা অজ্ঞানতার জন্য সংশোধন, সংযোজন, এবং সংবর্দ্ধন ও বিকৃতি সম্পাদন।

(গ) অনবধানতাপ্রযুক্ত বিপর্য্যয় বা বিকৃতি।

(ঘ) যথার্থ কবি-রসিকের পাঠ কল্পনা ও সংবর্দ্ধন।

(ঙ) স্বয়ং কালিদাস কর্ত্তৃক সংবর্দ্ধন এবং পরিবর্জ্জন।

প্রথমে 'ব্যাকরণ ঘটিত সংশোধন' সম্বন্ধে কিছু বলি। কালিদাসের রচনার মধ্যে এমন কিছু কিছু শব্দ এবং পদ পাওয়া যায় যাহা পাণিনি-ব্যাকরণের মতে অশুদ্ধ। মেঘদূতেও এইরূপ কয়েকটি 'অশুদ্ধি' আছে। তাহাদের 'শুদ্ধ' পাঠ পাওয়া যায় প্রধানতঃ মল্লিনাথের টীকায়। সুতরাং মল্লিনাথই যে এই শুদ্ধিকার্য্যের অন্যতম প্রধান পাণ্ডা তাহা বলিলে হয়ত বিশেষ ভুল হইবে না। এই শুদ্ধীকরণের দুই একটি উদাহরণ দিতেছি।

অধিকাংশ পুঁথি এবং টীকাকারের পাঠে মেঘদূতের প্রথম শ্লোকে আছে 'স্বাধিকারপ্রমত্তঃ' এবং 'বর্ষভোগ্যেন ভর্ত্তুঃ।' 'স্বাধিকারপ্রমত্তঃ' এই পঞ্চমীতৎপুরুষ সমাস পাণিনির মতে অসিদ্ধ, এখানে 'স্বাধিকারাৎ প্রমত্তঃ' এই অসমস্ত প্রয়োগ হওয়া উচিত। এই 'শুদ্ধ' পাঠ গ্রহণ করিলে ছন্দ ঠিক থাকে অথচ অর্থের ব্যত্যয় হয় না, সুতরাং এই পাঠ লইতে বাধা কি? অতএব জিনসেন এবং মল্লিনাথের পাঠ 'স্বাধিকারাৎ প্রমত্তঃ।' বর্ষভোগ্যেন এই স্থলে পাণিনির সূত্র (৮, ৪, ১৩) অনুসারে মূর্দ্ধন্য ণ হওয়া উচিত, সুতরাং মল্লিনাথ ধরিয়াছেন 'বর্ষভোগ্যেণ ভর্ত্তুঃ।' অষ্টম শ্লোকে আছে 'প্রত্যয়াদাশ্বসত্যঃ', পাণিনির মতে শ্বস্ ধাতু অদাদি, সুতরাং 'আশ্বসত্যঃ' হওয়া উচিত। মল্লিনাথও পাঠ ধরিয়াছেন 'প্রত্যয়াদাশ্বসত্যঃ।'

এখন তথা-কথিত কবি-রসিকের 'স্থূলহস্তাবলেহ' বিষয়ে কিছু বলি। অব্যাপারে ব্যাপার করিতে যায় এমন লোকের অভাব প্রাচীন কালেও ছিল না এবং এখনকার কালেও নাই। কালিদাসের মেঘদূতকে চাঁছিয়া ছুলিয়া ফাঁপাইয়া ফোলাইয়া অনুবাদ করিয়া সাধারণ লোকের পক্ষে সহজবোধ্য (?) করিবার প্রচেষ্টা হাল-আমলের রীতি মনে করিলে ভুল করা হইবে। মেঘদূত পরমরসাত্মক কাব্য কিন্তু সেই সঙ্গে যদি মনে করা হয় যে মেঘদূতের ভাষা ও রঘুবংশের ভাষা এক রকম তবে অত্যন্ত ভুল করা হইবে। সত্য বলিতে কি কালিদাসের রচনাগুলির মধ্যে মেঘদূতের ভাষা সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন। ভাল সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদিগের মধ্যেও, মেঘদূতের যে-কোন স্থানের প্রকৃত অর্থ চট্ করিয়া বলিয়া দিতে পারে এমন ব্যক্তি চিরকালই বিরল। 'মাঘে মেঘে গতং বয়ঃ' ইহা যদি শিক্ষার্থীর উক্তি হয় তবে তাহাকে যথার্থ বলিতে হইবে। মেঘদূতের ছন্দে আমরা সকলেই মুগ্ধ, এবং ইহার শ্লোকগুলির ভাবও কতক স্পষ্ট, কতক অস্পষ্ট, কতক আবছায়া রকম আমরা জানি, কিন্তু কোন বদ্‌রসিক যদি ঠকাইবার মতলবে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া বসে যে 'কর্ত্তুং যচ্চ প্রভবতি মহীমুচ্ছিলিন্ধ্রামবন্ধ্যাং' ইহার অর্থ কি তাহা হইলে আমরা কি তাহার মুণ্ডপাত করিব না? কিংবা যদি পাণ্ডিত্যাভিমানী ভাষাতাত্ত্বিক 'লোলাপাঙ্গৈ র্যদি ন রমসে লোচনৈর্বঞ্চিতোঽসি' ইহার অন্বয় করিতে বলে তাহা হইলে আমরা কি তৎক্ষণাৎ বলিয়া বসিব না 'বিলোল কটাক্ষে যদি প্রীত না হও তবে তোমার লোচনই বৃথা?'

সে যাহা হউক মেঘদূতের ভাষা কঠিন বলিয়াই সেকালের কোন কোন টীকাকার পাঠকল্পনা ও বিকৃতির দ্বারা কালিদাসের ভাষাকে সরলতর করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এখন কিছু উদাহরণ দেওয়া যাক।

'জালোদগীর্ণৈরুপচিতবপুঃ' এবং 'ভর্ত্তুঃ কণ্ঠচ্ছবিরিতিগণৈঃ' এই দুইটি শ্লোক যুগ্মক, অর্থাৎ ইহাদের অন্বয় একত্রে হইবে। প্রথম শ্লোকটিতে কোন সমাপিকা ক্রিয়া নাই, একটি অসমাপিকা ক্রিয়া আছে 'নীত্বা রাত্রিং।' সমাপিকা ক্রিয়া পাওয়া যাইতেছে দ্বিতীয় শ্লোকটিতে 'পুণ্যং যায়াস্ত্রিভুবনগুরোর্ধাম চণ্ডীশ্বরস্য।' দুইটি মন্দাক্রান্তা শ্লোকের একত্রে অন্বয় বড় সোজা কথা নহে, অতএব প্রথম শ্লোকটিতে একটি সমাপিকা ক্রিয়া বসাইয়া সমস্যার সমাধান করা হইল। কল্পিত পাঠ দাঁড়াইল এই 'হর্ম্মেষস্যাঃ কুসুমসুরভিষধ্বখেদং নয়েথাঃ।' 'অধ্ব-খিন্নান্তরাত্মা' এর স্থলে এখন 'অধ্বখেদং নয়েথাঃ এই পাঠ ধরিলে কালিদাসের উপর সুবিচার করিয়া 'নীত্বা রাত্রিং' এই পাঠ কিছুতেই রাখা চলে না। অতএব—

> হর্ম্মেষস্যাঃ কুসুমসুরভিষধ্বখিন্নান্তরাত্মা
> নীত্বা রাত্রিং ললিতবণিতা পাদরাগাঙ্কিতেষু॥

এই শ্লোকার্দ্ধের এইরূপ 'সংশোধন' করা হইল—

> হর্ম্মেষস্যাঃ কুসুমসুরভিষধ্বখেদং নয়েথা
> লক্ষ্মীং পশ্যন্ ললিতবনিতাপাদ রাগাঙ্কিতেষু॥

এই 'শুদ্ধীকৃত' পাঠ কেবল মল্লিনাথের টীকাতেই পাওয়া গিয়াছে।

(ক্রমশ)

স্ত্রী—"সুন্দরী কোনো মেয়ে দেখলেই ভুলে যাও যে তুমি বিবাহিত।"
স্বামী—"ভুলি না। মনে পড়ে।"

—

মনজুয়ান

স্কট টমসন লিখিত

অষ্টম সর্গ

ষ্টীম এঞ্জিনের আমি গাহি জয় গান,
যে-এঞ্জিন মুহূর্ত্তেকে দানবের বলে
অতিক্রমি নদ গ্রাম কান্তার পাষাণ
পুষ্পকেরে পরাজিয়া বাষ্প গর্ব্বে চলে।
সুপ্রাচীন সরীসৃপ লভি যেন প্রাণ
ফুঁসিয়া গর্জ্জিয়া করে আক্রমণ ছলে।
ধরিত্রীর অন্ত্র যেন ছিঁড়িবে এখনি!
ধরাতলে বিনির্ম্মিত ইন্দ্রের অশনি॥

নভক্রামী বেলুনের জয়ধ্বনি করি!
মানুষের ইচ্ছা যেন বুদ্বুদ আকারে
চলিয়াছে উর্দ্ধপানে পৃথ্বী পরিহরি!
নূতন সাগর মন্থে চাহে তুলিবারে
দ্যুলোকের সিন্ধু হ'তে নবীন অপ্সরী;
কবির বন্দনা সেই এরোপ্লেনটারে!
মাধ্যাকর্ষণের তেজ মানে না মানব
স্বর্গেরে লুঠিতে চায় নূতন দানব॥

তিমি দম্ভ বিনাশিয়া লক্ষ জাহাজের
অপূর্ব্ব কাহিনী লয়ে রচিব সঙ্গীত !
ঝড়ের ঝাপটে যারা ধূম্র নিশানের
পতাকা মেলিয়া দেয়, হয় না শঙ্কিত !
বাষ্পের পাখ্না লভি লক্ষ মৈনাকের
মত করে ছুটাছুটি, নাহি বর্ষাশীত,
নাহি আদি, নাহি অন্ত, নাহি তল পার
মানবের মূর্ত্ত ইচ্ছা দিতেছে সাঁতার ॥

আর গাহি জয় গান ষ্টীম রোলারের,
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ যাতে সমন্বয়,
যাহাতে মিলন হ'ল জ্ঞান ও কর্ম্মের ;
কলের এ ঐরাবত বড় কম নয় !
পথ চলে বিরচিয়া নিশানা পথের ;
করিও না তুচ্ছ, এ যে ক্ষুদ্র যম নয়,
কাঁকরের কম্যুনিষ্ট, ষ্টীমের ষ্টালিন
ছোট বড় করে সব ধূলায় বিলীন ॥

আমার বন্দনা লহ গোষ্ঠী পরিচয়,
(চল যাই হে পাঠক সে নব 'ব্যাবেলে')
আজি তাহাদের দিব কোষ্ঠী পরিচয়।
(শুধু হাতে হে পাঠক এসোনা তা বলে)
পকেটে আফিঙ নিয়ো মাত্র ভরি ছয়
পাইবে তা-হ'লে অর্থ আবোল তাবোলে,

গোষ্ঠের বুঝিনু অর্থ গোষ্ঠীদের দেখি
ভাষাতত্ত্ব বিজ্ঞান যে! মিথ্যা হবে সে কি ॥

এ বিরাট গোষ্ঠে (নহে গোষ্ঠে বিরাটের)
বিশেষণে ফেলিওনা, বিশেষ্যের যূপে,
পাঁচটি পাণ্ডব, আহা, বঙ্গ সাহিত্যের
করিছে অজ্ঞাত বাস বৃহন্নলারূপে।
বঙ্গ ভাষা একমাত্র দ্রৌপদী এঁদের!
আর এক গুপ্ত কথা বলি চুপে চুপে
উঠিছেন এঁরা ক্রমে বাণীর পুরীতে
বাথরুম সংলগ্নিত পেঁচানো সিঁড়িতে ॥

জমিল বিরাট সভা, একদিকে পুং
মিহি-ম্যাজ্জা সভ্য যত 'ব্যাবেল'-বিলাসী,
বেদান্তের ব্রহ্ম সম প্রায় সে নপুং;
দক্ষিণে রূপের ইন্দ্র ধনুক বিকাশি',
উঠাইয়া গহনার ধ্বনি টুং টুং
ডলি, মলি, বেবি, বিবি, নাহি তার শেষ,
সকলেই 'মিস' বটে, একুনে 'মিসেস্'।

পুরুষ নারীর মাঝে ভেদ চিরন্তন;
সে ভেদ ঘুচিল বুঝি পানামা, স্নেয়েজে।
পুরুষে রাখিল চুল, মেয়েতে কর্ত্তন,
চমৎকৃত হ'য়ে দোঁহে ভাবিল স্বপ্ন এ যে!

দুজনের দেহ মিলি দোহারা গড়ন ;
ফলে উভয়ের দেহ পড়িল নুয়ে যে !
কেশে বেশে স্ত্রীপুরুষ চেনা নাহি যায়,
বিবাহটা আজকাল লটারির প্রায় ।

তাই সবে বসিয়াছে পৃথক আসনে
এক সাথে মিলে গেলে চেনা হবে দায় !
যাহারা কাটিল দৃঢ় প্রকৃতি বাঁধনে,
বত্রিশ ভাজার মত মিশে যদি যায়,
তাদের পৃথক বল করিবে কেমনে ।
যাই হোক বসে তারা কৃষ্টি-রচনায় !
কৃষ ধাতু হতে সৃষ্ট কৃষ্টি ও কর্ষন
প্রত্যয় না হয় দেখ, সাক্ষী ব্যাকরণ ।

দেখিল সকলে দূর জানালার ফাঁকে
বারুদ-বরণ মেঘে অলৌকিক নভে
পাখার চমক হানি ওড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে
পারাবত, মেঘ ছায়া নামিল নীরবে
কালিন্দীর কালো স্রোত তৃষিতের ডাকে ।
ভরি দিল কলিকাতা অপূর্ব্ব গৌরবে
মনে হ'ল এ নগর চিনি কি না চিনি
কবির কল্পনা লোক বুঝি উজ্জয়িনী ।

ধরণীর গগনের মেঘ পূর্ব্বরাগ ;
সে ধরা শিহরি ওঠে কেতকী কাঁটায় ;

মানস মন্দারে ও যে অপূর্ব্ব পরাগ,
বিবাহের শুভদৃষ্টি উহারি ছায়ায় ;
ও যে মূর্ত্ত বাসনার ব্যাকুল বেহাগ
বিদ্যুৎ বীণার তারে কাঁদিয়া ঘনায় ;
আকাশে উধাও ওই মালবিকা-মন
মুহূর্ত্তে জাগায় ভাব কদম্বের বন॥

আজ যদি কোনোখানে থাকে উজ্জয়িনী
তবে সে মেঘের ওই অকাল প্রদোষে ;
কোথাও থাকে রে যদি শিপ্রা-স্রোতস্বিনী
ক্বচিৎ-কল্লোল তার শোন কবি বসে'
আপন অন্তরে ; যেথা চির-প্রণয়িনী
মলিন উৎপল যার কান হ'তে খসে
ভেসে যায় স্রোত ভরে সাগরের পানে,
ওরে কবি বিকশিয়া তোল তারে গানে॥

না, না, সে কোথাও নাই, ছিলনা কখনো !
তবে কেন কালিদাস দিল নিশ্বাসিয়া
বিতানিত বাসনারে, যদি তাহা কোনো
দেশে কালে নারীনয়ে থাকিত মূর্ত্তিয়া,
তবে কি কবির চিত্তে বেদনার ব্রণ
অলক্ষ্য অদৃশ্য পানে উঠি উচ্ছ্বসিয়া—
মন্দাক্রান্তা মেঘদূতে ক্রৌঞ্চদ্বারে হায়
ছুটে যেত মানসোৎকা হাঁসের পাখায়।

যাহা নাই, নাহি ছিল কভু নাহি হবে
সেই দুরাশার লাগি কবির ক্রন্দন।
তোমাদের বাসনার সোনায় নীরবে
আমরা গড়িয়া তুলি ললিত কঙ্কণ!
তোমাদের যে-বেদনা কথা নাহি কবে
আমাদের হাতে পাবে সঙ্গীত আপন;
তোমাদের সুখ দুঃখ আছে প্রেম, আশা
আমাদের হাতে শুধু পায় তাহা ভাষা॥

আপনার শত্রু নিজে, এমন মানুষ
কেবল খুঁজিয়া পাবে শিল্পী ও কবিতে,
তারা যে তারকা নহে, কেবল ফানুষ
জীবন তাদের কাটে এতথ্য বুঝিতে।
অন্তরে কবিত্ব শস্য, বাহিরেতে তুষ।
নিজেরে মশাল ভাবি সর্ব্বাঙ্গে জ্বলিতে
ইচ্ছিয়া পুড়িয়া মরে, কপালের লিখা।
তাহারা প্রদীপ শুধু একদিকে শিখা॥

গল্পে-শোনা হংস সম শিল্পী ও কবিরা
দৈনিক পাড়িতে পারে এক স্বর্ণ ডিম!
যদি কোনো গৃহকর্ত্রী হইয়া অধীরা
পেট কাটে, ভাগ্যে তার কি দুঃখ অসীম।
শিশির বিন্দুরে যদি ভাবি কেহ হীরা,
বেগে পরশিতে যায়, বল ততঃ কিম!

কবিত্ব অপূর্ব্ব রত্ন, কবি সাধারণ
এই তত্ত্ব বুঝিবেনা, তাহাদের পণ ॥

তাই কেহ রাখে চুল, কদাচিৎ দাড়ি,
নাসায় (বেশর নহে) চশ্মা অলঙ্কৃত,
কাহারো কাপড় দেখে মনে হয় শাড়ি,
ক্ল্যারেট-কাজলে কারো আঁখি কলঙ্কিত,
ষ্টীল-নীল ভাষা কারো, ব্যাকরণে আড়ি
দুষ্ট বাংলায় কারো ইঙ্গ মলম্-কৃত।
বৈচিত্র্য এতই বেশি পা-মাথা ইস্তক
মনে হয় চলমান দাবার যে ছক্ ॥

হেন কালে উঠিলেন ত্র্যম্বক প্রসাদ
সাহিত্য প্রসঙ্গ আজ হবে আলোচনা—
আঙুলে চুরুট চাপা, ত্যজি অবসাদ ;
বঙ্গীয় ক্রিটিক মাঝে তিনি কালোসোনা।
(মিলের খাতিরে এটা), পুস্তক-ওস্তাদ
সহজে চিনিতে পারি মন্দ ভালো সোনা।
অনেক পাণ্ডিত্য তার খেয়াল ধ্রুপদ
শুধু স্থিরিবারে নারে নিজের দু'পদ ॥

"এরিস্টটল হ'তে আনন্দ, মম্মঠ
যা পড়েছি সার তার বলিব আজিকে ;

আজ কাল কুঁড়ে আমি, আছিনু কর্ম্মঠ,
দশটায় শয্যা ছাড়ি, ন' কড়ি পাজিকে
ডাক দিই, এর্লামটা বলে ওঠো ওঠো,
ভৃত্য আসে, বলি তারে ডাক দেরে ঝিকে
চা আন্, আসে চা, কভু সর্ব্বত বেলের
গ্রীকদের সাথে দ্বন্দ্ব কাণ্ট হেগেলের ॥

ট্র্যাজেডির তত্ত্ব নিয়ে বড় গণ্ডগোল ;
ন'কড়ি কাগজ আনে, কামাই দাড়িটা,
আমি বড় ভাল বাসি সাঁত্রাগাছি ওল ;
বদ্‌লাবো জুন মাসে পুরানো বাড়িটা,
ন'কড়িরে বলি বেটা চা-টেবিল তোল,
আনিস বাজার থেকে কলা আর রিঠা
শোনে বেটা চুপ করে, ঘর খানা মোছে,
হেগেলের ঠিক উল্টা বলেছেন ক্রোচে ॥

শিলারের রসতত্ত্ব বড়ই কঠিন ;
যাই হোক তারপরে কলেজেতে যাই,
মাঝে মাঝে খেতে মোরে হয় কুইনিন,
ভাদ্রমাসে সন্তানিবে মোর বুধি গাই ।
আমার বয়স হল সচল্লিশ তিন
পেন্সন ও পণ্ডিচারি কেবলই ধেয়াই ।
শয়নের পূর্ব্বে আমি ড্যাশ খাই নিত্য
লোকে যা বলুক, ভাই, এই তো সাহিত্য ॥"

নন্দন তত্ত্বের ব্যখ্যা করি গুটিগুটি
বসিলেন বারখানা রুমাল ভিজিয়ে
আগাগোড়া আছে সব দন্ত্য, মূর্দ্ধণ্য টি
আপন ব্যক্তিত্ব গেছে ফাওরূপে দিয়ে,
সরস্-বতীর চুলে আপনার ঝুঁটি
সুকৌশলে দিয়েছেন কেমন জড়িয়ে!
অর্পিত নন্দন তত্ত্বে ইহার জীবন
তাহার প্রমাণ আছে নয়টি নন্দন ॥

বীরবল শব্দটার করিব অন্বয়,
'যে বলে বীরের মত বীর বল সেকি?'
বোধ করি এ ব্যাখ্যাটা হইল অন্যায়,
'বলে যে বীরের মত!' ভেবে দেখ দেখি।
আর যদি ইহাতেও নাহি মন লয়
'বলেও না, বীর নহে, আগা গোড়া মেকি।'
'বলে যে বীরের মত, বলে যে বা বীর'
অদ্যাবধি নারিলাম করিবারে স্থির ॥

'তোমারি শিক্ষিত বিদ্যা দেখাব তোমাকে,
'পান' দোষ শিখায়েছ সাহিত্য জীবনে
সবুজ পত্রের মাঝে কটা তাজা থাকে;
এই প্রশ্ন জাগে, গুরু, সবুজের মনে।
সব যারা বুঝে তারা সবুজের ডাকে,
জুটেছিল পত্রে বহু সবাপির [illegible]।

অসংখ্য পাঠক ছিল, সংখ্যা নাহি তার
সম্পাদক, সহকারী, কম্‌পোজিটার ॥

আরে না, না, তুমি নহ ; তুমি যে শিক্ষক
তোমারে লইয়া ঠাট্টা করিব না আর।
পাঠশালা চাল লগ্ন তুমি টিকটক *
'হিউমার' জ্ঞানশূন্য, তুমি ছাত্র-মার।
টেকষ্ট বুক অরণ্যের বিষম তক্ষক
ধারে যদি নাহি কাটে আছে তব ভার।
পাঠশালা অর্থ কিবা বলিবে কি, রায়
যে শালায় পড়ায় কি, পড়ে যে শালায় !

পরস্ত্রীর পরিহাস, সে তোমার নহে ;
রাম, রাম, পরস্ত্রীতে করিবারে ভাব
যতটুকু বুদ্ধি লাগে, (লোকে তাই কহে)
তোমার ভাণ্ডারে তার একান্ত অভাব।
বড়লোক এ জগতে কত ঠাট্টা সহে,
ছোট লোক নিন্দা করে, কি ঘৃণ্য স্বভাব
তোমার বড়ত্ব দাদা, দেহ হতে সুরু,
ক্রমে হবে গুরুতর, এবে শুধু গুরু ॥

ভাষা সে বীণার মত, কবির পরশে
কোকিল-মুখর মত্ত বনানীর প্রায়—

* টিকটিকির পুংলিঙ্গে প্রয়োগ,

গানের অলকানন্দা ঝরাবে হরষে ;
মুলতান-আকুলিত সায়াহ্ন ছায়ায়
ব্যাকুল বকুল যথা পড়ে খসে খসে
ভাষার হৃদয় হ'তে তেমনি ধারায়
অপূর্ব্ব আবেগ ভরে উচ্ছ্বসিবে গান
কবি স্পর্শে জীবনিবে অহল্যা পাষাণ ॥

অভিধান-কুরুক্ষেত্রে যেন ঘটোৎকচ
তোমরা লেগেছ সবে কোমর কষিয়া,
বীণারে করিয়া গদা একি তছনছ,
প্রাচীন প্রাচীর সব চায় যে ধ্বসিয়া,
কি তাল বাজাও ওই শুধু খচমচ,
কাব্য কুরুকুল নাশো হঠাৎ শুইয়া !
মূক ভাষা তোমাদের বলেনা হদিস্,
তোমরা এপোলো নহ, হারকিউলিস্ ॥

মোটরে হয় না কবি, নহে দীর্ঘ কেশে,
ঠাকুর বাড়ীর সাথে সম্বন্ধেও নহে,
কখনো হয় কি কবি বারেক বিদেশে
ঘুরে এসে যদি কেহ মিষ্টি ভাষা কহে !
উর্ব্বশীর সাথে জুড়ে দিলে আর্টিমিসে,
সাঁতারিলে দোয়াতের শুষ্ক কালীদহে
কল্পনার কালীয় সে হয়না নীরব
হয় শুধু কলঙ্কিত সাহিত্যের স্তব ।

তোমাদের এক মাত্র আছে ধৈর্য্য-ধন
(ধীরতায় নাহি হয় কাব্যলক্ষ্মী বশ)
তার চেয়ে কর গিয়ে সহ-সন্তরণ,
শুধু সন্তরণ চেয়ে হবে তা সরস।
তা না পারো কর গিয়ে সহ-কণ্ডুয়ন,
সহ-সাহিত্যের চেয়ে হবে তা'তে যশ।
রাগিতেছ ? করিলাম নেহাৎ ডিফেম ?
সত্যি বল তোমাদের আছিল কি ফেম ?

নাহি তোমাদের মৃত্যু, ত্বদীয় খ্যাতির ;
ভবিষ্যৎ স্কলারেরা তোমাদের দেখে,
বলিবে—ধরেছি বিদ্যা বৃদ্ধ বাল্মীকির
কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডটা চুরি মোর কাব্য থেকে।
প্রমাণিবে, সেতুবন্ধ হ'ল 'লেক'টির,
বালীগঞ্জে জানকীরে এনেছিল রেখে।
তোমাদের নিয়ে হবে কত জোক মাপ,
খুঁজিলে দেখিতে পাবে কল্কে-পোড়া ছাপ॥

এমন সময়ে কহে আ'নষ্টিন বোস,
আজ আমি প্রমাণিব একটা থিওরি
বন্ধু ও বান্ধবী সব চুপ করে' বোসো ;
পরলোকে নিউটন উঠিবে শিহরি,
ম্যাক্সবেল, ফ্যারাডের, আরো রোসো, রোসো,
একটা গেলাস আনো, হায়রে শ্রীহরি ·

আসল কথাই আমি গিয়েছি ভুলিয়া
বাক্স থেকে আন দেখি ড্যাশটা খুলিয়া ॥"

"আঙুরের দেব   তোমারে সেলাম
বহুত বহু,
তোমার কাননে   আমরা এলাম
একশো সেলাম
বিরাট, লহু!
মদ সাগরের   বাষ্প-মেঘের
পুঞ্জে ওই,
দ্রাক্ষা গুচ্ছে   রয়েছে উচ্চে
কুঞ্জে ওই।
বদ্‌লেয়ারের   কবি-মানসের
কল্পনা ও
এনাক্রিয়নের   মধুক বনের
অল্প না ও।
কত হায় কবি   সহ বান্ধবী
ভুঞ্জে ওই,
বহু রাত্রির   তনু পাত্রীর
বক্ষ মহু;
আঙুরের দেব   তোমারে সেলাম
বহুত বহু।"

অতঃপর কথা মোর আসিল ফুরায়ে,
মোটরে উঠিল সবে জড়িয়ে জুড়িয়ে;

মৃদু সন্ধ্যা সমীরণে চাদর উড়ায়ে,
গড়ের মাঠের পথে ঘুরিতে ঘুরিতে
বাড়ীতে আসিল সবে আদর কুড়ায়ে ;
'হা হতোঽস্মি' বলে কেহ পড়িল সিঁড়িতে
বুঝিল সবাই ভুল হইয়াছে ভারি
পুরুষে পুরুষ জুড়ি, রমণীতে নারী ॥

মিশ্র প্রেমে একি হায় অমিশ্র প্রমাদ
অবিমিশ্র সুখ বল জীবনে কোথায় ?
মাঠ চষি কর যদি ধানের আবাদ,
সেখানেও মাঝে মাঝে আগাছা গজায় !
যাই হোক, তোমাদের দিনু ধন্যবাদ
তোমরা জীবন নাট্যে বিদূষক প্রায়।
সার্থক এ কাগজের নাম পরিচয়
নিজেদের স্বীকারোক্তি মিথ্যা কভু হয় ॥

পুরাতন বাঙ্গালা হইতে

তুলোট কাগজে খাতার আকারে বাঁধা একখানি নামগোত্রহীন পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। পুঁথিটি আকারে বৃহৎ নহে। ইহাতে কতকগুলি সংস্কৃত শ্লোক এবং তাহার পরে বঙ্গানুবাদ দেওয়া আছে। নিম্নে কতকগুলি শ্লোক এবং অনুবাদ সাধারণ পাঠকের অবগতির

জন্য ছাপাইয়া দেওয়া হইল। বলা বাহুল্য যে মূল সংস্কৃত শ্লোকগুলি অপপাঠে ও ভ্রমপ্রমাদে পূর্ণ। আমরা সেগুলির শুদ্ধ পাঠই দিয়াছি। বাঙ্গালা অনুবাদের প্রাঞ্জলতা ছাড়া অন্য গুণ কিছু নাই। অনুবাদ যথাসম্ভব মূলের অনুগত।

পুঁথিতে কোন তারিখ নাই। লিপি দৃষ্টে অনুমান হয় যে পুঁথিটি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষপাদে অথবা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম অংশে লিখিত হইয়াছিল। বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে লিখিত হওয়াও নেহাত অসম্ভব নহে।

নিম্নে যে ছয়টি শ্লোক দেওয়া গেল, তাহার মধ্যে প্রথম তিনটি সুবিখ্যাত উদ্ভট শ্লোক; শেষের শ্লোক তিনটী শ্রীরূপ গোস্বামীর উদ্ধব সংবাদ * হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে।

[মূল]

শ্লিষ্টঃ কণ্ঠে কিমিতি ন ময়া মুগ্ধয়া প্রাণনাথ
শ্চুম্বত্যস্মিন্ বদনবিনতি কিং কৃতা কিং ন দৃষ্টঃ।
নোক্তঃ কস্মাদিতি নববধূ চেষ্টিতং চিন্তয়ন্তী
পশ্চাত্তাপং বহতি তরুণী প্রেম্নি জাতে রসজ্ঞা॥

[অনুবাদ]

কেন হাম বন্ধুরে না দিলুঁ ভিড় কোল।
চুম্বিল আমারে যবে বয়ন না তোল॥
এ দুই নয়ান ভরি কেনে না হেরিলুঁ।
কেন বা তাহার বোলে উত্তর না দিলুঁ॥

* শ্লোক সংখ্যা যথাক্রমে ৩৬, ৪০, ৪১।

হেনমতে নববধূচেষ্টা মনে গুণি।
প্রেমের সঞ্চারে ঝুরে রসজ্ঞা তরুণী ॥

২

[মূল]

নবনখপদমঙ্গং গোপয়স্যংশুকেন
স্থগয়সি পুনরোষ্ঠং পাণিনা দন্তদষ্টম্।
প্রতিদিশমপরস্ত্রীসঙ্গশংসী বিসর্পন্
নবপরিমলগন্ধঃ কেন শক্যো বরীতুম্ ॥

[অনুবাদ]

প্রতি অঙ্গে সুবেকত নব নখরেহ।
নেত্তের বসনে কেন ঝাঁপয়সি দেহ ॥
দংশিত অধর ওষ্ঠ তাহে হায় দিঞা।
আবরণ কর বন্ধু মনে কি ভাবিঞা ॥
পরস্ত্রীর সঙ্গশংসী অঙ্গ পরিমল।
তাহে নিবারণ কর দেখি তব ছল ॥

৩

[মূল]

শুশ্রূষস্ব গুরূন্ নিবর্ত্তয় সখীর্বন্দস্ব বন্ধুস্ত্রিয়ঃ
কাবেরীতটসন্নিবিষ্ট নয়নে মুগ্ধে কিমুত্তাম্যসি।
আস্তে পুত্রি সমীপ এব ভবনাদেলালতালিঙ্গন-
স্কন্ধালতমালদন্তুরদরী তত্রাপি গোদাবরী ॥

[অনুবাদ]

সেবা কর গুরুজনে সখীগণে সম্ভাষণে
জ্ঞাতিস্ত্রীরে করহ বন্দন ।
কাবেরীর তটোপরি নয়ন নিবিষ্ট করি
অয়ি মুগ্ধে কি কর ভাবনা ॥
হে বৎসে সেথাও আছে তব ভবনের কাছে
এলালতা-আশ্লেষ-বিহ্বল ।
তমাল-দন্তুর-দরী অপরূপ গোদাবরী
না হও না হও উতরল ॥

৪

[মূল]

রেণুর্ণায়ং প্রসরতি গবাং ধূমধারা কৃশানো
বেণুর্ণায়ং গহনকুহরে কীচকো রোরবীতি ।
পশ্চেন্মত্তে রবিরভিষযৌ নাধুনাপি প্রতীচীং
মা চাঞ্চল্যং কলয় কুচয়োঃ পত্রবল্লীং তনোমি ॥

[অনুবাদ]

গো-খুরের রেণু নহে ধূমচক্রবাল ।
বেণুনাদ নহে ধ্বনি কীচক রসাল ॥
এখানে রবির গতি নহে ত প্রতীচী ।
না কর চাঞ্চল্য স্তনে পত্রবল্লী রচি ॥

৫

[মূল]

মা মন্দাক্ষং গুরুজনাদ্দেহলীং গেহমধ্যা
দেহি ক্লান্তা দিবসমখিলং হন্ত বিশ্লেষতোহসি ।

এষ স্মেরো মিলতি মৃদুলে বল্লীবীচিত্তহারী
হারী গুঞ্জাবলিভিরলিভির্লীঢ়গন্ধো মুকুন্দঃ ॥

[অনুবাদ]

না কর না কর লাজ গুরুজন হৈতে।
গৃহ মধ্য পরিহরি আইস দেহলীতে ॥
সকল দিবস গেল বিচ্ছেদে-আতুর !
ঝামর হইল দেহ বচনের দূর ॥
হের দেখ স্মেরমুখ গোপীচিত্তহারী।
অলিলীঢ় গন্ধমাল্য মিলয়ে মুরারি ॥

৬

[মূল]

শৌরী র্গোষ্ঠাঙ্গনমনুসরন্ শিঞ্জিতৈরেব মুগ্ধঃ
কিঙ্কিণ্যাস্তে পরিহর দৃশোস্তাণ্ডবং মণ্ডিতাঙ্গি।
আরাদ্গীতৈঃ কলপরিমিলন্মাধুরীকৈঃ কুরঙ্গে
লব্ধে সদ্যঃ সখি বিবশতাং বাগুরাং কস্তনোতি ॥

[অনুবাদ]

কিঙ্কিণীর কলধ্বনি মোহিল মুরারি।
নেত্রের তাণ্ডব ত্যজ অয়ি বরনারি ॥
কুরঙ্গ হইলে মুগ্ধ স্নিগ্ধকলগীতে।
না করে বিস্তার ব্যাধ জাল তার ভিতে ॥

অনুবাদ সহ বাকি শ্লোকগুলি পরে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

অসম্ভব কথা

রবীন্দ্রনাথের সুদীর্ঘ কবিতাগুলির স্বর-লিপি প্রস্তুত হইয়াছে; শুনা যাইতেছে গোরা ও ঘরে-বাইরের স্বরলিপিও শীঘ্রই প্রস্তুত হইবে।

—

স্যর পি. সি. রায় দিনে ও রাত্রে পাঁচবারের বেশি দাড়িতে হাত দেন না। দাড়িতে হাত দেওয়া বিলাসিতার নামান্তর।

—

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সন্দেশ খান না।

—

শ্রীযুক্ত বিধানচন্দ্র রায় ওস্তাদ রাখিয়া গান শিখিতেছেন। শীঘ্রই তিনি গান রেকর্ড করিতে পারিবেন বলিয়া আশা করেন।

—

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার সাঁতার শিখিবার জন্য ইংলণ্ডে যাইতেছেন। তিনি দুই বৎসর পরে ফিরিবেন।

—

সিনেট হাউস্-এ আগামী মাস হইতে সিনেমা দেখানো হইবে। অত বড় হল-ঘরে দৈনিক দুইশত টাকা আয় হইবার সম্ভাবনা।

—

মাতৃভাষায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা প্রচলিত হইলে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পশ্চিমমুখী প্রস্তর মূর্ত্তি পূর্ব্বমুখী হইবেন। কবে মাতৃভাষা শিক্ষার বাহন হইবে এই আশায় তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ চাহিয়া বসিয়া আছেন।

—

শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বাঘের চামড়ার 'স্যুট' অর্ডার দিয়াছেন। স্বর্গীয় আশুতোষ বেঙ্গল টাইগার নামে পরিচিত ছিলেন—পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিবার জন্য পুত্র এইরূপ মতলব করিয়াছেন।

—

মহাত্মা গান্ধীর রচিত অভিনব কাব্যগ্রন্থ "হরিজন" যন্ত্রস্থ। পূজার পূর্ব্বে বাহির হইবে না।

—

শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায় ছন্দ-প্রস্তুতের জন্য একটি কল আবিষ্কার করিয়াছেন। এই কলে পৃথক কাগজে এক একটি শব্দ লিখিয়া ছাড়িয়া দিলে শব্দগুলি প্রার্থিত ছন্দে আপনিই ভাগ হইয়া বাহির হইয়া আসে। মিলগুলি পরে জুড়িয়া দিতে হয়।

—

কতকগুলি অস্পৃশ্য লোককে এখনও স্পর্শ করা হয় নাই বলিয়া বিহারে বন্যা হইয়াছে। হরিজন ফাণ্ডে আর কিছু চাঁদা দিলেই বন্যা সরিয়া যাইবে।

—

বাঙালী বিদেশী সিগারেট বন্ধ করিয়া কেন বিড়ি খায় এবং দলবদ্ধ ভাবে বিড়ি ছাড়িয়া সিগারেট ধরে ইহার কারণ নির্ণয়ের জন্য গবেষণা চলিতেছে। পঁচিশ বৎসর পরে কারণ জানা যাইবে।

—

সম্প্রতি একপ্রকার আকাশযান নির্ম্মিত হইয়াছে; উহা বহুকাল নীচে না নামিয়া আকাশেই ভাসিয়া থাকিতে পারে। বঙ্গদেশের জনৈক বিখ্যাত ব্যক্তি এইরূপ একখানি আকাশযান কিনিতেছেন। ক্রেতার নাম জানা যাইতেছে না।

—

সিনেমায় চারি আনার টিকিটের জন্য বাঙালী ছেলেরা জানালা ধরিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঝুলিতে থাকে। "এনডিওরেন্স ঝোলা" নামে, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ছেলেদের সঙ্গে বাঙালী ছেলেদের এ বিষয়ে একটি প্রতিযোগিতা হইবে। বাঙালীর জয় হউক।

—

কলিকাতার একটি রাজপথের ধারে সর্ব্বদা লোকের ভীড় দেখা যায়। সেখানে আগামী বৎসর একটি সিনেমাগৃহ প্রস্তুত হইবে। জানা গেল উদ্বোধন-রজনীর প্রথম টিকিট কিনিবে বলিয়া এখন হইতেই সেখানে ভীড় জমিয়াছে।

—

কো-এডুকেশন প্রচলিত হওয়াতে অনেক বাঙালী ছাত্র ভ্যানিটি ব্যাগ ব্যবহার করিতেছে। ক্লাসে লেকচার শুনিতে শুনিতে দশ পনের মিনিট অন্তর একবার করিয়া মাথা নীচু করে—ফস্ করিয়া চিরুণী বাহির করিয়া চুল আঁচড়াইয়া লয়—এবং আঙুল ডুবাইয়া ছোট্ট শিশি হইতে স্নো বাহির করিয়া মুখে মাখে। ছাত্রীরা ইহাদের নাম দিয়াছে "চিরুনিয়া"। কোন্ কলেজে কত "চিরুনিয়া" আছে তাহার হিসাব শীঘ্রই বাহির হইবে। চিরুনিয়ার দল সাবধান।

—

"প্রথমা"র লেখক শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্র স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া গিরিডিতে চাষ আবাদের উপযুক্ত জমি পাওয়া যায় কিনা পরীক্ষা করিতে গিয়াছেন। পরীক্ষা করিতে কয়েক বৎসর লাগিবে। তিনি আর বাংলা দেশে ফিরিবেন কিনা সন্দেহ।

—

পথের পাঁচালির লেখক শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় স্পিরিচুয়্যাল ব্যাপারে তিন মাস অনাহারে থাকিবেন। এই সময়ে তাঁহার কোনো হিতৈষী তাঁহাকে আহারে প্রলুব্ধ করিবেন না।

—

J. GHOSH. M. A., PH. D.
Professor of Mathematics
Presidency College

26. 8. 1934.

'শনিবারের চিঠি'-সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,

গত শ্রাবণ-সংখ্যা শনিবারের চিঠিতে প্রথম প্রবন্ধটির মধ্যে পরলোকগত ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের "অভয়ের কথা"র উল্লেখ দেখিলাম। এই বইখানির সম্পূর্ণ নাম "অভয়ের কথা ও ঠাকুরাণীর কথা।" কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বইখানি কলেজ ষ্ট্রীটের ফুটপাথে কিনিয়াছিলাম। যাঁহারা ফুটপাথের পুরাতন বই ঘাঁটিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে অনেক সময়েই things are not what they seem. এক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছিল। বইখানির মলাট ছিল না। বিক্রেতা বইখানির উপরে অন্য একখানি কাগজ আঁটিয়া তাহার উপরে "ঠাকুরাণীর কথা" এই নামটি লিখিয়া রাখিয়াছিল এবং উক্ত ঠাকুরাণীর ফোটোর পরিবর্ত্তে একখানি অর্দ্ধবসনা রমণীর ছবি আঁটিয়া রাখিয়াছিল। ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোন রচনা পূর্ব্বে পড়ি নাই। কিন্তু রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর ভূমিকা দেখিয়া বইখানির উপর লোভ হইল।

পরব্রহ্মের Active Aspect-এর নাম "অভয়" এবং Passive Aspect-এর নাম "ঠাকুরাণী"। ক্ষেত্রবাবু নিজে বলিতেছেন, "গত ১৩২০ সালে মানসী পত্রিকায় 'আমি' নামধেয় সচ্চিদানন্দ অভয় ব্রহ্মের ওকালতী করিয়াছি। ব্রহ্ম মহাশয় নির্গুণ বলিয়া কিছুই পারিশ্রমিক দেন নাই; পারিতোষিক ত দূরের কথা। এবার ঠাকুরাণীর মনস্তুষ্টির চেষ্টা করিব।

"ঠাকুরাণীকে আপনারা সকলেই জানেন। নানা সুমধুর নামে ইনি আপনাকে প্রচার করিয়া রাখিয়াছেন; যথা—রস, আনন্দ, প্রীতি, পীরিতি, স্নেহ, আদর, সোহাগ, ভালবাসা। শ্রীরাধিকাই ইঁহার নেদিষ্ঠ নাম। এই নামে আহূত, নিমন্ত্রিত হইলে ইনি নিরতিশয় তুষ্টা হয়েন।"

নির্গুণ ব্রহ্ম এবং শ্রীরাধিকার আধ্যাত্মিক তত্ত্বটিকে সরস, প্রাণবান্ এবং মধুর ভাষায় এমন চমৎকার করিয়া প্রকাশ ও বিশ্লেষণ অতিশয় উপাদেয় মনে হইয়াছিল। একজন গণিতের অধ্যাপকের পক্ষে সহসা এরূপ নিগূঢ় জ্ঞানগর্ভ অথচ সরস রচনা ত্রিবেদী মহাশয়ের ন্যায় প্রবীণ ব্যক্তিকেও মুগ্ধ করিয়াছিল। আমি সাহিত্যিক নহি, বৈদান্তিকও নহি। সুতরাং ক্ষেত্রবাবুর উক্ত বইখানি সম্বন্ধে আমার প্রশংসা বা উচ্চ ধারণার কোন মূল্য আছে বলিয়া মনে করিতে সাহস হয় নাই। কিন্তু এতদিন পরে নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে আমার মত ও মনোভাব আপনার প্রবন্ধ-লেখকের সহিত মিলিয়া যাওয়ায় অতিশয় আনন্দ হইল। তাই পরিচয়ের অভাব-সত্ত্বেও এই কথা কয়টি লিখিলাম। আশা করি ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন।

জ্ঞান, বিজ্ঞান এবং সাহিত্যের মধ্যে আমাদের দেশে যে ব্যবধান বর্ত্তমান, তাহার অনেক কারণ আছে। সব কারণের আলোচনা সংক্ষেপে করা সম্ভব নহে। তবে একটি কারণ এই যে আমরা জ্ঞান, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতির অধ্যয়ন, অধ্যাপন এবং আলোচনা সবই বৈদেশিক ভাষায় করি। সুতরাং গল্প, উপন্যাস, কবিতা প্রভৃতির সীমা ছাড়াইলেই আমাদের আর মাতৃভাষায় কথা জোগায় না।

ভবদীয় শ্রীজ্যোতির্ম্ময় ঘোষ

সিনেমা দানব
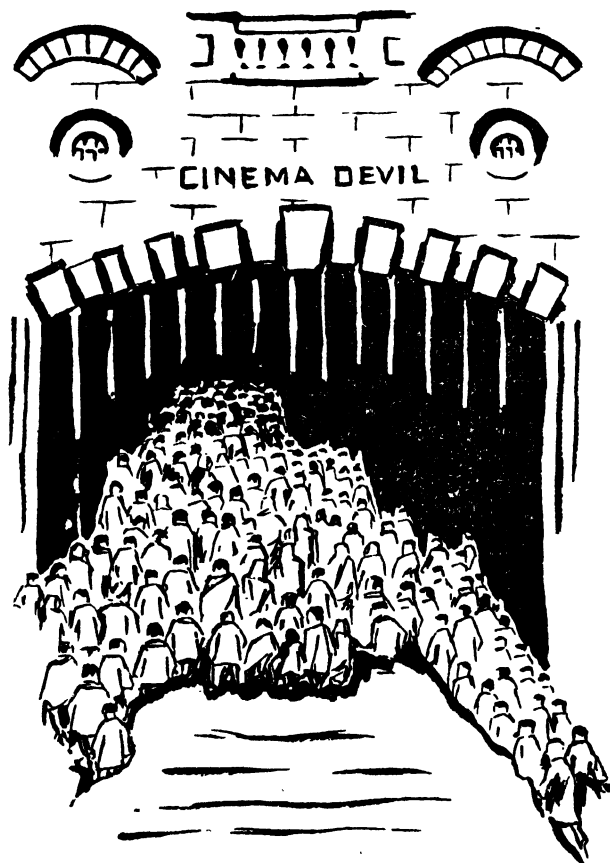
বঙ্গদেশকে গ্রাস করিতেছে

(প্রসঙ্গ-কথা দ্রষ্টব্য)

প্রসঙ্গ-কথা

সিনেমা ঘরের চারি আনা মূল্যের টিকিট অফিসের সম্মুখে শত শত লোককে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঝুলিয়া থাকিতে যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই জানেন সিনেমা-ব্যাধি এদেশে কি মারাত্মক ভাবে দেখা দিয়াছে। কিন্তু ইহার শেষ ফল কি দাঁড়াইবে তাহা বোধ হয় এখনো কেহ ভাবিয়া দেখিবার অবসর পান নাই। এক কলিকাতা শহরে প্রায় প্রতি মাসে নূতন নূতন সিনেমাগৃহ প্রস্তুত হইতেছে, এবং তথায় দিন রাত্রি ছবি দেখানো চলিতেছে। ব্যবসা হিসাবে সিনেমা যে একটি উৎকৃষ্ট বস্তু হইয়াছে এই সব নূতন পুরাতন সিনেমাগৃহই প্রতিদিন তাহার প্রমাণ দিতেছে।

—

জাতীয় জীবনে সিনেমার প্রভাব অসামান্য। উপযুক্ত সিনেমার সাহায্যে কোটি কোটি অশিক্ষিত নিরক্ষর লোককে অতি অল্প সময়ের মধ্যে সর্ব্ববিষয়ে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে পারা যায়। ইতিহাস, ভূগোল, স্বাস্থ্য, শিল্প, বিজ্ঞান যাহা স্কুল কলেজে শিখিতে জীবনের অর্দ্ধেক ব্যয়িত হয়—তাহা সিনেমার সাহায্যে অতি দ্রুত শিখানো যাইতে পারে। জ্ঞান বিস্তারের পক্ষে এত বড় শক্তিশালী উপায় আজ পর্য্যন্ত আর আবিষ্কৃত হয় নাই। ভারতবর্ষের মত এত বৃহৎ অশিক্ষিত এবং অর্দ্ধশিক্ষিত জনারণ্যকেও অল্প সময়ের মধ্যে ইহার সাহায্যে পুষ্পোদ্যানে পরিণত করা যাইতে পারে। এত বড় দেশের শিক্ষা-সমস্যা রাতারাতি ঘুচাইতে হইলে তাহাও সিনেমা ছাড়া আর কিছুতে সম্ভব নহে। অতীত ইতিহাসকে সর্ব্বাঙ্গীনভাবে জীবন্ত করিয়া তুলিতে, বিভিন্ন জাতির আচার ব্যবহার সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে, সুদূর দেশ

সমূহের নদ নদী অরণ্য পর্ব্বত কৃষি শিল্প ব্যবসা বাণিজ্যের জীবন্ত চিত্র দ্বারা ভূগোল শিক্ষা দিতে, সিনেমার তুল্য শিক্ষক আর নাই।

—

সমগ্র পৃথিবীর সমগ্র অংশের সকল বিষয়ের জ্ঞান লাভ ইহার সাহায্যে ঘরে বসিয়া করা যায়। কোথায় কি আছে, কোথায় কি হইতেছে, এবং কোথায় কি হইয়া গিয়াছে—সিনেমা সমস্তই দেখাইতে পারে। সিনেমার কাছে কিছুই মৃত নহে—অতীতও তাহার কাছে বর্ত্তমান। অণুবীক্ষণের জগৎ, দূরবীক্ষণের জগৎ, সমস্তই খোলা চোখে দেখিবার ব্যবস্থা এক সিনেমার দ্বরাই সম্ভব। সিনেমা এত বড় শক্তি। ইহার সাহায্যে বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত আদর্শ-জীবনের চিত্র অর্থাৎ যাহা আছে তাহা ছাড়াও, যাহা হওয়া উচিত তাহারও জীবন্ত চিত্র গড়িয়া তোলা যায়।

—

কিন্তু কি করিতে আমরা কি করিতেছি! সাধারণ চিত্রগৃহে শিক্ষাবিষয়ক চিত্রের স্থান অতি সামান্য। নাটকীয় চিত্রের সঙ্গে কখনো কখনো দুই এক রীল ভৌগলিক, ঐতিহাসিক বা বৈজ্ঞানিক চিত্র দেখানো হয়। ইহার কোনো চাহিদা নাই, ছবিগৃহের মালিকগণ দয়া করিয়া তাঁহাদের প্রোগ্রামের দৈর্ঘ্য ঠিক রাখিবার জন্য এই জাতীয় চিত্রের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। আসল চিত্রখানি ইয়াঙ্কি প্রেমের চিত্র হওয়া চাই—মাঝে মাঝে ভৌতিক চিত্র এবং অ্যাডভেঞ্চারও থাকে। একটি স্ত্রালোক লইয়া প্রণয়ীদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা অথবা একটি পুরুষের পিছনে একাধিক প্রণয়িনী। অভিনয় অনবদ্য—দেখিতে ভাল। য়ুরোপ অ্যামেরিকার ঐশ্বর্য্যবিলাস, তাহাদের প্রণয়ী-প্রণয়িনীর প্রেমের লীলা, তাহাদের অর্দ্ধ উলঙ্গ সুন্দরীদের নৃত্য—স্ত্রীপুরুষের অবাধ মেলামেশা—প্রেম লইয়া মারামারি কাটাকাটি। নায়ক, নায়িকাকে

যখন-তখন জড়াইয়া ধরিয়া প্রগাঢ় চুম্বন করিতেছে, স্ত্রী গোপনে প্রণয়ীর সঙ্গে স্বামীকে ফাঁকি দিবার মতলব আঁটিতেছে, মেয়ে-টাইপিষ্ট বা ঝি নায়িকার স্থান অধিকার করিতেছে, স্ত্রীলোকদের উলঙ্গ সন্তরণ, স্ত্রীলোক এবং মদ্যের মহোৎসব, তাহাদের অনাবৃত দেহের সৌন্দর্য্য-বিলাসে হাবুডুবু-খাওয়া যুবককুলের ছবি—ইহাই আমাদের দেশের লোককে উন্মাদ করিয়া তুলিয়াছে। এরূপ উন্মাদ, দেশের তরুণ তরুণীরা আর কিছুতে কখনো হয় নাই। আশ্চর্য্য এই, বালক বালিকারাও প্রতিদিন এই সব ছবিতে দলে দলে উপস্থিত হইতেছে।

—

সেদিন পাঁচ বৎসরের একটি বালিকা, নায়ক নায়িকার চুম্বন দৃশ্যে পার্শ্ববর্ত্তিনী দিদিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—"দিদি, লোকটা মেয়েটাকে কামড়াচ্ছে কেন?" দিদি ইহার কি উত্তর দিবে? অথচ ছোট ছোট ছেলেমেয়ে সঙ্গে না আনিলে নিজেদের এই সব লীলা-বিলাসের ছবি উপভোগ করা হয় না—জীবন ব্যর্থ হইয়া যায়। বাড়িতে ছোট ভাই বোনকে কাঁদাইয়া একা একা আসিতে বিবেকে বাধে।

—

এক সিনেমাই এদেশের সামাজিক জীবনে বিপ্লব আনিবে। সিনেমা-নায়কের মত আবেগে বুক উঠা-পড়া না করিলে স্বামীদের অবস্থা শোচনীয় হওয়া বিচিত্র নহে। স্ত্রী মনে করিবে শ্রেষ্ঠ ভালবাসা একমাত্র সিনেমাতেই সম্ভব। তাহার জীবনের স্বাদ চলিয়া যাইবে। কে জানে হয়ত ইতিমধ্যেই গরীব বাঙালীর সংসারে ট্র্যাজেডি আরম্ভ হইয়া গিয়াছে! য়ুরোপ আমেরিকায় যে হইয়াছে ইহা সে দেশের লোকে স্বীকার করিতেছে। ভাবিলে শঙ্কা হয়। তাহাদের নিজেদের সমাজের ছবি দেখিয়া তাহাদেরই মাথা খারাপ হইয়া যাইতেছে—

আমাদের পক্ষে ত উহা একেবারে মারাত্মক হইয়া উঠিবে। শহরে বাস করিয়া ক্লান্ত এবং পরিশ্রান্ত মনের পক্ষে একটু আনন্দ উপভোগ অনেকেরই দরকার। কিন্তু সত্যকার আনন্দ অথবা চিত্ত-রঞ্জন কি এই সব সিনেমাছবি দ্বারা হইতে পারে? ইহা মাদক সেবনেরই নামান্তর। স্ত্রীলোকের অর্দ্ধ নগ্ন দেহের অভিনয়—তাহার ঢং এবং ভঙ্গি যাহা আমাদের চোখে যথার্থই কুৎসিত, যে-কোনো দরিদ্র এবং কুলী-মজুর শ্রেণীর লোকের নিকট হইতেও পয়সা লুণ্ঠন করা যাইবে বলিয়া যাহা প্রস্তুত, আমাদের দেশের অন্তত বালক বালিকাদের তাহা কদাপি দেখা উচিত নহে।

—

সিনেমার বিজ্ঞাপন হিসাবে কয়েকখানা কাগজও আছে। তাহাতে প্রতি সপ্তাহে এইসব প্রায়-বিবস্ত্র অভিনেত্রীর একটি বা একাধিক ছবি ছাপা হয়। সাহস করিয়া বস্ত্র সরাইয়া ফেলাই যদি আর্ট হইত তাহা হইলে শিল্পীর পক্ষে সাধনার কোনো প্রয়োজনই হইত না। অভিনেত্রীরা ল্যাঙট পরিয়া দাঁড়াইলে অরসিকজনও মুহূর্ত্তকালের জন্য রসিক হইয়া উঠে, এবং বাজার খরচের পয়সায় টিকিট কিনিতে প্রলুব্ধ হয়। একই আর্ট, মুটে মজুর, কোকেন বিক্রেতা, গুণ্ডা এবং কোচম্যানদের সঙ্গে স্কুলের ছেলেমেয়ে এবং কলেজের ছাত্র-ছাত্রছাত্রীরা উপভোগ করিতেছে। আর্টের এরূপ সার্ব্বজনীনতা বড় ভয়ঙ্কর। সার্ব্বজনীন দেবতাপূজা চলিতে পারে, আর্টপূজা চলে না। এই কথাটা দেশবাসী একবার ভাবিয়া দেখিবেন।

———

"অস্মিন্ দেশে—"

তৃষ্ণায় ছাতি ফাটে—কই কোথা জল

কোথাও যে নাই জল-বিন্দু,

শূন্য যে খাল বিল শূন্য ইঁদারা কল

শূন্য যে নদী নদ সিন্ধু!

'সুজলা মোদের দেশ'

মুখস্থ ছিল বেশ

তৃষ্ণার বেলা দেখি সব জল নিঃশেষ!

আছে নাকি কিছু হায়

কাঁরমের বদনায়

আমারে দিবেনা, আমি হিন্দু!

২

দীঘি সে লজ্জাবতী পানার বোর্খা দিয়া

ঢাকিয়াছে ঘোলাটে সে রংকে,

কিন্তু তা' বলে' তা'রে ভেবোনা নিঠুর হিয়া,

শুনিয়াছি নাকি তার অঙ্কে—

মশকের 'লারভা'রা

পাইয়াছে ঠাঁই তারা;

পলাতক পিতামাতা, কচি কচি অনাথারা—
দীঘির অনাথালয়ে
উঠিতেছে বড় হয়ে
শ্যাওলার ঘন স্নেহ-পঙ্কে !

৩

বলেছিল দেশ নেতা—"কোথায় পাইবে জল ?
বড়লোকে শুষে নিল দেশটা,
সেমিজ, পাজামা ধুতি কাচিছে খুলিয়া কল !
কিছু যা-ও বাকী ছিল শেষটা—

শিশি হাতে ডাক্তার
এসে নিল ভাগ তার,
পুরাইতে বড় বড় ওষুধের দাগ তার !
রাস্তায় ঢালে জল
নহিলে 'কার' অচল,
চটে যায় বিষ্টু ও কেষ্টা !"

৪

গেলাম নেতার কাছে, কহিলাম "আসিয়াছি
হে দেবতা, বহু দুখ ভুঞ্জি'।
বাণী শুনে এতকাল বড় ভাল বাসিয়াছি
ওগো করুণার চেরাপুঞ্জী,

সুরু কর ধারা-পাত
সারাদিন সারারাত
তৃষ্ণায় ছাতি ফাটে কর কর দৃকপাত !
ভারতের গৌরব,
তুমি নাকি পার সব
এই কথা ক্রমাগত শুন্‌চি !"

কহিলেন নেতা হেসে—"ভাল করিয়াছ এসে
সত্যই বড় জলকষ্ট !
বরাবর বলিয়াছি ও পোড়া বাঙ্‌লা দেশে
সকলেই করে জল নষ্ট !

দেখিতেছি সত্যই
তুমি তৃষ্ণার্ত্তই
কিন্তু বাঙালী ভাই, মোর কাছে জল কই ?
অল্পই আছে যাহা
পারিব না দিতে তাহা
কারণটা বলি শোন পষ্ট ।

৬

হাড়িদের মেথরের বাগ্‌দি ও মুচিদের
গায়েতে হয়েছে এত গন্ধ
বুকে টেনে নিতে বাধে সাত্ত্বিক ও শুচিদের
রুমালেও করি নাক বন্ধ !

ময়লা যে চাপ চাপ
(—বিধাতার অভিশাপ !)
শপথ করেছি আমি করিবই তাহা সাফ,
আটা ও রুমাল বেচে
সাগর এনেছি সেচে
সাবানও জোটেনি কিছু মন্দ !

৭

আমার যা জল তাহা 'রিজার্ভ', পারি না দিতে
হে তৃষিত, করিও না দুঃখ ।
খেজুর পাইতে পার যদি তাহা চাও নিতে
হয় ত লাগিবে কিছু রুক্ষ !

খাও যদি খর্জ্জুরই
'রিলেটিভিটি'তে মুড়ি
বুঝিবে তখন তুমি কেউ নাই ওর জুড়ি !
বিশেষ তফাৎ নাই
জলে ও খেজুরে ভাই
চিন্তা করিয়া দেখ সূক্ষ্ম !"

৮

কহিলাম, "দাও দাও—জয় তব জয় হোক্
কোথায় খেজুর কই—কোনটা ?"
সত্য না স্বপ্ন এ ? ইহ না এ পরলোক ?
প্রলাপ কি বকিতেছে মনটা ?

—কিংবা এ শুধু তার
তৃষ্ণায় হাহাকার,
পিপাসার জল চায় বুকে বসি সাহারার!
সহসা আঁখির জল
ঝরিল অনর্গল
খেয়ে দেখি তা-ও হায় লোন্‌টা!

"বনফুল"

হংস দূত

বিশ্বনাথের একটি গুরুতর দোষ এই যে সে ঘুমন্ত অবস্থায় খাট হইতে গড়াইয়া মেঝেতে পড়িয়া যায়। কিন্তু ইহাতে সে এযাবৎকাল কোনো অসুবিধা ভোগ করে নাই, কারণ দেহ এবং বিছানার মধ্যে ছেদ পড়িলেও তাহার একটানা ঘুমের মধ্যে কোনো ছেদ পড়িত না। শীতকালের জন্য তাহার একটি ভারি ওজনের লেপ ছিল, কিন্তু একটু ঘুমাইয়া পড়িতেই সে লেপও তাহাকে চাপিয়া রাখিতে পারিত না; সে লেপের প্রভাব এড়াইয়া, হস্ত-মুষ্টি হইতে পারদবিন্দুর মত, বিছানা এবং লেপের ভিতর হইতে অবলীলাক্রমে গলিয়া নীচে আসিয়া পড়িত। এ সম্বন্ধে সে নিজে যে চিন্তা করে নাই তাহা নহে, সে বুঝিতে পারিয়াছে জাগরণ এবং সুপ্তির মধ্যে যে পার্থক্য, জাগরূক এবং সুপ্ত মানুষের মধ্যেও সেই পার্থক্য বর্ত্তমান। সুতরাং জাগ্রত অবস্থায় যদি লেপ দরকার

হয় এবং ঘুমন্ত অবস্থায় যদি লেপের দরকার না থাকে তাহা হইলে এ সম্বন্ধে কিছুই চিন্তা করিবার নাই।

এইরূপে জাগ্রত বিশ্বনাথ সুপ্ত বিশ্বনাথকে আন্তরিকতার সহিত ক্ষমা করিয়া বেশ আরামেই দিন কাটাইতেছিল, কিন্তু চৈত্র মাসের মাঝামাঝি একদিন সে সুপ্ত বিশ্বনাথের গলায় গামছা দিয়া তাহার নিশ্চিন্ত আরামের ভূমিশয্যা হইতে টানিয়া আনিয়া গুটিকতক শক্ত শক্ত প্রশ্ন করিয়া বসিল। সে সুপ্ত-বিশ্বনাথকে জিজ্ঞাসা করিল—বলি, উদ্দেশ্যটা কি? আজ যে বাঁ হাতখানা মচকাইয়া গেল, মাথায় চোট লাগিয়া রক্তপাত হইল ইহার ক্ষতিপূরণ কে করিবে? —নিদ্রিত বিশ্বনাথ ইহার কোনো সদুত্তর দিতে পারিল না। কাজেই বিশ্বনাথ নির্ব্বোধের মত খানিকটা হাসিয়া মাথায় টিংচার আইওডিন লাগাইল এবং হাতে ও মাথায় যথারীতি ব্যাণ্ডেজ বাঁধিল। না হাসিয়া বিশ্বনাথ কি করিবে? যদি সরলভাবে না পড়িয়া পড়াটা জটিল হইয়া হাত পা ভাঙে, অথবা ইহাতে ঘুম ছুটিয়া যায় তবে দোষ কাহাকে দিবে? জীবনে কত চৈত্রমাস আসিয়াছে, কিন্তু সে বয়স যে আর নাই।

রসায়ন শাস্ত্রে এম-এস-সি পড়িতে পড়িতে বিশ্বনাথ রসায়ন সম্বন্ধে মৌলিক চিন্তা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। কিছুদিন হইতে তাহার কেবলি মনে হইতেছে ঘুমটা একটা রাসায়নিক ব্যাপার, কিন্তু এ সম্বন্ধে সে কোনো কিছু পরীক্ষা করিয়া উঠিতে পারে নাই। এই চিন্তাটা মাথায় ঢুকিবার পর হইতে তাহার ঘুমের গভীরতা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কাজেই এখন খাট হইতে নীচে পড়াটা ঠিক আছে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সেই অচেতন নির্ব্বিকারত্বটি দূর হইয়া গিয়াছে। এমনি করিয়া মাসের পর মাস কাটিয়া যায়,

বিশ্বনাথ বাজার হইতে পাশ বালিস কিনিয়া আনে। একদিকে দেওয়াল, একদিকে পাশ বালিশ—মাঝখানে বিশ্বনাথ—বিশ্বনাথ আর পড়ে না।

ব্যক্তিগত অধঃপতন জাতিগত অধঃপতনের পূর্ব্বাভাষ, না জাতিগত অধঃপতনের ফলস্বরূপ তাহার এই অধঃপতন? ইহা সে deductive inductive দুই উপায়েই চিন্তা করিয়া দেখিল এবং বুঝিতে পারিল ইহার মূলে জাতিগত অধঃপতনের বীজ লুক্কায়িত রহিয়াছে। কিন্তু বুঝিয়াও নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না। তাহার ভাবনারাশি নানারূপ হাস্যকর পথে যাতায়াত করিতে চায়। ক্লান্ত মস্তিষ্ক আপন খেয়ালে স্বপ্ন-রচনা করে, বিজ্ঞান ছাড়িয়া সেটা প্রায় কাব্যের সীমায় চলিয়া আসে।

ঠিক এমনি একটি মুহূর্ত্তে বিশ্বনাথ তাহার বিছানায় শুইয়া বিশ্বরূপ দর্শন করিল। সে দেখিল তাহার খাট রীতিমত প্রশস্ত হইয়া উঠিয়াছে—পাশে স্ত্রী, তাহার পাশে অগণিত উদর এবং বক্ত্র, তাহারি মধ্যে বিশ্বনাথের যাবতীয় উপার্জ্জনের টাকা হু হু করিয়া ছুটিয়া চলিতেছে। রোধ করে এমন সাধ্য কাহারো নাই। বিশ্বনাথ এ দৃশ্য দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল।

সেদিন তাহার জীবনের একটি স্মরণীয় দিন। সে বুঝিতে পারিল তাহার জীবনের এক অধ্যায় শেষ হইয়া নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইবার মুখে আসিয়াছে। বিশ্বনাথ জাগতিক পরিবর্ত্তনকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করে। সে জানে এক একটি পরিবর্ত্তনের মূলে কতদিনের কত জটিল আয়োজন রহিয়াছে। সে তাহার বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া সকল জিনিসের উৎস দেখিতে পায়, কিন্তু সে দৃষ্টি সেইখানেই ফেলিয়া রাখেনা—সন্ধানী আলোর

মত তাহাকে সে ভবিষ্যতের ঘন অন্ধকারের দিকে চালনা করে।

বিশ্বনাথ সকাল হইতে বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছিল। প্রথমে সে সুদূর অতীতের দিকে চাহিল এবং সহস্র সহস্র বৎসর পার হইয়া Pliocene Pleistocene যুগে গিয়া দেখিতে পাইল, তখন মানুষ কেবল খাইতে শিখিয়াছে—কিন্তু চিন্তা করিতে শেখে নাই, তারপর যুগ যুগ ধরিয়া পরিবর্ত্তনের ধারা প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে। আজ মানুষ চিন্তা করিতে শিখিয়াছে কিন্তু খাইতে পায় না। কিন্তু খাইতে না পাওয়ার মধ্যে যে আনন্দ, খাইবার মধ্যে তাহা নাই। নাই বলিয়াই লোকে আজ হাজার রকম সমস্যার মীমাংসা করিবে বলিয়া উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। আজ কোনো সমস্যাই বিজ্ঞানের সমদৃষ্টিতে তুচ্ছ নহে। গাছ হইতে আপেলই পড়ুক কিংবা আকাশ হইতে বজ্রই পড়ুক দুইটি ঘটনারই কারণ-নির্ণয়ে বৈজ্ঞানিকের কৃতিত্ব। এই কারণেই বিশ্বনাথের খাট হইতে পড়িয়া যাওয়া বৈজ্ঞানিক জগতের বহুঘটনার মধ্যে অন্যতম ঘটনা হিসাবে গণ্য হইয়াছে।

বৈজ্ঞানিক-বিশ্বনাথ, আধুনিক কালের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাবান হইয়া পড়ায় অতীতের সঙ্গে সম্বন্ধ ত্যাগ করিতে চায়। অতীত কালে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া সে পিতামাতাকেও আন্তরিকভাবে শ্রদ্ধা করিতে পারে নাই। কিন্তু বাঙালী সংসারের সনাতন ইতিহাস নিজেকে বার বার একইরূপে প্রকাশ করিবার জন্য ব্যস্ত। কোনো বাঙালী-সন্তান যৌবনে পা দিবামাত্র প্রজাপতি নানা ছলে সেই সন্তানের অভিভাবকের চোখের সম্মুখে ফর্‌ফর্‌ করিয়া উড়িতে থাকে।

স্বয়ং মকরধ্বজও যৌবনকে সোজাসুজি আক্রমণ না করিয়া জরাগ্রস্ত অভিভাবককে আক্রমণ করেন, ফলে সন্তানের ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টিপাত না করিয়া অভিভাবক নিজের মতলব অনুযায়ী সন্তানের পাশে আর একটি নিরীহ মানবসন্তানকে আনিয়া দাঁড় করাইয়া দেন। সন্তান তখন অভিভাবককে শ্রদ্ধা করে।

কিন্তু এতকথা বলিবার প্রয়োজন নাই। একদিন ঘটক, পাঁজি, কোষ্ঠী এবং পিতার যোগাযোগে বিনা আড়ম্বরে বিশ্বনাথের বিবাহ হইয়া গেল। সত্য সত্যই তাহার খাট প্রশস্ত হইল এবং বধূ আসিয়া পাশ বালিসের স্থান অধিকার করিল। তারপর সে একটা গুরুতর গোলমালের ব্যাপার। বিশ্বনাথের মত বৈজ্ঞানিক মস্তিষ্কেও তাহার পারম্পের্য্যর ইতিহাস লিখিত হয় নাই। আকাশ বাতাস মধুরে মধুর, চারিদিক সঙ্গীতময়, বিশ্ব রঙীন, মনপ্রাণ অস্থির, মান অভিমান হাসি অশ্রুর লীলায় রাত্রিদিন ওতপ্রোত। নিঃশ্বাস টানিয়া সেটি ছাড়িতেই দেখা যায় একটি দিন নিশ্বাসের সঙ্গে চলিয়া গিয়াছে। দিন ও রাত্রি বিশ্বনাথের জীবন হইতে কে যেন সেকেণ্ডে একটি করিয়া খসাইয়া লইতেছে। কিন্তু সে দিকে লক্ষ্য করিবার অবসর কই? পাঠ্যপুস্তক হইতে বিজ্ঞানের যে সূত্রগুলি তাহার মস্তিষ্কে আসিয়া বাসা বাঁধিতেছিল, সেগুলি অসহায় ভাবে আবার পাঠ্য-পুস্তকে ফিরিয়া গিয়াছে। মাথার মধ্যে উচ্ছলিত যৌবন-নদী পাক খাইয়া খাইয়া বহিয়াযাইতেছে। দিন এবং রাত্রি এক হইয়া গিয়াছে। সময় যেন সঙ্গীতে রূপান্তরিত হইয়াছে, প্রতিদিনের সূর্য্য যেন সেই সঙ্গীতের একটি করিয়া মাত্রা। চারিদিকে কেবল রং আর রং! সহস্র রঙের আবর্ত্তে বন্‌বন্ করিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে বিশ্বনাথ দেখিতে পাইল বর্ত্তমানে দুইটি সন্তান (জমজ নহে) তাহাকে বাবা বলিয়া ডাকে।

যে-কোনো অপরিণামদর্শী যুবকের কাছে এই কালটা বড় ভয়ানক। কোমর একেবারে ভাঙিয়া পড়ে—বর্ষায় ভাঁটা পড়ে, দুইতীরের সকল জাঁক পাঁক হইয়া দেখা দেয়—চোখের, মনের, নেশা কাটিয়া যায়—যে ছিল সম্রাট তাহার সহসা যে-কোনো আপিসের কেরানী হইতে সাধ যায়।

বিশ্বনাথ এইরূপে এক ঝটকায় এক জন্ম পার হইয়া আসিল। প্রেয়সী যখন স্ত্রীর ধাপে নামিয়া যায় তখন আর যাহাই হউক তাহাকে সামনে বসাইয়া দুর্লভ মানবজীবনটা কাটাইয়া দেওয়া যায় না। বিশ্বনাথের জীবনে যখন রসায়ন সার্থকতা আনিয়া দিবে বলিয়া ভরসা দিয়াছিল ঠিক সেই মুহূর্ত্তে সেই রসায়ন রসে পরিণত হইয়া প্রথম-প্রেমের উত্তাপে একেবারে শুকাইয়া গেল, বিশ্বনাথের এক দেনা ছাড়া ডুবিবার আর কিছু অবশিষ্ট রহিল না। তখন পিতা বলিলেন—বাবা, যদি একবার দয়া করিয়া কিছু উপার্জ্জনের চেষ্টা দেখ তাহা হইলে কিছু সুবিধা হয়। স্ত্রী, স্বামীর অবস্থা দেখিয়া স্বরাজপার্টির কম্যুন্যাল অ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করার মত "রাখিতেও পারি না ছাড়িতেও পারি না" রূপ অবস্থায় পড়িল। বন্ধুরা বলিল, বেরিয়ে পড়—বেরিয়ে পড়। 'কুছ. পরোয়া নেহি' বলিয়া বিশ্বনাথ একদিন ঘরের বাহির হইয়া পড়িল।

বিশ্বনাথ গিয়া পড়িল কলিকাতার মেসে। চাকুরি খুঁজিতে হইবে। প্রতিদিন খবরের কাগজের "Wanted" কলম পড়িয়া অফিসে অফিসে ঘুরিতে হইবে। মনে হয় কাজটা অতি সহজ। মনে হয় যাহারা পাথর ভাঙে তাহাদের চেয়ে চাকুরি খুঁজিয়া বেড়ানো সহজ। মনে হয় যে খাইতে পায় না তাহার পক্ষে যে-কোনো কাজ করাই ত উচিত—অতএব যে-কোনো কাজই তাহার পক্ষে সম্ভব। বিশ্বনাথ

নিজেও এইরূপই চিন্তা করিল—কিন্তু কাজ যোগাড় করিতে পারিল না। খবরের কাগজে চাকুরির সংবাদ তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিল, সন্ধান পাইয়া অফিসের দ্বারে দ্বারে ঘুরিল, কিন্তু কিছুই হইল না। অবশেষে—

বিশ্বনাথ রাত্রে স্বপ্ন দেখিল। দেখিল সে যেন বন্দুক লইয়া অফিসের বড়বাবুদিগকে মারিতে যাইতেছে। ইহাদিগকে না মারিলে চাকুরি পাওয়া অসম্ভব। বিশ্বনাথ বন্দুক ঘাড়ে ময়দানে গিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে প্রায় পাঁচ হাজার বড়বাবু লাইন বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। চারিদিকে পুলিস পাহারা, পলাইবার উপায় নাই। ফোর্ট হইতে কামান গর্জ্জন হইল—এবং সঙ্গে সঙ্গে পাঁচ হাজার বড়বাবু কোটের বোতাম খুলিয়া ভুঁড়ি বাহির করিয়া দাঁড়াইলেন। এইবার গুলি ছুঁড়িবার পালা। বিশ্বনাথ বন্দুক লইয়া প্রথম ভুঁড়িটির দিকে লক্ষ্য করিল, কিন্তু তাহার বুক দুরু দুরু করিয়া উঠিল।— জীবনের প্রথম শিকার।—ঠিক যেন প্রথম প্রেম। বিশ্বনাথের সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। বিশ্বনাথ ঘামিয়া উঠিল। কিছুতেই গুলি করা হইল না। দেখিতে দেখিতে পাঁচ হাজার বড়বাবু পাঁচ হাজার হাঁসের মূর্ত্তি ধরিয়া শোঁ শোঁ শব্দ করিতে করিতে আকাশপথে উড়িয়া গেল। বিশ্বনাথ হতাশ হইয়া মাটিতে বসিয়া পড়িল। চারিদিক ফাঁকা—দেখা গেল শুধু একটিমাত্র হাঁস বিশ্বনাথের পায়ের কাছে বসিয়া কাতর দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া আছে। বিশ্বনাথ করুণায় আর্দ্র হইয়া বলিল—তোমার ঠিকানা বল।

হাঁস চারিদিকে চাহিয়া একটু কাসিয়া বলিতে লাগিল—প্যাঁক প্যাঁক প্যাঁক প্যাঁক প্যাঁক—আমার ঠিকানা কেয়ার-অব সরস্বতী—প্যাঁক প্যাঁক—তোমাকে উপদেশ দিতে চাই।—প্যাঁক প্যাঁক প্যাঁক

তুমি একখানা মাসিকপত্র বাহির কর—আর সব ভুলিয়া যাও সাহিত্য কর। প্যাঁক প্যাঁক। বিশেষনারী ত্যাগ করিয়া বিশ্বনারীর সন্ধান কর—প্যাঁক প্যাঁক। স্ত্রীলোক সম্বন্ধে কেচ্ছা ছাপাইতে থাক—প্যাঁক—খুব বিক্রি হইবে—প্যাঁক প্যাঁক তোমার দেশে মূর্খের অভাব নাই। তাহারা এই সব পড়িবে আর আনন্দে বত্রিশটি দাঁত বাহির করিয়া আর পাঁচজনের কাছে তোমাদের প্রশংসা করিয়া বেড়াইবে। প্যাঁক প্যাঁক প্যাঁক।

বিশ্বনাথ বলিল, তুমি সরস্বতীর হাঁস হইয়া এ ধরণের কথা বলিতেছ কেন? হাঁস বলিল, ক্রমবিবর্ত্তনে সরস্বতীর এই অবস্থা হইয়াছে। প্যাঁক প্যাঁক। পাবলিক ওপীনিয়ন যেদিকে সরস্বতী সেই দিকে চলিতে বাধ্য। প্যাঁক।

বিশ্বনাথ বলিল, পাবলিক ওপীনিয়ন তুমি কাহাকে বল? গোটাকত বয়াটে ছোকরার মতকে তোমরা পাবলিক ওপীনিয়ন বলিয়া মানিতেছ কেন? সরস্বতীর পক্ষে এরকম দুর্ব্বলতা ত কিছুতেই ক্ষমা করা যায় না।

হাঁস বলিল, মাইরি আর কি! তোমরা সরস্বতীকে কতটুকু খাতির কর? যাহারা সরস্বতীর দিকে বেশ একটু রঙীন দৃষ্টিতে তাকায় তাহাদের প্রতি সরস্বতীর একটু টান ত থাকিবেই—হাজার হইলেও স্ত্রীলোক ত! প্যাঁক।

বিশ্বনাথ উত্তেজিত হইয়া বলিল—বল কি! তাহা হইলে তোমার সঙ্গে তর্ক না করিয়া বরঞ্চ তোমার সরস্বতীর অ্যাডমায়ারারে-এর দলে নাম লেখাই।

হাঁস শুধু বলিল—প্যাঁক প্যাঁক প্যাঁক। তাহার পর ডানা বিস্তার করিল, তাহার পর উড়িয়া গেল।

বিশ্বনাথের তৎক্ষণাৎ ঘুম ভাঙিল না। সে সেদিন একটু অতিরিক্ত ঘুমাইয়া সকাল সাড়ে সাতটার সময় উঠিয়া বসিয়া একটা সিগারেট ধরাইয়া স্বপ্নের কথা ভাবিতে লাগিল।

রসায়ন হইতে সাহিত্যিক রসতত্ত্ব, একেবারে সমুদ্রে ঝাঁপ দেওয়া। হউক। বিশেষ-নারীকে ত্যাগ করিয়া বিশ্বনারীতে ঝাঁপাইয়া পড়ায় আর কিছু না হউক একটা নূতনত্ব হইবে। নূতনত্ব চাই। আর হাঁসের কথা যদি সত্য হয় তাহা হইলে শুধু নূতনত্ব নয়, পয়সাও হইতে পারে। বাঙালী-জীবনের কোনো উদ্দেশ্য নাই। বাংলা দেশ যেমন সমতল, বাংলার সৌন্দর্য্য যেমন একঘেয়ে, পাঁচ ক্রোশ পথ চলিতে যেখানে চোখ না খুলিলেও চলে সেখানে নূতনত্ব আনিতে হইবে একমাত্র কাঁচা খিস্তি দ্বারা। শারীরিক পরিশ্রম নাই, উচ্চে উঠিবার উচ্চতা নাই, বুকে হাঁটিয়া পাহাড়ে উঠিবার পাহাড় নাই, গরমে বাস করিয়া বরফের দেশে অভিযান করিবার মত শক্তি নাই, উত্তর মেরু দক্ষিণ মেরুতে যাইবার শিক্ষা নাই, তবে বাঙালী কি করিবে? করিবার মত একমাত্র কাজ উলঙ্গ হওয়া এবং সেই অবস্থায় সমাজের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়ানো। ছাপাখানা এ সুযোগ তাহাকে দিয়াছে। বিশ্বনাথও স্বপ্নাদেশে এ সুযোগ গ্রহণ করিল। বিশ্বনাথ গৃহত্যাগী হইয়া সাহিত্য-কর্ম্মে মনোনিবেশ করিল। সে বুঝিতে পারিল তাহার বৈজ্ঞানিক জ্ঞান যদি সাহিত্যের সঙ্গে যুক্ত হয় তাহা হইলে এক একটি বৈজ্ঞানিক তথ্য ভাঙিয়া শত শত গল্প ও কবিতা হইবে। গল্প ও কবিতার জন্য আর মানব সমাজের বা প্রকৃতি দেবীর সাহায্য লওয়া দরকার হইবে না।

বিশ্বনাথ তাহার মেস্‌-এর একটি ঘরের বাহিরে সাইনবোর্ড ঝুলাইয়া দিল। তাহার কাগজের নাম হইল "হংস-দূত"। স্বপ্নের হাঁসটাকে অমর করিবার কৌশল ইহার মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে। ইতিমধ্যে কিছু টাকা খরচ করিবার লোকও জুটিয়া গেল। যথাসময়ে রেজিস্ট্রেশন ডিক্লারেশন ইত্যাদি শেষ করিয়া বিশ্বনাথ ছোট একটি ব্যাগ হাতে পথে পথে ঘুরিয়া গ্রাহক এবং বিজ্ঞাপন সংগ্রহের কাজে লাগিল। ক্যানভাস্‌ করিবার কি অপূর্ব্ব ক্ষমতা! কথার তোড়ে ব্যবসায়ী ভুলিল, গ্রাহক ভুলিল। সকলেই বিজ্ঞাপন বা চাঁদার টাকা অগ্রিম দিয়া যথারীতি রসিদ গ্রহণ করিল। হংস-দূতের উদ্দেশ্য যে একেবারেই স্বতন্ত্র। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানে বিজ্ঞান চলিতে পারে, সাহিত্যিক জ্ঞানে সাহিত্য চলিতে পারে কিন্তু বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে ভিত্তি করিয়া এবং বৈজ্ঞানিক তথ্য ভাঙিয়া গল্প উপন্যাস এবং কবিতা এই প্রথম। খ-এর কথা চিন্তা করিলে ক-এর শিহরণ জাগে ইহা সাহিত্যের কথা। কিন্তু বিশ্বনাথের ভাষায় পরিবর্ত্তিত করিলে ব্যাপারটা দাঁড়ায় এই :—খ-কে চিন্তা করিলে ক-এর দেহে বিষাক্ত-দ্রব্যের আধিক্য ঘটে। এজন্য বাতাস হইতে বেশি বেশি অক্সিজেন সংগ্রহ করিয়া শিরা উপশিরার সাহায্যে সমস্ত শরীরে চালনা করিয়া দিবার প্রয়োজন হয়। হৃৎপিণ্ড এজন্য দুন্‌ চৌদুন্‌ মাত্রায় অক্সিজেন পাম্প করিতে থাকে। এইরূপে কিছুক্ষণ চলিলে অতিরিক্ত বিষাক্ত দ্রব্য অক্সিডাইজড হইয়া যায় এবং ক আরাম বোধ করে। প্রেমে পড়িলে হৃৎপিণ্ড যে লাফাইতে থাকে তাহার মূল কারণ ইহাই। সুতরাং হৃৎপিণ্ড লাফায় না বলিয়া উপরোক্ত বৈজ্ঞানিক বিবরণটি প্রকাশ করিলে বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগের মান বজায় থাকে। এই জাতীয় মৌলিক তত্ত্বোদ্‌ঘাটনে বিশ্বনাথের উপর বন্ধুবান্ধবের শ্রদ্ধা খুব বাড়িয়া গেল।

কিন্তু বিশ্বনাথ হৃৎপিণ্ডঘটিত যে তথ্যটি আবিষ্কার করিয়াছে তাহাতে রসায়নশাস্ত্রের বিশেষ কোনো হাত ছিল না। হাত ছিল ট্রাম কম্পানির। অল্পদিন হইল সে এস্‌প্ল্যানেড হইতে খিদিরপুর যাইবার পথে বুঝিয়াছে—পৃথিবীতে এরূপ সব অদ্ভুত অদ্ভুত শাস্ত্র আছে যাহা ফিজিক্স কেমিষ্ট্রি বটানির অনেক উর্দ্ধে—এবং তৎসম্পর্কিত জ্ঞান লাভ—চেষ্টা দ্বারা নহে, একমাত্র দৈবযোগেই ঘটিয়া থাকে। বিশ্বনাথ সমুদ্রেই ঝাঁপ দিয়াছে, এখন ডুবিয়াও যদি যায় তাহা হইলেও কিছু মুক্তা সংগ্রহ করিতে পারিবে—স্বপ্ন তাহাকে এই ভরসাই দিয়াছে।

ট্রামে এক একটি আসনে দুইজন বসিতে পারে; তাহার একটি আসনে একটি তরুণী বসিয়া, আর কোনো আসন খালি নাই। অনেক-গুলি ভদ্রলোক দাঁড়াইয়া আছেন। বিশ্বনাথও দাঁড়াইয়াই ছিল, কিন্তু ভাগ্য যখন সৌভাগ্যে পরিণত হয় তখন তাহার উপরে কাহারো হাত থাকে না। বিশ্বনাথ তরুণীটির অত্যন্ত কাছেই দাঁড়াইয়া ছিল—হঠাৎ শুনিতে পাইল—গভীর অন্ধকারে আলোর রেখার মত—মরুভূ-বক্ষে পান্থপাদপের মত—মেরুপ্রদেশের তুষার প্রান্তরে এক কাপ গরম চায়ের মত—আফ্রিকার জঙ্গলে অপরিচিত কণ্ঠে বাংলা গানের মত—কে তাহাকে সচকিত করিয়া বলিয়া উঠিল—বসুন, এই ত আসন খালি রহিয়াছে। বিশ্বনাথ তড়িতাহত হইয়া বসিয়া পড়িল। মনটা যদি দৃশ্য হইত তাহা হইলে এক গাড়ি যাত্রী দেখিতে পাইত বিশ্বনাথের চিন্তা-কেন্দ্রের অণুপরমাণুগুলি দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া আণবিক আকর্ষণ বিকর্ষণের ধারা অনুসরণ করিয়া কি কাণ্ডটাই না করিতেছে। তাহার দেহ মন উত্তপ্ত হইয়া উঠিল—বসিয়া বসিয়া বিশ্বনাথ অঝোরে ঘামিতে লাগিল। অজানার বক্ষে এই তাহার প্রথম লাফ—বেশ একটা উত্তেজক অভিজ্ঞতা।

বিশ্বনাথের খিদিরপুরে নামিবার কথা কিন্তু সে কখন বালীগঞ্জে চলিয়া আসিয়াছে তাহা বুঝিতেই পারে নাই। তরুণীটি যখন পার্কের কাছে নামিল তখন তাহার খেয়াল হইল সে কোথায় আসিয়া পড়িয়াছে! পূর্ণ জাগ্রত অবস্থায় বিশ্বনাথ জীবনে এই প্রথম দেখিল পনের মিনিট কেমন করিয়া এক সেকেণ্ডের রূপ ধরিয়া মানুষকে প্রতারণা করে।

জগদীশ বসু একাধারে বৈজ্ঞানিক এবং কবি। বিশ্বনাথও বুঝিল সে জগদীশ বসুর স্থলাভিষিক্ত। তাহার সার্থকতার পথ সে দেখিতে পাইল—বুঝিল তরুণীর পথ এবং তাহার পথ এক।

তরুণীটি যখন নামিবার জন্য আসন হইতে উঠিল তখন পথ ছাড়িয়া দিবার জন্য বিশ্বনাথকেও উঠিয়া দাঁড়াইতে হইল। দাঁড়াইবামাত্র বিশ্বনাথ তাহাকে নমস্কার করিল—সেও বিশ্বনাথকে প্রতিনমস্কার করিয়া নামিয়া গেল। বিশ্বনাথ আর স্থির থাকিতে পারিল না—সেও হঠাৎ চলন্ত ট্রাম হইতে লাফাইয়া পড়িল।

দুই খানা গাড়ি পর পর চলিয়া গেল। বিশ্বনাথ সেই চলমান মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া চাহিয়া তৃপ্তি পায় না। অনুসরণ করিবার সাহস নাই, বিশ্বনাথ নিজে কেন নামিল তাহাও বুঝিতে পারিতেছে না। কে এই তরুণী? এত লোক থাকিতে তাহাকেই সে পাশে বসিতে বলিল ইহার কি কোনো অর্থ নাই? অর্থ আছে বৈকি! মানুষের মনটা ত আর কেমিক্যাল ল্যাবরেটারি নয় যে টেষ্ট টিউবে ফেলিয়া সব বিচার করা যাইবে। তাহার ঐ একটি মাত্র কথার সূত্র ধরিয়া বিশ্বনাথ একটা মীমাংসার পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। সে হঠাৎ জগদীশ বসু হইতে শার্লক হোম্‌স্‌-এ রূপান্তরিত হইল। যে সূত্র সে আশ্রয় করিয়াছে, তাহাতে কিছুক্ষণ পরেই বুঝিতে পারিল, যাহা ঘটিয়া গিয়াছে সেটা একটা বৃহৎ ভবিষ্যতের শুভ সূত্রপাত।

বিশ্বনাথ চাঁদা আদায়ে অধিকতর মনোযোগী হইল। চাঁদা যাহা পূর্ব্বে আদায় হইয়াছিল এবং বর্ত্তমানে যাহা আদায় হইতেছে তাহার হিসাব রাখা আর সম্ভব হইল না। বিশ্বনাথ জীবনের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়াছে। হংস দূতকে স্মরণ করিয়া সে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল। তাহাকে শার্লক হোম্‌স্‌-এর রীতিতে অগ্রসর হইতে হইবে, ডাক্তার ওয়াট্‌সন না জুটিলেও ক্ষতি নাই।

বিশ্বনাথ শ্যামবাজার হইতে একটা আনুমানিক সময় ধরিয়া প্রত্যহ এসপ্ল্যানেড খিদিরপুরের পথে বালীগঞ্জে যাইতে লাগিল। বালীগঞ্জ পার্কের মধ্যে সে রোজ বিকালে বসিয়া থাকে—দিনের পর দিন কাটিয়া যায়—বিশ্বনাথের নিষ্ঠার ওজন কমে না। যখনি কোনো তরুণী বেঁটে ছাতা হাতে করিয়া ট্রামে উঠিতে আসে বিশ্বনাথও তৎক্ষণাৎ উঠিয়া গিয়া তাহার সঙ্গে ট্রামে চড়ে। দূর হইতে চেহারা লক্ষ্য করিতে পারে না। তাহার মনে হয় কোনো না কোনো দিন তাহার আকাঙ্ক্ষিত সেই বিশেষ তরুণীটি চলন্তিকা তরুণীদলের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিবে। এখন সে কোনো মেয়ের সঙ্গে ট্রামে উঠবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাহার মুখের দিকে তাকায় না। যদি সে না হয় তবে আগেই কেন সে ভুল ভাঙিবে। "ক্ষ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফেরে পরশ পাথর।" বিশ্বনাথও জনসমুদ্রের তীরে পাথর খুঁজিবার কাজে লাগিয়াছে, ইহার শেষ কোথায়? হে পাঠক, তোমাদের মধ্যে কেহ যদি বিশ্বনাথের মত কৃচ্ছ্রসাধনে নিযুক্ত থাক, তবে তাহাকে একটু অনুকম্পা করিও, আহা বেচারা এ পৃথিবীতে বড় একা।

অক্সিজেনের মণ্ডলে যখন কোনো জিনিস পুড়িতে থাকে তখন দোষ পড়ে আগুনের। আগুন ত যোগাযোগের একটা লিঙ্গমাত্র, স্ফুলিঙ্গও বটে। আগুন পোড়ায় না, পোড়ে বলিয়াই আগুন জ্বলে।

তাই আজ বিশ্বনাথ রসায়ন ভুলিয়া নিজের উত্তাপকে ক্ষমা করিতে পারিল না। বিশ্বনাথ ভাবিল, মেয়েরা যদি হয় অক্সিজেন আর পুরুষের হৃদয় যদি হয় কার্ব্বন তাহা হইলে হৃদয় পুড়িয়া ছাই হইয়া গেলেও অক্সিজেনের সঙ্গে তাহার কোনো সম্বন্ধ থাকে না। কিন্তু কেন? কেন লাভোয়াসিয়ের প্রিষ্টলি এ বিষয়ে নীরব? এই ধরণের নানারূপ চিন্তা করিতে বিশ্বনাথ ঘুমাইয়া পড়িল।

এক ঘণ্টা পর ঘুম হইতে উঠিয়া বিশ্বনাথ অনেকটা সুস্থ বোধ করিল। তাহার পর আস্তে আস্তে উঠিয়া পোষাক পরিয়া বালীগঞ্জের দিকে রওনা হইয়া গেল। পার্কের কাছে পৌঁছিতেই দেখে দূর হইতে একটি মেয়ে আসিতেছে। বিশ্বনাথ অভ্যাসমত অন্য দিকে চাহিয়া রহিল। দেখিল দুই দিকেই ট্রামের চিহ্ন নাই। ষ্টপের কাছে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইল—মেয়েটিও সেই দিকেই আসিতেছে। ট্রাম বহু দূরে দৃশ্য হইয়াছে, আসিতে একটু বিলম্ব আছে। বিশ্বনাথ ধৈর্য্য হারাইয়া দূর হইতেই মেয়েটির দিকে চাহিল—চাহিয়া চমকিয়া উঠিল। মনে হইল সে ইহারই জন্য এত দিন অপেক্ষা করিতেছে। ইহারই জন্য সে জীবনের গতির সঙ্গে ট্রামের গতিকে এক করিয়া ফেলিয়াছে। বিশ্বনাথ উন্মত্ত হইয়া উঠিল। সে কোথায় আছে ভুলিয়া গেল। আর তাহার দিকে তাকাইল না। বিশ্বনাথ অনুভবে বুঝিল মেয়েটি তাহার অতি কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সকল দেহে শিহরণ জাগিল। তাহার মন বলিতে লাগিল—হে দেবী আমার সাধনা কি আজ সফল হইল? বর পাইব বলিয়া কি মূর্ত্তি ধরিয়া আমার সম্মুখে আবির্ভূত হইলে? দেবী তুমি কেমিষ্ট্রি জান? প্রোটোনকে কেন্দ্র করিয়া ইলেক্ট্রন কি প্রচণ্ড গতিতে ঘুরিতেছে কিছু সন্ধান রাখ? কেমিক্যাল অ্যাফিনিটি বোঝ? অক্সিজেনের প্রতি সোডিয়াম পটাসিয়ামের যে

প্রাণান্তকর অ্যাফিনিটি রহিয়াছে তাহাতে দেখা যায় অক্সিজেন উক্ত ধাতুগুলাকে প্রায় হজম করিয়া ফেলে, দুইটিতে ফস করিয়া সংযোগ ঘটিয়া যায়, কাহাকেও আর চেনা যায় না। আমি শ্রীপটাসিয়াম পাল অ্যাফিনিটি অনুভব করিতেছি শ্রীমতী অক্সিজেন দেবীর প্রতি। তুমি সেই অক্সিজেন, কিন্তু আমাদের সংযোগ কই? হে আমার হৃদয় জগতের অ্যাট্‌মস্ফিয়ারবাসী অক্সিজেন, আমার থিওরি যদি মনঃপূত না হয় তাহা হইলে তাহার প্রতিবাদ কর।

মন এত কথা বলিল কিন্তু মুখ মূক হইয়াই রহিল। সে না পারিল তাকাইতে না পারিল কিছু বলিতে। কিন্তু কিছু না করিয়াও ত থাকা যায় না। ট্রামের কি হইল? কিছুতেই যেন কাছে আসে না! বিশ্বনাথ আর ধৈর্য্য রক্ষা করিতে পারিল না—একেবারে মরীয়া হইয়া ধরিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু হায়, যাহা প্রতিদিন হইতেছে আজও তাহার ব্যতিক্রম হইল না—তৃষ্ণার্ত্ত বিশ্বনাথ যাহা পাইল তাহা জল নহে, জলের আভাসও নহে, একেবারে পাঁক! হতবাক হতাশ বিশ্বনাথ মাটিতে বসিয়া পড়িল—আর তাহার সম্মুখে একটি অত্যাচারক্লিষ্ট স্ত্রীলোক পান চিবাইতে চিবাইতে তাহার দিকে কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল।

ট্রাম আসিল—ট্রাম চলিয়া গেল। স্ত্রীলোকটিও ট্রামে চলিয়া গেল—একক বিশ্বনাথ বসিয়া বসিয়া বালীগঞ্জের রাস্তার ঘাস ছিঁড়িতে লাগিল।

হংসদূত অফিসে বসিয়া বসিয়া বিশ্বনাথ হাঁসের ডিম আর চা খাইতেছে। চাঁদা ও বিজ্ঞাপনের টাকায় তাহার তিন মাসের মেস্ খরচ চলিয়াছে—হাতে সামান্য কিছু অবশিষ্ট আছে, আরো কিছু

দিন চলিবে। কাগজ কবে বাহির হইবে তাহা সে নিজেও জানে না—বাহিরে মুখ দেখানো তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। হিসাব পত্র বাহির করিয়া সমস্ত দিন ধরিয়া মিলাইয়া দেখিল একশত পঁচিশ টাকা আদায় হইয়াছে এবং বিশ্বনারীর সন্ধানে পূরা একশত টাকাই খরচ হইয়াছে। যে পঁচিশ টাকা অবশিষ্ট রহিয়াছে তাহার ভিতর তাহার বিশেষ-নারীকে অন্তত কুড়িটি টাকা না পাঠাইলেই নয়। কারণ, স্ত্রীর নিকট হইতে তিন মাসে অন্তত দশ খানা চিঠি আসিয়াছে, কিন্তু সে তাহার একখানারও উত্তর দেয় নাই। এত দিন পরে বিশ্বনাথ বুঝিল তাহার বিবেক বলিয়া বস্তুটির এখনো কিছু অবশিষ্ট রহিয়াছে। দুইটি সন্তান সহ স্ত্রী এবং বৃদ্ধ পিতাকে তাহার কিছু সাহায্য করা উচিত। বিবেকের এ আদেশ সে শিরোধার্য্য করিয়া যখন মনিঅর্ডার ফর্ম খানি লিখিয়া ফেলিল তখন তাহার আত্মা অনেকটা তৃপ্ত হইল। তৃপ্তির নিশ্বাসে সে বুঝিল জগতে কিছুরই মানে হয় না। কত বৈজ্ঞানিক থিওরি প্রতিদিন উলটিয়া যাইতেছে, বিজ্ঞান দর্শন এ সব কিছুই সত্য নহে। কোনো কিছুরই যে কোনো মানে নাই এ কথাটা বিশ্বনাথ অতি গভীর ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিল। তাহার প্রাণ মন উদাসীন হইয়া উঠিল—সন্ন্যাসী হইবার ভাব মনের মধ্যে ফুটিয়া উঠিল। সে সমস্ত রাত্রি জাগিয়া বহু পরিশ্রম করিয়া একটি গান রচনা করিল। গানটি আরম্ভ এই—

> ওরে ও মন শোন রে শোন
> এ জগতে সবই ফাঁকি,
> গ্যাস নিয়ে তুই ভরলি ঝুলি—
> সলিড্ যে তোর রইল বাকী।

একেবারে রাসায়নিক সঙ্গীত। গানের ছত্রে ছত্রে বিশ্বনাথের

মধ্যে বাউল জাগিতে লাগিল। সে গুন্ গুন্ করিয়া রাত্রি তিনটা পর্য্যন্ত অবিরাম গাহিয়া চলিল। আজ তাহার নব জাগরণ—অন্ধকার হইতে আলোয়, মৃত্যু হইতে অমৃতে। প্রেমের অনিবার্য্য পরিণতি বৈরাগ্য। পুরুষের মধ্যে যে বৈরাগ্য সুপ্ত থাকে—যে বৈরাগ্য পুরুষের জন্মগত সংস্কার—প্রেমের স্পর্শে সেই বৈরাগ্য জাগিয়া উঠে। এই জাগ্রত বৈরাগ্যের দুইটি রূপ আছে। প্রথম-রূপ এবং শেষ-রূপ। প্রথম-বিকার এবং শেষ-বিকার। কথাটা ব্যক্তিগত প্রেম সম্পর্কেও যেমন ভাবগত প্রেম সম্বন্ধেও তেমনি। বিশ্বনাথের প্রেমের মূলে ব্যক্তি ছিল মাত্র পনের মিনিট, ব্যক্তির ভাব ছিল তিন মাস। বৈরাগ্যের দুইটি রূপই বিশ্বনাথের মধ্যে জাগিয়াছে। ব্যক্তির স্পর্শে প্রথম—সংসারের উপর উদাসীনতা আসে। পরে যখন ব্যক্তি সরিয়া পড়ে তখন আসে নিজের জীবনের উপর। এই দুইটিই অমৃত-লোকের ঠিকানা বলিয়া দেয়।

বিশ্বনাথের যখন গান গাওয়া শেষ হইল তখন তাহার হাল্কা দেহ-মন ঘুমের আবেশে অচৈতন্য হইয়া পড়িল। নিদ্রিত অবস্থা কতক্ষণ স্থায়ী হইয়াছিল তাহা জানিবার পূর্ব্বেই বিশ্বনাথ দেখিতে পাইল সে খাটের উপর হইতে গড়াইয়া মেঝের উপর পড়িয়া গিয়াছে। মাথায় চোট লাগিয়া খানিকটা কাটিয়া গিয়াছে। স্থানটি দেখিতে দেখিতে অত্যন্ত ফুলিয়া উঠিল। কিন্তু বিশ্বনাথ ইহা গ্রাহ্যই করিল না। এতদিন পর খাট হইতে পড়িয়া যাইবার মধ্যে সে বিধাতার ইঙ্গিত প্রত্যক্ষ করিল। তাহাকে আবার সংসারে ফিরিতে হইবে—কিন্তু সংসারের প্রতি, মানুষের প্রতি তাহার যে মোহ ছিল তাহা ভাঙিয়া দিবার জন্যই বিধাতা তাহার নিকট হংসদূত প্রেরণ করিয়াছিলেন—তিনি কেবল একটি চাকুরির সন্ধান তাঁহাকে দিলেন না।

বিশ্বনাথ বেলা নয়টা পর্য্যন্ত যাহাদের নিকট হইতে হংসদূতের জন্ম অগ্রিম টাকা লইয়াছিল, তাহাদিগকে চিঠি লিখিল। লিখিল—পূর্ব্বে যাহা ভাবা যায় নাই এইরূপ একটি দুর্ঘটনায় হংসদূত প্রকাশ বন্ধ রহিল; যিনি যে টাকা দিয়াছেন তাহার যথারীতি রসিদ পাইয়াছেন। সেই রসিদ দেখাইলে ভবিষ্যতে কোনোদিন টাকা ফিরাইয়া দেওয়া হইবে। ইহা প্রতারণা নহে; ইহা বিশ্বাস করুন।

ইতি—বিনীত শ্রীবিশ্বনাথ পাল।

আর বিলম্ব নয়। আজই দেশে রওনা হইতে হইবে। মনিঅর্ডার ফর্ম্ম-খানির আর দরকার নাই। টাকা যাহা আছে মেস্-এর প্রাপ্য চুকাইয়া দিয়া সঙ্গে লইলেই চলিবে। বিশ্বনাথ বিছানাপত্র বাঁধিয়া ম্যানেজারের জিম্মায় রাখিল। পরে কখনো লইয়া যাইবে। সঙ্গে ছোট একটি ব্যাগ ছাড়া আর কিছু রহিল না। খাওয়া দাওয়া শেষ করিয়া বেলা একটায় বিশ্বনাথ ট্রামে উঠিয়া হাওড়া ষ্টেশনের পথে রওনা হইল।

বিশ্বনাথ আজ শরতের মেঘের মত হাল্কা মন লইয়া ট্রামে উঠিয়াছে—হাতের ব্যাগটিও হাল্কা। মনের উপর হইতে প্রচণ্ড বোঝা নামিয়া গিয়াছে। না নামিলে তাহার মনে গান জাগিত না। বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে সম্ভব না হইলেও বিশ্বনাথের পক্ষে বৈরাগ্যই মুক্তিরূপে দেখা দিয়াছে। সংসারের হিসাবনিকাশ অত্যন্ত ছোট হইয়া গিয়াছে—বিশ্বনাথ যেন বহুদূরে অবস্থিত কোনো গ্রহ হইতে ক্ষুদ্র পৃথিবী-বিন্দুকে দেখিতেছে। ট্রাম হ্যারিসন রোড জংশনে আসিতেই সে নামিয়া পড়িল—এখানে তাহাকে গাড়ি বদল করিয়া বাস্-এ উঠিতে হইবে। বাস্ প্রস্তুত—বিশ্বনাথ গিয়া বাস্-এ উঠিল। কিন্তু উঠিবামাত্র তাহার মাথা ঘুরিয়া গেল, সমস্ত শরীর ঝিম্ ঝিম্

করিয়া উঠিল, হঠাৎ তাহার রক্তের চাপ অত্যন্ত বাড়িয়া গেল। মনে হইল বাস ঘুরিতেছে, হ্যারিসন রোড ঘুরিতেছে, আকাশ ঘুরিতেছে। বিশ্বনাথ বাস্-এর আসনে বসিতে পারিল না, কাঁপিতে কাঁপিতে নীচেই বসিয়া পড়িল। দুইজন আরোহী তৎক্ষণাৎ তাহার হাত ধরিয়া উপরে বসাইয়া দিল। কিন্তু বিশ্বনাথ স্থির থাকিতে পারিল না—অস্ফুট স্বরে বলিতে লাগিল—আছে, আছে—এখনও আছে, কিছুই যায় নাই মোহ যায় না। বলিতে বলিতে তাহার কিছু শক্তি ফিরিয়া আসিল। যাহার জন্য সে সন্ন্যাসী হইয়াছে—সেই মূর্ত্তি তাহারই সম্মুখে! —বোধ হয় হাওড়া যাইতেছে। বিশ্বনাথ আর কথা বলিতে পারিল না—অতিরিক্ত বিস্ময়, হর্ষ এবং ঘটনার অভাবনীয়তায় সে বাস্ হইতে নামিয়া পড়িল। কেন নামিল, নামিয়া ভুল করিল,—এইরূপ সব অনুতাপ দুই মিনিট পরেই আরম্ভ হইল। কিন্তু আর উপায় নাই। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বিশ্বনাথ ইডেন গার্ডেনে গিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে একটি নিরিবিলি স্থানে ব্যাগটি নামাইয়া তাহাকেই বালিশ বানাইয়া সে একেবারে শুইয়া পড়িল। আবার খুঁজিতে হইবে। পরশ-পাথর-খোঁজা ক্ষ্যাপার কথা তাহার মনে পড়িল। কিন্তু উপায় কি? হায় হংসদূত! মেস্-এ ফিরিবার পথও তাহার বন্ধ। চিঠিগুলি ডাকে দেওয়া হইয়া গিয়াছে! কোথায় সে যাইবে? এত কাণ্ডের পরেও ত এ পৃথিবী ফাঁকি নয়! দুই ছত্র গান লিখিলেই সব মিথ্যা হইয়া যায় না। বরঞ্চ গানই মিথ্যা হইয়া যায়—মায়াময় মোহময় বিস্তীর্ণ পৃথিবী পড়িয়া থাকে। বিশ্বনাথ আর চিন্তা করিতে পারিল না—অবসাদগ্রস্ত মন লইয়া সেখানেই ঘুমাইয়া পড়িল।

ইহার পর ঘুমন্ত অবস্থায় তাহার ব্যাগটি চুরি হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু এ গল্পের পক্ষে তাহা নিতান্তই অনাবশ্যক।

ক্যালেণ্ডারের ট্র্যাজেডি

[সম্পাদক মহাশয়, গত সংখ্যায় আপনারা যে ক্যালেণ্ডারের ট্র্যাজেডি ছাপাইয়াছিলেন উহাতে অনেকগুলি মারাত্মক ভুল আছে। চন্দ্র গ্রহণের দিন পঞ্জিকায় যে সমস্ত গোলমাল হইয়াছিল বা হইতে পারিত তাহাই এই কবিতার প্রতিপাদ্য।—লেখক]

দুটি কানে নাড়া দিয়া সোম কয় বুধেরে
"তোমারে কিনিনু আমি পীরিতির সুদেরে!
আসল যা' তাতে হায় বাঁধা আছে দুনিয়া
জ্যোৎস্নার স্বপনেতে কত জাল বুনিয়া!"

মঙ্গল ভাবে—"বৃথা পাশাপাশি কাটিল—
বুধ-আশা-বুদ্বুদ নেহাৎই কি ফাটিল?
আশা কই? বুধ দেখি সোম রসে টলে গো!
Somnanbulism এরেই কি বলে গো?"

গুরু ক'ন, "মিছে নয় যাহা কিছু রটে গো
নচ্ছার শুক্রটা আছে সব ঘটে গো!"
শুক্র হাসিয়া কয়—"ব্যথা তব জানি রে,
কচ কি ভোলেনি আজও মোর দেবযানীরে?"

রবিরে মারিয়া খোঁচা শনি কয়—"Funny ত!
কই প্রভু ছাড়িলে না তুমি কোন বাণী ত?"

শেষ শ্রাদ্ধ

১৫

প্রায় মাসাধিক কাল গত হইয়াছে। এক দিন অপরাহ্ন বেলায় হরেন্দ্র আসিয়া হঠাৎ কমলের গায়ে একটা কাপড়ের পুঁটুলি ও এক তাড়া নোট ছুঁড়িয়া দিয়া বলিল, "আজ কালের মধ্যেই চাই কিন্তু, টাকাটা অগ্রিম দিয়েছে।" এইখানে একটি কথা বলিয়া রাখা প্রয়োজন। কাপড়ের কারিগর হিসাবে ইতিমধ্যে আগ্রা সহরে কমলের যথেষ্ট সুনাম বাহির হইয়া পড়িয়াছে। তাহার রোজগারও যথেষ্ট হইতেছিল না তাহা নহে, বস্তুতঃ সে মনে করিতেছিল তাহার ঘরেই দুই এক জন মুসলমান দর্জ্জি রাখিয়া ব্যবসা চালাইবে, দু' পাঁচজন ছোকরা-উমেদারও জুটিয়াছিল, কিন্তু কাহাকে ছাড়িয়া কাহাকে রাখিবে তাহা স্থির করিতে না পারিয়া আজকাল করিয়া কেবলই বিলম্ব করিতেছিল।

হরেন্দ্রের পুঁটুলি খুলিয়া কমল একটি দামী কাপড়ের থান ও পুরাতন পাঞ্জাবী একটি বাহির করিয়া জামাটি শুঁকিতে লাগিল। হরেন্দ্র ভাবিয়া পাইল না ইহার তাৎপর্য্য কি! কমলের একটি বিশেষ প্রতিভা ছিল যে-কোনো পুরুষমানুষের একটিবার সান্নিধ্যলাভ করিতে পারিলে তাহার জামার গন্ধ কমলের নাকে লাগিয়া থাকিত,—মানুষের মধ্যে এরূপ ঘ্রাণশক্তি বিরল। বস্তুতঃই সে পাঞ্জাবীটার এদিক ওদিক বিশেষ করিয়া শুঁকিয়া যেন কতকটা নিঃসন্দিগ্ধভাবে সেটি রাখিয়া দিল, তার পর হঠাৎ হি হি করিয়া হাসিয়া বলিল, "অজিতবাবু সৌখীন

মানুষ, তাঁর দামী কাপড়টা আমি নষ্ট করতে পারব না, আপনি বরঞ্চ এটা ফিরে নিয়ে যান।"

হরেন্দ্র আশ্চর্য্য হইয়া প্রশ্ন করিল, "কি করে জানলেন এটা অজিতবাবুর ?"

কমল দাঁত বাহির করিয়া বলিল, "আমি হাত গুণতে পারি।"

হরেন্দ্র অগত্যা স্বীকার করিল। কহিল, "সে কিন্তু বড় দুঃখ পাবে যদি আপনি ফিরিয়ে দেন। আশ্রমের ছেলেদের কাছে কালই সে বল্‌ছিল, তাদের অনেকে আপত্তি করেছিল যে ও কাপড় কমল কাটতে পারবে না, অজিত তর্ক করছিল, কেন এ ত আর সব সময় পরবার জন্য নয়। এক হাত ছোট আর এক হাত বড় হলেই বা যায় আসে কি ? এ শুধু জন্ম মৃত্যু শ্রাদ্ধ ইত্যাদি বিশেষ পর্ব্ব দিনে পরলেই চলবে, নচেৎ এ ত আমি ন্যাপথলিনের বড়ি দিয়ে ভাঁজ করে বাক্সে তুলে রাখব। ছেলেরা তখন স্বীকার করেছিল যে তা হ'লে হ'তে পারে। সত্যি বলচি, তার চেয়ে বেশী শ্রদ্ধা বোধ করি আপনাকে কেউ করে না।"

কমল বলিল, "তবু আমার রান্না খেয়ে তিনি সেদিন মাথা কামিয়ে বোষ্টম হয়েছিলেন! আমি কিন্তু জানতাম তাঁর গোটা মাথায় আবার চুল গজাবে, নচেৎ—", এই পর্য্যন্ত বলিয়াই সে অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া পড়িল। বলিল, "ছি ছি ও কি আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন যে, বসুন না।" ভাবের আবেগে সে নিজের মনেই কথা বলিতেছিল, এতক্ষণ লক্ষ্য করে নাই যে হরেন্দ্র একটি লাঠির উপর ভর করিয়া বাঁকিয়া দাঁড়াইয়া আছে। বসিবার দ্বিতীয় স্থানও ঘরে ছিল না, বিছানাটার উপর কচু বেগুণ পেঁয়াজ ছেঁড়া-কাপড় ইত্যাদি জমা হইয়া একটা বিশ্রী ব্যাপার হইয়াছিল। ঘরের মধ্যে আর একটি মাত্র স্থান জলচৌকিটি, তাহাতেই

উপর বসিয়া কমল সূচিকর্ম্ম করিতেছিল। অগত্যা হরেন্দ্রকে তাহারই এক পাশে বসিতে হইল, তবে পাশাপাশি বসিবার জায়গা না হওয়ায় পরস্পর পিছন ফিরিয়া বসিল, অর্থাৎ কেহ কাহারও মুখ দেখিতে পাইল না। তবে কথাবার্ত্তা বেশ চলিতে লাগিল, বস্তুতঃ মুখ না দেখিতে পাইলে কথা বলা হয় না, ইহা উভয়ের কেহই বিশ্বাস করিত না।

কমল পিছন হইতে হরেন্দ্রের উদ্দেশে বলিল, "এই যে কাছটিতে বসতে বলা উচিত ছিল অথচ তা বলিনি। আপনি নিজেও ত গোড়া থেকেই এমনি বসতে পারতেন, অথচ তা বসেন নি। এর থেকে সংসারে কত অনর্থপাতই না হয়, অথচ এইটিই লোকে সব চেয়ে ভোলে বেশী।"

হরেন্দ্র সম্মুখের কাষ্ঠ-সিন্দুকটাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "একি আমাকে বলচেন না আপনার সমুখের গাড়ুটাকে বলচেন?" সে ইতিপূর্ব্বেই দেখিয়াছে কমলের সামনে একটি খালি গাড়ু পড়িয়াছিল, 'যদি আমার জন্য হয় ত স্পষ্ট ভাষায় বলুন, ওসব হেঁয়ালি আমার মাথায় ঢুকছে না।"

কমল গাড়ুটার দিকে চাহিয়া বলিল, "হেঁয়ালিই বটে! সহজ সরল রাস্তা, মনে হচ্ছে যেন বেশ চোখ বুজে চলে' যাওয়া যায়, বাস্তবিক, খেয়ালের বশে গেছিও ত অনেকবার, কিন্তু পায়ে হোচটটি লাগলেই চৈতন্য জাগে—কেন পড়ে মরতে এমন চোখ বুজে চলবার খেয়াল হয়েছিল! এমনি করে' একদিন একজন বুড়ো ডিমওয়ালার ঘাড়ের উপর গিয়ে পড়েছিলাম। তার মাথায় ছিল ডিমের ঝুড়ি, সেও পড়ল উল্‌টে, আর আমিও ডিমের গাদার উপর একেবারে লেপটে গেলাম। তবে সেই দিন ঘরে এসে কাপড় নিংড়ে ত্রিভঙ্গবাবুকে ডিমের চপ রেঁধে খাইয়েছিলাম।"

"ত্রিভঙ্গবাবুটি আবার কে ?"

"শিবনাথের পূর্ব্বে তাঁরই কাছে ছিলাম। তিনি একজন পাটের দালাল, নাক দিয়ে এমন বাঁশী বাজাতে পারতেন দূর থেকে ক্লারিওনেট বলে ভ্রম হত! বড় দয়ার শরীর। আমাদের পাশের ঘরেই একজন সুবর্ণ বণিক সস্ত্রীক বাস করতেন একদিন রাত্রে মদ খেয়ে এসে পরিবারের পিঠে ও মাথায় তবলা বাজিয়ে বলেছিলেন, বেটি আমি ত সঙ্গৎ কচ্চি তুই একখানা গজল গা দিকি! ত্রিভঙ্গবাবুর আর সহ্য হ'ল না, সেই রাত্রেই মাতাল স্বামীকে হাতে পায়ে বেঁধে নীচের তলায় ফেলে দিলেন আর তার স্ত্রীর হাত ধরে অন্ধকারেই বেরিয়ে গেলেন।"

হরেন্দ্র কহিল, "আপনি বড্ড আধ্যাত্মিক হয়ে উঠছেন, কোথাকার কে ত্রিভঙ্গের কথা এনে ফেললেন!"

"শুধু ত্রিভঙ্গ কেন, বঙ্কিম, বদরুদ্দিন, নৃত্যগোপাল, ভাগ্যধর, শেখ কিনু সকলকার কথাই আজ মনে পড়চে। একটি ক্ষণও যে আনন্দ দিয়েচে তাকে আজ ভুলতে পারচি না!"

"রক্ষা করুন, এঁদের কাউকেই আমি চিনি না। যাদের চিনি তাদের কথা বলুন, যেমন শিবনাথ, অজিত, রাজেন। আমাকে বিশ্বাস করুন, আমি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করলেও প্রেমের গল্প শুনতে বড্ড ভালবাসি। আপনাকে আমি ঠকাবো না।"

"পরের প্রেমের কথা শুনে কি আপনার পেট ভরবে, নিজের ব্যবস্থা করেন না কেন ?"

হরেন্দ্র চুপি চুপি বলিল, "অক্ষয় যদি আনাচে কানাচে থাকে, শুনতে পেলে আমায় খেয়ে ফেলবে।"

কমল নিজ পৃষ্ঠদেশ দিয়া হরেন্দ্রের পৃষ্ঠ ঠেলিয়া দিয়া বলিল, 'না, বাবু না, আমিই আপনার একটা ব্যবস্থা করি, যদি বলেন।"

হরেন্দ্র অজিতের মুখে সে রাত্রির ব্যাপার শুনিয়াছিল, ষাঁড়ে ও বলদে যুদ্ধ না বাধিলে অজিতের রক্ষা পাওয়া দুরূহ ছিল। কথাটা ঘুরাইবার জন্য হরেন্দ্র বলিল, "রাজেনের খবরটা কি বলুন শুনি, কি করে' সে ছোঁড়াটার উপর এত টান হ'ল আপনার! আরও যে গণ্ডা গণ্ডা ভালো ক্যাণ্ডিডেট আছে, কাকে ছেড়ে কাকে প্রেফারেন্স দেবেন?"

কমল বলিল, "শুধু মুখে ব'ল্‌লেই ত হয়না হরেনবাবু, কে কেমন ক্যাণ্ডিডেট রীতিমত তাদের নিজেদের এসে যোগ্যতা প্রমাণ করা চাই। তা না হলে আমিই বা কেস্‌গুলো নিয়ে ডীল করি কি করে? আপনি সব্বাইকে ব'লবেন কেউ যেন লজ্জা না করে, অকপটে এসে নিজেদের মনের কথা জানায়। এতে লজ্জার কিছু নেই হরেনবাবু, কামনা করি নরনারীর এই পরিচয়ই যেন একদিন জগতে আলো বাতাসের মত সহজ হয়ে যায়।"

"আজ আপনার কি যে হয়েছে জানিনে, যা বলচেন সমস্তই দুর্ব্বোধ্য!"

কমল বলিতে যাইতেছিল, "এম্‌নিই হয়", কিন্তু দ্বারের নিকট হইতে কে যেন তাহার মুখের কথাটা কাড়িয়া লইয়া বলিল, "না, এমনিই হয় না, একজন ক্যাণ্ডিডেট স্বয়ং তার কেস প্রমাণ করতে রাজীর।" বিস্মিত হইয়া তাহারা দেখিল অজিত ঘরে ঢুকিতেছে। হরেন জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপার কি অজিত, এমন সময় কোত্থেকে?"

অজিত কহিল, "কি জানো হরেনদা জামাটা আমার দু' একদিনের মধ্যেই চাই তোমাকে ব'লতে ভুলে গেছলাম, তাই ভাবলাম একবার ঘুরেই আসি, তা বেরিয়েছি অনেকক্ষণ। পথে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম, যেতে যেতে দেখি একবারে পাগলা-গারদের সামনে!

মনে মনে কি যে বিড় বিড় করে বকছিলাম তা জানি না, যাই হোক গারদের পাহারা ব্যাটা ভাবলে বোধ করি ভিতর থেকে পালিয়ে এসেছি। ধরে নিয়ে গিয়ে আটকে রেখেছিল অনেকক্ষণ, দু' এক ঘা মেরেও দিয়েচে, অনেক কষ্টে বুঝিয়ে সুঝিয়ে কিছু দক্ষিণা দিয়ে তবে ছাড় পেয়েছি, উঃ পিঠটা বোধ করি ফুলে উঠেছে", এই বলিয়া সে পিঠের জামা তুলিয়া দু' তিন স্থানে সুস্পষ্ট প্রহারের চিহ্ন দেখাইল।

হরেন কহিল, "বিলক্ষণ! এতক্ষণ এঁর সঙ্গে ত তোমারই কথা হচ্ছিল, ভাগ্যে এসে পড়েচ, নইলে রাজেন ছোঁড়াটা প্রায় তোমাকে ডিস্‌পজেস্ করেছিল আর একটু হ'লে।"

কমল কহিল, "একবার যে ভুল করে অনুতাপে দগ্ধ হচ্ছি, তা যেন আর না ঘটে।" এই বলিয়া সে বাঁহাতের কনুই দিয়া হরেন্দ্রকে একটু ঠেলিয়া দিল। উদ্দেশ্য অজিতের জন্য একটু বসিবার জায়গা করিয়া দেওয়া। অজিত সেই চৌকিটির এক কোণে কোন প্রকারে আশ্রয় লইল। তবে এবার তিন জনে তিন মুখো হইয়া বসিল। খানিকক্ষণ কেহ কোন কথাবার্ত্তা বলিল না, এই ভাবেই কাটিল। তারপর নীরবতা ভঙ্গ করিয়া কমল হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "রাত্রি অনেক হ'ল, এখন একটা বিছানা পেতে দিই, দু'জনে শুয়ে পড়ুন।"

হরেন্দ্র বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিল, "এই ঘরে? কিন্তু আপনি?"

"আমিও এই খানেই আপনাদের কাছে শোব, আর ত ঘর নেই!"

এ যে কি প্রস্তাব হরেন্দ্র কল্পনাও করিতে পারিল না। তাহার বিমূঢ় ভাব লক্ষ্য করিয়া কমল উঠিয়া পড়িয়া এবং হরেন্দ্রের হাত ধরিয়া তাহাকে দরজার বাহিরে টানিয়া লইয়া গেল, বলিল, 'জানি, এ আপনার কর্ম্ম নয়, আপনার শুধু বদচিন্তাই মাথায় জাগচে। অথচ অজিতবাবুর হাতে এক খানি পাকপ্রণালী অথবা কবিরাজি ওষুধের

বিজ্ঞাপন দিলে তাই নিয়ে সারা রাত্রি অনায়াসে কাটিয়ে দেবেন, পাশে মানুষ শুয়ে আছে কি মহিষ শুয়ে আছে একবার ভাবতেও সময় পাবেন না। ওইখানেই মানুষে মানুষে তফাৎ হরেনবাবু, আপনি বরঞ্চ বাড়ী ফিরে যান।” ফিরিয়া সশব্দে হরেনের মুখের উপরই দরজাটা বন্ধ করিয়া কমল খিল আঁটিয়া দিল। হরেন্দ্র কিছুক্ষণ অন্ধকারে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর সিঁড়ির দরজা কল্পনা করিয়া যেখানটিতে প্রবেশ করিল তাহা একটি গারদহীন জানালা, নীচেই খোলার চাল এবং তন্নিম্নে সরকারি রাস্তা। হরেন্দ্র লাফাইয়া খোলার চালের উপর পড়িতেই তাহা মড় মড় করিয়া উঠিল এবং সে গড়াইয়া রাস্তার উপর পড়িয়া গেল, সেখান হইতে হাকিয়া বলিল, “আলোটি ধর হে অজিত হাড়গোড় সব ভেঙে চুরমার হয়ে গেল।” অজিত উঠিবার উপক্রম করিতেই কমল তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল—“তুমি যেতে পাবে না, কেমন যাও ত দেখি!” অজিত অসহায়ভাবে বসিয়া রহিল, হরেন্দ্র খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে প্রস্থান করিল, প্রদীপের স্বল্পালোকে অজিতের দিকে কমলের দুই চক্ষু দু’টি দমের বিড়ির ন্যায় জ্বলিতে লাগিল। অজিত অল্পকাল চুপচাপ থাকিয়া বলিল, “কিছু খেয়ে আসা হয়নি, দু’টো ভাতে ভাত ফুটিয়ে দিতে পারেন?”

কমল শ্লেষপূর্ণ কণ্ঠে বক্রোক্তি করিল, “গোঁসাইজীর জাত যাবে না?” “দুৎ, আপনি ভারী দুষ্ট!” “কেন দুষ্ট কিসের! এই সেদিন গাড়ীর মধ্যে চেপে ধরে বললেন কমল তুমি রাজি? আমি বললাম আমিই কি গররাজি! সে কথা যাক্, আমি ত আর বোষ্টমী নই যে পাকা জাত বোষ্টমের পাতে ভাত দেব।”

অজিত হঠাৎ অস্বাভাবিক আগ্রহের সহিত বলিল, “হতে পারেন না কি কোন দিন? সত্যি বলুন না, হতে পারেন না—যা বললেন?”

"বলেছিলেন কি কখনও ?" বলিতে বলিতে কমলের কণ্ঠস্বর ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল, "কোনদিন বলেছিলেন কি যে কমল তুমি বোষ্টমী হবে ? হই কি না হই দেখতেন ! বরং পূর্ব্বে ডাকতেন তুমি বলে, এখন বলচেন 'আপনি', কি অপরাধ করেচি আমি ?"

উদ্যত অশ্রু গোপন করিবার জন্যও বটে, তাছাড়া দরকার বলিয়াও বটে, কমল ষ্টোভটা জ্বালিয়া কি একটা তাহাতে চড়াইয়া দিয়া বলিল, "লোকের মুখে শুনি আপনার কত টাকা ! কিন্তু এ ক'দিন একরকম আধপেটা খেয়েই রয়েছি, কারো হাতে দু'চার আনা পাঠিয়ে দিয়েচেন কি ?" তারপর কি একটা নামাইয়া আবার কি একটা ষ্টোভে চড়াইয়া বলিতে লাগিল, "একটা হাত ত গেছে, আর একটাই বা যেতে কতক্ষণ! শেষেকি না খেতে পেয়ে মারা পড়ব ? রাজরাণী হওয়া যার সাজে তার এই উঞ্ছবৃত্তি আর সকলে দেখুক, আপনি দেখছেন কি করে ?"

এ প্রশ্নের জবাব আসিল না, বোধ করি অত্যন্ত কঠিন বলিয়াই। কিই বা রান্না! উচ্ছেভাতে ভাত, শেষ হইতে বিলম্ব হইল না। আহারান্তে কমল অজিতকে প্রশ্ন করিল, "একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, আশ্রমে ঢুকতে আপনাকে যুক্তি দিলে কে ?"

"হরেনদা। ভারতবর্ষের ধর্ম্ম ও সমাজ না হলে রক্ষা হয় কি করে ? আমাদের মত ব্রহ্মচারী, ব্রতধারী নিষ্কলুষ যুবকেরা…" কমল হঠাৎ তাহার আঁচলটা অজিতের উচ্ছিষ্ট মুখেই গুঁজিয়া দিয়া কহিল, "চুপ্ চুপ্, হাতমুখ ধুয়ে শুয়ে পড়ুন, আর না।"

"কিন্তু আমাকে ত আশ্রমে ফিরে যেতে হবে এখুনি, ব্রহ্মচারীদের বাইরে থাকা নিষেধ।"

"না, হবে না। আজ এখানেই শুতে হবে। অনেক কথা আছে।"

"কিন্তু তুমি খাবে না ?"

"আমার প্রথম স্বামী মরবার পর থেকে কি দু'বেলা খাই, যে আজ খাব ?"

অজিত আর কথা বলিল না। হাতমুখ ধুইয়া আসিয়া কমলের স্বহস্তরচিত শয্যার উপর বসিয়া দেখিল বালিশের ওয়াড়ে একটি উড়ন্ত হাঁস আঁকা রহিয়াছে। নিবিষ্ট চিত্তে তাহাই দেখিয়া একটি অজ্ঞাত প্রীতিরসে তাহার চিত্ত সিক্ত হইয়া উঠিতেছিল, এমন সময় থালাবাটি ধুইয়া কমল ঘরে প্রবেশ করিয়া কহিল, "কি দেখছেন ? ওই কাজটুকু ! ও শুধু আপনার জন্যেই করেছিলাম। না না, অপর কেহ যে বিছানায় শুয়েছে, তা আপনাকে দিতে পারি না। এ শুধু আপনি আসবেন বলে ; যেদিন তাজমহলের সমুখে প্রথম দেখা হয় ভেবেছিলাম, আসবেনই একদিন, তাই রাত জেগে ঐ কাজটুকু করেছিলাম। শিবনাথ দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন ; আমি বলেছিলাম এ তাঁরই জন্য, কিন্তু মাইরী বলচি শিবনাথের পুরানো পিরীতের জন্য আমার বয়ে গেছল রাত জাগতে।"

অজিত কথা কহিল না, শুধু একটা আরক্ত আভা তাহার মুখের পরে দেখা দিয়া চক্ষের নিমেষে নিভিয়া গেল। কমল বলিল, "কথা কইছেন না যে ?"

"না।"

"তার কারণ ?

"কারণ, যেমন শিবনাথকে লুকিয়ে আমার জন্য হাঁসটি এঁকেছ, আমাকে লুকিয়ে হয় ত আবার কারও জন্য একটি বক আঁকবে !"

"সেটা খুবই স্বাভাবিক, কিন্তু আজকের ওই হাঁস আঁকাও যেমনি

সত্যি, সেদিনকার বক আঁকাও তেমনি সত্যি হবে। যতদিন কাছে থাকব, ঐ শিক্ষাটিই দিয়ে যাব।"

অজিত বলিতে যাইতেছিল, "শুধু বক কেন, হয় ত কত পাখীই আঁকতে হবে, শেষে চামচিকাটি পর্য্যন্ত," কিন্তু কমল বাধা দিয়া বলিল, "কামনা করি, নরনারীর এই পরিচয়টাই জলের মত স্বচ্ছ, বাতাসের মত হাল্কা এবং তেলের ধারার মত তরল ও অবিচ্ছিন্ন হয়ে থাক।"

অজিত নিঃশব্দে তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া দেখিল। কথা কহিল না। তবে গম্ভীর হইয়া বসিয়া থাকার জন্য তাহার মুখটা কতকটা পেঁচার ন্যায় হইয়া উঠিয়াছে দেখিয়া কমল ভাবিতেছিল, না জানি ইহা কোন্ ভবিষ্য দিনের শুভকর্ম্মের সূচনা করিতেছে। সেও কোন কথা বলিল না, শুধু ধীরে ধীরে অজিতের মাথায় আঙুল চালাইতে লাগিল। তাহাতে আরাম পাইয়া অজিত কতক্ষণ তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল বলা যায় না, কিন্তু কমল তাহার চুল ধরিয়া টানিতেই সে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল।

কমল বলিল, "শেষ পহরের মুর্গী ডাকছে ভোর হল বোধ করি।"

"হুঁ, আর ঘুমোবার সময় নেই, বোধ করি উঠে পড়াই ভাল।"

(ক্রমশঃ)

—পূর্ণগ্রাস

On the bulletin board of a ladies' college an instructress in astronomy had posted a notice that read: "Anyone wishing to look at Venus, please see me".

গাব আমরণ

“আমি　গা’ব আমরণ মহা সঙ্গীত।”
ওই　ক্রন্দিছে দর্দ্দুর, “বাকি আর কদ্দুর
　গর্জ্জিতে সুদীপ্ত “বৃংহিত” ?
ছিনু　ঘুমিয়ে,—
ও কে　চুমিয়ে
দিল　সুপ্তি মৃত্যুসম দূরিয়া,
দিল　কণ্ঠের গুণ্ঠন পুড়িয়া ;—
নিয়ে　ছটাক ভস্ম তার, কোকিল-পুরীষ আর
　ব্রাহ্মী হবির সনে চাটিনু।
ফলেঃ　দ্বিধালু চরণে থপথপিয়া
নাদি　কট্‌কট্‌ শ্রীল নাম জপিয়া—
এবে　ক্রন্দি না আমি আর
　ক্রন্দিছে সবে আর—
　কর্ণ-কুহর মরি সঁপিয়া।

“নব জাগরণ” (শ্রীদিলীপকুমার রায় বিচিত্রা, আষাঢ়, ১৩৪১)-এর অনুভাবে।

—শ্রীল উৎকেন্দ্র শর্ম্মা

বৃহৎ ঠুংরী-গজলান্তক রসায়ণ
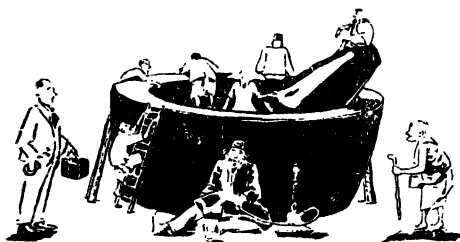
ত্রিলোচন কবিরাজ মহাশয়ের দেহত্যাগের সংবাদে সমগ্র বাঙলা দেশ মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু কিছুদিন পরেই যখন তাঁহার সুযোগ্য পুত্র শ্রীমান্ চতুর্ভুর্জ ডাক্তার বি-এস-সি ফেল করিয়া পিতৃপরিত্যক্ত ব্যবসায়ে কায়েমী হইয়া বসিলেন তখন বঙ্গবাসী আবার কান খাড়া করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সকলে একবাক্যে স্বীকার করিল, চতুর্ভুর্জ, কবিরাজ মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র বটে।

চতুর্ভুর্জ পিতার ব্যবসার এমন দুঃসাহসিক সংস্কার করিল যে "এভারেষ্ট এক্সপিডীশন্"এর বীরেরাও অবাক মানিলেন। হোমিওপ্যাথি, এলোপ্যাথি কবিরাজী ও হেকিমী চারিহস্তে (অবশ্য নাম কল্পনায় যে চারিহস্ত রহিয়াছে।) চারিশাস্ত্র লইয়া তিনি কলিকাতার চিকিৎসা জগতে অবতীর্ণ হইলেন। তখন চতুর্ভুর্জের একাদশ বৃহস্পতি। হিন্দু মুসলমান মিলনের চেষ্টা চলিতেছে আর গান্ধিজী ইংরেজের সহিত ভারতবাসীর সসম্মান সন্ধির জন্য প্রাণপাত করিতেছেন,—এমনি সময় চতুর্ভুর্জের পরিচালিত চতুর্ভুর্জ ঔষধালয়

কলিকাতার রুগী মহলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, হিন্দু এবং মুসলমানের মহামিলন তীর্থ হইয়া দাঁড়াইল। চতুর্ভুজ ফাঁপিয়া উঠিল।

চতুর্ভুজ বিজ্ঞাপন দিল ঃ—

দেহ, মন, বুদ্ধি, ঐহিক, পারত্রিক ও পারলৌকিক
সর্ব্ববিধ ব্যাধি নিবারণের একমাত্র স্থান
চতুর্ভুজ ঔষধালয় !!
চারি মহাশাস্ত্রের অপূর্ব্ব সঙ্গম স্থল—
চিকিৎসায় চতুর্ব্বর্গ ফল লাভ করিয়া ধন্য হউন !!

দলে দলে রুগী আসিতে লাগিল। চতুর্ভুজ একা আর কত পারিয়া ওঠে। কাজেই সে 'অ্যালোপ্যাথির' জন্য একজন 'অ্যাঙ্গলো ইণ্ডিয়ান' 'হোমিওপ্যাথির' জন্য একজন ইণ্ডো-জারমান্ এবং কবিরাজী ও হেকিমীর জন্য যথাক্রমে একজন সেনশর্ম্মা ও একজন 'খোন্দকার' নিযুক্ত করিল।

ইহা ব্যতীত চতুর্ভুজ সম্প্রতি একটি ল্যাবরেটরি খুলিয়াছে। তথায় চারিশাস্ত্রের মিলিত সার সংগ্রহ করিয়া সে "ইউনোপ্যাথি" নামে নূতন চিকিৎসা-প্রকরণ আবিষ্কার ও তৎকারণ নব ঔষধি প্রস্তুতে মনোনিবেশ করিয়াছে। তাহার মনে দৃঢ় বিশ্বাস যে ভারতবর্ষে তথা জগতে যখন 'সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়' হইবে তখন সকলে এক ঈশ্বর ভজনা করিবে—'হরি-হর-জন' নামে এক জাত মানিবে—একথালায় একই চালের ভাত খাইবে আর 'ইউনোপ্যাথি' মতে চিকিৎসিত হইয়া একভাবে প্রাণত্যাগ করিবে। জগতের সেই নব জাগরণের দিন স্মরণ করিয়া চতুর্ভুজের চক্ষে জল আসে। এক 'ড্রপ' 'আই-কিওর' চোখে দিয়া সে আবার গবেষণায় মন দেয়।

ইতিমধ্যেই 'ইউনোপ্যাথি'র কতকগুলি ঔষধ বাজারে বেশ

নাম করিয়া ফেলিয়াছে। সরকারের একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী জানাইয়াছেন—

"আমার কন্যা শ্রীমতী মহুয়া দেবী অষ্টম শ্রেণী হইতে প্রথম বার্ষিক শ্রেণী পর্য্যন্ত ক্রমাগত আধুনিক সাহিত্য চর্চ্চা করিয়া ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া পড়ে। তাহার ধারণা হয় সে পুরুষ ও যে কোনও পুরুষকে নারীরূপে দেখিয়া সে তাহার সহিত ঘনিষ্ঠতা স্থাপনের জন্য উৎসুক হইয়া ওঠে। ক্রমে এই ধারণা তাহার মনে এতই বলবতী হইয়া ওঠে যে সে সমগ্র নারী জাতিকে আক্রমণ করিয়া গল্প লিখিতে সুরু করে। এই সঙ্কটময় কালে চতুর্ভুজ ডাক্তারের "অ্যান্টি-কম্প্লেক্স রসায়ন" অমৃতের ন্যায় ফলপ্রদ হইয়াছে। আমার কন্যা এই ঔষধ সেবন করিয়া সম্পূর্ণ নিরাময় হইয়া বিবাহাদি করিয়া সুস্থভাবেই ঘর সংসার করিতেছে।"

বিখ্যাত কংগ্রেস কর্ম্মী হেমন্ত তরফদার মহাশয় চতুর্ভুজ ডাক্তারের প্রসিদ্ধ গান্ধীমার্কা "ছুৎমার্গ বধ বটিকা"র প্রচুর প্রশংসা করিয়া জানাইয়াছেন, মান্দ্রাজ ও বোম্বাই অঞ্চলে ইহার উপকারিতা বিশেষ উপলব্ধি করা গিয়াছে।

আলোয়ার হইতে চতুর্ভুজের পেটেণ্ট "কলহারাম ফস্" এক হাজার ফায়েলের 'অর্ডার' আসিয়াছে। তাহার "সোহাগাসকাসব" যক্ষ্মারোগের সদ্য ফলপ্রদ ঔষধ। এক ডোজ "হেকমতে সিপিয়া পুরিয়া" খাইলে বাস্ত ভয় ও দাঙ্গা নিবারিত হয়। বিনা মূল্যেই যখন 'ক্যাটালগ' পাওয়া যায় তখন অধিক বলা বাহুল্য মাত্র।

মদনদাদা চতুর্ভুজের প্রতিবেশী, সকলেরই দাদা। একদিন নিম্ন স্বরে অবিশ্বাসের ভঙ্গীতে জনৈক বন্ধুর নিকট বলিয়াছেন, বুঝিলে

ভায়া আমাদের ওই গোবিন্দ কবিরাজের ছাগলাদ্য ঘৃত আর চ্যবনপ্রাশই ভাল—আবার অত ল্যাঠা কেন?

কথাটা রঞ্জিত হইয়া চতুর্ভুজ ডাক্তারের কানে গেল। চতুর্ভুজ প্রমাদ গণিল! মদনদাদা সকলেরই দাদা, তাঁহার বৈঠকখানায় আপামর সাধারণের আড্ডা। এহেন মদন দাদা ইউনোপ্যাথির মর্য্যাদা না বুঝিলে চতুর্ভুজের পসার মাটি! কাজেই চতুর্ভুজ একদিন প্রভাতে মদনদাদার বৈঠকখানায় দেখা দিল।

—এই যে ভায়া! এসো, এসো! তারপর, তোমার ব্যবসা চলছে কেমন?—বলিয়া মদনদাদা চতুর্ভুজকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন। সুযোগ পাইয়া চতুর্ভুজ বলিল,—আর দাদা ব্যবসা! আপনার লোকদের সহানুভূতি না পেলে কি আর ব্যবসা চলে? এই তো সেদিন পরেশ বলছিল দাদারও নাকি এসবে বিশ্বাস নাই!

অপ্রস্তুত হইয়া মদনদাদা বলিলেন——আরো রামঃ! ওসব ছেলে ছোকরার কথা ধর কেন? তবে হ্যাঁ, আমার একটু আশ্চর্য্য লাগছে বটে—

—আশ্চর্য্য তো লাগাবেই দাদা। একি সাধারণ ব্যাপার? কতবৎসরের সাধনার জিনিষ এ! তুমি যদি না দেখে শুনেই অবিশ্বাস কর দাদা তবে আমি কাঁহাতক আর হ্যাণ্ডবিল আর বিজ্ঞাপন দেব?

—কি যে বল! অবিশ্বাস করব কেন? তবে একটু খটকা লাগে বই কি!

—কিসের খট্‌কা? তুমি চলনা আমার সঙ্গে আমার ল্যাবরেটরি দেখবে।

—সর্ব্বনাশ, ওখানে গিয়ে আমি কি করব ? তার চেয়ে—

—তার চেয়ে কি বল দাদা ! তুমি যা বলবে তাই করতে রাজি আছি।

মানে তোমার পেটেণ্ট ওষুধ গুলো কি 'প্রিন্সিপ্যালে' তৈরি তা বরং একটু বুঝিয়ে দাও। তা হলেই আমার মনের সন্দেহ মিটে যায়। এই ধরনা কেন শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় থেকে স্বরু করে আমাদের গোবিন্দ কবিরাজ পর্য্যন্ত জানে কফাধিক্যে 'চ্যবনপ্রাশ' উপকারী। তুমি হয়তো সেখানে 'উন্মন-নিবারণাসব' খেতে বল এর মানে আমি বুঝিনা।

—তাই বল। আমার 'প্রিন্সিপ্যাল'টাই তবে তোমার জানা দরকার। শোন তবে। এ্যালোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, হাইড্রোপ্যাথি বাইয়োকেমিক, কবিরাজী হেকিমি, তন্ত্র, মন্ত্র, মাদুলী চরণামৃত সমস্ত মিলিয়ে আমার 'ইউনোপ্যাথি' সৃষ্টি হয়েছে। চিকিৎসা জগত আমার এই আন্দোলন হরিজন আন্দোলনের মতই বিভিন্ন পদ্ধতিকে একত্রীভূত করে দিয়েছে। এইভাবে চিকিৎসা করতে হলে রোগের মূল জেনে রুগীর শারীরিক মানসিক আত্মিক ইত্যাদি সর্ব্ব প্রকারের উপসর্গ দূর করে রোগীকে সম্পূর্ণ নিরাময় করতে হয়। যেমন ধর একজনের সর্দ্দিকাসী হল। তাকে চ্যবনপ্রাশ দিলে হয় তো বা সাময়িক ভাবে তার উপকার হবে। কিন্তু যদি দেখা যায় লোকটার নিত্যকর্ম্ম-পদ্ধতি কি, তাহলে হয় তো দেখবে সে চাঁদের আলোয় বসে কবিতা পড়ে আর ঘরে বসে কবিতা লেখে। হয় তো সিগারেট ধরাতে গিয়ে বা এমনি একটা কিছু কারণে তার মিল হারিয়ে গেলে সে উন্মনা হয়ে অনেকক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে। এটা তার অভ্যাস। এ অবস্থায় যদি ঠাণ্ডা লাগে এবং উন্মন ভাবের জন্য শারীরিক স্নায়ু সমূহের

শৈথিল্য হেতু তার সর্দ্দিকাসী হয় তাহলে ক্যাম্ফর ২০০ই দাও আর চ্যবনপ্রাশই দাও তার কি কোনও স্থায়ী উপকার হবে? কাজেই তখন তাকে 'উন্মননিবারণাসব' না দিলে আর রক্ষা নাই।

মদনদাদা জিজ্ঞাসা করিলেন—আচ্ছা তোমার এই 'উন্মন-নিবারণাসব'টা কি কি উপাদানে তৈরী?

চতুর্ভুজ উৎসাহিত হইয়া বলিল,—ঠিক ধরেছ! এইবার ওষুধটার 'ফরমুলা'টা শোন তা' হ'লেই সব বুঝতে পারবে।

—হোমিওপ্যাথি 'জেলসিমিয়াম' উদাসীনতার ওষুধ। তার এক ফোঁটা দিতে হবে। উঠে বাইরে যাওয়ার মধ্যে একটু রাগ, এবং একটু খামখেয়ালী ভাব আছে সে জন্য 'ক্যামোমিলা' এক ফোঁটা দিতে হবে। মিল হারিয়ে যাওয়ায় একটু ভয়ের ভাব আছে যাতে স্নায়ু শিথিল করে দেয়—সেজন্য 'বোরাক্স' এক ফোঁটা! সেই সঙ্গে 'চ্যবন-প্রাশ' বাসক পাতার রস ও 'টিঞ্চার এ্যামন ইপিকাক্'। এর পর স্বাদ ও গন্ধের জন্য ইউনানী মতে প্রস্তুত কয়েক ড্রপ "বাদশাহী খোশ্‌বু আরক" দিলেই "উন্মননিবারণাসব"এর এক ডোজ প্রস্তুত হ'ল!

মদনদাদা ক্রমশই উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিতেছিলেন। বলিলেন,—তাই তো হে! ব্যাপারটা তো মন্দ ঠেকছে না!

—আর একটু বাকী রইল দাদা। মিল হারানোর কারণটা বের করে সেটা দূর করবার ব্যবস্থা করতে হবে। যদি দেখ তামাক খাবার জন্য মিল হারায় তবে এই 'আসবে'র সঙ্গে প্রতি মাত্রায় এক এক ফোঁটা চায়না ৩x দিতে হবে। যদি চায়ের নেশায় পড়ে মিল হারায় তবে সমস্তটা বোতলে এক ফোঁটা 'থুজা' ২০০ দিলেই হবে।

—চমৎকার পদ্ধতি তো!

—এইবার বুঝলে তো দাদা এ বড় গভীর গবেষণার জিনিষ!

শরীরতত্ত্বের সঙ্গে এই চিকিৎসার জন্য মনস্তত্ত্ব, দেহতত্ত্ব, পরলোকতত্ত্ব সবই পড়তে হয়। অর্থাৎ এক কথায় সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ না হলে 'ইউনোপ্যাথী' মতে চিকিৎসা করা যার তার কর্ম্ম নয়!

বিস্মিত মদন দাদা আরো একটা কি প্রশ্ন করিতে যাইবেন এমন সময় চতুর্ভুজের একজন সহকারী আসিয়া খবর দিল বহু রুগী চতুর্ভুজের জন্য অপেক্ষা করিতেছে। কাজেই তাহাকে উঠিতে হইল। যাইবার সময় সে বলিল,—তাহলে উঠি দাদা আরো যদি কিছু জানবার থাকে তবে একবার দয়া করে আমার ল্যাবোরেটরিতে পায়ের ধুলো দিও—বলিয়া চতুর্ভুজ মদন দাদাকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইল।

মদনদাদা বিস্ময়াপ্লুত নয়নে চাহিয়া রহিলেন। মনে প্রশ্ন জাগিতেছিল, 'খোশ্‌বু আরক' আর 'এ্যামোনিয়া'র উগ্র গন্ধে হোমিওপ্যাথি ঔষধগুলির গুণ নষ্ট হইয়া যায় না কেন? কিন্তু এতো কথা শুনিয়া ব্যাপারটাকে উড়াইয়া দেন কি করিয়া! কাজেই মনে মনেই একটা মীমাংসা করিয়া লইলেন—বিভিন্ন ঔষধের গুণাগুণ রক্ষা করিয়া মিশ্রণের একটা উপায় বাহির করিয়া লইয়াছে বোধ হয়। হাজার হোক বি-এস্-সি ফেল তো!

কিন্তু বিশ্বাস করিতেই হইল। মদন দাদা চতুর্ভুজ ডাক্তারের মহা ভক্ত হইয়া উঠিলেন। কি করিয়া এই ব্যাপার সঙ্ঘটিত হইল তাহাই বলিতেছি।

মদনদাদার মনে সঙ্গীতের বৈঠক সম্বন্ধে এক ভয়াবহ ধারণা ছিল। তিনি একবার মল্লিকবাড়ী এক মাইফেলে গিয়াছিলেন। কাশী হইতে এক বৃদ্ধ ওস্তাদ আসিয়াছিলেন—সঙ্গীতের প্রারম্ভেই

ওস্তাদ সঙ্গতকারীর মস্তকে তানপুরাটি চূর্ণ করেন সেই হইতে তাঁহার ধারণা 'বৈঠক' ডনবৈঠকের নামান্তর—একপ্রকার শারীরিক কসরৎ। এবং এই কসরৎস্থান হইতে তিনি সযত্নে দূরে থাকিতেন। কিন্তু সেদিনকার বন্ধুর বাড়ী নিমন্ত্রণ দাদা এড়াইতে পারিলেন না। সঙ্গীতের বৈঠকে ভয়ে ভয়ে গেলেন!

বৈঠকের প্রারম্ভেই দাদার প্যালপিটেশন্ সুরু হইল! তানপুরার ন্যায় হালকা জিনিসটি কোলের কাছে স্থিরভাবে সোজা রাখিয়া সর্ব্বাঙ্গের যে এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর কসরৎ চলিতে পারে দাদার তাহা জানাই ছিল না। নির্ব্বাক বিস্ময়ে দাদা দেখিলেন গমক গিট্‌কিরীগুলি কেমন অঙ্গভঙ্গীতে পরিস্ফুট হইতেছে! গলার প্রয়োজন অনুভূতই হইতেছে না। পশ্চিমদেশীয় ওস্তাদজী বাম হস্তে তানপুরা ধরিয়া মুক্ত দক্ষিণ হস্তে এক একটি তানের টুকরা ধরিয়া কোনোটি আকাশে ছুঁড়িয়া দিতেছেন কোনোটি মুঠি ভরিয়া আপনার কোলে টানিয়া আনিতেছেন, কোনোটি বা যে-কোনও শ্রোতার দিকে নিক্ষেপ করিতেছেন। কিন্তু এইখানে শেষ হইলে তবু রক্ষা ছিল! দুই ঘণ্টা ব্যাপী সুর-সংগ্রামের ফলে দাদার কানে কেবল "বুঁদরিয়া" কথাটি

প্রবেশ করিল। তাহাও আবার এমন ভীম গমক ভরে পুনঃ পুনঃ উচ্চারিত হইতে লাগিল যে মদন দাদা অচিরাৎ উপলব্ধি করিলেন যে তাঁহার স্নায়ুমণ্ডলী গভীর মূর্চ্ছনায় টন্ টন্ করিয়া উঠিতেছে এবং বক্ষের উভয় পার্শ্বে রীতিমত 'খিঁচ্' ধরিয়াছে। এই অবস্থায় সঙ্গত-কারী এমন বিকট মুখভঙ্গী করিয়া "ধেরে ধেরে ঘেনে নাগ্" বাজাইলেন যে দাদার প্রাণপাখী দাদাকে একমাত্র সৎপরামর্শ দিল 'উঠে পড়ে টেনে ভাগ্!' সুস্থ শরীরে গান শুনিতে গিয়া মদন দাদা বালাপোষ মুড়ি দিয়া 'রিক্স' চড়িয়া বাড়ী ফিরিলেন। সারারাত গরম ফ্লানেলের সেঁক দিয়াও বুকের ব্যথা উপশম হইল না। ভোরের দিকে আধ স্বপ্ন আধ প্রলাপের ঘোরে মদনদাদা "বোঁ ওঁ———উঁ" করিয়া এমন চীৎকার করিয়া উঠিলেন যে পাড়ার লোক ছুটিয়া আসিল। সকলের পরামর্শ মতে চতুর্ভুজ ডাক্তারকে কল দেওয়া হইল। বিবরণ শুনিয়া চতুর্ভুজ ডাক্তার ইউনোপ্যাথি মতে প্রস্তুত এক ডোজ "কুয়তে-পালসোসিপিয়াবাসক কম্পাউণ্ড" খাওয়াইয়া দিল। মদন দাদা আধ ঘণ্টার মধ্যে অনেকটা সুস্থ হইয়া বসিলেন। চতুর্ভুজ বুকের বোতাম ঢিলা করিয়া দিয়া বলিল—না হবে কেন? হেকিমি 'কুয়তে মেদা' এক বড়ি, পালসেটিলা এক ফোঁটা, সিপিয়া এক ফোঁটা, বাসকারিষ্ট আর সিরাপ বাসক এই সব মিলিয়ে এই ওষুধ তৈরী করা হয়েছে! হাতে হাতে ফল দিতে বাধ্য।

প্রতিবেশীদের অবাক করিয়া মদনদাদাকে আরো এক ডোজ ওষুধ ঘণ্টাখানেক পরে খাইতে বলিয়া সগর্ব্ব পদক্ষেপে চতুর্ভুজ চলিয়া গেল!

•

পরদিনই চতুর্ভুজের 'ইন্‌ডোর' রুগী—অর্থাৎ যাঁরা তার বাড়ী আসিয়া ব্যবস্থা ও ঔষধ লইত—চতুর্গুণ বাড়িয়া গেল।

রামতারণ মুখুজ্জে ক্ষুব্ধ স্বরে জানাইলেন, তাঁহার পুত্রটির শক্ত ব্যামো হইয়াছে। পড়াশোনায় মন লাগে না। কেবল রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়ায়। বই খুলিলেই মাথা ধরে। চতুর্ভুজ তাঁহাকে বলিল—চিন্তার কোনও কারণ নাই "এক্সট্রাক্ট কন্টিনেণ্টাল ফিকৃশন সিরাপ" এক ডোজ খাইলেই আরাম হইয়া যাইবে। উহাতে মেধাবর্দ্ধক ব্রাহ্মী ঘৃত আছে—উন্মনভাব দূর করিবার জন্ত 'এসিড ফস্' আছে, হেকিমী মোদক আছে, এবং মোমসেক বটীকা ও 'ভাইনাম গ্যালিসিয়া' মিশাইয়া বিদেশী ভাষার প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি করিবার ব্যবস্থা আছে। মুখুজ্জে মশায় খুসী হইয়া চলিয়া গেলেন।

ভবানীপুর হইতে এক বৃদ্ধা আসিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন,—বাবা আমার বড় বিপদ! আমার মেয়ের ঘরের নাতিটি বড় ভাল ছেলে ছিল; খুব 'নেকা পড়া' করেছে। কত যে বই 'নিকেছে' তার ঠিক নেই। কিন্তু এখন বড় শক্ত ব্যায়রামে ধরেছে বাছাকে। বয়েস হয়েছে বলে বিয়ের কথা বলেছিনু। বুড়ো মানুষ কবে আছি কবে নেই! নাতবৌ দেখবার বড় সাধ হয়েছিল। কিন্তু বিয়ের কথা যেই-না তোলা—বাবা, বললে পেত্যয় যাবে না—বাছার আমার ভিরমী নেগে গেল! সেই থেকে জোয়ান মেয়ে দেখলেই বাছার গা বিড়িয়ে ওঠে। মেয়েজাতটাকেই বাছা দু'চক্ষের কোণে দেখতে পারে না। চতুর্ভুজ জিজ্ঞাসা করিল,—আচ্ছা সুস্থ অবস্থায় আর কখনো বিয়ের কথা বলেছিলেন?

—বলেছিনু বাবা, তা বলে মেয়ে পছন্দ হয় না।

—আর কোনও উপসর্গ আছে?

—তা উপসগ্‌গো কি না জানি নে বাবা—তবে বাছা আমার কেমন যেন দিনকের দিন্ মেয়ের মত হয়ে যাচ্ছে। কথাবার্ত্তা কেমন

বিনিয়ে বিনিয়ে বলে। আরো মুস্কিল হয়েছে প্রায় তিরিশ বছর বয়েস হ'ল যেটের কোলে কিন্তু আজও বাছার দাড়ি গোঁফ গজাল না!

—ওহ্ বুঝেছি, আচ্ছা আপনি আমার ওষুধ নিয়ে যান।

চতুর্ভুজ—এণ্টিকম্প্লেক্স মেওয়ার সহিত নার্ভিগর মিশাইয়া তৎসহ ষড়গুণাবলীজারিত মকরধ্বজ মাড়িয়া একত্র করিয়া দিল। আর বলিল—এই ওষুধ তিন বোতল খাওয়াবেন আর একটু করে মাংসের যুস্‌ও খাওয়াবেন নির্ঘাৎ ফল পাবেন।

বৃদ্ধা আনন্দিত মনে চলিয়া গেলেন।

(Stop Press :—আমরা খবর পাইয়াছি বৃদ্ধার নাতিটি ভাল মানুষ সাজিয়া বিবাহ করিয়াছেন এবং নেহাৎ সংসার পাতিয়া বসিয়াছেন। ভবানীপুরে প্রতি পরিচিতের নিকট বৃদ্ধা এখন চতুর্ভুজের প্রশংসা পঞ্চমুখে গাহিয়া বেড়ান।)

এইরূপে অন্যান্য রুগী বিদায় হইবার পর মদনদাদা সর্ব্বশেষে আসিলেন। দাদাকে দেখিয়া স্মিত মুখে চতুর্ভুজ জিজ্ঞাসা করিল—কি দাদা আরাম হয়েছো তো?

—বলিহারি তোমার আবিষ্কার ভায়া! সার্থক তোমার নাম। ত্রিলোচন কবিরাজের উপযুক্ত বংশধর হয়ে তুমি চিরকাল বেঁচে থাক! কিন্তু ভায়া বুক ধড়ফড়ানিটা এখনও একটু রয়ে গেল যে!

—তাই নাকি? কিরকম ধড়ফড় করে বলতো!

—একেবারে কাটা মুরগীর মত! যেন দমবন্ধ হয়ে যায়।

—বটে? আচ্ছা দেখ। এক্ষুনি দেখবে কি অমূল্য জিনিষ আমি আবিষ্কার করেছি—। এই বলিয়া চতুর্ভুজ একটা 'মেজার গ্লাসে' কি একটা আরক খানিকটা ঢালিল। তারপর তাহাতে একএকটি ঔষধ বলিয়া বলিয়া মিশাইতে লাগিল,—এইটে হেকিমি

'দফে দমা', সেবনে হৃৎপিণ্ড সবল হয় ও দম পাওয়া যায়। এইটে 'সিপিয়া'; সঙ্গীত-বাদ্য জনিত দুঃখ দূর করে। আর এইটে স্বর্ণ সিন্দুর, খলে বেশ করে মাড়া-ই আছে। তার সঙ্গে একটু সিরাপ দিলাম স্বাদের জন্যে; খাও দেখি।

মদন দাদা খাইলেন। চক্ষের নিমেষে দাদার জড়তা দূর হইয়া গেল। সোজা হইয়া বসিয়া দাদা উৎফুল্ল কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "বাঃ চমৎকার। কি বলব ভাই ওষুধ যে জিবের তলায় যাবার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুতের মত কাজ করে তা তুমিই দেখালে।

চতুর্ভুজ ডাক্তার স্মিত হাস্যে দাদার দিকে চাহিয়া রহিল। দাদা বলিলেন,—বাঁচিয়েছ ভায়া ভেবেছিলাম রাজকুমারের নেমন্তন্নটা রক্ষা করতে পারব না, অথচ না গেলে নয় রাজার ছেলের ডাক্! মুস্কিলেই পড়েছিলাম আর কি! কিন্তু এখন ভরসা হচ্ছে—। ভগবানের কৃপায় তুমি বেঁচে থাক ভায়া রাজকুমার কেন স্বয়ং যমরাজার আহ্বানকেও আর আমি ডরাইনা।

—রাজকুমার কে?

—নাম শোন নি?—কুমার শচীপতি শর্ম্মা। রাজ্য ছেড়ে দিয়ে বাঁয়া তবলা নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন। সম্প্রতি গজল ভজনায় সিদ্ধ হয়েছেন। শুনেছি অতি চমৎকার গলা—যুদ্ধ বিগ্রহ ভুলে বাস্তবিকই গান করেন! যাবে?

—যেতে তো ইচ্ছে হয় দাদা কিন্তু একটা নূতন এক্সপেরিমেণ্ট নিয়ে পড়েছি। বাংলা দেশে মাসিক পত্র অজস্র বের হচ্ছে তার ছোঁয়াচ লেগে নানান্ কঠিন ব্যাধি বিস্তৃতি লাভ করছে, তাই একটা "অ্যাণ্টি পিরিয়ডিক্যাল মিক্শ্চার বের করবার চেষ্টায় আছি।

—বেশ, বেশ—তোমার কাজে বাধা দিতে চাইনা। আচ্ছা

তবে আসি। হয়তো রাত্তিরেই তোমায় আবার 'কল' দিতে হবে। গান তো! বলা যায় না কি হয়। তবে ভরসা এই যে বাঙলা গজল আর ঠুংরী এবং কুমার শচীপতি গাইবেন। এখন সঙ্গৎ ওয়ালা সঙ্গত ভাবে বাজালেই রক্ষে। আচ্ছা চল্লুম।

দাদা চলিয়া গেলেন। চতুর্ভুর্জ গবেষণায় মনোনিবেশ করিল।

পালিত ষ্ট্রীটের ললিত-গায়ক কুমার শচীপতির বাড়ীতে বৈঠক বসিয়াছে। নিমন্ত্রিত ও অনিমন্ত্রিতের মধ্যে বিখ্যাত গজল লেখক শ্রীযুক্ত দুর্জ্জয় ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত প্রমোদ পুরকায়স্থ, শ্রীযুক্ত হিমাংশু রায়; মউলভী কেরামত হোসেন ইত্যাদি সকলে ছিলেন। অন্যান্য বহু কবি সাংবাদিক ইত্যাদিরও অভাব ছিল না। মদনদাদাও গিয়া আসরে বসিলেন। চতুর্ভুর্জ ডাক্তারের ওষুধের গুণে দাদার সঙ্গীত বাদ্যাদির প্রতি ভয় কাটিয়া গিয়াছিল। তা'ছাড়া কুমারের গানে ভয়ের কিছু নাই।

কুমার তখন গজল ধরিয়াছিলেন। সুললিত কণ্ঠে সকোমল সপ্তস্বর অবাধ লীলায় খেলিয়া যাইতেছে। একজন ক্ষীণকায় ব্যক্তি বাম হস্তে ডাইনা ও ডান হস্তে বাঁয়া বাজাইয়া সঙ্গত করিতেছিল। এই হস্তবিবর্ত্তনের দরুণই বোধ হয় সঙ্গত-বেগে তবলা বিদীর্ণ হইবার আশঙ্কা ছিলনা এবং তদপেক্ষা আশার কথা এই যে এই নবীন তবলচীটির স্কন্ধ দেশের ঈষৎ নৃত্য এবং বামে ঈষৎ মস্তক হেলান ব্যতীত অন্য কোনও শারীরিক কসরৎ তখনও অভ্যাস হয় নাই। কাজেই মদন দাদা ভয়ে ভয়ে প্রবেশ করিয়া শেষে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বসিলেন। তখন কুমার গাহিতেছিলেন—

দখিনের পবনটীরে আজকে সখি ছুঁস্‌নে আঁচল দিয়ে,
আঁচলের লাগলে ছোঁয়া হ'বেই হবে গন্ধে পাগল প্রিয়ে।
পরিস নে কাজল চোখে গগন বুকে জমবে সজল মেঘ,
তুই ধরা কি ফেলবি ছেয়ে পদ্ম ফুলে আলতা পায়ে দিয়ে?

ফাঁক্‌ বুঝিয়া দুর্জ্জয়বাবু মহা সমঝদারের মত 'ওহো—হো' করিয়া উঠিলেন। প্রমোদবাবু একটু নাড়িয়া চড়িয়া বসিলেন, আর 'সমে'র সঙ্গে সঙ্গে কেরামৎ মিয়া "চ্ছা—বহুৎ আচ্ছা" বলিয়া 'বাহার' দিলেন। মদনদাদা চমকিয়া উঠিয়া একটা পান মুখে দিলেন।

গান শেষ হইলে কুমার শচীপতি পাঁচ মিনিট বিশ্রাম করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। সকলের নিকট বিদায় লইয়া তিনি উঠিয়া পার্শ্বের কক্ষে গেলেন। সকলে মৃদুস্বরে কুমারের গলার 'তারিফ' করিতে লাগিলেন—এবং সম্মুখস্থ পান ও সিগারেটের প্রতি মনোনিবেশ করিলেন। অপেক্ষাকৃত বয়োবৃদ্ধ মদন দাদা এই সুদীর্ঘ পাঁচ মিনিট কি ভাবে কাটাইবেন তাহাই ভাবিতেছিলেন এমন সময় দেখিলেন কুমার শচীপতি কক্ষান্তর হইতে ইঙ্গিতে তাঁহাকে ডাকিতেছেন। ঈষৎ বিস্মিত মদনদাদা ব্যস্তভাবে উঠিয়া গেলেন। কুমার বলিলেন,—দাদা বড় বিপদে পড়েছি উদ্ধারের উপায় বলে দিতে হবে।

—বলেন কি কুমার! আপনার বিপদ! কি ব্যাপার বলুন তো!

—ভয়ানক বিপদ দাদা, শোন! শ্রোতাদের মধ্যে সামনে যারা বসে আছেন তাঁদের চেন?

—খুব ভাল করে নয়, কেন বলুন তো?

—ওই যে ছাতার মত চুলওয়ালা রোগা লোকটি বসে আছেন উনিই সঙ্গীত রচয়িতা দুর্জ্জয় ভট্টাচার্য্য মহাশয়।

মদনদাদা দেখিলেন, ক্ষুদ্র চক্ষু, বৃহৎ চশমা, ক্ষীণ দেহ, ঢোলা পাঞ্জাবী, ভাঙা গাল আর পুরন্ত জুলপী বাঁকা বাঁশীর মত নাক আর তাম্বুল রঞ্জিত বদনওয়ালা এক ব্যক্তি মহা উৎসাহে হাত মুখ নাড়িয়া তবলচী অচিন্ বাবুর সহিত আলাপ করিতেছেন। তবলচটী একটু সন্ত্রস্ত ভাবে কথা কহিতেছে পাছে তাহার মুখ-নিসৃত তাম্বুল রাগ তাহার জামা কাপড় রঞ্জিত করিয়া দেয়! মদন দাদা অবাক বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন,—ইনিই বিখ্যাত সঙ্গীত রচয়িতা দুর্জ্জয় বাবু?

—ইনি কি শুধু গানই লেখেন দাদা? যেমন নাম এর তেমনি প্রতিভা! গল্প উপন্যাস কবিতা গান সবই লেখেন। তারপর অভিনেতা হিসাবে লোকটার দারুণ নাম;—ঠেকার সময় 'নাধিন্ ধিন্ না' বাজিয়ে তবলার ঠেকাও চালাতে পারেন। গান গাইতে না পারলেও বহু সুর এঁর কণ্ঠস্থ। এঁর ভ্রাতাটিও সর্ব্বাংশে অগ্রজেরই উপযুক্ত—তিনিও কবিতা, কথিকা, গল্প, ব্যঙ্গ রচনা ইত্যাদিতে সব্যসাচী, সম্প্রতি সাহিত্য সাধনার উদ্দেশ্যে কলকাতায় আশ্রম খুলেছেন।

তারপর যে লোকটি একমুখ দাড়ি নিয়ে অপেক্ষাকৃত গম্ভীর ভাবে বসে আছেন—হ্যাঁ ওই যে—বহরে দুর্জ্জয়বাবুরই মত প্রায়, লম্বায় দেড় আঙুল বেশী হবে, ইনিও সঙ্গীত রচয়িতা প্রমোদবাবু। তারপর বসেছেন মুন্সী সাহেব, হিমাংশুবাবু ইত্যাদি এঁরাও সকলে সঙ্গীত রচনা করেন। এখন এঁদের কথা শোন।

সেদিন 'ইউনিভার্সিটি ইনিষ্টিটিউটে' গান গাইবার পর কথা প্রসঙ্গে

আমি বলেছিলাম বাঙলা ভাষায় ভাল ঠুংরী বা গজল জাতীয় গান নেই অথচ এর যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। বলে ফেলেই বুঝলাম কি ঘোর পাপ করেছি! সেই বৈঠকেই দুর্জ্জয়বাবু স্বরচিত ৫৩টি গান, প্রমোদ বাবু ২৩টি ও মুন্সী সাহেব ৪টি—সর্ব্বসাকুল্যে ৮০টি গান, সুরসংযোজনার জন্য আমায় উপহার দিলেন। কি করি তিনজনকেই খুসী করবার জন্য বেছে তিনজনের তিনটে গানে সুর দিলাম। গান তিনটে গ্রামোফোন কোম্পানীতে চলে গেল। তিন লেখক তিন তিরিক্‌খে নয় টাকা পেলেন। তাতে আরো সর্ব্বনাশ হল। এখন লেখক অলেখক সকলের কাছ থেকে ডাকে অডাকে প্রতিদিন কেবল গানই উপহার পাচ্ছি! বাড়ীময় পুরানো কাগজ স্তূপীকৃত হয়ে উঠেছে। পাইকারী দরে সব বিক্রী করে দেব বলে 'সাহিত্য সাপ্লাইং কোম্পানী'র হরিকুমার বাবুকে খবর দিয়েছিলাম তিনি দেখেশুনে ভয়ে পালালেন! বললেন ও ছোঁয়াচ্ লাগলে আমার দোকান ফেল হয়ে যাবে! এমন দারুণ ছোঁয়াচই লাগল যে আমাদের গৌতম বোস পর্য্যন্ত গান লিখে পাঠাল। সেটা কাব্য বলতেও পার। আস্থায়ী অন্তরা সঞ্চারী ও আভোগ লইয়া সর্ব্বশুদ্ধ ১৭টি ষ্ট্যান্‌জা সে কবিতায় ছিল। তাতে নাকি কামোদ আর দীপক রাগিণী মিলিয়ে সুর দিতে হবে। কিন্তু কামোদ্দীপক রাগিণী আমার গলা দিয়ে বের হল না, সতেরটা ষ্ট্যাঞ্জা কি একটা সোজা ব্যাপার? বহু কষ্টে ভদ্রলোককে বুঝিয়ে শুঝিয়ে গানের জগৎ থেকে উপন্যাস গল্পের জগতে ফেরৎ পাঠিয়েছি।

এই গজলের বন্যায় পড়ে আমার প্রাণ যাবার উপক্রম হয়েছে। অনেকগুলোতে সুর দিয়েছি পাঁচ সাতটা নূতন রাগিণী আমদানী করেছি আর বিদ্যেয় কুলোয় না। অন্যান্য লেখকদের তো কথাই নাই, সব চেয়ে বিভ্রাট হয়েছে ওই দুর্জ্জয়বাবুকে নিয়ে। ভদ্রলোকের

ধারণা তাঁর তীব্র সবল সৌন্দর্য্যানুভূতি বাঙলা গানে এক অভিনবতা দান করেছে। তাঁর সূক্ষ্মতম আবেগগুলো যে নিবিড় মৃদুতায় রূপায়িত হচ্ছে তা সুরে ধরা ক্রমশই কঠিন হচ্ছে, অথচ ভদ্রলোক এমন বদ-মেজাজী যে কিছু বললে হয় তো একটা খুনখারাপি করে বসবে! এখন উপায় কি বল।"

মদনদাদা এতক্ষণ স্তব্ধ হইয়া শুনিতেছিলেন। এইবার বলিলেন,—এতো মহা বিপদ দেখছি কুমার!

—বিপদ বলে বিপদ! একেবারে মড়কের মত সাঙ্ঘাতিক, যক্ষ্মার মত মারাত্মক, কলেরার মতই সংক্রামক!

চিন্তিত মুখে মদনদাদা বলিলেন,—ঠিক বলেছেন কুমার, কলেরার মতই সংক্রামক। কিন্তু 'কুছ-পরোয়া-নেই' আপনি বাইরে গিয়ে গান ধরুন আমি এক্ষুণি ডাক্তার নিয়ে আসছি।

নিরাশাব্যঞ্জক ভঙ্গী করিয়া কুমার বলিলেন,—এই মরেছে! এতক্ষণ তবে বৃথাই তোমার কাছে বক্ বক্ করে মরছিলাম দাদা। একেবারে নেশায় চুর্ হয়ে আছো? গানের ব্যাপারে ডাক্তার করবে কি?

—বলেন কি কুমার! নেশা করেছি কি? আমি কি যে-সে ডাক্তারের কথা বলেছি? ৺ত্রিলোচন নন্দন চতুর্ভুজ সর্ব্বরোগে ধন্বন্তরি! আপনি নিশ্চিন্ত হন। আপনার ফোনটা কোন ঘরে দেখিয়ে যান। সব ভার আমার।

মদন দাদার বোধ হয় কোনও মৎলব আছে এই ভাবিয়া দ্বিধাভরে ফোন দেখাইয়া দিয়া কুমার বলিলেন,—দেখো দাদা শেষে একটা বিভ্রাট করে বোসো না যেন।

—কোনও ভয় নাই।—বলিয়া মদন দাদা 'ফোনে'র 'ডাইরেক্টরি'তে

মনোনিবেশ করিলেন। চিন্তিত মনে কুমার বাহিরে গান গাহিতে চলিয়া গেলেন।

সমস্ত শুনিয়া চতুর্ভুর্জ ডাক্তার বলিল—এঁদের রচনার নমুনা দেখতে হবে। বাহিরের ঘর হইতে কুমার তখন আবার উঠিয়া আসিয়াছেন। তিনি অবাক বিস্ময়ে ইউনোপ্যাথির আশ্চর্য্য গুণ শুনিয়া বলিলেন, নমুনা খুব সহজেই দেখাতে পারব।—বলিয়া কুমার কক্ষস্থিত এক প্রকাণ্ড 'প্যাকিং কেস' খুলিলেন। বাক্সটি কাগজে পরিপূর্ণ। তাহার মধ্য হইতে তিন খণ্ড কাগজ আনিয়া তিনি চতুর্ভুর্জ ডাক্তারের হাতে দিলেন। প্রথমটি দুর্জ্জয়বাবুর গান। একটা মড়ার মাথা আঁকা নোট পেপারে বেশ গোটা গোটা করিয়া লেখা। হঠাৎ দেখিলে রবীন্দ্রনাথের লেখা বলিয়া ভ্রম হয়। গানটি এইরূপ—

সুর—মিশ্র ভৈরবী তিলক কামোদ ঝিঁঝিট লক্ষ্ণৌ ঠুংরী—

তাল—ব্রহ্মামুরারী

হাস্নাহানা ভাসল চুপে
অশ্রুমতীর জলে,
স্বপনে কোন মায়াবী পড়ল ঢলে
শিউলিফুলের কোলে।
যৌবনে হায় ফুল দলে পায়—
ফুলমহলায় বাঁশী বাজায়—
মরমে মোর সোনার নূপুর
বাজলো বুকের তলে।

স্বপন না ভাঙে যদি

মেঘ বাতায়ন খুলো,

এই মহুয়া বনে মনের

হরিণ পথ ভুলো।

লয়লা কাঁদে মজনু সাথে

বঁধূ এলো মধু রাতে

ঝুলনেরই দোল লাগে ওই

বাবলা বনের কোলে।

সুর ও তালের দিকে নির্দ্দেশ করিয়া কুমার বলিলেন—দেখছেন কি ভীষণ পরিশ্রম করতে হয়েছে!

দ্বিতীয়টির কাগজটি একটি দন্তমঞ্জনের বিজ্ঞাপন। তাহার অপর পৃষ্ঠায় প্রমোদবাবুর ছোট্ট একটি গান দুর্ব্বোধ্য অক্ষরে লেখা। কুমার বাহাদুর বলিলেন,—এঁর নয়শো তেষট্টিটি গানের মধ্যে এই কটা লাইনই চলনসই বলে নিয়েছিলাম।—চতুর্ভুজ পড়িল :—

খুঁজে দেখা পাইনি তব স্মরণখানি

পেয়েছি চরণ মোর পিঠে

তার কাজল নয়নে ছিল আগুন জানি

তথাপি লেগেছে চোখে মিঠে।

গানের পশরা মাথে, অশ্রুবারি,

নয়নে ঝরিছে গেছে শ্বশ্রু বাড়ি'

হলনা মিলন তবু পথেতে চলি

বেদনা বেড়েছে গিঁঠে গিঁঠে।

তৃতীয় গানটি মুন্সী কেরামত আলি মিয়ার। ইনি বাঙলা

সংগীতে মুসলমানগণের রচনার পার্সেন্‌টেজ বাড়াইবার জন্য কাউনসিলে দরখাস্ত করিয়াছেন এবং নিজে সেই অভাব পূর্ণ করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। তাঁহার গানটি একটা রুলকরা 'এক্‌সারসাইজ বুক' এর পাতায় লেখা। উহা এইরূপ—

আশমানে আশমানে জাগিল রোশনাই
মুসাফির হাওয়া পথে ফিরি করে খোস বাই!
দরদিয়া বিবি কই বেদরদী দিল রে—
পেরেশান্‌ সেচি বসে নয়নের বিল্‌ রে—
মাশুক আসক করে ঝরোকায় বোরখায়—
খঞ্জর মারো বুকে আজ কাছে বিষ নাই।

গান তিনটি পাঠ করিয়া চতুর্ভুজ ডাক্তার অনেক্ষণ ভাবিল। তারপর বলিল,—একবার এদের সঙ্গে একটু আলাপ করতে পারলে হোত। ইতিমধ্যে দুর্জ্জয় বাবুর দুর্দ্দমনীয় কণ্ঠস্বর শোনা গেল—

—কুমার বাহাদুর কই? আর দু'এক খানা গান হবে নাকি?

ওরে বাপ! ওই পাটকাঠি সদৃশ দেহখানার মধ্য হইতে এমন "বোম্বার্ডন্‌" মার্কা আওয়াজ কি করিয়া বাহির হইল ভাবিয়া চতুর্ভুজ অবাক হইয়া গেল। সন্ত্রস্ত স্বরে সে বলিল,—না আলাপের প্রয়োজন নাই। আমি চললাম। এ বড় 'কমপ্লেক্স' ব্যাধি দেখছি। তা' কুমার বাহাদুর চিন্তিত হবেন না আমি সম্পূর্ণ নিরাময় করতে পারব গ্যারান্টী দিচ্ছি। এরজন্য 'স্পেশ্যাল টনিক' সৃষ্টি করতে হবে। তাই একটু যা সময় লাগবে।

কুমার সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিলেন,—টনিক কি হবে মশাই?

—দেখুন কুমার বাহাদুর আপনার বড় ভয়ানক সঙ্কট কাল

সমাগত। এই যে গজল ঠুংরীর বাতিক, এও আমাদের শাস্ত্র মতে এক মহাব্যাধি। বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে পড়ে বিভিন্ন মনোভাব অবলম্বন করে এই ব্যাধির বীজাণু জন্মায় আর বড় শীঘ্র জিনিষটা ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে। যাই হোক আপনি ভাববেন না। সপ্তাহকাল পরে এঁদের সকলকে চায়ের মজলিসে নেমন্তন্ন করবেন। ইতিমধ্যে আমি ওষুধ পাঠিয়ে দেব। আমার ওষুধ এক ডোজ করে সকলের চায়ের সঙ্গে মিশিয়ে দেবেন। দেখবেন ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই এঁরা নিরাময় হবেন। এ যদি না হয় কুমার, তাহলে আমার সর্ব্ব শাস্ত্র গঙ্গায় ভাসিয়ে দেব।

পুলকিত ও বিস্মিত হইয়া কুমার বলিলেন—এ যদি পারেন ডাক্তার বাবু, তবে আপনাকে প্রচুর পুরস্কার দেব।

চতুর্ভুর্জ ডাক্তার কুমার বাহাদুরকে আশ্বাস দিয়া ও সশ্রদ্ধ নমস্কার নিবেদন করিয়া বাড়ী ফিরিল।

৩

দিন পাঁচ ছয় পরে মদন দাদা একদিন চতুর্ভুর্জের 'ল্যাবরেটরি'তে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। চতুর্ভুর্জ তখন কি একটা 'এক্স পেরিমেণ্ট' করিতেছিল। মুখ তুলিয়া বলিল—

—এসো দাদা—বস।

—কিহে, তোমার নূতন ওষুধের কি হ'ল? কুমার বাহাদুর যে তাগাদা দিয়ে লোক পাঠিয়েছিলেন।

চতুর্ভুর্জ গম্ভীরভাবে 'লেবল' আঁটা একটা বড় বোতল দেখাইয়া দিল। মদন দাদা দেখিলেন উহার গায়ে বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে "বৃহৎ ঠুংরী গজলান্তক রসায়ন" নিম্নে সেবন বিধি, চতুর্ভুর্জ

ডাক্তারের 'ল্যাবরেটরির' ঠিকানা ইত্যাদি সব লেখা আছে। সর্ব্ব নিম্নে লাল পাইকা অক্ষরে লেখা আছে :—

"সেবনের পূর্ব্বে শিশি ঝাঁকাইবেন না। সেবনান্তে রুগীকে ঝাঁকাইয়া দিবেন।"

খুসী হইয়া মদনদাদা বলিলেন,—বেশ ভায়া, দেখে তো—ভালই বোধ হচ্ছে এখন কাজ হলেই হয়।

—কাজ হবেনা? বল কি! ওতে কি কি ভেষজ আছে জানো?

—কি করে জানব?

—বলি তবে শোন। হৃদয়ের গোপন দুঃখ নিবারণের জন্য—'ইগ্নেশিয়া'। উদ্বিগ্নতা ও মৃত্যুভয় দূর করবার জন্য—'সিকেলি'। অন্যমনস্ক ভাব দূর করবার জন্য—'ক্যানাবিস ইণ্ডিকা'। সর্ব্ব প্রকার 'ম্যানিয়ার' জন্য—'ক্যান্থারিস'। সমস্ত রাত্রি অকারণ অশ্রু বর্ষণ নিবারণের জন্য—'ইণ্ডিগো'। পরিপাক ব্যাঘাতে অনিদ্রার জন্য—'পালসেটিলা'। তারপর এঁরা একা থাকতে ভয় পান বলে সর্ব্বদাই কল্পনায় স্বপন-প্রিয়া সৃষ্টি করে হয় গজল লেখেন নয় একটা অনর্থ করেন—তার জন্যে দিয়েছি—'লাইকোপোডিয়াম'

এইত গেল হোমিওপ্যাথি। তারপর অ্যালোপ্যাথি 'অ্যালেট্রিস কর্ডিয়েল' দিয়েছি। সর্ব্বপ্রকার আতিশয্য নিবারণ করে 'সিস্টেম'টাকে 'নিউট্রেলাইজ' করবে। একটু 'টিঞ্চার অ্যামন ইপিকাক্' দিয়েছি শ্লেষ্মাধিক্য নিবারণ করবে। ভাল 'ল্যাকসেটিভ' হিসাবে প্রতি 'ডোজে' একটা করে 'লিভার পিল' দেওয়া আছে। তারপর দেখ বাতের ব্যথা নিবারণের জন্য 'বাতারি সালসা'—হৃদয়দৌর্ব্বল্যের জন্য 'স্বর্ণ সিন্দুর' মস্তিষ্ক ও দেহের জ্বালা নিবারণের জন্য ইশবগুলের 'একস্ট্রাক্ট', কণ্ডুয়ন আর হিক্কা নিবারণের জন্য শ্বেত চন্দন, তেঁতুল গোলা, আনারস পাতার রস আর শর্করা দেওয়া হয়েছে। সর্ব্বশেষে হেকিমি মতে সাধারণ স্বাস্থ্যের জন্য "কুদরতে দরাজী" ও শিরদরদ নিবারণার্থে "দরদে রহম" দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া আর যা করেছি শুনলে বুঝবে কত কষ্টে কত ভেবে চিন্তে এই ওষুধ তৈরী করেছি! হস্ত ও মুখ স্তম্ভন করবার জন্য তন্ত্র মতে পুষ্যা নক্ষত্রে সংগৃহীত শ্বেত আকন্দের মূল, রঘুমলা ও মধু সমপরিমাণ মিলিত করে এর সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছি। এতেও যদি উপকার না হয় দাদা তবে সর্ব্বশাস্ত্রে আগুন দিয়ে গঙ্গায় ডুবে মরব। মদনদাদা নির্ব্বাক বিস্ময়ে শুনিতেছিলেন,—হঠাৎ চীৎকার করিয়া উঠিলেন—

—আলবৎ হবে, তোমার জয় জয়কার হবে। বেঁচে থাক ভায়া!

ইত্যবসরে বহির্দ্বারে কড়া নড়িয়া উঠিল। চতুর্ভুজ—ভিতরে আসুন—বলিয়া ডাকিতেই কুমার শচীপতি উদ্বিগ্ন মুখে প্রবেশ করিলেন ও চতুর্ভুজ ডাক্তারকে দেখিয়া বলিলেন,—কই ডাক্তার বাবু আপনার ওষুধের কি হ'ল? আমি তো আর অপেক্ষা করতে পারিনা।

মদন দাদা মহোৎসাহে বলিলেন—মাভৈঃ কুমার বাহাদুর, ওষুধ

প্রস্তুত। বলিয়া ঔষধের বিবরণ ও তাহা কি কি উপাদানে তৈয়ারী তাহা কুমার বাহাদুরকে মহোৎসাহে বুঝাইতে লাগিলেন।

সমস্ত শুনিয়া ঔষধের বোতলটি পরীক্ষা করিয়া কুমার বাহাদুরের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তারপর একটু দ্বিধা ভরে বলিলেন,—সবই সুন্দর হয়েছে ডাক্তার বাবু, কেবল ওই ঝাঁকুনির ব্যাপারটাতেই একটু গোলে পড়েছি। চায়ের সঙ্গে ওষুধ না হয় এক ডোজ করে দিলাম, কিন্তু ভদ্রলোকের ছেলেদের ঝাঁকাব কি বলে?

—তা না হলে তো হবে না কুমার। এত বিভিন্ন উপাদানে এই ওষুধ তৈরী যে পেটে যাবার পর বেশ করে ঝাঁকিয়ে না দিলে কোনও কাজ হবে না।

—তাই তো কি করা যায়!

মদন দাদা মীমাংসা করিয়া বলিলেন,—তার আর কি! দিন কতকের জন্য একটা গাড়োয়ালীকে ঠিকা দারোয়ান রাখুন না!

—মন্দ বলনি দাদা! তাই হবে। নইলে আর পারা যায় না। 'লাইফ মিজারেবল্' করে তুলেছে। বলিয়া কুমার "বৃহৎ ঠুংরী গজলান্তক রসায়নের" বোতলটি হাতে লইয়া উঠিলেন। চতুর্ভুর্জ বলিল,—ফলাফল জানাতে ভুলবেন না কুমার! নমস্কার!

—বলেন কি। নিশ্চয়ই জানাব।—বলিয়া কুমার চলিয়া গেলেন।

সপ্তাহ পার হইল না। হাস্যমুখে কুমারবাহাদুর আসিয়া চতুর্ভুর্জকে জানাইলেন—ঔষধ যথারীতি সেবন করান হইয়াছিল। আশাতীত ফল হইয়াছে। প্রমোদ বাবু তাঁহার রচিত দেড় হাজার ঠুংরী ও গজল গান শতকরা দেড় টাকা হিসাবে এক দেশী সিনেমা

কোম্পানী ও এক গ্রামোফোন কোম্পানীকে বেচিয়া ফেলিয়াছেন। আর কেরামত মিয়া বন্যার খবর পাইয়া দেশে গিয়াছে। কেবল গোল বাধিয়াছে দুর্জ্জয় বাবুকে লইয়া। ঔষধের গুণে তাহার হস্ত মুখ 'স্তম্ভিত' হইয়াছে এবং দেহ হইতে গজল এবং ঠুংরীর ভাব লুপ্ত হইয়াছে বটে কিন্তু দারুণ ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে তিনি এখনও মনে মনে এই ধারণা পোষণ করেন যে তিনি ভারতের অদ্বিতীয় গান লেখক ও সমঝদার। কাজেই তিনি এখনও কুমার বাহাদুরের পেছু ছাড়িতেছেন না।

অবস্থা শুনিয়া মদনদাদা বলিলেন—কি চতুর্ভুজ? দুর্জ্জয়কে জয় করতে পারলে না বুঝি?

—আলবৎ পারব! ওঁর এই ঔদ্ধত্যের কথা তো আমায় আগে জানান হয়নি। কুমার বাহাদুর চিন্তিত হবেনা, ওঁকে আরো এক ডোজ ওষুধ খাওয়াতে হবে। এবার ওষুধের সঙ্গে প্ল্যাটিনা ৩০ এক এক ফোঁটা যেন মিশিয়ে দেওয়া হয়। আর দেখুন ঠিকা গাড়োয়ালীটা আছে নিশ্চয়ই, একটু ভাল করে ঝাঁকিয়ে দিতে বলবেন।

পরবর্ত্তী এক সপ্তাহ মধ্যে প্রত্যেক মাসিক পত্রিকা আপিস, মায় 'সাহিত্য সাপ্লাইং কোম্পানী' পর্য্যন্ত এক এক বোতল করিয়া 'বৃহৎ ঠুংরী গজলান্তক রসায়নের' 'অর্ডার' দিয়াছে।

Distracted Mother: "Oh, dear, what shall I do with baby?"

Young Son: "Didn't we get a book of instructions with it, mother?"

সংবাদ-বৈচিত্র্য

পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা বড় গোঁফ আছে কাঠিয়াওয়াড়-বাসী Lesur Arjan Dangar মহাশয়ের। ইহার গুম্ফের দৈর্ঘ্য ৮ ফুট ৮ ইঞ্চি।

তবু তাহাকে গোঁফ বলিতে হইবে?

—

কোনও চৈনিককে শীষ্ দিতে শুনিয়াছেন কি?

না। শীর্ষ দিতে শুনিয়াছি।

—

পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ পরিবার প্রতিপালন করিতে হয় Syriaর অন্তর্গত Hamah নগর নিবাসী Haj Hamdo Al-Helu নামক জনৈক ব্যক্তির। ইহার ৪৩টি সন্তান জীবিত।

ইহাদের সকলেরই কি বিবাহাদি হইয়াছে?

—

Mme. Maldemeusre নামক ফরাসী মহিলার প্রথম বৎসরে ১টি সন্তান, দ্বিতীয় বৎসরে যমজ সন্তান, এবং তৃতীয় ও চতুর্থ পঞ্চম ও ষষ্ঠ বৎসরে ক্রমান্বয়ে ৩টি, ৪টি, ৫টি ও ৬টি সন্তান একত্র হইয়াছিল।

প্রসবের নেশা নয় ত!

—

সমুদ্রের বাতাসে না কি Ozone থাকে না।

যেখানে আমরা ওজন আশা করি সেখানেই উহা না থাকা সম্ভব।

—

ত্রিশ বৎসর আগে Sirius নক্ষত্র হইতে যে রশ্মি বিকীর্ণ হইয়াছিল, আমরা আজ রাত্রে তাহা দেখিতে পাইতেছি।

ব্যাপারটা খুবই serious মনে হয়।

—

উত্তর আফ্রিকার মরুভূমিতে যাহারা বাস করে তাহাদের মধ্যে অনেকেই গর্ত্তের ভিতর বাস করে। মাটির ভিতর কূপের ন্যায় বড় বড় গর্ত্ত খুঁড়িয়া তার পর সেখানে লম্বা লম্বা সুড়ঙ্গ বানাইয়া তাহার মধ্যে বাস করে। বাড়ীর ভিতর ঢুকিতে হইলে সুড়ঙ্গ-পথে এই কুয়ার মধ্যে নামিতে হয়। ইহাদের নাম Troglodytes।

—Hill Station এর hill না থাকিলে সুড়ঙ্গ ছাড়া উপায় কি? রবীন্দ্রনাথও লিখিয়াছিলেন—"উপরে উঠিতে নাহি পাই যদি সুবিধা, পড়ে থাকি ভাই নীচুতেই ভাই নীচুতে।"

—

পৃথিবীর দীর্ঘতম নির্ব্বাক ফিল্ম ৫ মাইলের বেশী লম্বা (২৮১০০০ ফিট)। ইহার জন্মস্থান মেক্সিকোতে এবং ইহার প্রয়োগ-শিল্পী "আইন্‌ষ্টাইন" (রুশীয়)। চিত্রখানি হলিউডে আছে।

নির্ব্বাক ফিল্ম লইয়া কলরব করা ঠিক নহে, যেখানে হয় থাকুক।

—

পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা বড় পুস্তকাগার—Washington এর Library of the United States Congress। অসংখ্য মানচিত্র, পাণ্ডুলিপি, ইত্যাদি ছাড়াও ইহার পুস্তক সংখ্যা ৪৪৭৭৪৩১। সমুদয় গ্রন্থ রাখিতে ৮৪ মাইল লম্বা "তাক" (shelf) প্রয়োজন।

শুনিলে তাক্ লাগিয়া যায়।

—

ডিম হইতে ফুটিয়া বাহির হইয়াই Australian Jungle Fowl উড়িতে পারে।

অকালপক্কের লক্ষণ।

—

Robin পক্ষী ঘুমন্ত অবস্থাতেও গান করে।

তফাৎ এই যে মানুষ মরিয়াও গান করে।

———

খ্যাতির পিপাসা

রবীন্দ্রনাথ চিরদিন সুন্দরের উপাসনা করিয়াছেন। সকল বস্তুর মধ্যে তিনি সুন্দরকে অনুসন্ধান করিয়াছেন, সর্ব্বত্র তাহাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার যত্ন করিয়াছেন। কিন্তু সকল ক্ষেত্রে যে এরূপ চেষ্টা সফল হইবে, তাহার কি মানে আছে? রবীন্দ্রনাথের সুন্দরের সাধনাও যে রুদ্রের নিকট, আলস্য অবসাদের নিকট, পরাজিত হইয়াছে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। এরূপ অবস্থায় রবীন্দ্রনাথ অন্তরের সমস্ত স্থৈর্য্য হারাইয়া শিশুর মত ব্যবহার করিয়াছেন। শিশু যেমন যাহা চায় না, তাহাকে ভুলিতে চায়, নিজেকে দূরে সরাইয়া লইয়া যায়, রবীন্দ্রনাথও তেমনই ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু সকল ক্ষেত্রে তাহাও সম্ভব হয় নাই। আমাদের জাতীয় জীবনের আলস্য, ভীরুতা সবই বার বার রবীন্দ্রনাথের মনকে আঘাত করিয়াছে এবং যখন তিনি তাহাদের

পরাভবও করিতে পারেন নাই, ভুলিতেও পারেন নাই, তখন উপহাসের দ্বারা, তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের দ্বারা তাহাদিগকে বিদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ভাবের ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে তিনি চিত্তের স্থৈর্য্য হারাইয়াছেন। স্বীয় কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উদাসীন থাকিয়া গিয়াছেন।

নিজের জীবনে তিনি যে তামসিক বৃত্তিকেই যথাযথভাবে লইতে পারেন নাই তাহা নহে। রুদ্রকেও তিনি রুদ্রের মত গ্রহণ করিতে পারেন নাই। বজ্র তাঁহার কাছে বজ্র নয়, প্রিয়তমের বংশীধ্বনির আকার ধারণ করিয়া তবে গ্রহণযোগ্য হইয়াছে। সেই জন্য বৈশাখের গান কখনও তাঁহার কাছে বর্ষার গানের মত জমে নাই। বর্ষার কবিতায়, প্রতি অনাড়ম্বর শব্দের অন্তরালে যে গভীর অনুভূতি ও প্রেমের সম্ভার বর্ত্তমান, রুদ্রের ভৈরবের অথবা বৈশাখের কল্পনায় তাহা কখনও পাওয়া যায় না। সেখানে শব্দের আড়ম্বর বিস্তার করিয়া তিনি অনুভূতির দৈন্য এবং বস্তুর সহিত বিষয়ীর ঐক্যের অভাবকে ঢাকিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

এই দুর্ব্বলতার কারণ কি? বুদ্ধির দিক হইতে যিনি এত প্রখর, কাব্যের জগতে যাঁহার যোড়া কদাচিৎ পাওয়া যায়, তিনি কেন বিশ্বের সকল রূপ, সকল প্রকাশকে সমানভাবে লইতে পারেন না? ইহার জন্য দায়ী মনে হয় তাঁহার "সুন্দর",—যে দেবতাকে তিনি এতদিন নানা উপচারে, নানা অনুষ্ঠানের দ্বারা অবিরাম পূজা করিয়া আসিয়াছেন। যে সুন্দরের দেবতাকে আশ্রয় করিয়া তিনি কাব্যের সম্ভার রচনা করিয়াছিলেন, নিজের চারিদিকে বহুবিধ উপচারের জাল রচনা করিয়াছিলেন, সেই দেবতাই আজ তাঁহাকে আরও অগ্রসর হইতে না দিয়া বরং পিছনে আকৃষ্ট করিয়া রাখিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ একবার বলিয়াছিলেন যে রূপে, রসে, গন্ধে

ভরা পৃথিবীর প্রতি মমতা ছাড়িয়া তিনি অনির্দ্দেশের পথ গ্রহণ করিতে চান নাই। তাহার কারণ হয়ত ইহাই যে আধ্যাত্মিকতার দাবী অপেক্ষা তিনি আর্টের দাবীকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন। মানুষ তাঁহার কাছে অতি প্রিয়, প্রকৃতি আরও প্রিয়, আর্ট ততোধিক। ইহাদের ছাড়িয়া তিনি নিরালা পথে শুধু চরম অনুভূতির লোভে অগ্রসর হইতে চান নাই। সে অনুভূতিকে তিনি চেনেন না, আর্টকে চেনেন, সুন্দরকে চেনেন, অতএব তাহাদেরই সাহচর্য্যে জীবনভোর কাটাইয়া দিতে চান।

কিন্তু তিনি চান অথবা না চান, বিশ্ব তাহার সুন্দর এবং অসুন্দরের সম্ভার লইয়া বহুবার রবীন্দ্রনাথের চিত্তে আঘাত করিয়াছে। মৃত্যু, যাহা হয়ত সুন্দর এবং অসুন্দরের পারে, তাহা ধীর পদক্ষেপে দীর্ঘ ছায়া বিস্তার করিয়া ক্রমে তাঁহার জীবনে নামিয়া আসিতেছে। যে সুন্দরের সাধনা কবি চিরদিন করিয়া আসিয়াছেন, তাহা বিশ্বসংসারের বহু সম্পদ তাঁহার ভোগের জন্য দান করিয়াছে। কিন্তু বিশ্বের আরও একটি বৃহৎ অংশ, যাহাকে সুন্দর বা অসুন্দরের কোঠায় ফেলা যায় না, তাহাই ক্রমে ক্রমে তাঁহার অনুভূতিকে অধিকার করিতেছে। কবির মনের গভীর নিরালায় কখনও কখনও হয়ত এ সন্দেহ হয় যে সব বোঝা হয় নাই, সব জানা হয় নাই, পরিচয়ের গণ্ডীর বাহিরে অনেক থাকিয়া গিয়াছে এবং হয়ত যাহাকে আধ্যাত্মিকতার আরও চরম সাধনার দ্বারা তিনি জয় করিতে পারিতেন, কেবল আর্টের প্রতি মমতার বশে তাহা পারেন নাই। এই বোধ যতই তাঁহার নিকটে আসিতেছে, ততই তিনি তাহাকে বিস্মৃত হইবার জন্য নব নব কৌশল খুঁজিতেছেন।

এমনই একটি ইচ্ছার বশে রবীন্দ্রনাথ লোকের প্রশংসার এত সন্ধান করিতেছেন। তাহার দ্বারাই তিনি জীবনের শেষ দৈন্যটুকু ঢাকিতে চান, নিজেকে ভুলাইতে চান যে তাঁহার আর্ট তাঁহাকে যথেষ্ট সম্পদ দান করে নাই। প্রশংসার পিপাসা রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সম্ভবতঃ কোনও ক্ষুদ্র সংস্কার হইতে আসে নাই। ইহা সাধনার শেষ অবস্থার পূর্ব্বমুহূর্ত্তে আরও অগ্রসর হইবার ভয় হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। সেইজন্য রবীন্দ্রনাথের খ্যাতির জন্য এই ব্যাকুলতাকে লঘু বস্তু মনে না করিয়া বরং ইহা ট্র্যাজেডির সমকক্ষ বলিয়া বিবেচনা করা যায়।

অথচ সকলের বড় ট্র্যাজেডি হইল এই যে মানুষের প্রশংসার কোলাহল, যতই বহুল, যতই অবিচ্ছিন্ন হউক না কেন, তাহা কখনও রবীন্দ্রনাথের জীবনের অন্তরতম প্রদেশে পৌঁছাইতে পারে না, তাঁহাকে কোন সান্ত্বনাও দিতে পারে না।

প্রণয়ী—আমাকে সত্যই ভাল বাস?

প্রণয়িনী—অবশ্যই বাসি, হ্যারি।

প্রণয়ী—হ্যারি?—আমার নাম জিম।

প্রণয়িনী—ও!—আমি ভাবছিলাম আজ সোমবার।

আগন্তুক—দুর্ঘটনার দরুন আমাকে কাঠের পা ব্যবহার করিতে হয়. আমার পক্ষে কি বীমা করা সম্ভব?

এজেণ্ট—জীবনবীমা না অগ্নি-বীমা?

প্রজাপতির পক্ষপাত

(চতুরঙ্ক নাটক)

তৃতীয় অঙ্ক

১

দুর্ম্মুখ আফিস

সহকারী। আজ তো কাগজ ভরলো না—matter নেই কি করা যায়।

সম্পাদক। নাঃ তুমি এখনো পাকা হওনি হে! সংবাদ জিনিষটা আগাছার মত, যত্ন করে' চাষ করে ফলাতে হয় না। মাঠে ঘাটে কত জন্মে আছে—কেটে নিলেই হ'ল।

এক কাজ কর—কলেজ ষ্ট্রীটে একটা লোককে ট্রাম চাপা দাও। এই উপলক্ষ্য নিয়ে ট্রাম কোম্পানিকে বেশ কড়া কড়া দু কথা শুনিয়ে দাও। লেখ—"যে বিদেশী বণিক সম্প্রদায়"—। পাট কলের ধর্ম্ম-ঘটের সময় যে বক্তৃতাটা লিখে-ছিলাম—সেইটাই নাম ধাম গুলো বদলে দাও বসিয়ে।

সহকারী। তবু যে আধ কলম বাকি রইলো!

সম্পাদক। নাঃ তোমার দ্বারা কিচ্ছু হবার নয়। দাও সেই লোকটাকে গরুর গাড়ী চাপা। এবার লেখ—"যে সব অনভিজ্ঞ অদ্ভুত দেহাতি লোক কলিকাতায় অর্থ লোভে আসিয়া নিজের অনবধানতার জন্য মারা পড়ে তাহারা দেশের কলঙ্ক।" বাস্ এর পর থেকে সেই সেদিন কাউন্সিলে প্রবেশের বিরুদ্ধে

যে বক্তৃতা দিয়েছিলাম সেটা বসিয়ে দাও। এবার দেখ কাগজ ভরে কি না ভরে।

(দ্রুত প্রদোষের প্রবেশ)

প্রদোশ। মশায় প্রদোষবাবুর নামে যে বিয়ের খবর বেরিয়েছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

সম্পাদক। সেকি মশায়! প্রদোষবাবুর বন্ধু ও ভাবী শ্যালক গোবর্দ্ধনবাবু স্বয়ং যে এই খবর দিয়ে গেছেন।

প্রদোষ। কিন্তু প্রদোষবাবুর খবর তাঁর চেয়ে বেশি কেউ জান্তে পারে না—আমি তাঁর পরম আত্মীয়।

সহকারী। তবে আপনাকেই বা বিশ্বাস কি?

(গোবর্দ্ধন ও যোগজীবনের প্রবেশ)

সহকারী। দেখুন মশায়রা ইনি বলছেন প্রদোষবাবুর বিয়ের খবর নাকি মিথ্যা।

গোবর্দ্ধন। ইনি যে স্বয়ং প্রদোষবাবু।

সম্পাদক। তবে খবর সত্যি সন্দেহ নাই। কারণ আপনি যখন ছদ্মবেশে এসেছেন তখন নিশ্চয় লজ্জায় এরকম বলছেন।

যোগজীবন। একথা কি এত কষ্ট করে বুঝতে হল! লজ্জাতেই উনি এরকম বলছেন—দেখছেন না ওঁর মুখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছে।

প্রদোষ। রাস্কেল—ষ্টুপিড্।

যোগজীবন। আজ আমার জীবন ধন্য, স্বয়ং প্রদোষবাবু আজ আমাকে স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে ভর্ৎসনা করছেন! প্রভু, ভারত-উদ্ধারকারী

ধূমকেতু, তোমার পায়ের এক পাটি চটি মারিয়া আমাকে ধন্য কর!

সম্পাদক। আহা প্রদোষবাবু মারবেন না, মারবেন না।

গোবর্দ্ধন। থামুন থামুন মশায়! আজ আমাকে এমন সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত করবেন না। হে বঙ্গ-গগনের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক, হে আমার ভাবী ভগ্নীপতি, আমাকে—আমাকেও এক পাটি।

(অসীম ও নীরেশের প্রবেশ)

নীরেশ। খবরদার প্রদোষ অমন কাজও করো না। ভক্তির আতিশয্যে দুই জন দুই পাটি নিয়ে সরে পড়বে।

প্রদোষ। মশায় সমস্ত খবর মিথ্যা—কিছু যেন ছাপা না হয়।

গোবর্দ্ধন। মশায় এত যে সহ্য করলাম সে কি মিথ্যার জন্য?

যোগজীবন। আজই যেন সমস্ত খবর দিয়ে এক কলম বের হয়।

অসীম। রাস্কেল দুটোকে পুলিসে দেওয়া যাক্।

নীরেশ। আর গোলমাল করে কাজ নেই চল।

(দুই জনের প্রস্থান)

অসীম। সব খবর মিথ্যা—তাড়াতাড়ি বাড়ীতে গিয়ে জানাতে হচ্ছে। খবর শুনে অবধি ক্ষণিকার ফিট হচ্ছে। মেয়ে মানুষ কিনা—একটুতেই কাতর হয়ে পড়েছে। (প্রস্থান)

গোবর্দ্ধন। যাঃ ফস্কে গেল!

যোগজীবন। কোনো ভয় নেই! চল, এবার নবকান্তকে ধরি গে।

চতুর্থ দৃশ্য

১

পথে নবকান্ত

নবকান্ত। উঃ বাড়ীতে টেকবার জো নেই—জগত্তারণবাবুর খোঁচা অসহ্য! যেন আমার চেয়ে তাঁর ভালবাসা বেশি! নাঃ প্রেম জিনিষটা জোনাকির আগুন—দেখতেই উজ্জ্বল—ও দিয়ে কোনো কাজ হয় না। কিন্তু এখন লাটের চিঠিখানা ফিরিয়ে পেলে যে হয়।

(জগত্তারণবাবুর প্রবেশ)

জগত্তারণ। আরে নবকান্ত শোনো, শোনো এবার তোমার পথ পরিষ্কার।

নবকান্ত। হ্যাঃ একেবারে সব পরিষ্কার হয়ে গেছে—লাটের চিঠিখানা পর্য্যন্ত!

জগত্তারণ। কোনো ভয় নেই—এবারে টোপ্ ফেল্‌লেই—

নবকান্ত। আমার দরকার নেই মশায়—আপনি ফেলুন গিয়ে। মহা মুস্কিল—এদিকে কাজে join করবার দিন এসে গেল অথচ চিঠিখানা না নিয়ে যাই কেমন করে!

জগত্তারণ। লাটের চিঠি তো সামান্য—সেই তাঁর······

নবকান্ত। রাখুন মশায় আপনার তাঁর···তাঁর চিঠিতে কি চাকরী জোটে?

জগত্তারণ। ছিঃ ছিঃ এমন কথা বল্‌তে নেই! তাহলে তুমি নিতান্তই

নাচার···তবে আমাদের উল্টোদীঘির আর একটা ছেলেকে engage করতে হ'ল দেখছি। (প্রস্থান)

নবকান্ত। সেই ভালো।

(যোগজীবন ও গোবর্দ্ধনের প্রবেশ)

যোগজীবন। আরে নবকান্তবাবু এত বিমর্ষ কেন?

নবকান্ত। আর ভাই তোমাদের লাটের চিঠি খোয়া গেলে তোমরাও এমন করতে।

গোবর্দ্ধন। আহা বড় দুঃখের বিষয়!

যোগজীবন। কিন্তু ভয় নেই। আপনাকে সে চিঠি জোগাড় করে দেব।

নবকান্ত। ঠিক্ দেবে! তোমার কাছে চির-ঋণী হয়ে থাকবো। দেখ লাট সাহেব নিজ হাতে লিখেছিলেন—সেক্রেটারি নয়—একেবারে নিজ হাতে—

গোবর্দ্ধন। তা তো হবেই—একজন ফাষ্ট গ্রেড ডেপুটি···

নবকান্ত। নিজে লিখেছিলেন—I have the honour to be, Sir, your most obedient Servant···

গোবর্দ্ধন। কি বল্‌লেন স্যর, Servant?···

যোগজীবন। দেখুন আমার কথা শুনে যদি চলেন তবে চিঠিখানা পাবেন।

নবকান্ত। কেমন করে?

যোগজীবন। ক্ষণিকার সঙ্গে যার আলাপ আছে তাকে দিয়ে ওখানা আনিয়ে দিতে হবে।

নবকান্ত। তেমন কে আছে?

যোগজীবন। এই তো গোবর্দ্ধনের বোন্ আছে···

নবকান্ত। আবার বোন্—না মশায় আমার চিঠিতে কাজ নেই।

গোবর্দ্ধন। ভয় কিসের!

নবকান্ত। ভরসাই বা কি! মেয়ে মানুষের সঙ্গে আর আলাপ করছিনে। মেয়েরা যেন কাশীর বাঙালীটোলার গলি—এঁকে বেঁকে গেছে—পথ না জান্‌লে একই স্থানে ঘুরতে হয়—এগোনো যায় না।

গোবর্দ্ধন। বেশ তো আলাপ নাই করলেন—শুধু চিঠি খানা নিয়ে চলে আস্‌বেন।

নবকান্ত। কিন্তু দেখো···

যোগজীবন। আরে···না···না এ মেয়ে তেমন নয়···এ যে সরল রাজপথ।

নবকান্ত। তবে চল আর দেরী নয়।

যোগজীবন। (জনান্তিকে) দেখলে গোবর্দ্ধন—এবার আর ফস্কাবে না। (প্রস্থান)

২

(আদিনাথবাবুর বাটী)

অতুল। দিদি তোমার কাল অসুখ হয়েছিল আজই ভাত খেলে!

ক্ষণিকা। অসুখ সেরে গেছে ভাই।

অতুল। তোমার কি অসুখ হয়েছিল দিদি!

ক্ষণিকা। সে ভীষণ অসুখ।

অতুল। তোমার অসুখ এত তাড়াতাড়ি সারে কি করে?

ক্ষণিকা। খুব ভাল ওষুধ খেয়েছিলে বুঝি।

ক্ষণিকা। চট্ করে গিয়ে অসীমকে ডেকে নিয়ে আয় তো!

(অসীমের প্রস্থান)

(প্রদোষের প্রবেশ)

প্রদোষ। অসীমকে ডাকতে পাঠালে তো। এখন যদি একজনের বদলে দুই জন এসে উপস্থিত হয়!

ক্ষণিকা। অসীম বাড়ীতে থাকলে তো!

প্রদোষ। যাক্ তবে নিশ্চিন্ত! একটা সুখবর আছে।

ক্ষণিকা। কি ডেপুটিগিরি জুটেছে নাকি?

প্রদোষ। বোধ হয় জুটুবে—লাট সাহেবের চিঠি পেয়েছি!

ক্ষণিকা। সত্যি নাকি কই দেখি দেখি।

প্রদোষ। দেখাতে ভয় হয়—পাছে দেখতে নিয়ে আটুকে রেখে দাও!

ক্ষণিকা। কেন আমার লাটের চিঠি দিয়ে দরকার কি?

প্রদোষ। কেমন করে বলব। এক জন তো চিঠি হারিয়ে এখন পথে পথে হায় হায় করে মরছে।

ক্ষণিকা। আঃ সে কথা থাক্।

(নীরেশের প্রবেশ)

ক্ষণিকা। আসুন নীরেশবাবু।

নীরেশ। যাক্ তবু আপনি যে ভোলেন নি তাই যথেষ্ট। আর এক জন তো তীরে উঠে তরীতে লাথি মেরেছে।

প্রদোষ। আঃ নীরেশ এ তোমার অন্যায়।

নীরেশ। একশ বার স্বীকার করছি কারণ নৌকার বোঝা উচিত সে জলে চলবার জন্য—তীরে উঠে তার আর আবশ্যক কি?

ক্ষণিকা। তাই তো নীরেশবাবু, জলে স্থলে অন্তরীক্ষে চলে এমন একটা যান জার্ম্মানিতে ফরমাস দিয়ে পেটেণ্ট করিয়ে নেবেন।

নীরেশ। নাঃ আর আশা নেই—স্বয়ং জজ যখন আসামীর ওকালতি

গ্রহণ করছেন। আশা করি—আপনাদের সেই মাথা ধরাটা সেরেছে।

প্রদোষ। কই আর তো বুঝতে পারিনে!

নীরেশ। তবে একটা সার্টিফিকেট লিখে দাও কর্পোরেশনের নূতন চীফ ইঞ্জিনিয়ারের এটা একটা মস্ত কৃতিত্ব।

ক্ষণিকা। আপনারা থাকুন—আমি যাই বাবা আস্‌ছেন।

(প্রস্থান)

(আদিনাথবাবুর প্রবেশ)

আদিনাথ। নীরেশ চল কিঞ্চিৎ জলযোগ—

নীরেশ। জলযোগের চেয়ে বড় যোগও হচ্ছে তো।

আদিনাথ। তা বটে তা বটে।

নীরেশ। তা বলে জলযোগের কথাটা ভুলবেন না—দেখুন, মিষ্টান্ন-মিতরে জনা কথাটা শাস্ত্রকার অনেক দুঃখে লিখেছিলেন।

আদিনাথ। কেন, কেন।

নীরেশ। কারণ আমি অনেক চেষ্টা করেও ঐ ইতরতার উপরে উঠ্‌তে পারলাম না!

আদিনাথ। তা মন্দ কি, আজ কাল কম্যুনিজ্‌মের যুগ—

নীরেশ। সেই একমাত্র ভরসা।

অসীমের সহিত ভৃত্য জল খাবার
লইয়া প্রবেশ করিল।

আদিনাথ। নীরেশ, তাহলে বিয়ের তারিখটা এ মাসের চৌদ্দই থাক্।

নীরেশ। তাই ভালো। একেবারে সব বদলানো ভালো নয়—অন্তত তারিখটা ঠিক রাখা উচিত।

আদিনাথ। অসীম তুমি তাহলে চিঠিগুলো ছাপতে দিয়ে এস।

অসীম। নীরেশবাবু—আপনারা খান আমি চল্লাম। (প্রস্থান)

(আগামী বারে শেষ)

———

দুর্জ্জয় মান

[শ্রীশ্রীপদ কোকনদ নামক যে পদ-সংগ্রহের পুঁথি সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতে নিম্নোদ্ধৃত পদটি পাওয়া যায়। পদে কোনও ভণিতা না থাকায় রচয়িতার নাম জানা যায় না। এ বিষয়ে গবেষণা প্রয়োজন। কেহ কেহ মনে করেন ইহা গোবিন্দদাস কবিরাজের রচনা। আমাদের কিন্তু সন্দেহ হয়, কোনও অর্ব্বাচীন কবি প্রাচীন পুঁথির মধ্যে এই পদটি প্রক্ষিপ্ত করিয়াছেন; কারণ কার্য্যকলাপ সম্পূর্ণ আধুনিক ধরণের। বিশেষজ্ঞদিগের মতামত আহ্বান করিতেছি। —চন্দ্রহাস]

সখীর প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি :—

মান ভরে সব কোপিনী সুন্দরী
করে ধরি টানল কাণ।
বিষম টানে মঝু কর্ণে হুতাশন
রহত কি যাত পরাণ॥
কহিলুঁ বিনয় করি কাণ ছাড় ধনি
অতি সঙ্কট মম হাল।
রোখে উঠিয়া তব কেশ ধরি মঝু
আঁচড়ি দেয়ল গাল॥
ধনি ধনি অব তুহুঁ রাখহ প্রাণ।
কোপ শরে তব তনু অতি জরজর
গাল ভৈল খান খান॥ ধ্রু॥
মিনতি করলুঁ হাম রোই রোই যত
পাথর দ্রব ভৈ যাই।

তবহুঁ সো রাই বিনয় নহি মানল
লোহিত-লোচনে চাই ॥
নিকটে যাই যব কর দুহুঁ ধারই
চাহিলুঁ টুটইতে মান।
নাসাপর মুঝ ঘূঁষি চলাওল
দারুণ বজর সমান ॥
মুণ্ড ঘুরি হম পরলুঁ চরণ তলে
নয়নে হেরি আঁধিয়ার।
তবহুঁ সো কোপ কঠিন-হিয় নাগরি
মোহে ন করল পিয়ার ॥
চরণ ধরিতে যব কর পরসারলুঁ
নিতম্বে মারল লাথি।
কুঞ্জ তেজি হম দ্রুতগতি ভাগলুঁ
আগ ভয়ে জনু হাতী ॥
এ সখি শুন শুন হম ন যাব পুন
সো ধনি রণ-চামুণ্ডা।
প্রেম হুতাশনে জীবন সংশয়
দেহ ভেল মঝু গুণ্ডা ॥
ব্রজ গোকুল অব ছোড়ি চললুঁ হম
চলি যাওব মধুপুরে।
জীবন যৌবন অভয়ে ডারি দিব
কুবুজিক চরণ-নূপুরে ॥

সংবাদ-সাহিত্য

মাসিক পত্র ত অনেক দেখিলাম, কিন্তু কোথাও প্রাণ খোলা সরলতা দেখিলাম না। আধুনিক যুগটাই সরলতা-ধর্ম্মের বিরোধী; আন্তরিকতা এ যুগে পাপ, আত্মম্ভরিতা ধর্ম্ম, এবং আত্মপ্রচার আত্মোন্নতি। এ হেন যুগে কোনো সম্পাদক যদি সাহসপূর্ব্বক যুগ-প্রভাব অগ্রাহ্য করিয়া খোলা গায়ে খোলা প্রাণে আমাদের সম্মুখে হাজির হন তাহা হইলে তাঁহাকে আমরা কি করিব? কি করিব তাহাই ভাবিতেছি।

—

যাহা সহজ এবং যাহা প্রাণ-চায়-তাহাই করিবার সাহসকে আমরা প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। সহজপন্থীকে সহজিয়াপন্থী কবিত্ব করিয়া বলা যায় বটে, কিন্তু তাহাতে পন্থীর কিছুই আসিয়া যায় না। সত্যই আমাদের আজ প্রেরণা জাগিয়াছে। কখন কোথায় কিসে কি হইয়া যায় আমরা বুঝি না। কিন্তু ভাদ্রের উদয়নের প্রথম ছবি "প্রফুল্ল-কানন" আমাদের সুখ দিয়াছে। নিজের বাগানবাড়ির ফোটো এমন করিয়া ডাঃ সুনীতি চাটুয্যের বৃহত্তর বঙ্গের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়াইয়া দিতে আর কে পারিত?

ইহা যে নিতান্তই বাগানবাড়ি!—রাজ প্রাসাদ নয়, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল নয়, মিউজিয়াম নয়, নিতান্তই সাদাসিধা একতলা বাড়ি! এ বাড়িতে শ্রীশ চাটুজ্যের ইণ্ডিয়ান আর্ট নাই, ডোরিক গথিকের

স্থূলতা নাই, স্যারাসিনিকের কারু নাই এ যে নিতান্তই মাড়োয়ারী প্যাটার্ণ! "নাই আমাদের কনক চাঁপার কুঞ্জ"—সামনে আছে শুধু একটি ডোবা, আর পশ্চাতে এবং পাশে আছে গুটি কত নারিকেল গাছ। মাছ ধরিয়া ডাব বেচিয়া মালীর কিছু হইতেও পারে, কিন্তু মালিকের আনন্দ উহা পাঁচজনকে দেখাইয়া। ইহাই সরলতা। সরলতা কি আর গাছে ধরে?

—

উদয়ন উল্টাইয়া যাইতে যাইতে দেখিতে পাইলাম "রাতের ব্যথা।" রাত্রেই কাগজখানি পড়িতেছিলাম—অত্যন্ত গরম, এক ফোঁটা বৃষ্টি নাই। ব্যথা স্বভাবতই পাইতেছিলাম, সুতরাং "রাতের ব্যথা" দেখিবামাত্র আনন্দে হৃদয় নাচিয়া উঠিল; শুধু আমাদেরই নহে, আরো পাঁচজনেরও যে রাতের ব্যথা থাকিতে পারে ইহা স্মরণ করিয়া সত্যই ব্যথা দূর হইল। কবিতাটি না পড়িয়া পারিলাম না, পড়িয়া আরো আরাম বোধ করিলাম।

—

শ্রীমতী আভা গুপ্তা বলিতেছেন—

প্রিয়া নাই পাশে—অনুরাগ ভরা তরল আঁখি। হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়াছিলাম। কিন্তু ওটা আমাদেরই ভুল। কারণ কিছু পরেই দেখিতেছি—

> অধরে অধরে গভীর স্পর্শ—না বলা বাণী
> সঞ্চিত সুধা ঢেলে দিতে চায় পরাণখানি।
> নয়নের কোণে আদর ঝুরিছে—আবেশ প্রাণে···

এ বিরহী নিশ্চয় সম্মুখে আয়না ধরিয়া কবিতা লিখিয়াছে—না হইলে নয়নের কোণ হইতে ঝুরায়মান আদর দেখিল কেমন করিয়া?—আদরে

ত আর গামছা, রুমাল, ব্লটিং পেপার কিংবা স্পঞ্জ ভেজে না যে চোখের কোণে একবার উহা বুলাইয়া লইলেই টের পাওয়া যাইবে!

—

কিন্তু সে যাহাই হউক উক্ত বিরহী একেবারে কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান হারাইয়া ফেলিয়াছে। সে বলিতেছে—

সম্বিত-হারা—আকাশের পানে চাহিয়া থাকি।

কোন অবস্থায় পৌছিলে লোকে সম্বিত হারায় লেখিকা সেটা ভাবিয়া দেখেন নাই। কিন্তু ইহাতেও আমরা মনে কিছু করি নাই, আমরা ভাবিতেছি,

স্থদূর হইতে স্থদূরে চলেছে সম্ভাষণ
মিলন-রভসে ভরিয়া উঠিছে নীল গগন!

ইহা হইল কেন? লেখিকা নীল গগনের উপর এতখানি স্নেহ দেখাইতে পারিলেন অথচ বেচারা বাতাসই দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া মরিল! এদিকে—"রজনীর নেশা মিছে হ'লো শুধু আমারি কাছে।" —রজনী কি জাতীর নেশা করিয়াছিল?

—

কাগজখানি আর উল্টাইবার বাসনা ছিল না, কিন্তু হঠাৎ পূব দিক হইতে একটা দমকা হাওয়া আসিয়া কয়েকখানা পাতা একবারে উল্টাইয়া দিল। একেবারে "ঘরে বাইরে"তে গিয়া উপস্থিত হইলাম। প্রথমেই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ছবি, নমস্কার করিয়া তাঁহার সম্বন্ধে লেখাটি পড়িতে আরম্ভ করিলাম।

—

উদয়ন বলিতেছেন—

এই অর্দ্ধ শতাব্দী কালের ভিতরে এত বড় ভারতে এমন একজন লোক জন্মগ্রহণ করিলেন না, যিনি বিদ্যাসাগরের

> স্থান নিতে পারেন। সুতরাং তাঁর নাম আজ আমরা বার বার শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি।

—

"সুতরাং" কথাটির বাহাদুরি! বিদ্যাসাগরের স্থান গ্রহণ করিবার মত কেহ জন্মিলে এই সব গোলমালের দরকার হইত না। জন্মে নাই তাই স্মরণ করিতেছি। জন্মিলে ভাষাও অন্যরূপ হইত। তখন "সুতরাং" না লিখিয়া "তৎসত্ত্বেও" লিখিতে হইত; অবশ্য স্মরণ করিবার দরকার হইলে।

—

বিদ্যাসাগরের আত্মমর্য্যদাও অসাধারণ ছিল—

> এই তেজস্বী ব্রাহ্মণ আত্মমর্য্যাদায় ছিলেন স্থাণুর মত স্থির।···

অর্থাৎ মাথায় কেহ চাঁটি মারিয়া গেলেও কথাটি কহিতেন না। আত্ম-মর্য্যাদা বিষয়ে জড়ধর্ম্মী হওয়া শুধু কি বিদ্যাসাগরেরই কৃতিত্ব?

—

বিদ্যাসাগরের সেবার একটা "অনুভূতি" ছিল। যেমন ইংরেজের রাজ্যশাসন করিবার অনুভূতি আছে, ক্যাপ্টেন স্কটের যেমন দক্ষিণ মেরুতে যাইবার অনুভূতি ছিল, মেবুরু-এর যেমন নাঙ্গা পর্ব্বতে উঠিবার অনুভূতি ছিল, বাঙালীর যেমন কাগজ বাহির করিবার অনুভূতি আছে বিদ্যাসাগরের তেমনি সেবার অনুভূতি ছিল। উদয়ন বলেন—

> তাঁর সেবার অনুভূতি···দেশে আজ মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে।

বিদ্যাসাগর চরিত রচনায় উদয়নকে ভবভূতি ছাড়া আর কি বলা যাইতে পারে।

তিলক সম্বন্ধেও উদয়নের উদারতা আছে—

> বালগঙ্গাধর তিলক অমর হয়ে আছেন নব্যভারতের জনগণের কাছে। কিন্তু তাঁর এ অমরত্ব লাভের ভিতর ফাঁকি নেই—ভেজাল নেই।

অর্থাৎ উদয়নের ধারণা, অমরত্ব লাভ করিতে হইলে কিছু ভেজাল এবং কিছু ফাঁকি দরকার হয়। Adulterated অমৃত দ্বারা অমরত্ব লাভ ত একটা সাধারণ ঘটনা—কিন্তু তিলক, কর্পোরেশনের সার্টিফিকেট-প্রাপ্ত অমৃত পান করিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসে এরূপ ঘটনা ইতিপূর্ব্বে আর ঘটে নাই।

—

হঠাৎ একটা ভবিষ্যৎ বাণীতেও আমরা পরিতুষ্ট হইলাম—

> বাংলার বাইরে যে সব বাঙালী ছড়িয়ে পড়ে আছেন তাঁদের সংখ্যা সামান্য নয়। এই বিপুল সঙ্ঘের সঙ্গে বাংলার যোগ বাঁচিয়ে রেখেছে প্রধানতঃ বাংলা-সাহিত্য এবং অতি দূর ভবিষ্যতেও যদি কেউ তাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে তবে তাও রাখবে এই বাংলা সাহিত্যই।

লিখিবার সময় লেখকের মনটা বেশ খুশী ছিল বলিয়া বোধ হয়। অতি দূর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দৈববাণী করিবার ইচ্ছা মানসিক অবস্থা বিশেষের উপরেই নির্ভর করে।

—

ইহার পর অন্য এক বিখ্যাত ব্যক্তি সম্বন্ধে উদয়নের কল্পনা একেবারে উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছে। ইনি "ভন হিণ্ডেবার্গ।" কিন্তু ইনি "ভন" নহেন "ফন", দ্বিতীয়ত ইনি "হিণ্ডেনবার্গ" নহেন "হিণ্ডেন-বুর্গ।" এই সামান্য দুইটি প্রমাদ ছাড়া নামটি মোটামুটি ঠিক

হইয়াছে। রুষ সেনানায়কও একটু বিব্রত হইয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। উদয়ন লিখিয়াছেন শ্যামসেলফ। তাঁহার নাম অবশ্য Samsonov. ইহার পর বিস্‌মার্ক এবং হিণ্ডেনবুর্গ সম্পর্কে যে সব ঐতিহাসিক গবেষণা করা হইয়াছে তাহার লেখক নিশ্চয়ই বিস্‌মার্ক সম্বন্ধে বিস্তারিত কিছু জানেন না এবং হিণ্ডেনবুর্গ সম্বন্ধে খুব সামান্যই জানেন। আমরাও এইটুকুই জানিলাম।

—

ঠান্‌দিদির রূপকথার ভাষাও উদয়ন অনেকটা আয়ত্ত করিয়া আনিয়াছেন, যথা—

> উত্তর ভারতের কোন-না-কোন সহরে এই অধিবেশন হ'য়ে আসছে প্রায় প্রতি বৎসরেই…এবার বাংলা নিমন্ত্রণ করেছে তার প্রবাসী ভাইদের কলিকাতায় এই সম্মিলন উপলক্ষ্যে।…বালিকা বিদ্যালয় সমূহের মধ্যে যাঁর কাজ উৎকৃষ্ট হবে তাঁকে অনারেবল নবাব ফারোকী সাহেব দেবেন কাপ।

'রাতের ব্যথা" কি সম্পাদকীয় লেখককেও আক্রমণ করিয়াছে? সবই যে কবিতা হইয়া উঠিল!

—

কিন্তু শুধু কাব্য নয়, নাটকও আছে।—

> বনগাঁও (?) এর কাছাকাছি একটি যায়গায় এসে আগের একখানি গাড়িকে অতিক্রম করতে গিয়ে গাছের সঙ্গে লাগে তাঁর গাড়ির ধাক্কা। ফলে গাড়ির সামনের অংশটা ভেঙে যায় এবং ষ্টিয়ারিং হুইলের 'রডে' আঘাত লেগে কুমারের বুক বিদীর্ণ হয়ে যায়। এই শোচনীয় মৃত্যুতে তাঁর

পরিবারের ভিতরে শোকের যে দুঃসহ জ্বালা জেগে উঠেছে তা সহ্য করা কঠিন।

—

গত মাসে লিখিয়াছিলাম, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বর্ত্তমানে প্রমাণ করিতেছেন যে আমাদের দেশের কোনো খ্যাতনাম ব্যক্তিই ঠিক তারিখে জন্মগ্রহণ করেন নাই। তিনি রাজা রামমোহন রায়ের বয়স কমাইয়া দিয়াছেন। আমরা মাত্র এই দুইজনের কথা উল্লেখ করিয়াছিলাম। আমাদের ভুল হইয়াছিল। কিছুদিন পূর্ব্বে সাহিত্যপরিষদ পত্রিকায় তিনি প্রমাণ করিয়াছেন কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের জন্মবৎসর ১৮৪১ নহে ১৮৪০। বয়স এক বৎসর বাড়িয়া গেল। ব্রজেন্দ্রবাবু নাকি বলিতেছেন, তিনি কাহাকেও ছাড়িবেন না।

—

প্রবাসীকে এত দিন পরে সর্ব্বসংস্কার বর্জ্জিত প্রগতিপন্থীরূপে দেখিয়া আনন্দিত হইলাম। তবে স্যানিটারি ল্যাট্রিনের নাম করিবার আগেই দেশী পায়খানার নাম উল্লেখ করায় প্রগতিটা উগ্ররূপ ধারণ করিয়াছে। ৬৩৬ পৃষ্ঠায় দেখিতেছি—

> রাত তখন প্রায় ন'টা, দাদা পায়খানা থেকে ফিরে এসে রান্না চড়ালে। কি বিশ্রী জায়গাতেই থাকে!...

ইহা ছাড়াও উক্ত বস্তুর নাম আরো কয়েক জায়গায় আছে, কিন্তু সেগুলি ছাপার ভুলে "কারখানার"র রূপ ধারণ করিয়াছে।

—

তবু ইহাকে রস বৈচিত্র্যহীন বর্ণনা বলিয়া মানিয়া লইলে গুরুতর আপত্তি করিবার কিছু থাকে না, কিন্তু ষ্টেটমেণ্ট অব ফ্যাক্ট-এর পথে না গিয়া যেখানে আপত্তিকর শব্দদ্বারা রসসৃষ্টি করিবার প্রয়াস দেখা

সেখানেও প্রবাসীর সমর্থন দেখিয়া আমরা শুধু আনন্দিত হইতে পারিলাম না পুলকিত হইলাম।

৬৫৬ পৃষ্ঠায়—

> এগার জন বাঙ্গালী খদ্দের পাইয়া সে সব রকম কষ্ট এবং অসুবিধাই স্বীকার করিতে রাজি হইল,—বারান্দা উনান পরিষ্কার করিতে, রাঁধিবার তৈজস পত্র মাজিয়া লইতে, কাপড় ছাড়িতে, এমন কি নিজের বরাঙ্গের উপর একবার ভিজা গামছাটা বুলাইয়া লইতেও।

টীকা নিষ্প্রয়োজন।

—

প্রবাসীর চিত্রপরিচয় বিভাগ উঠিয়া গেল কেন? পূর্ব্বে যে সব চিত্রের পরিচয় ছাপা হইত—তাহা বুঝিতে কিন্তু "পরিচয়ে"র ততটা আবশ্যক হইত না। পরিচয় বর্ত্তমানে আবশ্যক। কেননা অধিকাংশ চিত্রই হয় চিত্রের সীমানায় পৌছিতে পারিতেছে না, না হয় চিত্রের সীমানা লঙ্ঘন করিতেছে। আমরা আর কত পরিচয় দিব? "নীল-ফুল" নামক ছবিতে চিত্রকর একটি নূতন ধরণের কাপড় আমদানি করিয়াছেন। কাপড় খানা লাল রবারের। রবারের থলিও বলা চলে। একটি নীল রঙের স্ত্রীলোক এই থলির মধ্যে বসিয়া আছে—থলিটি পাম্প করিয়া ফুলাইয়া দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু অর্দ্ধোন্মুক্তবক্ষা স্ত্রীলোকটি হঠাৎ গাঢ় নীলে রঞ্জিত হইল কেন? বোধ হয় স্ত্রীলোকটি মহাসমুদ্রের প্রতীক। হতভাগ্য মানব আত্মহত্যা করিবার জন্য এই মহাসমুদ্রের তরঙ্গান্বিত নীল বুকে ঝাঁপাইয়া পড়ে। ইহার দুই হাতে দুইটি শাদা ফুল। নদীতে ভাসিয়া আসিয়া ফুল দুইটি সমুদ্রে পড়িয়াছে। মোট কথা ইহা চিত্র নহে চিত্রের ছলে দার্শনিক তত্ত্ব। মহেশ ঘোষ

মহাশয়ের স্বর্গারোহনের পর হইতে প্রবাসীর দার্শনিক বিভাগটি চিত্রকরের হাতে সমর্পিত হইয়াছে।

"শুষ্কতরু" নামক আর একখানি ছবিতে একটি বৃদ্ধ মুসলমান মাথায় লাল ক্যাপ এবং হাতে লাল ছড়ি লইয়া ছাদে দাঁড়ানো অভ্যাস করিতেছেন। ইঁহার পোষাকের পারিপাট্য এবং বিন্যাস দেখিলে রস-সাগর বলিয়াই মনে হয়, শুষ্কতরু মনে হয় না।

—

রবীন্দ্রনাথ যাহাদের লইয়া কাব্যের উপেক্ষিতা লিখিয়াছিলেন তাহারা এতদিন পরে একে একে কবিকুলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। ঊর্ম্মিলাকে লইয়া প্রবাসী শুভ পুণ্যাহ করিয়াছেন।

বাল্মীকির অনাদৃতা সতীত্বের খনি,
চতুর্দ্দশ বর্ষ হায়, দিন গণি গণি
কাটাইলে!

এতদিন জানিতাম খনিতে ধাতু, তেল, হীরক, কয়লা প্রভৃতিই পাওয়া যায়, এখন জানিলাম, সতীত্বও খনিজ পদার্থ। ঊর্ম্মিলা যদি সতীত্বের খনি হয় তাহা হইলে সীতা কি?

—

উদয়ন সম্পর্কে অনেক কথাই বলিয়াছি—কিন্তু তবু কিছু বাকী আছে। "প্রেম-কম্পন" বিষয়ে কিছুই বলা হয় নাই। প্রথম ম্যালেরিয়া আক্রমণ করিলে যে সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়—কম্পন, তৃষ্ণা, এবং ঘাম দিয়া জ্বর ছাড়া—এ সমস্তই প্রেমের নামে চলিয়া গেল! চতুর কবি রূপকের সাহায্যে ম্যালেরিয়া বর্ণনায় বেশ কৃতিত্ব

দেখাইয়াছেন। কিন্তু শেষের দিকে অর্থ লইয়া একটু গোলমালে পড়িয়াছি।

দুটি গণ্ডের কোমল শয়নে
শোভে অনুরাগ-ঘনিমা।

"ঘনিমা" স্থলে "লঘিমা" হইবে, কেননা ম্যালেরিয়ায় রক্তাল্পতা ঘটে। তবে প্রথম অবস্থায় উত্তাপে মুখচোখ লাল হওয়া স্বাভাবিক।

তারপর—

গ্রীবাখানি যেন প্রেমের স্বরগ
যেন মদনের সুখ ঠাঁই
গ্রীবা গরিমায় ডুবে যেতে চাই
গ্রীবা ধরে যেন মরে যাই।

"গ্রীবা গরিমায়" স্থলে যদি "গ্রীবার গরমে" পড়া যায় তাহা হইলে "ডুবে যেতে চাই" স্থলে "পুড়ে যেতে চাই" হইবে। কিন্তু যাহার গরিমায় ডুবিতে হইবে—তাহাকে ধরিয়াই মারা যাওয়াটা ভাল দেখায় না। এতটা লয়্যাল্টি না থাকিলেও চলে।

অধ্যাপক-কবির ব্যাপার খুব সুবিধাজনক মনে হয় না;

বসনে গোপন বক্ষ-কমল—
কুয়াশায় ঢাকা নলিনী
তারও আহ্বানে কেঁপে ওঠে বুক
সে যে দুনয়ন মোহিনী।

অধ্যাপক হওয়ার এই বিপদ। কেবল কাঁপিতে হয়। ছাত্রাবস্থায়

যে সব সিচুয়েশনে আনন্দ দেয়—অধ্যাপক অবস্থায় তাহাই কাঁপাইতে থাকে। ইহার কি কোনো প্রতিকার নাই ?

—

তারপর—

এই এই মোর অতুলা প্রেয়সী
এ যে দিল আজি কম্পন ;
প্রেম-কম্পনে জেগে উঠি আজ
জেগে ওঠে সারা প্রাণ মন।

"এই এই" কি ? "হেই হেই" এর ভিন্নরূপ ? কিন্তু কম্পন ছাড়া প্রেয়সী আর কি দান করিবে ? ম্যালেরিয়ার যে উহাই পুঁজি ! টাইফয়েড, নিউমোনিয়া কিংবা কলেরা জাতীয় কিছু হইলে অধ্যাপকের পক্ষে যে তাহা অধ্যশন হইয়া উঠিত, সামাল দিতে পারিতেন না !

—

কলিকাতা এবং ঢাকা উভয় স্থান হইতেই পূর্ব্বাচল বাহির হইতেছে। কলিকাতার পূর্ব্বাচল আমরা আষাঢ় মাসে পাইয়াছি—শ্রাবণ মাসে পাইলাম ঢাকার পূর্ব্বাচল। প্রথমত মনে করিয়াছিলাম ষ্টেটস্‌ম্যানের মত ইহা একই সঙ্গে ঢাকায় এবং কলিকাতায় ছাপা হইতেছে। পরে আমাদের সে ভুল ভাঙিয়াছে। সে ইতিহাস শ্রাবণ সংখ্যা শনিবারের চিঠিতে আছে। অর্থাৎ ঢাকার পূর্ব্বাচল এখনো অচল নহে—ভাদ্র সংখ্যাও আমাদের হস্তগত হইয়াছে।

—

প্রথমেই সম্পাদক লিখিতেছেন—

জাতীয়তা বাদ দিয়ে কোনো সাহিত্যকেই ভাবন যায় না।

যেমন যায় না নক্ষত্রগুলোকে বাদ দিয়ে আকাশের কথা ভাবন।

লেখক ভূপেন্দ্রকিশোর বর্ম্মণ মহাশয়ের বর্ম্মণটাও কি gerund ? কিন্তু বর্ম্মণ মহাশয় নূতন কিছু করিলেন বলিয়া উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছেন কেন ? ঢাকায় ত 'যাওন' 'করণ' 'ভাবন'—বহুদিন হইতেই চলিতেছে ! প্রথম-লিখিলেন বলিয়া আনন্দ ? লেখাও পূর্ব্বে দেখিয়াছি। এমন কি গাড়োয়ানী ভাষাও ছাপার অক্ষরে আছে।

—

বাঙালীর ভাষা যাঁহারা সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন তাঁহারা বাঙালীর ভাষাই লিখিয়াছেন, বাঙালের ভাষা লেখেন নাই। এখন যদি কেহ বাঙালের ভাষা লিখিয়া তাহা বাঙালীর ভাষা বলিয়া চালাইতে চাহেন তাহা হইলে স্থান বিশেষের কাপড় তোলন এবং বেতন ছাড়া আর কি প্রতিকার বাঙালী করিতে পারে ? জিরাণ্ডের প্রতিকার জিরাণ্ডের দ্বারাই ভাল হইবে।

অলঙ্কার শাস্ত্রে যে সব অলঙ্কারের পরিচয় আছে তাহা সাহিত্যের ভাষা ভঙ্গি বিশ্লেষণ করিয়া পাওয়া গিয়াছে। প্রত্যেক অলঙ্কারের একটা স্বতন্ত্র রূপ আছে। সেই রূপ যতক্ষণ ভাষার অর্থসামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলে ততক্ষণই তাহা অলঙ্কার। অলঙ্কার নিজের উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইয়া অনর্থ সৃষ্টি করিতে পারে না। পৃথিবী গোল, টাকাও গোল, সুতরাং পৃথিবী যদি চলে তাহা হইলে আমার টাকাটাও চলিবে—কিংবা বিড়াল এবং গাধা উভয়েই চতুষ্পদ জন্তু সুতরাং বিড়াল যদি মাছ খায় তাহা হইলে

গাধাও মাছ খাইতে বাধ্য, এরূপ তর্ক চলে না। ইহা analogyর অপপ্রয়োগ। পূর্ব্বাচলের পক্ষে ইহা 'বোঝন' কি একেবারেই অসম্ভব?

—

পূর্ব্বাচল বলিতেছেন—

> রবীন্দ্রনাথ যদি লেখেন "প্রলয় নাচন, ভাঙন, মারণ, তা হ'লে "জাতির সর্ব্বনাশ ঘটিবার" কোনো কারণ নেই। আমরা যদি লেখি যাওন, আসন, খাওন, তা হ'লেই তাদের যত আপত্তি।

রবীন্দ্রনাথ যেটুকু লিখিয়াছেন তাহা তিনি বানাইয়া লেখেন নাই। বাঙালী বহু যুগ ধরিয়া মারণ উচাটন ভাষণ কথন করণ তরণ তারণ প্রভৃতি রূপ সংস্কৃত হইতে গ্রহণ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ তাহাই ব্যবহার করিয়াছেন মাত্র। লঘুকরণ, বশীকরণ, অধিকরণ, গমন, আগমন অবতরণ অভিভাষণ প্রভৃতি সংস্কৃত শব্দের অনুকরণে কতকগুলি খাঁটি বাংলা শব্দেরও সৃষ্টি হইয়াছে। নাচন, ভাঙন নড়ন গড়ন প্রভৃতি এই জাতীয়। বর্ম্মণ মনে করিয়াছেন এতটাই যখন হয় তাহা হইলে আরো একটু হইবে। অর্থাৎ ছেলে যখন মায়ের গলায় হাত দেয় তখন সে গলা টিপিবে না কেন? ছেলে যদি না টেপে তবে বর্ম্মণ আছেন। কিছু পয়সা আছে—ছাপাখানাও আছে।

—

পূর্ব্বাচলের খাওন যাওনের আতিশয্যে কাণ্ডজ্ঞান লোপ পাইয়াছে। কারণ—

> এই সব sectarian সমালোচকদের সমালোচনা বরাবরই একমুখো। কেউ হয়ত রবীন্দ্রভক্ত, রবীন্দ্র সাহিত্যের সমালোচনা লেখনই তার জীবনের একমাত্র ব্রত। অন্য কোনো লেখকের লেখার সমালোচনা করা চলতে পারে এ তাঁর

> ধারণায়ও স্থান পায় না। বরং তিনি সমালোচনা লেখা ছেড়ে দেবেন তাতেও রাজী তবু রবীন্দ্রনাথ ছাড়া অন্য কোন লেখকের লেখা নিয়ে সমালোচনা লিখতে রাজী নয়। তাদের ধারণা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহিত্যও লোপ পাবে।

রবীন্দ্রনাথকে পূর্ব্বাচলের প্রতিদ্বন্দ্বী কল্পনা করিয়া এই মান অভিমানের পালাটা আর একটু জমিতে পারিত, যদি ভাষায় আবোল-তাবোলের ভাগটা আর একটু কম থাকিত এবং ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যে যে পার্থক্য আছে সে সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ জ্ঞান থাকিত।

—

রবীন্দ্রনাথ যে ভাষা কিংবা সাহিত্য নহেন, জনৈক ব্যক্তি, তিনি দেহত্যাগ করিলেও যে তাঁহার সৃষ্টি থাকিয়া যাইতে পারে, এ বোধটুকুও লুপ্ত! সাহিত্য কি শুধু খাওন যাওন দিয়াই হইবে?

—

শ্রীনিবারণ চক্রবর্ত্তী নামক লেখক শাস্তিতে "বাঙ্গালা সাহিত্যে হাস্যরস" নামক প্রবন্ধে লিখিতেছেন—

> বর্ত্তমান যুগে হাস্যরস রচনায় কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বনোয়ারীলাল গোস্বামী, তারকনাথ সাধু, পরিমল গোস্বামী প্রভৃতি মহাশয়গণের নামও উল্লেখযোগ্য।

দেখিতেছি চক্রবর্ত্তী মহাশয়ও রসরচনায় হাত পাকাইয়াছেন।

—

গত মাসে শনিবারের চিঠিতে Primary Education in the City নামক যে বিদ্রূপাত্মক ছবি বাহির হইয়াছে—উহার ফলে শহরের বুক হইতে অসভ্য বিজ্ঞাপনগুলি দূর হইয়া যাইবে এতদূর আশা আমরা করি না—কিন্তু ইতিমধ্যেই বিদ্রূপের তীক্ষ্ণতায় কেহ কেহ কাবু হইয়া পড়িয়াছে। ভয়ও পাইয়াছে। পাছে এরূপ আন্দোলন হইলে নিজেদের কাগজের বুকে যে নবাবী বড়ি প্রভৃতির অশ্লীল বিজ্ঞাপন আছে তাহা তুলিয়া দিতে হয়! সম্প্রতি ঘোষাল নামক জনৈক কাগজী বুক চাপড়াইয়া চুল ছিঁড়িয়া মাথা ঠুকিয়া উন্মত্ত হইয়া

উঠিয়াছে। ভেলীর যে সংযম ছিল তাহাও নাই। লেজ পেটের নীচে আশ্রয় লইয়াছে। দেখিলে করুণা হয়।

—

"শান্তি" স্বর্গের সোপানের যে নক্সা দিয়াছেন তাহার ধাপগুলি কোনো এঞ্জিনীয়ারের পরিকল্পিত নহে; কেহই তাল সামলাইয়া ইহা অতিক্রম করিতে পারিবে না। যদি বা পারে, স্বর্গে পৌঁছিয়া দেখিবে জুয়াচোরের হাতে পড়িয়াছিল।

সীতা স্বরগের লাগি মরিয়া যে হয়েছ অমর
সেই সে বিজয়ী শুদ্ধ মৃত্যুঞ্জয়ী প্রেমিক প্রবর!
ভাল বেসে, বাধা পেয়ে, সেই মত আমিও মরিতে চাই
ধ্বংসের মাঝারে প্রেম পূর্ণ হয়ে জাগে
মহান এ নীতি আমি চিরদিন গাই।

এই শুদ্ধ প্রেমিক কে? রাম না রাবণ? সীতার জন্য মুখ্যভাবে মরিয়াছেন রাবণ; রামের মৃত্যু গৌণ। সেটা ঠিক সীতার জন্য না হইতে পারে। রামের মৃত্যুর পূর্ব্বে লক্ষ্মণের মৃত্যু হইয়াছিল কিন্তু তথাপি তাহাকেও সীতার শোকে মৃত্যু বলা যায় না। রামের মৃত্যু লক্ষ্মণের জন্যও হইতে পারে। সোপানের কবি বোধ হয় রাবণকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহার শেষ সোপান রচনা করিয়াছেন।

—

"একটি অপরাহ্নে" কবিশেখর তাঁহার মানসিক প্রমাদ এবং চিত্তের প্রসাদহীনতার কথা বিবৃত করিয়াছেন। স্থান ভারতবর্ষ, কাল, ভাদ্রের অপরাহ্ন।

…কোথা যাই ভেবে ভেবে আগাতে আগাতে
একপা দুইপা করি নগরেরে ফেলিনু পশ্চাতে।
অজানা ফুলের গন্ধ বহি আনি চপল পবন
উত্তরীয় ধরে টেনে নিয়ে গেল।…

সৌভাগ্য এই যে কালটা অপরাহ্ন, গলায় উত্তরীয় ছিল। যদি মধ্যাহ্ন হইত, এবং গলায় গামছা থাকিত তাহা হইলে গামছা ধরিয়াই ত টানাটানি করিত? **অজানা ফুলের গন্ধবাহকে** বেহায়া না বলিয়া পারিলাম না—শ্রীযুক্ত কালিদাস রায়ের চাদর ধরিয়াও টান মারে!

কবিশেখর চরাচরের স্থাবর অস্থাবর বস্তুসমূহের নশ্বরতা লইয়া দার্শনিকতা করিতেছেন। গাছের গায়ে লতা উঠিয়াছে, কবি বলিলেন, বৈশাখের ঝড়ে তুমি কোথায় থাকিবে?...ইত্যাদি। তারপর কবি গ্রামে ঢুকিলেন। জেলেনি ফুঁ দিয়া চুলার আগুন "জোরালো" করিতেছে—তাহার পার্শ্বে "দয়িত তরুণ", তরুণী-স্ত্রীর দিকে চাহিয়া আছে।

মনে মনে বলিলাম—ওরে মূঢ়, তরুণীর মন
জান না ত কোথা আছে! ছলে বলে মাছ ধরো জেলে,
হয়ত পালাবে বধূ মায়াজাল সব ছিঁড়ে ফেলে
শিকারী রাখ কি খোঁজ?

মৎস্যজীবীর তরুণী-স্ত্রীর মন কোথায় আছে এরূপ প্রশ্ন করিয়া কবিশেখর বুঝাইতে চাহেন যে তাহার মনের সকল বৃত্তান্তই তিনি অবগত আছেন। আমাদের বলিবার কিছু নাই।

প্রাপ্তি-স্বীকার ও অভিমত

প্রকৃতি—সচিত্র বৈজ্ঞানিক পত্রিকা, সম্পাদক শ্রীসত্যচরণ লাহা ৫০ নং কৈলাশ বোস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—বার্ষিক মূল্য চারি টাকা।

জনৈক ভ্রমণকারী ভিক্টোরিয়া ফল্‌স্‌-এর সম্মুখে বসিয়া ভাবিতেছিল—"এই যে জলপ্রপাত যুগ যুগ ধরিয়া কোটি কোটি মণ জল ঢালিয়া শব্দে বর্ণে এরূপ অপরূপ সৌন্দর্য্য রচনা করিয়া চলিয়াছে ইহার এত দিনের এই বিপুল আয়োজন কি আমার মত একটি মাত্র দর্শকের আনন্দের জন্য? এইরূপ চিন্তা করিতে গিয়া ভ্রমণকারীর মন প্রকৃতির এই বেহিসাবী অপব্যয়ে পীড়িত হইয়াছিল।

বড় জিনিসের সঙ্গে ছোট জিনিসের তুলনা যদি অসঙ্গত না হয়—তাহা হইলে বলিতে পারি বাংলাদেশের নির্জ্জন অরণ্যে

"প্রকৃতি"র মত একখানি মূল্যবান পত্রিকা সামান্য দুই চারি জনের তৃপ্তির জন্যই প্রকাশিত হইতেছে। ইহার যথার্থ মূল্য দিবার মত লোক বাংলাদেশে বিরল। বাঙালী যখন বলে, এ যুগটা বৈজ্ঞানিক যুগ, তখন বলিতে ইচ্ছা হয়, ভগবান ইহাদিগকে ক্ষমা করুন, ইহারা য়ুরোপীয় বৈজ্ঞানিক যুগকে সর্ব্বসাধারণের বৈজ্ঞানিক যুগ বলিয়া বিবেচনা করিতেছে। বাঙালীর বৈজ্ঞানিক কৌতূহল নাই; কেননা তাঁহার মন বৈজ্ঞানিক মন নহে। যাঁহারা বিজ্ঞানের সাধনা করিতেছেন তাঁহারা বাঙালীর ব্যতিক্রম। তাই প্রকৃতির মত একখানি পত্রিকা কাছে পাইয়াও মন পীড়িত হইতেছে।

রসশ্রী—সম্পাদক শ্রীসুধাংশুকুমার রায়, ১৪ নং বাদুড় বাগান লেন, কলিকাতা।

রসশ্রী, রসকলা, কারুশিল্প ও ফোটোগ্রাফি বিষয় একমাত্র দ্বৈমাসিক পত্রিকা।

বিজ্ঞান সম্বন্ধে যেরূপ শিল্প সম্বন্ধেও তেমনি, জাতীয় মন প্রকৃত শিল্প ও সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে এখনও জাগ্রত হয় নাই। হইলে কেবলি দিনের পর দিন ভাঙা ছন্দের কবিতা ন্যাকা-প্রেমের অপাঠ্য গল্প আর সিনেমা অভিনেত্রীর ছবি লইয়া মাসে মাসে এত পত্রিকার আবির্ভাব হইত না, শিল্প ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে বহু কাগজ দেখিতে পাইতাম। রসশ্রীর আবির্ভাবের সঙ্গেও যদি বাঙালী তাহার বিকৃত রুচি বদলাইবার কিছু সুযোগ পায় তাহা হইলেই রসশ্রীর সার্থকতা বলা যাইবে।

"মটর বিজ্ঞান"—গ্রন্থকার শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র গুপ্ত, মাষ্টার মেকানিক; প্রকাশক মিঃ দাশগুপ্ত এণ্ড কোম্পানি, পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক, ৫৪।৩ কলেজ ষ্ট্রীট কলিকাতা—৫৪২ পৃষ্ঠা মূল্য মাত্র আড়াই টাকা॥

এত বড় বই, এত ভাল ছাপা কাগজ এবং বাঁধাই, পাতায় পাতায় ছবি—অথচ এত শস্তা কি করিয়া দেওয়া সম্ভব হইল তাহা বুঝি না। মোটর বিজ্ঞান সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় এরূপ

সম্পূর্ণ তথ্য বিশিষ্ট এরূপ চমৎকার বই ছাপাইয়া বিক্রয় করিতে যাওয়া দুঃসাহস সন্দেহ নাই। প্রকাশকের কৃতিত্ব আছে ॥

গ্রন্থকার নিজে মোটর বিজ্ঞানে পরিপক্ক ওস্তাদ। বই তাঁহার নিজের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা হইতে লেখা। কোনো তথ্যই বাদ যায় নাই। শুধু তাই নহে তথ্যগুলি ছক কাটিয়া, টেব্‌ল্ দিয়া, ছবি দিয়া নানা ভাবে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। অবাঙালীর হাত হইতে মোটর-ব্যবসা বাঙালীর হাতে আনিবার পক্ষে এই বইখানি যথেষ্ট সাহায্য করিবে। বাঙালী সর্ব্বক্ষেত্রেই চালিত হয়, চালায় না। এইরূপ একখানি বই হাতে লইয়া যদি সে চালক হইতে উৎসাহিত হয় তাহা হইলেই এরূপ পুস্তকের মান বজায় থাকে; সেই সঙ্গে বেকার সমস্যাও যে কিছু সমাধান হয় একথা বলাই বাহুল্য।
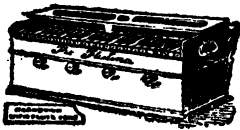
শ্রীপরিমল গোস্বামী এম-এ কর্ত্তৃক সম্পাদিত। ২৫।২ মোহনবাগান রো, শনিরঞ্জন প্রেস হইতে শ্রীপ্রবোধ নান কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৩য় সংখ্যা] পৌষ, ১৩৪১ [৭ম বর্ষ

ভারতচন্দ্র

মুকুন্দরামের প্রধান দোষ গ্রাম্যতা, কি ভাবে, কি ভাষায়, কি চরিত্র-অঙ্কনে ; অবশ্য কল্পনায় নয়, তার কারণ কল্পনাশক্তি মূলেই তাঁহার ছিল না। সাহিত্যে যে urbanity আমাদের আদর্শ, পুরাতন কবিদের মধ্যে একমাত্র ভারতচন্দ্রে তাহা পাই ; মুকুন্দরাম sub-urbanityতেও পৌঁছিতে পারেন নাই। একদল আছেন যাঁহারা বলেন মুকুন্দরামের বৈশিষ্ট্য, তিনি তৎকালীন লৌকিক ভাষায় কাব্য লিখিয়াছেন। অবশ্য ইহা মুকুন্দরামের বৈশিষ্ট্য, কিন্তু সাহিত্যের নহে। সাহিত্যের ভাষার আদর্শ লৌকিক নহে, অলৌকিক। অর্থাৎ যে ভাষায় লোকে কথা বলে তাহা নয়, যে ভাষায় লোকের কথা বলা উচিত তাহাই। যেমন কাব্যের ঘটনা কাব্য নহে, তাহার উপাদান মাত্র ; ঘটনা ভাবনায় রূপান্তরিত হইলেই কাব্য-সৃষ্টি হয়। তেমনি মুখের

ভাষা কাব্যের ভাষার উপাদান মাত্র, তাহা "আদর্শায়িত" হইয়া উঠিয়াই কাব্যের ভাষায় পরিণত হয়। মুকুন্দরামের ভাষায় এই আদর্শী-করণ নাই।

মুকুন্দরামের চরিত্র-সৃষ্টি সম্বন্ধেও একই কথা। তাঁহার সকল সৃষ্টির মধ্যে একটি চরিত্র ব্যতীত সবই অপসৃষ্টি। তাহা মূলে যে চরিত্র-সৃষ্টির উপাদান মাত্র ছিল ফলেও সেই উপাদান রহিয়া গিয়াছে। এই সব সৃষ্ট-চরিত্র একান্তভাবে লৌকিক ও গ্রাম্য হইয়া রহিয়াছে। পাঠককে কল্পনায় তৎকালীন গ্রাম্য সমাজের মধ্যে প্রবেশ করিতে হয়, তবেই সেই সব চরিত্র-চিত্রের খানিকটা মর্ম্ম-উদ্ঘাটন সম্ভব।

একমাত্র ভাড়ুদত্তের চরিত্র সম্বন্ধে একথা খাটে না। এই সব-চেয়ে গ্রাম্য ব্যক্তিটি সাহিত্যিক গ্রাম্যতা-দোষের উর্দ্ধে উঠিয়াছে। কিন্তু ইহাতে মুকুন্দরামের কৃতিত্ব কতটা সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলিয়াছি, মুকুন্দরাম কাব্যের যে উপাদান হাতের কাছে পাইয়াছিলেন তাহাই গুছাইয়া কাব্য আকারে সাজাইয়াছেন, যে দিব্য কল্পনাশক্তি উপাদানকে কাব্য করিয়া তোলে তাহার অভাববশত মুকুন্দরাম উপাদানের উপরে নিজের প্রতিভার ছাপ তেমন করিয়া দিতে পারেন নাই। ইহা সত্য হইলে, ভাঁড়ুদত্তের সৃষ্টির খ্যাতিতে মুকুন্দরামের দাবী অনেকটা কমিয়া যায়। আমার বিশ্বাস ভাঁড়ুদত্তের চরিত্রটি কবি কল্পনা করেন নাই, যাহা পূর্ব্বে পাইয়াছেন ও চারি পার্শ্বে যাহা পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন তাহাই পাঠকের সম্মুখে ধরিয়া দিয়াছেন। মুকুন্দরামের কাব্যের উপাদান সম্বন্ধে গবেষণা সম্পূর্ণ হইলে, আশা করি তখন আমাদের মন্তব্যের মূল্য উপলব্ধি হইবে।

ভারতচন্দ্র ও মুকুন্দরাম দুই জনেরই বৈশিষ্ট্য দুইটি অপ্রধান চরিত্র-

কল্পনায়, হীরামালিনী ও ভাঁড়ুদত্তের। একটি পূর্ণ সৃষ্টি ও একটি অপূর্ণ সৃষ্টিতে কি প্রভেদ বোঝা যায় এই দুটি চরিত্রের সমালোচনায়। এমন অসম্ভব নয় যে ভারতচন্দ্র হীরার চরিত্রের উপাদান পূর্ব্ববর্ত্তী কোনো গ্রন্থ হইতে পাইয়াছেন, কিন্তু আমরা যাহা পাই তাহা অসম্পূর্ণ উপাদান নয়, সম্পূর্ণ সৃষ্টি। ভাঁড়ুদত্ত ও হীরামালিনী দুজনেই সাহিত্যিক urbanityতে পৌঁছিয়াছে, তাহাদের বুঝিবার জন্য পাঠককে কল্পনায় তৎকালীন সমাজে প্রবেশ করিতে হয় না।

হীরার চরিত্র কেবল মাত্র একটি অস্পষ্ট outlineএ অঙ্কিত নহে, ছোটখাটো ঘটনায়, কথাবার্ত্তায়, রসালাপে, তীক্ষ্ণ শ্লেষ ও ব্যঙ্গের detailএ তাহা অত্যন্ত প্রত্যক্ষ, স্পষ্ট জীবন্ত। ভাঁড়ুদত্ত একটিমাত্র outlineএর সৃষ্টি। যে কল্পনা-শক্তি, ভাষাকে আদর্শায়িত করিবার শক্তি থাকিলে, নানরূপ detailএর দ্বারা, পাঠকের মনে রসবোধ জাগ্রত করে, তাহার অভাববশত এই outlineএর সৃষ্টি সম্পূর্ণরূপে ভরিয়া উঠিতে পারে নাই। তাহার চরিত্রের এই অবকাশপথে পাঠকের মনোযোগের ও রসবোধের অনেকটা অংশ পড়িয়া গিয়া নষ্ট হয়। মুকুন্দরাম যে বস্তুনিষ্ঠ (Realistic) পন্থার কবি, তাহার পক্ষে তথ্যের সমাবেশ একান্ত আবশ্যক। সে তথ্যের সমাবেশ যেখানে অনাবশ্যক সেখানে তিনি করিয়াছেন, কিন্তু যেখানে তাহা অবশ্যম্ভাবী সেখানে কবির খেয়াল নাই। ইহার একটি কারণ আছে মনে হয়, কবি বুঝিতে পারেন নাই যে ঐ ভাঁড়টাই তাঁহার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি; তিনি বুঝিতে পারেন নাই যে কালকেতু, ফুল্লরা, ধনপতি প্রভৃতি বড় বড় বীর ও প্রধান চরিত্রকে বাদ দিয়া ভবিষ্যতের পাঠক ঐ গ্রাম্য মোড়লটার প্রতি এত আত্মিকতা (sympathy) অনুভব করিবে। আমার তো মনে হয় বুঝিতে পারিয়া ভালই হইয়াছে। অনিপুণ কবির দৃষ্টি এদিকে পড়িলে

তাহাকে দ্বিতীয় একটা কালকেতু করিয়া তুলিতেন। পিতৃ-পরিত্যক্ত কর্ডেলিয়া যেমন লিয়ারের বিপদে সহায় হইয়াছিল, কবির এই ত্যজ্য পুত্রও তেমনি মুকুন্দরামকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। যে-সমাজে কবি সৃষ্টি করিতেছিলেন তাহা ছিল গ্রাম্য ; সে সমাজ আনন্দ পাইত কালকেতুর মত বিকট একটা বিদূষক-বীরের কল্পনায়। তাহা আসরের প্রান্তবর্ত্তী ভাঁড়ুকে লক্ষ্য না করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়াছে। ভাঁড়ুর প্রতি তাহাদের দৃষ্টি পড়িলে শনিদৃষ্টি-ভস্ম-গণেশ-মস্তকের ন্যায় ভাঁড়ুরও দুর্দ্দশার একশেষ হইত। কাব্য যে কবির একার সৃষ্টি নয়, সমাজ যে তাহাতে পরোক্ষভাবে সাহায্য করে কাল-কেতুর বিকৃতি ও ভাঁড়ুর নিষ্কৃতিতে তাহা অত্যন্ত প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে।

হীরামালিনী ভারতচন্দ্রের সচেতন কল্পনার সৃষ্টি। মুকুন্দরামের মত ভারতচন্দ্রও পাঠক-নিরপেক্ষ ছিলেন না। তিনি ছিলেন রাজসভার কবি। রাজসভার আদর্শ রুচি ও ফরমাইস খানিকটা পরিমাণে তাঁহার লেখনীকে নিয়ন্ত্রণ করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। রাজকুমারী বিদ্যার প্রতি স্বভাবতই রাজার লক্ষ্য ছিল, কাজেই বিদ্যাকে বাক্য ও বাহ্য অলঙ্কারে সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন করিতে কবি বাধ্য হইয়াছেন। রাজ-কুমার সুন্দরের প্রতিও রাজার দৃষ্টি থাকা স্বাভাবিক, কাজেই তাহাকেও রাজাদর্শোচিত করিয়া গড়িতে হইয়াছে। কাব্যের নায়ক ও নায়িকা, সৌন্দর্য্য ও বিদ্যা ; রাজসভার আদর্শ ইহার অপেক্ষা আর কি বেশি হইতে পারে! যে সুন্দর ও বিদ্যার সাক্ষাৎ আমরা ভারতচন্দ্রে পাই, কৃষ্ণচন্দ্রের সভাতে সেই জাতীয় সৌন্দর্য্য ও বিদ্যার চর্চ্চাই হইত. গভীরতার অপেক্ষা নিপুণতা যাহাতে অধিক, আন্তরিকতার অপেক্ষা বাহ্যিকতা যাহাতে অধিক। এই সব দেখিয়া এক একবার মনে হয় কা

গল্পের উপলক্ষ্যে রাজসভার রূপক লিখিয়া গিয়াছেন। এই রূপক একাধারে কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভার রূপকথা এবং স্বরূপ কথা।

কিন্তু কবি এক স্থানে স্বাধীন ছিলেন, অপ্রধান চরিত্রের মহলে। তাঁহার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হীরামালিনী। এখানে কবির প্রতিভা অপ্রতিহত ভাবে লীলা করিবার সুযোগ পাইয়াছে, এবং তাহার ফল প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যের সর্ব্বাপেক্ষা জীবন্ত নারী-চরিত্র। হীরা ভাঁড়ু দত্ত দুজনেই জীবিত, বাংলা দেশের পথে ঘাটে আজো তাহাদের দেখা পাওয়া যায়। অনেক সময় ভাবিয়াছি, যদি পথের মোড়ে হীরার সহিত ভাঁড়ুর দেখা হয়, তবে কেমন হয়। যাহাই হোক, হীরার তীক্ষ্ণ মার্জ্জিত ব্যঙ্গবাণে দুর্দ্ধর্ষ ভাঁড়ুকে যে পৃষ্ঠভঙ্গ দিতে হয় তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

ভারতচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব তাঁহার ভাষায়। এমন মার্জ্জিত, তীক্ষ্ণ, ব্যঙ্গোজ্জ্বল ভাষা, প্রাচীন সাহিত্যে তো দূরের কথা বর্ত্তমান সাহিত্যেও বিরল। আজ যে ভাষায় বাংলা কাব্য লিখিত হয়, তাহার পূর্ব্বধ্বনি পাই ভারতচন্দ্রে। ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর পরে একশত বৎসরের অব্যব-হারে তাঁহার ভাষা নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। ঈশ্বর গুপ্তের ভাষাতেও ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণতা আছে, কিন্তু রায় গুণাকরের তুলনায় তাহা নিতান্ত গ্রাম্য। তীক্ষ্ণ বাণে ও সম্মার্জ্জনীতে (উপযুক্ত হাতে দুই-ই জ্বালাকর) যে প্রভেদ, সেই প্রভেদ ভারতচন্দ্র ও ঈশ্বর গুপ্তের ভাষায়। ভারতচন্দ্রের ভাষার urbanity ঈশ্বর গুপ্তে নাই। এই urbanity আধুনিক যুগে প্রথম বারের জন্য পাই মধুসূদনের রচনায়।

ভাষার এই পরিণতির তিনটি কারণ আছে। প্রথমত, ভারতচন্দ্রের সময়ে ভাষার স্বাভাবিক পরিণাম অনেকটা অগ্রসর হইয়াছিল। দ্বিতীয়ত, ভারতচন্দ্র যে-ভাষায় কাব্য লিখিয়াছিলেন তাহা বাংলার গ্রাম্য অঞ্চলের ভাষা নহে। এখনকার দিনে যেমন কলিকাতা ও

তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থান, তখনকার কালে তেমনি বিদ্যা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র ছিল মুর্শিদাবাদ, নবদ্বীপ ও তাহাদের পারিপার্শ্বিকতা। সৌভাগ্যক্রমে বাংলার urban অঞ্চলে তৎকালীন শ্রেষ্ঠ কবি কাব্য রচনা করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে এই জন্যে যে এমনটি হইবার কথা নহে। ভারতচন্দ্র বর্দ্ধমানের লোক, ঘটনাচক্র তাঁহাকে নবদ্বীপে টানিয়া না আনিলে তিনি উন্নততর ঘনরাম চক্রবর্ত্তী হইয়া থাকিতেন, অন্নদামঙ্গলের সৃষ্টি হইত না। তৃতীয় ও সর্ব্বপ্রধান কারণ কবির স্বকীয় প্রতিভা। যে-প্রতিভার তাপে ভাব, ভাষা একীভূত হইয়া গিয়া দিব্য বাণীমূর্ত্তির সৃষ্টি করে ভারতচন্দ্রের তাহা অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে ছিল। সেই শক্তির মাহাত্ম্যে তিনি তৎকালীন কাব্য-পিপাসা মিটাইয়াও এমন ভাষা সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন যাহা পরবর্ত্তী কালেও মানুষের সৌন্দর্য্য-বোধকে নন্দিত করে।

তাঁহার ভাষার প্রধান গুণ—তাহা মডার্ণ। প্রাচীন বাংলার অন্য কোনো কবি সম্বন্ধে একথা বলা চলে না। বৈষ্ণব পদাবলী মুখে মুখে রূপান্তরিত হইয়াছে, রামায়ণ মহাভারত সম্বন্ধেও একই কথা, কাজেই তাহাদের সম্বন্ধে এ প্রশ্ন চলে না; কিন্তু অন্য কোনো কবির ভাষাকে আমরা মডার্ণ বলিতে পারি না।

এ ভাষা যে মডার্ণ তাহার প্রধান প্রমাণ বাংলা সাহিত্যে ইহার পুনরাবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী। ঈশ্বর গুপ্ত একবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কালের দোষে ও শক্তির অভাবে তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই; বঙ্কিমচন্দ্রের তীক্ষ্ণ, মার্জ্জিত, স্বল্পাক্ষর গদ্যে ভারতচন্দ্রেরই পদ্যের ভাষার যেন দূর প্রতিধ্বনি। মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত যে-যুগ প্রধানত তাহা সৃষ্টির যুগ। সৃষ্টির যুগের পরে সমালোচনার যুগ, Satire সমালোচনার সগোত্র, ভারতচন্দ্র প্রধানত

রোমাণ্টিক satirist। কাজেই বাংলা সাহিত্যে যে-যুগটা আসন্ন, যে-যুগের প্রধান লক্ষণ হইবে সমালোচনা, satire, এবং বাংলা দেশের প্রাণধর্ম্ম অনুসারে রোমাণ্টিক satire তাহাতে ভারতচন্দ্রের ভাষার পুনরুত্থান একান্ত ভাবে অবশ্যম্ভাবী। একজন বড় কবি যে ভাষার সৃষ্টি করেন, কিছুদিন ধরিয়া তাহার অনুবৃত্তি চলে। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ উভয়ের ভাষারই অনুবৃত্তি ঘটিয়াছে। ঐতিহাসিক ও সামাজিক বিপ্লবের ফলে ভারতচন্দ্রের ভাষার যথেষ্ট অনুবৃত্তি হয় নাই। তার পরে ভারতচন্দ্র সামাজিক যে অনিশ্চয়তা ও নাস্তিকতার মধ্যে বাঁচিয়া ছিলেন আমাদের সময়টাও নানা কারণে অনেকটা সেই রকমের। এই অনিশ্চয়তার, অবিশ্বাসের, নাস্তিকতার সাহিত্যিক পরিণাম satire, এবং বাংলা সাহিত্যে ইহার একমাত্র আদর্শ ভারতচন্দ্র। কাজেই প্রায় পৌনে দুই শত বৎসর পরে এই যুগটাতে ভারতচন্দ্রের পুনরাবির্ভাব আসন্ন হইয়া উঠিয়াছে।

বিদগ্ধ

লইয়া বিক্ষত পৃষ্ঠ বিমর্দ্দিত শ্রবণ যুগল,
ধারাপাত সিক্ত করি বিগলিত অশ্রু-ধারাপাতে
কত কিছু শিখিলাম! ইতিহাস, গণিত, ভূগোল।
সাহিত্য ও স্বাস্থ্য-পাঠ দণ্ডধারী পণ্ডিতের হাতে।

‘প্রবেশিকা’ সীমা রেখা অতিক্রমি’ পিতৃ-পুণ্যফলে
‘নলেজ’-লোলুপ হয়ে উত্তরিনু কলেজ-প্রাসাদে;
নানাবিধ ভাব সেথা জুটিয়া কহিল দলে দলে
“মস্তিষ্ক-কোটরে ওরে অবিলম্বে মোদের বাসা দে

আমি হায় ক্ষুদ্র নর—অতি ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক আমার
তারি মাঝে ভাব-বৃন্দ বসিলেন গাদাগাদি করি ;
চকিতে ফলিল ফল !—বুক ফাঁক হইল আমার,
পাদুকার চাকচিক্যে দর্পণ কহিল, মরি মরি !

দেশ-প্রেম, রুষ-প্রেম, চর্চ্চা করি নানারূপ প্রেম
রাজা ও উজির কত মারিতেছি হ'য়ে এক জোট
সহসা মরিল পিতা ! সঙ্গে সঙ্গে এবং (ও, শেম !)
পরীক্ষায় ফেল করি পাইলাম নিদারুণ চোট !

ক্রমশঃ বুঝিতে হ'ল মিথ্যা মায়া প্রেম জামা জুতা !
পিওনের ঘন ঘন আনাগোনা থেমে গেল সব ;
চতুর্দ্দিক হ'তে লভি' বহুবিধ উপদেশ-গুঁতা
'নোট'-ভেলা 'পরে চড়ি পারাইনু পরীক্ষা-অর্ণব !

অর্ণব হইয়া পার দেখিতেছি ধূ ধূ বালুরাশি
শ্রম-ক্লিষ্ট দেহ হায় মাগিতেছে ক্ষুধার খাবার,
শিরোপরে ভাব-গুচ্ছ (কলেজে যা জুটেছিল আসি')
দ্বীপবাসী বৃদ্ধ সম তাড়না করিছে বারম্বার।

সিন্দবাদ সম মোর নাহি বীর্য্য নাহি বুদ্ধি বল
ভাব ভাবনার ভার বহিতেছি পিঠে চিরকাল ;
ক্ষুধা-খিন্ন দুর্ব্বলের একমাত্র ডিগ্রীটি সম্বল
তাই লয়ে খুঁজিতেছি 'wanted' সন্ধ্যা ও সকাল।

"বনফুল"

রবীন্দ্রনাথ বনাম হিন্দুস্থানী সঙ্গীত

আমাদের জাতীয় জীবনে যতগুলি ব্যাধি প্রবেশ করিয়াছে তন্মধ্যে যিনি যে বিষয়ে যত উদাসীন অথবা যত বিরুদ্ধবাদী, তাঁহার দ্বারাই সেই বিষয়ের মর্ম্মোদ্‌ঘাটন করাইবার ব্যর্থ চেষ্টা, অন্যতমরূপে প্রকাশ পাইতেছে। আধুনিক industrial ageএর বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের অভিমত কাহারও অবিদিত নাই, তথাপি পাটের গুদাম হইতে গেঞ্জি ও মোজার কারখানাগুলি সবই যদি তাঁহার দ্বারা উদ্বুদ্ধ না হয় তবে ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মকর্ত্তাগণ মনে করিবেন তাঁহাদের জীবন ব্যর্থ হইল। নিখিল-বঙ্গ-সঙ্গীত-সম্মেলনের উদ্বোধন ব্যাপারটাও সেই হিসাবে একটা tragic success বলিতে হইবে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সঙ্গীত-বিদ্যাকে যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষনীয় বিষয়রূপে অন্তর্ভুক্ত করিবার প্রস্তাব সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মতামত আহ্বান করা হইয়াছিল, তিনি বেশ স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছিলেন যে হিন্দুস্থানী সঙ্গীত একটা dead science, উহার চর্চ্চায় সঙ্গীতের কোন উন্নতি অথবা জাতীয় জীবনে কোন উৎকর্ষ সম্ভবপর নহে। তথাপি তাঁহারই দ্বারা হিন্দুস্থানী সঙ্গীতকে কতখানি উদ্বুদ্ধ করা গিয়াছে বলিতে পারি না, তবে তাহার শ্রাদ্ধক্রিয়ার সঙ্কল্প সূচিত হইয়াছে তাহা নিশ্চিত। যাহাই হউক, হিন্দুস্থানী সঙ্গীত সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের উক্তি ও তাহার সারবত্তা সম্বন্ধে এস্থলে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বক্তৃতার প্রারম্ভে তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ বিনয়ের বশে বলিয়াছেন—"যাহাকে ধ্রুব-পদ্ধতি সঙ্গীত বলে" সে সম্বন্ধে তাঁহার "ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সঙ্কীর্ণ।" তথাপি "প্রাচীন শাস্ত্রের প্রতি

অশ্রদ্ধা না করে” তাঁহার মন্তব্য যাহা সরল ভাষায় বলিতে চাহিয়াছেন, তাহা মোটামুটি এই—তাঁহার মতে “সঙ্গীত প্রাণধর্ম্মী জিনিষ এবং চতুর্দ্দিকের পরিশ্রমের ক্রিয়াবান প্রত্যুত্তর” এবং “যে যা পেয়েছে তার চেয়ে বেশী কিছু পাবার জন্য অন্তরের দাবী, প্রেরণা—এই দু'টি লক্ষণকে মিলিয়ে” তিনি “সঙ্গীতের তত্ত্বতে প্রয়োগ করতে ইচ্ছা” করেন। “তা যদি হয় তাহ'লে ক্রমাগত পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়ে প্রাণের যে গতি প্রতিনিয়ত অগ্রসর হচ্ছে, তার কল্লোল, তার ধ্বনি একটা কোন নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকতে পারে না।” তানসেনের গান মোগল-সাম্রাজ্যের পারিপার্শ্বিক ক্রিয়াবান প্রত্যুত্তর এবং সামগান বৈদিকযুগের কর্ম্ম ও যজ্ঞের পূর্ণতার প্রকাশ,—ইত্যাদি। অর্থাৎ রীতিনীতি ও সামাজিক অনুষ্ঠানের ন্যায় তানসেনের সঙ্গীতও একটা সাময়িক উচ্ছ্বাসের মত প্রকাশিত হইয়াছিল। এটা ত আর মোগল-বাদশাদের যুগ নয়, কাজেই আক্‌বর সাহের দীর্ঘজীবন কামনা অথবা মোহম্মদ সাহের প্রেয়সীর জন্য তাঁহার মিলনের পিয়াসাবর্ণনা একেবারে নিরর্থক।

রবীন্দ্রনাথের জীবনের সহিত যাঁহাদের পরিচয় আছে তাঁহারা সকলেই জানেন তিনি নিজেকে classical music সম্বন্ধে যতখানি অজ্ঞ বলিয়া প্রচার করিতে চান, বাস্তবিক তিনি তাহা নহেন। তাঁহার অনেক গানের সুর প্রচলিত হিন্দী গানের সুর অবলম্বন করিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বহুর মধ্যে দুইটি :—“সুন্দর নাগরী হ্যায়”—“মন্দিরে মম কে,” “রুমে ঝুমে বরখে—আজু বাদরুবা”—“শূন্যহাতে ফিরি হে নাথ, পথে পথে”। ৺রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী তাঁহার যে গান গুলিতে সুরসংযোগ করিয়াছেন, উদাহরণস্বরূপ—‘অল্প লইয়া থাকি তাই’,—তাহাতে সুর ও ভাবের সমন্বয় যেরূপ সুচারু হইয়াছে

তাহা রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য গানে বিরল। মোটের উপর হিন্দুস্থানী সুরজগৎ হইতে রবীন্দ্রনাথের গানে সুরের শ্রেষ্ঠ প্রেরণাগুলি আসিয়াছে—যাঁহারা হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের সহিত পরিচিত তাঁহারা ইহা অস্বীকার করিতে পারিবেন না। তবে, রবীন্দ্র-সঙ্গীতে তাহাই সব নহে। ইংরেজি সুরের অনুকরণ এবং হিন্দুস্থানী সুরের অদ্ভুত সংমিশ্রণ তাঁহার গানগুলিকে একটি বিশিষ্ট রূপ দিয়াছে, এবং বাউল ও কীর্ত্তন হইতেও তাহারা অনেক প্রভাব গ্রহণ করিয়াছে, তাহা সত্য। যাহাই হউক, রবীন্দ্রনাথের গান আমার আলোচ্য বিষয় নহে, কেবলমাত্র ইহাই আমার বক্তব্য যে তিনি হিন্দুস্থানী সঙ্গীতকে সম্পূর্ণরূপে disown করা দূরে থাক্, উহার নিকট তাঁহাকে যথেষ্ট ঋণ করিতে হইয়াছে। তিনি যে surroundingsএর কথা বলিয়াছেন, তাহা সুর-শিল্পীগণের নিকট অত্যন্ত gross. রবীন্দ্রনাথের গানে অবশ্য বাণীটা বাদ দিলে শুধুমাত্র সুরহিসাবে গানগুলির দান অত্যন্ত poor কিন্তু হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে বাণীটা একেবারে background, একটা উপলক্ষ্যমাত্র, সুরটিই সর্ব্বপ্রধান। তানসেনের যেসব গান সম্রাট্ আক্‌বরের প্রশংসামূলক, তিনি যখন সেই গান গাহিতেন, সম্রাট্ স্বয়ং, অন্যান্য শ্রোতাগণ ও গায়ক নিজে—কেহই গানের মধ্যে স্তুতিবাদের কথা মনে করিতেন না, তানসেনের দরবারী কানাড়ার অপরূপ অভিব্যক্তির কথাই হয়ত মুগ্ধ হইয়া ভাবিতেন, নচেৎ তাঁহারা তানসেনকে তাঁহার মর্য্যাদাদান করিতে পারিতেন না। তাছাড়া তাঁহার অধিকাংশ গানই রাধাকৃষ্ণের প্রেমবিষয়ক এবং প্রকৃতিবর্ণনামূলক,—কোন দেশ কাল পাত্র লইয়া তাহারা রচিত হয় নাই। তখনকার শিল্পীরা এক একটি বিশিষ্ট সুরে যে রূপ দিয়াছিলেন তাহা পরবর্ত্তী যুগে এবং প্রতিযুগেই বহু গুণীজনের সাধনা এবং অনুভবের

মধ্য দিয়া রূপান্তরিত হইয়া আসিয়াছে, এবং এখনও হইতেছে, ইহা ভারতীয় সঙ্গীতের সকল ছাত্রই অবগত আছেন। ভারতবর্ষের সঙ্গীত-জগৎ একটি বিশাল সমুদ্র। এক একজন গুণীর চেতনায় এক একটি রাগের রূপ বিশেষভাবে প্রকাশ পাইয়াছে; দ্বিতীয় গুণী সেই রাগ-টিকেই হয়ত আবার ভিন্নরূপ দিয়াছেন। এইরূপে প্রত্যেক স্বরটি প্রতিযুগে নব নব রূপ ধারণ করিয়াছে, অথচ তাহার জন্মগত স্বাতন্ত্র্য কখনও লুপ্ত অথবা ব্যাহত হয় নাই। যাঁহারা ৺পণ্ডিত বিষ্ণুদিগম্বরের সুমধুর কণ্ঠের রাগালাপ শুনিয়াছেন, তাঁহারাই অবগত আছেন যে তাঁহার রস-সৃষ্টির এমন একটি বিচিত্র শক্তি ছিল যে তাঁহার গান শুনিলে কেহ রবীন্দ্রনাথের মত মনে করিতে পারিতেন না ইহা অতীত যুগের নিছক পুনরাবৃত্তি। পক্ষান্তরে মনে হইত, ইহা একটি dynamic force, অনন্ত সৃষ্টির সম্ভাবনা এই সুরলোকে রহিয়াছে। অথচ যেটা সঙ্গীতের বিজ্ঞান অর্থাৎ যে note গুলিকে আশ্রয় করিয়া যে শ্রুতির technique ও যে লয়ের মধ্য দিয়া এক একটি রাগ মূর্ত্তিধারণ করে, তাহা কখনও অতিক্রান্ত হয় নাই, নিয়মের মধ্য দিয়াই শিল্পকলার অপরিমিত সৌন্দর্য্যের প্রকাশ হইয়া থাকে। তানসেনের গানে আজ যদি কেহ পুলকিত হন, তবে রবীন্দ্রনাথ বলিবেন আজ তিনি জন্মিয়াছেন কেন? তবে যাঁহারই কালিদাস অথবা বিদ্যাপতি ভাল লাগিবে তাঁহারও জন্মান উচিত হয় নাই, গীতা-উপনিষদের বাণীতে যে লোক পুলকিত হইবেন তাঁহার পক্ষে মৃত্যুই বরণীয়, একশত বৎসর পরে যদি কেহ রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়িয়া মুগ্ধ হন, তবে এখন হইতে তাঁহাকে সাবধান করিয়া দেওয়াই ভাল, তিনি যেন না জন্মগ্রহণ করেন।

রাগাত্মক হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে দেশ কাল পাত্রের প্রভাব নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। কোন কালে পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাব তাহারা

কি পরিমাণে অথবা আদৌ গ্রহণ করিয়াছিল কিনা তাহা বলা কঠিন, তবে যে সুরের অভিব্যক্তিটুকু কণ্ঠে ও যন্ত্রে অতীত কাল হইতে আজ ভাসিয়া আসিয়াছে, তাহা নিত্য, সৌন্দর্য্যের সত্য তাহার মধ্যে আছে। যাঁহারা মাইহারের বিখ্যাত যন্ত্রী আলাউদ্দিন খাঁ অথবা ওস্তাদ হাপেজ আলি খাঁর স্বরোদ শুনিয়াছেন তাঁহারা অবগত আছেন—প্রতিবার প্রত্যেক সুরটি তাঁহাদের হাতে নূতন করিয়া ধরা দেয়। ইহা চেষ্টায় হয় না, হৃদয়ের স্বতস্ফূর্ত্ত করুণা ও সৌন্দর্য্যবোধ হইতে এই সুরলোকের সৃষ্টি হইয়া থাকে। বাণী এখানে পশ্চাতে পড়িয়াছে, বাণীর দান স্বতন্ত্র, সে যাহা দেয়—তাহা প্রধাণতঃ intellectকে আশ্রয় করে, কিন্তু সুরের আশ্রয় feeling, অনুভবের জগতে সুর যত সহজে ও শীঘ্র মানুষকে সচেতন করিতে পারে, বাণী তাহা পারে না। হিন্দুস্থানী সঙ্গীত পুনরাবৃত্তি অথবা জড়ধর্ম্ম নহে, রবীন্দ্রনাথের ন্যায় মনস্বী ব্যক্তি কেন যে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের খোসাটাই দেখিলেন এবং স্থান কাল পাত্রকে অতিক্রম করিয়া তাহার যে অন্তরতম সৌন্দর্য্য প্রতিযুগে সঙ্গীতরস-পিপাসুদের চিত্তে আনন্দবিধান করিয়া আসিতেছে, তাহা দেখিতে পাইলেন না, ইহাই আশ্চর্য্য। খোসা অর্থে বলিতেছিলাম, সঙ্গীতের technique এবং শুষ্ক পাণ্ডিত্য। কিন্তু প্রকৃত সুরশিল্পীগণের কাহারও কাহারও সহিত রবীন্দ্রনাথের নিশ্চয়ই জীবনে একাধিকবার পরিচয় হইয়াছে। তিনি কি তাঁহাদের সঙ্গীতেও বুঝিতে পারেন নাই যে হিন্দুস্থানের সঙ্গীত জড় অথবা পুনরাবৃত্তি নহে, শ্রেষ্ঠতম কাব্য অপেক্ষা একটি রাগের যথার্থ বিকাশ অধিকতর শক্তিমান এবং মনোমুগ্ধকর। তাহাদের রূপ সুরের মধ্যে বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না! যদি রবীন্দ্রনাথের ন্যায় অনুভবশীল ব্যক্তি ইহা অনুভব না করিয়া থাকেন তবে বুঝিতে হইবে, শিল্পসৃষ্টির যে শক্তি, অর্থাৎ কাব্য-প্রতিভা, তাঁহাকে

সাহিত্য-জগতে এতখানি উচ্চ আসন দান করিয়াছে, সেই শক্তিই তাঁহাকে সৌন্দর্য্যালোকের আর একটা বৃহত্তম রাজ্য সম্বন্ধে অন্ধ করিয়া রাখিয়াছে।

যে প্রাণধর্ম্ম ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার ক্রিয়াবান প্রত্যুত্তরের কথা তিনি বলিয়াছেন, তাহা অল্পবিস্তর সকল শিল্পীকেই অবলম্বন করিতে হয়, কিন্তু অমর প্রতিভা যে শিল্পীর আছে, তিনি তাহার মধ্য দিয়াই অমৃতরস দান করিয়া যান। তাহা প্রতিযুগের ও প্রতি-কালের। Elizabethan audience চাহিত রক্তপাত ও প্রতিহিংসা। Othello এবং Hamletএর পরিকল্পনায় Shakespeare সেই জনপ্রিয় উপাদানই গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহারই মধ্য দিয়া মানব-চরিত্রের যে চিরন্তন রহস্য ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা অনুভব করিয়া যদি কেহ আজ পুলকিত হন তবে কি বলিব তিনি বাঁচিয়া আছেন কেন? সদারঙ্গ অথবা অদারঙ্গের খেয়াল গান গাহিয়া যদি আজিকার কোন গুণী গায়ক শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন তবে কি বুঝিতে হইবে—শ্রোতারা সকলেই জড়পদার্থ বিশেষ? সঙ্গীতের কোন অভিজ্ঞান হইতে রবীন্দ্রনাথ এই অভিজ্ঞতার বাণী উচ্চারণ করিলেন তাহা তিনিই জানেন, কিন্তু হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের জগতে যে সব শিল্পী জন্মিয়াছেন এবং গুণীপদবাচ্য আজও যাঁহারা জীবিত আছেন, তাঁহাদের সৌন্দর্য্যবোধ ও রস-সৃষ্টির শক্তি দেখিয়া বুঝিতে পারি যে তাঁহারা জড়ধর্ম্মী নহেন, অথবা তাঁহারা নিছক পুনরাবৃত্তি করেন না, এবং তাঁহাদের সৃষ্টিতে অফুরন্ত প্রাণ-শক্তির পরিচয় আছে। তাঁহারা শুধু সাময়িক ক্রিয়াবান প্রত্যুত্তর করেন না, তাঁহাদের সঙ্গীত মানুষের প্রাণে যে ভাব জাগ্রত করে, তাহা কোন বিশেষ দেশ কাল পাত্রের নহে।

কৃষ্টি বিনিময় ও বিশ্বমৈত্রীর অগ্রদূত রবীন্দ্রনাথ যখন সঙ্গীতে

provincialism এর advocacy করেন, তখন একটু আশ্চর্য্য বোধ হয়। তিনি বাঙ্গলার কীর্ত্তন ও বাউল গানকে (যাত্রাটা কেন বাদ দিলেন বলিতে পারি না) বাঙালীর বিশেষত্ব বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন ও এই বিশেষত্বের পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। "বৈষ্ণব সঙ্গীত সমস্ত হিন্দুস্থানী সঙ্গীতকে পিছনে ফেলে বাঙালীর প্রাণ আপনার সঙ্গীতকে উদ্ভাসিত করেছে।" কথাটা কতদূর সত্য তাহা জানি না, তবে বাঙালার কীর্ত্তন যে প্রধানত হিন্দুস্থানী সুরেরই অঙ্গ-বিচ্ছেদ করিয়া জন্ম লইয়াছিল, তাহা জানি। হিন্দুস্থানী রাগ-জগতের বিচিত্র অনুকরণ বাদ দিলে কীর্ত্তনের মধ্যে যাহা থাকে—তাহা নিতান্ত একঘেয়ে বস্তু। যাহাই হউক, সঙ্গীতে প্রাদেশিকতার স্থান নাই, বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকারের চাল অথবা ঢং আছে, এই মাত্র।

আধুনিক কালে সমগ্র ভারতে সঙ্গীতের renaissance সার্ব্বজনীন রূপ ধারণ করিতেছে। প্রাদেশিকতার সঙ্কীর্ণ ধারণা সঙ্গীতকারগণের নিকট স্থান পায় নাই। যদি গোয়ালিয়ার অথবা আলোয়ারের লোক কোনকালে সঙ্গীতের চর্চ্চায় অগ্রণী হইয়া থাকেন, তাহাদের নিকট শিক্ষা করিতে বাঙালী ছাত্র কুণ্ঠিত হন নাই। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতেই বাঙ্গলা আজ যে সৃষ্টি-শক্তির পরিচয় দিতেছে, ভারতের গুণীসমাজ সেই পরিচয় সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন আজিকার দিনে ইহার উল্লেখ বাহুল্য মাত্র।

—শ্রীবিজয়কৃষ্ণ সিংহ

———

ঈর্ষা

[অধুনা-লুপ্ত সাপ্তাহিক "ছায়া"তে কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীযুক্তা সন্ধ্যা দেবী ঈর্ষা নামে একটি কবিতা লিখেন। অনেকে হয়ত কবিতাটি পড়বার সুযোগ পাননি, তাই কবিতাটি এখানে তুলে দেওয়ার প্রয়োজন মনে করলাম।—

ওরা কেন ঈর্ষা করে আমাদের নিরালার প্রেম ?
ভাবে কি তুমি না এলে ওরা পেত আমার প্রণয় ?
এতো বোকা হতে পারে ? ভাবি আর শুধু কৃপা হয় ;
কিন্তু তা'রা ঈর্ষা করে এ'কথায় খুশীই হলেম।

তাদেরে জানিতো আমি, শুধু চায় কদিন খেলিতে,
কয়টি চটুল কথা, নানা ঢঙে 'ফ্লার্ট' করে চলা,
ক'দিনের উত্তেজনা—তনুমনে শিহরণ তোলা,
এইতো ওদের প্রেম—শেষ হয় চলিতে চলিতে।

প্রেমের বোঝে কি ওরা উড়ে-চলা ফড়িঙের দল ?
তোমার মতন তা'রা—থাক্ সে কথায় কাজ নাই ;
শুধু ভাবি কি নির্ব্বোধ ! বুদ্ধিটা কি একেবারে নাই ?
নগ্ন কুশ্রী নির্লজ্জতা ইহাদের শুধু কি সম্বল !

তবু তোমা ঈর্ষা ক'রে ওরা দেয় সম্মান তোমার,
কৃপা হয় ! ঈর্ষাতেও ইহাদের নাই অধিকার।

বলা নিষ্প্রয়োজন, কবিতাটি চমৎকার। কিন্তু ঈর্ষা মানুষের মনে এতোই গভীর শিকড়পাত করেছে যে মানুষ শুধু মানুষের প্রেমকেই ঈর্ষা করে না, সময় এবং স্থান বিশেষে মানুষ, অমানুষ, পশু এমন কি অপ্রাণীকেও ঈর্ষা করতে পারে এবং করে। তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে 'বিশ্ব'ব্যাপারে যদি কিছু ultimate সত্য থাকে তবে তা Universal Law of ঈর্ষা। সে আমাকে ঈর্ষা করছে, আমি আপনাকে ঈর্ষা করছি, আপনি অমুককে করছেন, অমুক তমুককে—এই ত বিশ্ব সংসার।

সে যাক্, ঈর্ষা ব্যাপারে শ্রীযুক্তা সন্ধ্যা দেবীর "ওরা" অর্থাৎ শ্রীমানেরা যে কতদূর এগিয়েছেন আমি তারি একটা ক্রম-অবনয়ন দেখাতে চেষ্টা করেছি।—ইতি। লেখক।]

১

ড্রাইভার রবি রায়

উন্মাদসম প্রায় ভ্রমিতেছে রাস্তায় যুবা কে ?
বেলা বুঝি পড়ে এলো, সায়াহ্ন রৌদ্র যে শান্ত,
ঘন ছায়া রচিয়াছে তরুবীথি খর্জ্জুর-গুবাকে—
মধ্য-সহর নয়, আসলে এ নগরীর প্রান্ত।

'ফুট্‌পাথে' ভাষা ফুটে দু' একটা মোটরের হর্ণে
আন্‌মনা তরুণের তনু মনে সাড়া জাগে অমনি,
ধরণী রঙীন্ হয় স্বপ্নের রামধনু-বর্ণে
আশাভীরু শঙ্কিত বক্ষে অধীর হয় ধমনী।

২

এখনি আসিবে বুঝি 'বেথুনের' সুরম্য বাস্‌টি—
যুবক দাঁড়িয়ে কেন বাকি আছে এখনো তা জানতে ?
—মৌন চকিত চাওয়া, ফেলে যাওয়া লঘু নিঃশ্বাসটি
তারি আশে তৃষাতুর বসে আছে রিক্ত দিনান্তে।

বাস্‌ এসে ফিরে যায়, ড্রাইভার রবি রায় কি সুখী ! !
উনি যে সুখের ভাগী ভাগ্যে জুটবে তার কিছু কি ?

২

ভৃত্য

ভাড়াটে বাড়ীতে থাকে একটি যুবক এক কক্ষে,
তার পাশে বাস করে রাজপুত পরিবার একটি,
পর্দ্দানশীন বড়ো, পর্দ্দাই পড়ে সদা চক্ষে,—
কদাচিৎ তার নীচে দেখা যায় তরুণীর legটি।

এই leg-ধারিণীরে দেখেছে সে একদিন মাত্র,—
বয়স উনিশ-কুড়ি, অপূর্ব্ব সুন্দরী গৌরী ;
পর্দ্দার পিছনেই আপনারে ঢাকে অহোরাত্র,
চোখে চোখ পড়লেই অমনি পালিয়ে যায় দৌড়ি'।

তারি ঘরে কাজ করে জনৈক পশ্চিমা ভৃত্য,
বয়সে যুবক বটে, গাঢ় উজ্জ্বল শ্যাম বর্ণে,
তরুণীটি তার সাথে হাসে আর কথা কয় নিত্য
তাদেরি হাসির রোল পশে ওর তৃষার্ত্ত কর্ণে।

জানিনা ভাবিবে কিবা বৃদ্ধ বা পণ্ডিত প্রাজ্ঞ—
যুবাটি ঈর্ষা করে সামান্য ভৃত্যেরই ভাগ্য।

৩

Lap Dog

Lap dog পালিয়াছে ও-বাড়ীর জমিদার কন্যা,
Lap dog—যার সাথে অতীতের কতো স্মৃতি জড়ানো;
যারে নিয়ে খেলা ক'রে ইঙ্গ রমণী কতো ধন্যা—
সভ্য সমাজে যার market value সদা চড়ানো।

সেই প্রিয় Lap dog পালিয়াছে সুন্দরী তরুণী,
সহস্র আব্দারে প্রাণীটার নাই আর রক্ষে
যত্ন-আদর কতো—স্নানাহার, 'ব্রাশ' আর চিরুণী;
ঘন ঘন চুম্বন সহসা জড়ায়ে ধরি' বক্ষে।

রাত্রে তাহারি পাশে একটি লেপের তলে সে থাকে,
অনূঢ়ার তনুমন জুড়িয়াছে পশুটাই একেলা;
ভীষণ দরাজ মেয়ে, বাগাতে পারবে বল কে তাকে?—
মন নিয়ে খেলা যেন তার কাছে পুতুলের সে খেলা।

তরুণীর আশা নিয়ে যারা যায়, ফিরে এসে তাহারা
হেরে শুধু Lap dog, আর ধূ ধূ নিরাশার সাহারা।

৪

ফাউণ্টেন পেন

সাদরে দিয়েছে কিনে নিজের প্রিয়ারে যেই penটি
পার্কার নাম আর চকোলেট রঙ তার বেশ তো !
সামান্ত ভীরু দান, কিছু নয়, অতিশয় scanty
তবু জানে তার কাছে নাই এর মূল্যের শেষ তো।

ভাবে—"হায় পেনটার নাই সৌভাগ্যের অন্ত—
প্রিয়া তারে সযতনে রাখিয়াছে সুশীতল বক্ষে ;
উরজ পরশ পেয়ে ভুঞ্জিছে সুখ সে অনন্ত,
বক্ষ-দোলন-লীলা হয়ত হেরিছে সদা চক্ষে।

"না জানি কি ভাবে প্রিয়া, দুর্জ্জেয় রমণীর চিত্ত !
ভাবে কি দামের কথা ? অথবা সে পেনটার পরশে
প্রিয়ের আঙল ভাবি অকারণে লাজ পায় নিত্য ?
—অথবা কি মনে পড়ে অতীতের অনুরূপ হরষে ?"

তাহার আঙুল চুপে ভয়ে ভয়ে ছুঁয়েছিল যেখানে
পেনটা আজিকে কিনা স্পর্দ্ধায় বাস করে সেখানে !

৫

লংক্লথ

ষোড়শীরে জড়ায়েছে নীল সাড়ি কি নিবিড় পরশে !
তাও নয়—তারো নীচে আশমানি ব্লাউজের কি মায়া !

ব্লাউজ বক্ষবাস! মন খানি ভরে উঠে হরষে;
তবু হায় তাও নয়, তারো নীচে আধো আধো কি ছায়া?

নব নামে কঞ্চুলী কিবা শোভা বিরচিয়া বক্ষে
দুই বাহু প্রসারিয়া বেড়িয়াছে উন্নত উরসে;
তবু সেও কিছু নয় অতলের ডুবুরীর চক্ষে—
সেমিজে সবি যে ঘেরা, আর সবে বঞ্চিত ও রসে।

শুধু নীচে, অধোবাস—হে ডুবুরী এই বার থামো না,—
সম্বর' সন্ধানী ঈর্ষা-শানানো খর অস্ত্র:
বহু দূর ডুবেছিলে, তবু হায় মেটে নাকো কামনা;
শেষটায় হতে চাও এক খানি লংক্লথ বস্ত্র?

বুকের সোনার হার, অথবা হও না কেন 'লকেট্'ই—
তোমারি বদলে বুকে তুলে নেবে stylish coquetteই।

The auctioneer's clerk had come to make an inventory, and the outgoing tenant had left a bottle of port on the sideboard. Some hours afterwards the man was found asleep in an armchair, and the only entry he had made in his book was, "One revolving dining-room carpet."

—

প্রসঙ্গ কথা

বিদ্যুৎ কাহাকে বলে এবং বিদ্যুৎ কয় প্রকার এই অবশ্য-প্রয়োজনীয় প্রশ্ন দুইটির উত্তর সম্বন্ধে অবহিত না হইয়াও আমরা দেখিতে পাই, বর্ষাসমাগমে বিচিত্ররূপা নবীন মেঘজালকে উদ্ভাসিত করিয়া আকাশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিদ্যুৎ ঝলকিয়া উঠিতেছে এবং ক্বচিৎ কখনও বজ্ররূপে ধরণীপৃষ্ঠে পতিত হইয়া বিভ্রাট ঘটাইতেছে। এই বিদ্যুৎ স্বতঃই অক্সিজেনকে ওজোনে পরিণত করিলেও বুদ্ধিপ্রবণ মানুষ ইহাকে কাজে লাগাইতে পারে নাই। আমেরিকার জেদী ফ্রাঙ্কলিন ঘুড়ি উড়াইয়া একদা আকাশ-বিদ্যুৎকে মাটির কাজে লাগাইতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু সে আবিষ্কার-যুগের কথা। ফ্রাঙ্কলিন আবিষ্কার মাত্র করিয়াছিলেন, কাজে লাগাইতে পারেন নাই।

* * *

প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য কাহাকে বলে এবং এই সাহিত্য কয় প্রকারে অভিব্যক্ত হয় ইহা আমাদের সঠিক জানা না থাকিলেও বাংলা দেশে 'উত্তরা'-রূপে মাঝে মাঝে তাহার ঝলক দেখিতে পাই এবং রাধাকমল, ধূর্জ্জটিপ্রসাদ, দিলীপকুমার ও মহেন্দ্রলাল-রূপ বজ্রনিক্ষেপে মাঝে মাঝে আমরা সচকিত ও বিভ্রান্ত হইয়া পড়ি। উত্তরা-সম্পাদক সুরেশ চক্রবর্ত্তী ও অভিধানসম্পাদক জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের ওজন স্বতঃই বাড়াইয়া দিলেও এই সাহিত্য সম্বন্ধে আমরা অবহিত ছিলাম না। হোমিওপ্যাথিক ম-জীবনবীমা-ডাক্তার সুরেশচন্দ্র রায় মহাশয়ও কম জেদী নন। গত বড়দিনের বন্ধে তিনি এক প্রকার ঘুড়ি উড়াইয়াই সে সাহিত্যকে

কলিকাতার টাউন-হলে আকর্ষণ করিয়াছিলেন। আমরা স্বচক্ষে সেই বিদ্যুৎ দেখিয়া আসিয়াছি।

* * *

দেখিয়া আসিয়াছি বলিয়া মনে মনে আত্ম প্রসাদ তো লাভ করিতেছি কিন্তু বাহিরের কানা-ঘুষায় যেরূপ বুঝিতেছি তাহাতে মনে হইতেছে ঠিক জিনিষটিকেই দেখা হয় নাই। মনটা ছিল tabula rasa.—শাদা মন না লইয়া কোনো কিছুই বিচার করা চলে না এই মহাজনবাক্যটি আমরা আন্তরিক ভাবে পালন করিয়া থাকি। শুনিলাম Let there be a সম্মিলন—and there was a সম্মিলন। চোখ খুলিয়া দেখিলাম নিউ ইণ্ডিয়া ও গ্রেট ইণ্ডিয়া ইনশিওর‍্যান্স কম্পানির পরিচালকবর্গ সম্মুখে সমাসীন। ভাবিলাম এই দুইটি কম্পানির বোধ হয় amalgamation হইতেছে—সেই উপলক্ষেই এই আয়োজন। বীমা-এজেণ্ট সম্পর্কে একটা স্বাভাবিক ভয় ছিল, উঠিয়া পলাইবার যোগাড় করিতেছি, এমন সময় পাশে উপবিষ্ট জনৈক অপরিচিত ব্যক্তি চাদর ধরিয়া টান মারিলেন। বুঝিলাম উঠা চলিবে না, হতাশ হইয়া বসিয়াই পড়িলাম।

* * *

হঠাৎ দেখি আমাদের টুনি মহিলাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া আসিতেছে। টুনি কলেজে পড়ে, দেখিয়া ভরসা হইল, কলেজের ছেলেমেয়েরা আর যাহাই হউক শরণাগতকে ফেলিয়া পলাইবে না। বিপদে পড়িলে উহাদেরই সাহায্য লইব ভাবিয়া সম্মিলনের কার্য্যকলাপ নিরীক্ষণে মনঃসংযোগ করিলাম। পার্শ্ববর্ত্তীদের আলাপ-আলোচনায় স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম ইহা প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য সম্মিলন। আমি ফস্ করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলাম, প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য সম্মিলনের প্রমাণ

কি? তিনি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিলেন। দেখিলাম—প্রবাসী সম্পাদক মহাশয় তাঁহার শ্বেতশ্মশ্রুরাশি অবলীলাক্রমে নীচের দিকে বিলম্বিত করিয়া বসিয়া আছেন। এটা যে প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য সম্মিলন তাহা প্রবাসী-সম্পাদক মহাশয় প্রমাণিত করিলেন। এমন সময় রবীন্দ্রনাথ মাটির দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া কোনো একটা হারানো দ্রব্য খুঁজিতে খুঁজিতে টাউন হলের সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিয়া আসিলেন।

* * *

পার্শ্ববর্ত্তী বলিলেন, মহাশয় দেখুন আর একজন প্রবাসী বাঙালী আসিয়াছেন—আপনার সন্দেহ কি এখনো ঘুচিল না? প্রবাসী বাঙালী সম্বন্ধে সন্দেহ অবশ্যই ঘুচিয়াছিল, কিন্তু সাহিত্য সম্বন্ধে সন্দেহ গাঢ় হইয়া উঠিল। বহুদিন হইতেই মনে একটা প্রশ্ন জাগিয়াছিল, "সাহিত্য বলিতে কি বুঝায়?" এবং এই প্রশ্নের সমাধানকল্পে পৃথিবীর সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধীয় বইগুলি পড়িব পড়িব মনে করিতেছিলাম, এমন সময় অপ্রত্যাশিতরূপে সাহিত্য-সম্মিলনীতে উপস্থিত হইবার সৌভাগ্য ঘটিয়া গেল। ভাবিলাম, পূর্ব্ববর্ত্তী প্রশ্ন "সাহিত্য বলিতে কি বুঝায়" না হয় আপাতত থাক, পরবর্ত্তী প্রশ্ন "সাহিত্য কয় প্রকার" তাহা এই সুযোগে জানিয়া যাই। কিন্তু হায়, তাহাও জানা গেল না।

* * *

রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, "সাহিত্য ব্যাপারে সম্মেলনীর কোনো প্রকৃত অর্থ নাই।" কথাটা আমরা বহু পূর্ব্ব হইতেই জানিতাম, সেই জন্যই ত ইনশিওর্যান্স-সম্মিলন বলিয়া সন্দেহ হইয়াছিল! "পৃথিবীতে দশে মিলে অনেক কাজ হয়ে থাকে, কিন্তু সাহিত্য তার অন্তর্গত নয়"—রবীন্দ্রনাথ এ কথা সাহিত্য-সম্মিলনীতে প্রচার করিলেন কেন? তাহার চেয়ে যদি বলিতেন মানুষের দুইখানি মাত্র হাত, এবং বলিয়াই

বসিয়া বসিয়া পড়িতেন, তাহা হইলেও সাহিত্যিক-রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সাহিত্য ক্ষেত্রের বাহিরের একটা অতিপরিচিত সত্য ঘটনা প্রকাশ করার জন্য ধন্যবাদ দিতাম। কিন্তু সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য-ক্ষেত্রের সর্ব্বজন-পরিচিত পুরাতন একটি কাহিনীকে এরূপ জোর করিয়া প্রকাশ করিলেন কেন ভাবিয়া পাই না। মনের সৃষ্টি এবং হাতুড়ির সৃষ্টি যে এক নয় তাহা কি রবীন্দ্রনাথ এতদিন জানিতেন না, বা জানিয়াও গোপন রাখিয়াছিলেন? হায়, সাহিত্য-পালের গোদা যে কথা বলিলেন তাহাতে হতাশ হওয়া ছাড়া আর উপায় ছিল না।

* * *

বাংলা দেশের আকাশে সাহিত্য নাই, কিন্তু সেই আকাশ যে শব্দভেদী রক্তপিপাসু বাণে ছাইয়া গিয়াছে ইহা আমরা পূর্ব্বে জানিতাম না। রবীন্দ্রনাথ দেখিতে পান "বাংলা দেশের ছোট বড় খ্যাত অখ্যাত গুপ্ত প্রকাশ্য নানা কণ্ঠের তূণ থেকে শব্দভেদী রক্ত-পিপাসু বাণে আকাশ ছেয়ে ফেলল, এই অদ্ভুত আত্মলাঘবকারী মহোৎসাহে বাঙালী আপন সাহিত্যকে খান খান করে ফেলতে পারত, পরস্পরকে তারস্বরে দুয়ো দিতে দিতে সাহিত্যের মহাশ্মশানে ভূতের কীর্ত্তন করতে তার দেরী লাগতো না—কিন্তু···বেঁচে গেছে।"

* * *

বঙ্গদেশে "আজও", (ধরা যাউক এই বৎসরে) যতগুলি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ গল্প বা উপন্যাস পুস্তক ছাপা হইয়াছে তাহার মধ্যে পরস্পর আক্রমণ করিয়াছে এরূপ একখানি পুস্তকও আমাদের চোখে পড়ে নাই। গত এক বৎসরের মধ্যে (পূর্ব্বের কথা ছাড়িয়াই দিলাম) বাংলা ভাষায় যতগুলি মাসিক পত্র বাহির হইয়াছে তাহার মধ্যে

"প্রবাসী"তে রবীন্দ্রনাথের বা অন্য কাহারো বিরুদ্ধে গালিগালাজ করিয়া লেখা কোনো প্রবন্ধ কবিতা বা গল্প দেখি নাই। ভারতবর্ষ ত কাহারো বিরুদ্ধেই বড় একটা কিছু বলে না, তথায় মাত্র দুই একটি এরূপ লেখা দেখিয়াছি। তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দকে গাল দিয়াছেন। এই রমাপ্রসাবাবু অবশ্য কিছুদিন পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথকে গাল দিয়া বসুমতীতে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা প্রত্নতত্ত্ববিদের ব্যর্থ গাল—কবির উপলব্ধির' বিরুদ্ধে। "প্রাচীন ভারতে গ্যালভানিক ব্যাটারি ছিল কি না" নামক ব্যঙ্গ রচনা দ্বারা রবীন্দ্রনাথ নিজেই এক সময়ে প্রাত্নতত্ত্বিকের গায়ে খোঁচা মারিয়াছিলেন, রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় এতকাল পরে তাহার শোধ তুলিয়াছেন।

* * *

ভারতবর্ষের পর বিচিত্রা। কাহাকেও আক্রমণ করে বলিয়া দুর্নাম নাই। বসুমতীতে বহুদিন আগে শ্রীযুক্তা রাধারাণী দেবী ও শ্রীযুক্ত জলধর সেনের বিরুদ্ধে কয়েকটা প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল। মনে হয়, ইহাও এক বৎসর পূর্ব্বের কথা। কিন্তু "বঙ্গশ্রী" কাগজে শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের গবেষণা-মূলক ঐতিহাসিক প্রবন্ধ ছাপা হইয়াছিল। তাহা হইতে জানা যায় রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধে প্রচলিত কাহিনীগুলির অধিকাংশই ভ্রমাত্মক। কিন্তু এই প্রবন্ধগুলি কাহাকেও আক্রমণ করিয়া লেখা নহে। ইহার ফলে ব্রজেনবাবুই কিঞ্চিৎ আক্রান্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু ইহা সাহিত্য-ক্ষেত্রের ব্যাপার নহে, ইতিহাস-ক্ষেত্রের ব্যাপার। ইহা ছাড়া শ্রীযুক্ত সত্যসুন্দর দাস মহাশয় সাধু ভাষা বনাম চলতি ভাষা লইয়া আলোচনাকালে রবীন্দ্রনাথের লেখা হইতে উভয় প্রকার ভাষা উদ্ধৃত করিয়া তুলনামূলক সমালোচনা

করিয়াছিলেন। ইহাও রক্ত-পিপাসুর আক্রমণ নহে। রবীন্দ্রনাথ এই প্রকার আক্রমণে "পরস্পর" কথাটি ব্যবহার করিয়াছেন। ইহার অর্থ এই যে রবীন্দ্রনাথকে যদি কেহ আক্রমণ করিয়া থাকেন তবে রবীন্দ্রনাথও পাল্টা বলিতেছেন—"আজও বর্ত্তমান সাহিত্যেও বাঙালীর ভাঙন-ধরানো মনের কুৎসা-মুখরিত নিষ্ঠুর পীড়ন-নৈপুণ্য সর্ব্বদাই উদ্যত।"

ইহাকেই বলে পরস্পর আক্রমণ। যাহা হউক শব্দভেদী বাণে আকাশ একেবারে ছাইয়া ফেলিল এরূপ তীরন্দাজ "আজও" বাংলা সাহিত্য-ক্ষেত্রে তাহা হইলে রহিয়াছে। অপরকে গাল দেয় বলিয়া শনিবারের চিঠির অপবাদ আছে বটে, কিন্তু রক্ত-পিপাসু বাণ তাহার নহে। আকাশ ছাইয়া ফেলিবার গর্ব্বও তাহার নাই। রবীন্দ্রনাথ এই বিভীষিকা দেখিলেন কোথা হইতে ? তিনি নিজে আক্রমণের যে ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন তাহাও ত খুব মধুর নহে !

* * *

ব্যঙ্গ করিবার রীতি সভ্য সমাজে প্রচলিত বলিয়াই রবীন্দ্রনাথের মত সুমার্জ্জিত, মনঃপ্রকর্ষকপ্রাপ্ত ব্যক্তিও ব্যঙ্গ-কৌতুক নামক গ্রন্থ প্রকাশ করিতে পারিয়াছিলেন। ইংরেজি পাঞ্চ কাগজে যখন সার জন সাইমনের পায়ে জুতার পরিবর্ত্তে ক্ষুর থাকে, মাথায় টুপীর পরিবর্ত্তে শিং থাকে, অথবা ম্যাকডোনাল্ডের লেজ বাহির হয় তখন তাঁহারা কেহই পার্লামেন্টে গিয়া বলেন না যে ইংরেজের "ভাঙন-ধরানো মনের কুৎসামুখরিত নিষ্ঠুর পীড়ন-নৈপুণ্য সর্ব্বদাই উদ্যত।" বারনার্ড শ কে লইয়া, চেষ্টারটনকে লইয়া ব্যঙ্গ বিদ্রূপের অবধি নাই, কিন্তু তাঁহারাও কখনো সেন্টিমেণ্টাল হইয়া উঠিয়া নিষ্ঠুরতা নির্দ্দয়তা প্রভৃতির অপবাদ

কাহাকেও দেন নাই। খ্যাত ব্যক্তি মাত্রেই পাঁচ জনের আলোচনার বিষয়। খ্যাত ব্যক্তিগণ ইহাতে বিচলিত হওয়া দূরে থাক, ইহাকে গ্রাহ্যই করেন না। সামান্য ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ যাঁহাকে স্পর্শ করে, যিনি ইহাতে অবিভূত হইয়া পড়েন, লোকের কাছে কাঁদিয়া বেড়ান, তিনি খ্যাত হইতে পারেন, মহৎ নহেন।

* * *

বাংলা লিপি পরিবর্ত্তন করিয়া রোমান লিপি গ্রহণের কথা উঠিয়াছে। শ্রেষ্ঠ ভাষাতত্ত্ববিদ ডঃ শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ইহার পক্ষপাতী। ভাষার কালগত পরিবর্ত্তনের প্রত্যেকটি অবস্থার সহিত যাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয়, লিপির প্রতিও তাঁহার মমতা থাকা স্বাভাবিক। সুতরাং এইরূপ কোনো ভাষাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত ব্যক্তি যখন কোনো প্রচলিত লিপি ত্যাগ করিয়া নূতন লিপি গ্রহণের পক্ষপাতী হন, তখন বিষয়টি প্রত্যেকেরই ভাবিয়া দেখা উচিত। সংস্কারগত-গোঁড়ামি যে-কোনোরূপ পরিবর্ত্তনেরই অন্তরায় হইতে পারে। কিন্তু যদি বুঝা যায়—এরূপ পরিবর্ত্তনে এক সংস্কার ছাড়া আর আর কোনো দিকেই কোনো বিরোধ নাই, এবং ইহাতে বর্ণমালা শিক্ষা এবং ছাপার কাজ অধিকতর সুবিধাজনক হইতে পারে, তাহা হইলে এই প্রস্তাবকে আমরা সমর্থনই করিব। নিজ নিজ লিপিবিষয়ে সকলেরই অভ্যাসগত মমতা আছে, সুনীতিবাবুরও আছে, কিন্তু যে-কোনো নূতন বৈজ্ঞানিক-রীতির প্রচলনে চিরদিনই আমরা পুরাতনকে বিদায় দিয়াছি। সুতরাং আজ যদি লিপিবিষয়ে সেরূপ কোনো ত্যাগের প্রয়োজন উপস্থিত হইয়া থাকে তবে তাহা লইয়া দুঃখ বা হাহুতাশ করা হাস্যকর।

* * *

কেহ কেহ এরূপ কথাও বলিয়াছেন যে য়ুরোপের সভ্যতার নিকট আমরা আমাদের সকল বৈশিষ্ট্যই জলাঞ্জলি দিয়াছি—বাকি ছিল অক্ষর তাহাও যাইতে বসিল। বৈশিষ্ট্য বলিতে কি বুঝায় সেরূপ হাস্যকর প্রশ্ন এখানে তুলিব না, কিন্তু বৈশিষ্ট্য যদি আকার পরিবর্ত্তনেই যায়, তাহা হইলে তাহা যাওয়াই ভাল। কোনো চামড়া-তত্ত্ববিদ যদি বলেন কোনো একটা বিশেষ ঔষধ খাইলে ভারতবাসীর চর্ম্ম-বর্ণ য়ুরোপীয়দের মত হইবে এবং ফলে চর্ম্মরোগ কখনো হইবে না, তাহা হইলে কি আমরা আমাদের বর্ণ-বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া চিরদিন পিঠ চুলকাইতে থাকিব, কদাপি সে ঔষধ পান করিব না? এরূপ বৈশিষ্ট্য ত বড় ভয়ানক! চলিবার বেলা গো-যান ত্যাগ করিলাম, ভুঁড়ি আবৃত করিয়া জামা পরিলাম, টিকি কাটিয়া টুপি পরিলাম, মোজা-জুতায় পা ঢাকিলাম কৈ আমাদের বৈশিষ্ট্য ত নষ্ট হইল না! বাঙালীর চরিত্রগত গুণ ত সবই বিদ্যমান রহিয়াছে! থিয়েটার পার্টিতে চাঁদা দিলে আজও ত রাজা সাজিবার জেদটি আত্মপ্রকাশ করিয়া বসিতেছে—বাঙালীর সব চেয়ে উচ্চাকাঙ্ক্ষা অর্থাৎ সাহিত্যিক হওয়া ইহাও ত পৃথিবীর কোনো সভ্যতাই ঠেকাইতে পারিতেছে না! তবে একমাত্র লিপি পরিবর্ত্তনে বৈশিষ্ট্যের প্রশ্ন কেন?

* * *

সার লালগোপাল মুখোপাধ্যায় প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য সম্মিলনে সভাপতির অভিভাষণে বলিয়াছেন—

> আমাদের ভারতবর্ষে অনেকগুলি লিপি প্রচলিত। সকল দেশেই লোকের নিজের দেশের লিপির প্রতি একটা টান আছে—যেমন আমাদের বাংলা লিপির প্রতি। যদি আমরা দেবনাগরী অক্ষর চালাই, সেও কতক ভাবে এক প্রদেশের

লিপিকে অন্য প্রদেশের লিপির উপর স্থান দেওয়া হবে। তাতে অনেকের প্রাদেশিক মনে ঘা লাগতে পারে। কিন্তু সকলেই একটা নূতন অক্ষর গ্রহণ করতে রাজী হ'তে পারেন। এবিষয়ে চেষ্টা করে লোকমত গঠন করে, আজ থেকে ধরুন ২০ বৎসর পরে আমাদের নিজের চেষ্টায় আইন করে আমরা Roman অক্ষর চালালে, সে কাজটা সহজ হবে, আর মঙ্গলের ত কথাই নাই।

দেবনাগরী অক্ষর চালাইবার প্রশ্নই উঠে না। সমস্ত ভারতবর্ষের এক লিপি হউক ইহা মুখ্য নহে, লিপি সংক্ষিপ্ত এবং সহজ হউক ইহাই মুখ্য উদ্দেশ্য। সুতরাং দেবনাগরী কিংবা ফার্সী লিপিতে প্রাদেশিক মনে ঘা না লাগিলেও উহা গ্রাহ্য নহে।

* * *

মান্দ্রাজ আর্ট স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী মহাশয় শিল্প-বিভাগের সভাপতি হিসাবে যে অভিভাষণটি পাঠ করিয়াছেন তাহা নানা দিক দিয়া বিশেষ মুলবান হইয়াছে। বাংলা-দেশে চিত্র শিল্পী কত আছেন আমরা তাহার হিসাব জানিনা (এ জীবনে জানিবার সৌভাগ্যও হইবে না) কিন্তু চিত্রশিল্প সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিতে পারেন এরূপ লোকের দেখা পাইলাম না। শিল্পী না হইয়া শিল্প আলোচনা করা চলে, কিন্তু শিল্পের ভাষা না জানিয়া শিল্প সমালোচনা করা চলে না। ইতিহাসের দিক দিয়া, অভিব্যক্তির দিক দিয়া বিশেষ যুগের ষ্টাইলের দিক দিয়া যে কোনো শিক্ষিত ব্যক্তিই শিল্প আলোচনা করিতে পারেন, কিন্তু শিল্পী কোথায় প্রতারণা করিল—কোথায় সফল হইল, কোথায় বিফল হইল, ইহা বিচার করিতে হইলে বিশেষ-শিক্ষা প্রয়োজন। দেবীপ্রসাদের সেই

শিক্ষা আছে; কারণ তিনি শিল্পী, সুতরাং সমালোচনায় তাঁহার অধিকার আছে।

* * *

কিন্তু অভিভাষণে তিনি কোনো শিল্প সমালোচনা করেন নাই, দুই চারিটি প্রাণের কথা বলিয়াছেন। আমাদের শিল্পের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা অত্যন্ত মোলায়েম হইয়া পড়িয়াছে। বলিবার এমন সুযোগ পাইয়া দেবীপ্রসাদ তাহা নষ্ট করিয়াছেন। "সাহিত্য-সম্মিলন" এই নামটিই তাঁহাকে উদ্ভ্রান্ত করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। পাথর-খোদাই হাত, আর ৪০ ইঞ্চি ছাতি! হায় দেবীপ্রসাদ, শেষকালে খারাপ জিনিসকে প্রাণ খুলিয়া খারাপ বলিতে বাধিল! খুলিয়া না বলিলে যে কাহারো চেতনা সঞ্চার হয় না। দুঃখকে এরূপ ভাবে চাপিয়া গেলে দুঃখ দুঃখই রহিয়া যাইবে। বাংলা দেশে শিল্পের বর্ত্তমানে যা অবস্থা হইয়াছে—অন্তত মাসিক পত্রিকা মারফৎ যাহা দেশময় পরিবেষিত হইতেছে তাহার অধিকাংশই শিল্পের ব্যভিচার ছাড়া আর কিছুই নহে। যেমন সাহিত্যে, তেমনি শিল্পে এই ব্যভিচারের লীলা চলিতেছে; ইহার প্রতিবাদে কোনো ফল আপাতত হইবে না—কিন্তু তবু যদি প্রতিবাদ করিতেই হয় তবে তাহা তীব্র ভাবেই করিতে হইবে। ওরিয়েণ্টাল আর্ট নামে যে ফাঁকি চলিতেছে, সে বিষয়ে দেশকে সচেতন করিবার ভার শিল্প-সমালোচকের।

* * *

দেবীপ্রসাদ বলিয়াছেন,

> অবনীন্দ্রনাথের চিত্রধারা অবলম্বন ক'রে বাংলাদেশে যে নূতন আন্দোলন চলেছে—সেটাকে মোটমাট আধুনিক

ভারতীয় চিত্রকলার আন্দোলন বলা চলতে পারে। * এই নূতন আন্দোলন চলতি হবার পর মাসিক পত্রিকার শিল্পীরা নির্দ্দয়ভাবে নরদেহের উপর অত্যাচার করলেও তাতে আনুমানিক ভারতীয় চিত্রকলার ধারা থাকায়, বিকলাঙ্গ দেহও মার্জ্জনীয় হয়ে উঠেছে। এই সব যথেচ্ছচারিতার সমর্থন করার মূলে রয়েছে ফ্যাশান বা চলতি রুচি। * * বিদেশীদের অনুকরণে মাঝে মাঝে এদেশেও এমন ছবি বার হয়, যা দেখে বুঝতে পারি, প্রতিভা এবং পাগলামির মাঝে যেটুকু প্রভেদ আছে, তা উঠিয়ে দেবার দক্ষতা অনেকে অর্জ্জন করেছেন। * * * আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলার দোহাই দিয়ে মাসের পর মাস যে সব ছবি কাগজে ছাপা হচ্ছে, সেগুলি হয়ত শিল্পীকে উৎসাহ দেবার জন্যই সম্পাদকেরা প্রকাশ করে থাকেন ; কিন্তু এরকম ছবির প্রচারে ব্যভিচারই বেশি করে প্রশ্রয় পেয়ে থাকে। শিল্পীর সাধনা এবং রস-সৃষ্টির অপেক্ষা তার প্রতারণা স্পষ্ট ভাবে ধরা পড়ে।

এই কথাগুলি আরো স্পষ্ট করিয়া বলিবার প্রয়োজন আছে। শিল্পী দেবীপ্রসাদ বাংলাদেশের যে শিল্পধারা দেখিয়া পীড়িত হইয়াছেন, তাহার বিরুদ্ধে তাঁহার তীব্রতম প্রতিবাদ এবং কঠিনতম ভাষা প্রযুক্ত হউক।

মহুয়া

(ময়মনসিংহ গীতিকা)

রজনীগন্ধার বনে পূর্ণিমার শুভ্র-নীরবতা,
নিরূর্মি নিষুপ্ত হ্রদে ছায়াপথ ভাস্বর যেমন,
বসন্তের অরণ্যেতে ক্ষণতরে স্তব্ধ ব্যাকুলতা,
তেমনি ঘুমায় বালা, মহুয়া সে ; এবে তার মন
নীড়ে-ফেরা পাখী সম, বিস্মরিয়া সুদূর কানন
বিস্মরিয়া দিবসের সঙ্গীহীন বিশাল আকাশ
স্মরিছে একটি মুখ, নেহারিছে একটি স্বপন।
একটি প্রেমের স্মৃতি নাশ করে সকল আভাস
বিরাট গগন-পটে লক্ষ তারালুপ্তকারী যথা পৌর্ণমাস॥

২

স্বর্ণ সৌরকর সম মিলনের স্মৃতির মৃণাল
অগ্নিবর্ণে নেমে গেছে তলহীন হৃদয়ে তাহার ;
কি বা সে নাগিণীদল ভেদ করি বাসনা-পাতাল
ললিত-তরল-নৃত্যে খুঁজিতেছে আলোকের পার !
কৌতূহলী চন্দ্র করে উদ্ঘাটিত যেমন অপার
পাথারের গূঢ় লীলা, জলতল উপল-চিক্কণ ;
স্বপন-সাগর মথি অধরের হাসি-রেখা তার
স্মৃতিসুধা সঞ্জীবিত প্রকাশিছে ব্যর্থ সে জীবন,
অগাধ সাগরতলে শূন্য যথা কমলার রত্ন সিংহাসন॥

স্বপন-সোপান-স্বর্ণে অবতরি হৃদয়ে তাহার
দেখিলাম ভূলুণ্ঠিত একখানি পদ্ম শতদল ;
স্মৃতির পাপড়িগুলি একে একে উঘারিয়া তার
জীবনের মধুকোষ, অকথিত বাণীতে অচল।
মহুয়া বেদের মেয়ে, দেখাইয়া ব্যায়াম কৌশল
ভ্রমে দলবলসহ ; এই মতে কাটিত জীবন।
হেন কালে চাঁদ সনে অকস্মাৎ দেখা তার হল !
বুঝিল মহুয়া নারী, সবিস্ময়ে দেখে নিজ মন,
কৈশোর-শিথান প্রান্তে নিশান্তে লভিল যেন অপূর্ব্ব রতন ॥

সেই হতে দিনে রাতে কভু একা সজনে বিজনে
বিথারি' আপন মন চাহিয়াছে বুঝিতে তাহারে ;
অলক্ষ্য আলোকলুপ্ত আকাশের উচ্চতম কোণে
তৃষার্ত্ত চাতক সে যে ; সে কি আসে নয়নের পারে ?
মাঝে মাঝে সচকিয়া বুকফাটা তপ্ত হাহাকারে
আপন নিশানা দেয়, ওরে মুগ্ধা, সেই মন হায়
ধরা কি কখনো দেয় জগতের কঠিন বিচারে !
সে মানসী পা ফেলিয়া চলে রক্ত ব্যথায় ব্যথায়,
জরির জড়োয়া হানি ধায় সে ছলনাময়ী হাসির আভায় ।

কি ছিল চাঁদের চোখে না বুঝিল অবোধ বালিকা,
পুরুষের আঁখি হায়, সে যে হেন পরশ-রতন
কে জানিত আগে তাহা ! ভালে তার কি রহস্য লিখা
যৌবনের অশ্বমেধে ছুটিয়াছে ত্বরিত-চরণ
জীবনের তুরঙ্গম। মুগ্ধ বালা করিল অর্পণ

কোকিল-ব্যাকুল এক বসন্তের নীরব নিশীথে
প্রেমের বেদিকাতলে তার সর্ব্ব দেহ প্রাণ মন।
শৈশবের খেলাঘরে বেহাগের ব্যথার ইঙ্গিতে
যে জাগিল প্রেম সে কি? নাহি ভেদ তবে কিগো
গরল-অমৃতে?

কে মিশালো সমভাগে প্রেমপাত্রে অমৃতে সুধায়,
নন্দনের হেমপাত্রে অকস্মাৎ-বেদনার খাদ!
ছিঁড়িয়া মোতির মালা তারে দিয়া কে অশ্রু বানায়,
কোন্ দুষ্ট রাহু হায় গ্রাস করে চুম্বনের চাঁদ!
দুরন্ত সমুদ্রতটে কেবা রচে বালুকার বাঁধ
নিতান্ত কৌতুকভরে! হায় বালা চেয়ো না বুঝিতে
প্রণয়ের পরিণাম জীবনের রহস্যে অগাধ;
সহজে ভাসিয়া যাও পাবে কূল সোনার তরীতে,
অতলে তলাও যদি নাহি তল, নাই তীর মৃত্যুর নিভৃতে॥

ভ্রমরা বাঁদিয়া ছিল মহুয়ার পিতা; ভাসমান
মেঘসম গুটায়ে কানাৎ তাঁবু দলবল সহ
অশ্ব, ছাগ, অশ্বতর আর লয়ে ইজ্জত সম্মান
চলিল সুদূর দেশে; "মাণিক রে এ ব্যথা দুঃসহ!
থাক্ পড়ে জমি জমা, হেথাকার আবাস ত্যজহ,
আমার কুলের মেয়ে, পাহাড়ের বনেদি বাঁদিয়া,
সে হবে রাজার বউ! দূর বনে এখনি চলহ।"
ছাড়িয়া বামুনকাঁদি নিশীথের আড়াল লভিয়া
চলিল বেদের দল, চলিল মহুয়া সাথে দীর্ঘ নিশ্বসিয়া॥

যে-তুঃখে রাজার ছেলে নিক্ষেপিয়া রাজত্ব সম্বল
পথিকের দীক্ষা লয় ; নিরাশার নিকষ-শিলায়
আপন হৃদয়ক্ষত, একমাত্র উষার উজ্জ্বল
বাসনার রক্তরাগ, তারি লুব্ধ হাত ছানি, হায়,
(ব্যাকুল কমল যথা মানসোৎকা হাঁসের পাখায়)
চাঁদেরে উদাসি' দিল। ছাড়িল সে গৃহ ধন জন।
বহুদেশ ভ্রমি একা, বহুকাল সহি নির্ব্বাসন,
সোমেশ্বরী নদী তীরে, আজিকে সন্ধ্যায় দোঁহে হয়েছে দর্শন ॥

ঘুমায় মহুয়া সুখে ; জীবনের জটিল বনের
শাখা প্রশাখার ফাঁকে চিরকাল যে শশী ভাস্বর,
তাহারি একটি রেখা, আজি তার বিরহী মনের
ব্যথায় ব্যর্থতা পরে, বাসনার সোনায় সুন্দর
গড়িছে বাসর-কক্ষ। ভেঙে ভেঙে পড়ে নিরন্তর
জগতের তরঙ্গিনী জীবনের এক উপকূলে
জাগে স্বপনের তীরে নবদেশ শ্যামল উর্ব্বর।
যে মেঘ কাঁদিয়া গেল পূর্ব্ববায়ে মন্দ পাল তুলে
সে পুন ছুটিয়া নামে ব্রহ্মপুত্র স্রোতস্বীর গিরিদ্বার খুলে ॥

নারদের বীণাচ্যুত মন্দারের মালাগাছি সম
লুটায় মহুয়া ঘুমে—অরণ্যের পল্লব-শয্যায়
নয়ন-নিমীল সুখে, চন্দ্রকর যেন নেত্রোপম
রজনীগন্ধার পুষ্প পেলবতা চোর ; এবে হায়,
চরণের চঞ্চলতা, কাঁপিত যা ঝঙ্কৃত বীণায়

আলোর ঝলক সম শ্রোত্রপেয় সে সঙ্গীত ধার
আপনারে অনুবাদি' ভাস্করের স্ফটিক-ভাষায়
নীরব গরবে মরি ; এলায়িত কৃষ্ণ কেশভার
বিস্মৃতির বৈতরণী, মৃত্যুর রহস্য বহি অতল অপার ॥

বিদেশী বঁধুর মুখ আজি তার জাগিছে স্মরণে !
নদীর কল্লোলে আর, বসন্তের চাঁদের ইঙ্গিতে,
স্মৃতির তুফান ওঠা সোম-গন্ধী মল্লিকার বনে,
যামিনীর মৌনভেদী অকারণ করুণ সঙ্গীতে,
অকস্মাৎ সেতু-গাঁথে জনমের ভবিষ্যে অতীতে।
ক্ষণিক আকার পায় জীবনের ক্ষীণ-বৃন্ত সাধ,
সুমেরু সুবর্ণপদ্মে ফোটে তাহা চিত্তের নিভৃতে।
একখানি কাম্য মুখ, চারিদিকে সমুদ্র অগাধ,
সুখসুপ্ত ধরণীর স্বপ্ননেত্রে যথা কৃষ্ণাদশমীর চাঁদ ॥

সহসা জাগিল বালা, নেহারিল আঁখি কচালিয়া,
ও কি ও খদ্যোৎ জ্বলে, অসময়ে মেঘ-আড়ম্বর !
না, না, ও জোনাকী নয়, আঁখি-দ্যুতি বন উজলিয়া,
অন্তর্গূঢ় ঈর্ষ্যারূঢ় হুমরার বজ্র গর্জ্জস্বর।
"আর কত ঘুমাওরে। চোখ মেলে জাগো মা সত্বর ;
আমার কুলের সর্প এতদূর এলো মাটি খুঁড়ি !
চিরদিন গৃহবাসী, সেই হবে বাদিয়ার বর !
পথিকের কণ্ঠহার অবশেষে সে করিবে চুরি ?
যাও মা মহুয়া তারে স্বহস্তে বধিয়া এসো, এই লহ ছুরি ॥"

উঠিল মহুয়া ধীরে ; পূর্ণ শশী মেঘে দিল ঢাকি।
দেখিল ক্ষণেক কাল, বুঝিল সে এ নহে স্বপন ;
উত্তর প্রত্যাশাব্যগ্র হুমরার নিশাচর আঁখি
ছোটে বা কোটর ত্যজি ! শ্বাস রুধি করিল গ্রহণ
শীতান্তে জাগ্রত তপ্ত তক্ষকের জিহ্বার মতন
খরশাণ ছুরিকারে ; তারপরে গেল পায়ে পায়ে,
নদীর উজান-ঠেলা মন্দগতি তরণী যেমন,
শ্যামশস্প শয্যাপরে ডোরা-টানা শালবনচ্ছায়ে
শিথানে রতন-পাওয়া নির্ভর নিসুপ্ত চাঁদ যেখানে ঘুমায়ে ॥

রাতের স্বপনে যেবা ভোর বেলা দেখে মূর্ত্তিমতী
তাহারি আগ্রহভরে, অকস্মাৎ উঠে বসে চাঁদ :
"মহুয়া মহুয়া, সখী, ভাগ্য মোর সুপ্রসন্ন অতি।
উদ্বেল বাসনাবারি লঙ্ঘিল কি নিষেধের বাঁধ,
অয়ি মোর কামনার কমনীয় কনক নি-খাদ।"
নীরব মহুয়া, শুধু বিকম্পিত বেতসীর মত
কাঁপিল সে সারা অঙ্গে ; চারিদিকে স্তব্ধতা অগাধ ;
প্রাণপণে দীর্ঘশ্বাস-চেপে-রাখা মহুয়ার, হায়,
অঞ্চল আড়াল হ'তে খসে পড়ে ছুরিখান, প্রদীপ্ত জ্যোৎস্নায়

কাঁদিয়া মহুয়া বলে—"মোরে তুমি, ছেড়ে দাও প্রিয়,
ওই তো গহিন্ নদী, জলে তার আমি ডুবে মরি॥"
"তার চেয়ে প্রিয়তমা সে তটিনী তুমি সে হইও
অনন্ত যৌবনে তব আপনারে সমর্পন করি
অতলে ডুবিয়া যাব, দাবদগ্ধ জীবন বিস্মরি।

মৃত্যু কি ভীষণ এত ! জীবন কি এতই আশ্রয়
জীবন মরণাতীত প্রণয়ের গর্ব্ব বক্ষে ধরি !
এ জীবন-উত্তরীয় বহুবার হয়েছে নিশ্চয়
অনেকের প্রেমে রাঙা ; তোমার চরম প্রেমে হোক্ তা অক্ষয়।

"জীবন-উত্তরী মোর কত পূর্ব্ব জনমের প্রেমে
নাহি জানি অপ্রমেয়, কত নববনচ্ছায়াতলে
প্রণয়কুসুম স্পর্শে বারম্বার গিয়েছিনু থেমে
এক কাননের ফুল অন্য বনে ফেলি খেলাচ্ছলে
জীবনের ছায়াপথে উত্তরিয়া আসিয়াছি চ'লে।
তবু তার গন্ধটুকু ! অলক্ষ্য সে গন্ধের মালিকা
চকিতে চমকি দেয়, নবতন প্রেমের কল্লোলে।
হৃদয়-দেহলি-তলে আজি লক্ষ প্রেম দীপালিকা,
একটি জীবনে হেরি শতপূর্ব্ব প্রণয়ীর অঙ্গুরীয় লিখা।

•

"মৃত্যুরে না করি ভয়, যদি পাই প্রেমের আশ্বাস।"
মহুয়া কহিল ধীরে,—"নাহি ব'লো মরণের কথা,
কেবল প্রভাত হবে, জীবনের মিটে নাই আশ,
এখনো রয়েছে বাকি সায়াহ্নের নীরব নম্রতা
তারপরে অবশেষে নিশীথের স্তম্ভিত স্তব্ধতা।
তার চেয়ে চল যাই, রজনীর থাকিতে থাকিতে
অন্ধকার অবশেষ, অন্য দেশে, সুখ আছে যথা !
আছে দুটি তাজি ঘোড়া, মোর জানা, বনের নিভৃতে,
ঘুমায় বেদের দল শিকারের পরিশ্রমে বিশ্বসিত চিতে।"

২

চামেলী-চমক লাগা শশী-রাকা নীরব শর্ব্বরী
পাখী-জাগা, আলো-আঁকা ছায়া-ছাকা পথে
যুগল ঘোড়ার ক্ষুরে রহি রহি উঠিল শিহরি ;
এ শাখে কোকিল ডাকে, কুহুস্বর অন্য শাখা হতে,
সুরের বসনখানি বুনে দেয় স্তব্ধ বায়ুস্রোতে।
ধরণীর রসোচ্ছ্বাস কুসুমের অজস্র বুদ্বুদে
অসহ্য প্রাণের ভরে বৃন্তপরে কাঁপে শতে শতে,
মৃত্যুর ললাটে দেয় জীবনের পত্রলেখা খুদে,
সৌরভের স্বয়ম্বরে প্রাণস্বপ্নে মরণের নেত্র আসে মুদে॥

চাঁদ মহুয়ার অশ্ব বাহিরিল বনভূমি হ'তে
সম্মুখে বিস্তার মাঠে পূর্ণিমার পূরন্ত জোয়ার ;
ডুবেছে পৃথিবী যেন ধবলিত জাহ্নবীর স্রোতে ;
খুদিয়াছে বিশ্ব ছবি যেন কোন্ কারু কর্ম্মকার
শুভ্র হস্তিদন্তপটে ; দাক্ষিণ্যে কি দিগ্বধূ বালার
রাশি রাশি কুন্দ বেলা নিশি গন্ধা মল্লিকা মালায়
বর্ষিল অজস্র-ধারে ; পানপাত্র আজি দেবতার
উচ্ছ্বসিত সোমরসে উদ্বেলিত কানায় কানায়
উৎসারিত সে মদিরা স্বর্গমর্ত্ত রসাতল দ্যুলোক ডুবায়॥

না, না, না, ভেঙেছে আজি চন্দ্রমার মধুচক্র খানি।
অনুরাগপাটল পাখা তারকার মধুমক্ষী যত

কনক-চাঁপার মধু সযতনে রেখেছিল আনি
দ্যুলোকের দিব্য-চক্রে ; দুর্ব্বিষহ রসভারে নত
সে মধুমাধুরী মদ লক্ষ স্রোতে ক্ষরিছে নিয়ত
স্বর্ণায়িত ত্রিভুবনে ; হায় সৌম্য হে ওষধিপতি
বুকে চাপি কাঁদে বিশ্ব চিরন্তন বেদনার ক্ষত।
বিরহখাণ্ডবদাহে ধরাতল বেয়াকুল অতি
আছে কি সে সোমলতা ভুলায় যা জীবনের সর্ব্বলাভ ক্ষতি ॥

চাঁদ ছোটে আগে আগে, পিছে ছোটে মহুয়া সুন্দরী ;
মদনের ধনুচ্যুত দুইখানি শরের মতন
ছুটিছে দুইটি অশ্ব ; কাননান্ত উঠিল শিহরি
নিশান্তের শীত বায়ে ; সোমেশ্বরী ভাঙিয়া স্বপন
আবর্ত্তিল তরঙ্গের জপমাল্য নিয়ত যেমন।
ক্বচিৎ পাখীর রব, ভীত শিবা ছুটে চলে যায়,
দূরে অশ্বক্ষুর দোঁহে সচকিতে করিল শ্রবণ,
ক্ষণেক থমকি থামে, থামে ধ্বনি, বোঝে শেষে হায়,
নিজেরি ঘোড়ার ক্ষুর প্রতিধ্বনিরূপে যেন তাদের ভয়ায় ॥

সহসা দেখিল দোঁহে পশ্চিমের দিগন্তরেখায়
পদ্মবনমধুরক্ত প্রৌঢ়হংস চন্দ্রমা সুধীরে
নামিছে স্থগিত পক্ষে, মন্দাকিনী তীর ত্যজি হায়
জাহ্নবী-পুলিন-পটে ; অতিদূর পূর্ব্ব গিরিশিরে
উষসীর পূর্ব্বরাগ ; বীণ্‌কার ভৈরবীর মীড়ে
তুলিছে মূর্চ্ছনা যেন ; সুখসুপ্ত দিগ্বধূ বালার
ঘুমে জাগরণে দ্বন্দ্ব, কভু আলো কখনো তিমিরে।

পূর্ব্বাশা পালঙ্কপরে লীলাময়ী দিক্-অঙ্গনার
নয়নে অধরে আলো, অসম্বৃত কেশপাশে নিশার আঁধার ॥

নীরব বজ্রের গর্জ্জে অকস্মাৎ উদিল সবিতা
বেদনার বেদমন্ত্র ; অন্ধকার তমসার তীরে
উদাত্ত উদ্বেগময়ী যেন আদি কবির কবিতা।
থামিল মহুয়া চাঁদ, পশ্চিমেতে তাকাইল ফিরে
সূর্য্যচন্দ্র উদ্ভাসিত উদয়াস্ত দুই গিরি শিরে।
যুগল কনককর দুই দিকে পড়িয়াছে লুটি,
দোঁহার ধরিয়া কর দুইজনা সম্ভাষিছে ধীরে।
স্বপ্নে আর জাগরণে ক্ষণতরে ভেদ গেছে টুটি,
নিসর্গের মানদণ্ডে সুধাস্যন্দী সৌন্দর্য্যের তুলাপাত্র দুটি ॥

বসন্তের সুপ্রভাত! গ্রামপ্রান্তে কোকিলের স্বর ;
শিশিরে শ্যামল মাঠ ; মাঠে মাঠে ক্ষেত গোধূমের :
শ্যামল আঁধার আর পদ্মমৃদু স্বর্ণ রবিকর ;
নদীমুখী কিশোরীর পায়ে লাগি ঝরে শিশিরের
লঘু স্বচ্ছ মুক্তাদল ; জড়াইয়া যুগল অশ্বের
ক্ষুরে ক্ষুরে ফল্গুরস ফাল্গুনের কুসুমেরি রাশি
দলিল' যা সারা রাত ; দুই জনা দেখে দুজনের
কপালের স্বেদ লেখা, ওষ্ঠাধরে ক্ষীণবৃন্ত হাসি,
অধরে মিলন তৃষা, নয়নে নয়নে জাগে উদাসিয়া বাঁশী ॥

ফাল্গুনের বেলা বাড়ে ; দুই অশ্ব তীরের মতন
প্রান্তরের বক্ষভেদী লক্ষ্যমুখী ছুটে চলে যায় ;

কুণ্ডলিত চক্রবাল ধীরে ধীরে করে আবর্ত্তন
দু' পাশের তরুশ্রেণী হুস্‌ করি ছুটিয়া পালায়।
ক্লান্ত অশ্বমুখ হ'তে রাশি রাশি ফেন-মল্লিকায়
আঁকিছে পথের চিহ্ন; বিলম্বিত বাতাসের স্রোতে
মহুয়ার চুল হতে সুরাগন্ধী সুরভি কষায়
হানিছে চাঁদেরে কশা; সংসারের পাঠশালা হ'তে
পলাতক দুইজনা, প্রলয়ের উল্কাসম আপন আলোতে॥

আজ বহুদিন পরে জীবনের আবর্জ্জনা হ'তে
মুক্তির দিগন্ত 'পরে দেখা দিল প্রণয়ী দুজন।
জানি জানি ভেসে যায় নিম্নমুখী কালিন্দীর স্রোতে
সকল সান্ত্বনা আর ধন জন সৌন্দর্য্য যৌবন।
তবু যা ফেরে না আর, জপমাল্যে নাহি আবর্ত্তন,
তারি লাগি কবিচিত্ত নিশি দিন কাঁদিয়া উন্মনা।
কোটালের বন্যা এ যে, এ যে হায়, নিশান্ত স্বপন,
গরল মাণিক্যময় এযে হায় জীবনের ফণা,
যে স্পর্শমণির স্পর্শে জীবনের সর্ব্বগ্লানি হ'য়ে যায় সোনা॥

রমণীর রূপ আর পুরুষের সবল যৌবন
হে বিধাতঃ শক্তিহীন! তুমি শুধু, পার একবার
মানবে এ বর দিতে। তারপরে সুদীর্ঘ জীবন
স্কন্ধে করি বহে চলি দুর্ব্বিবহ সুখস্মৃতি ভার
এইতো সংসার লীলা! তার চেয়ে চাঁদ মহুয়ার
ক্ষণিকের অবকাশ শতগুণে লক্ষগুণে শ্রেয়।

অশ্ব এক, নারী এক, সম্মুখেতে দিগন্ত অপার,
কালসঙ্গে পাল্লা দিয়ে অবিশ্রাম ছুটে চলে যেও,
অবজ্ঞার কশা হানি ; এইত জীবন, আর বাকি তো তুচ্ছেয় ॥

বয়স বাইশ যবে, আর যবে, নারী সপ্তদশী,
ধরাতে বসন্ত যবে, বনতল উঠেছে ফাল্গুনি',
মণি-গলা নভতলে জাগে যবে স্বপ্নহানা শশী,
বাসক-শয়নমুখী নূপুরের মৃদু রুনরুনি
সঙ্কোচে সার্ব্বসে যবে সন্তর্পনে ধীরে দেয় বুনি
বাসনায় বেদনায় ব্যাকুলতা আশা-আকাঙ্ক্ষায়
সেই তো জীবন মূঢ় ! যবে শুধু, দূর থেকে শুনি
মনে শুনি কানে শুনি, ধরিবারে দেহ ধেয়ে যায়
অতৃপ্ত তৃষার রথে জীবনের পথে পথে চির-মৃগয়ায় ॥

চাঁদ মুহুয়ার অশ্ব অবশেষে প্রবেশিল বনে ;
পথহীন অরণ্যের অবিরাম আদিম মর্ম্মরে
উর্ব্বশীর হাহাকার বিস্তারিয়া ব্যাকুল পবনে
কাঁদিতেছে নিরন্তর ; বিকশিত শ্যাম তৃণপরে
প্রভাতী শিশিরকণা নাহি শোষে খররবি করে
হেন সে গহন বন ; জোনাকীর সনে জ্বলে যথা,
শ্বাপদের দীপ্ত আঁখি, সে নিভৃতে সর্ব্বাঙ্গ শিহরে
সরীসৃপ-শীতলতা ; কানপাতা সতর্ক স্তব্ধতা
অধরে তর্জ্জনী রাখি শুনিবারে চাহে যেন অন্তরের কথা ॥

কিংশুকের কশাঘাতে আরক্তিম বনবীথি দিয়া
যুগল প্রণয়ী ধায় ; বসন্তের আতপ্ত বাতাস*

মহুয়ার খোঁপা হতে একটানে লয়েছে খুলিয়া
রবিরে আড়াল-করা ঘুমে-ভরা দীর্ঘ কেশপাশ,
জীবনের ব্রণ 'পরে মরণের স্নিগ্ধ পূর্ব্বাভাস।
"হে সুন্দরী মুখে তব জনপূর্ণ জীবনের জ্যোতি,
নিবিড় কুন্তলে তব তলহীন মৃত্যুর আশ্বাস,
অধরে গরল তব, দুটি নেত্রে অমৃত-মিনতি,
মর্ম্মর-নির্ম্মল দেহে জীবনে মরণে তুমি, সেতু-মূর্ত্তিমতী॥

"তুমি সখী রক্তহীন জীবনের কঠিন পাষাণে
সুদূরে নিকটে-আনা স্বপ্ন-হানা মুগ্ধ বাতায়ন।
ভাঙিলে প্রাকার ক্ষুদ্র, প্রকাশিলে বিস্মিত নয়ানে
মেঘের কাজল-পরা অতিদূর শিখর, কানন।
নিমেষের দ্রাক্ষা-পেষা সুদূরের মদিরা উন্মন
আমার বীণায় তুমি ছায়াময়ী বেহাগের মীড়,
যে-কথা পড়েনা মনে, করে শুধু হৃদি উচাটন,
তাহারি সঙ্কেত তুমি; শুধু যবে রজনী গভীর,
রজনী-গন্ধার গন্ধে স্বপ্নেরে করিয়া দাও চঞ্চল অধীর॥"

থামিল যখন চাঁদ, মহুয়ার ফুটিল অধরে
অর্থহীন ভাবে ভরা হাসি; যবে নিশীথ শেষের
শরৎ-পূর্ণিমা-চন্দ্র ধরণীর কুয়াশার পরে
বুলায় পরশ খানি, জাগাইয়া রেশমী-রেশের
ঊর্ণাতন্তু ইন্দ্রজাল, তুলনা কি সে স্মিত হাস্যের?
সে হাসি বোঝে না সবে, বোঝে যার আছে শুধু মন।

ব্যর্থ ভাষা নাহি পারে প্রকাশিতে মনোজগতের
সকল সঙ্কেত সূক্ষ্ম ; তাই সৃষ্টি হাসি ও ক্রন্দন,
তাই সৃষ্টি অনবদ্য বাসনা বাসর লাগি আশ্লেষ-চুম্বন ॥

কতক্ষণে বন ত্যজি দুই জনা আসিলা প্রান্তরে।
সম্মুখে তটিনী-ধনু ; অশ্ব হ'তে উতারিল ধীরে
দুইজনে : ক্লান্ত অশ্ব মুখ হ'তে যেন পুষ্প ঝরে ;
হঠাৎ আলোক যবে ঝলকায় কালো-দীঘি-নীরে
—উজ্জ্বল ঘোড়ার চোখ : জিন-গ্রন্থি গেছে সব ছিঁড়ে
বিস্ফারিত বক্ষ হ'তে নিশ্বাসের চাপে : মহুয়ার
চেনা স্বরে দুটি ঘোড়া বারম্বার চাহে ফিরে ফিরে।
মহুয়া উঠিয়া ধীরে কাছে টানি দুটি অশ্ব তার,
আদর করিল বহু, তৃণদল শেষ দান দিল বন্ধুতার ॥

তারপরে দুইজনে অবতরি তটিনীর নীরে,
দুরন্ত ধনুর পুঞ্জ কেশর আঁকড়ি, অবিরাম
চলিল ভাসিয়া শুধু ; শালবন দুই তীরে তীরে,
শ্যামল ছায়ায় তার দুই কূলে নেত্র-অভিরাম
তরঙ্গিত ছায়া পথ ; চোখে পড়ে কত ছোট গ্রাম ;
কেবল দুজনে তারা পাশাপাশি চলিল ভাসিয়া,
—অকারণ স্বপ্ন সম নাহি যার অর্থ, পরিণাম,—
জীবন-প্রবাহবেগে কত স্বপ্ন নশ্বর ছিঁড়িয়া
প্রলয় পয়োধিতলে এই মত ভেসে যায়, বারেক সাধিয়া ॥

সলিলে মলিন হ'ল মহুয়ার চোখের কাজল,
অধর পাণ্ডুর হ'ল, দুই গালে শুক্তির শুভ্রতা ;
অপাঙ্গ আরক্ত আর মধুগন্ধী আলোল কুন্তল
লিপ্ত হ'ল গ্রীবাতটে, বাহু দুটি কল্মীর লতা
এলায়িত জলতলে ; ভেদ করি শাড়ির স্বচ্ছতা,
তরঙ্গের তালে তালে ওঠা-পড়া বক্ষে নিরবধি
নিখাদ সোনায় গড়া বুদ্‌বুদের মুখে নাহি কথা।
—ভাসিয়া চলিল দোঁহে পাশাপাশি, বাহি ধনু নদী
ধরণীর কোনো প্রান্তে জীবনের উপান্তেও স্বর্গ থাকে যদি

(ক্রমশঃ)

নিও-জেনেসিস (Neo-Genesis)

যেমন হয়ে থাকে।—অনেকক্ষণ চা' খাওয়া হয়ে গেছে। কিন্তু [illegible]া ভালো করে জমে নি ; কারণ প্রত্যেকেই দলের ভিতর এত বেশী পরিচিত হয়ে পড়েছে—যে কারও আর বলবার মত কোনো কথা অবশিষ্ট নেই। এ রকম অবস্থায় যা' হয়ে থাকে,—অর্থাৎ সকলেই [illegible] বসে অপরের ছিদ্র অন্বেষণে নিযুক্ত আছে। সাধু বাঙলায় [illegible] গেলে—অতিপরিচয়ের ফলস্বরূপ প্রত্যেকেই ব্যাঘ্রের মত [illegible] পেতে বসে আছে ; একটু ছিদ্র পেলেই শিকারকে সলম্ফে আক্রমণ [illegible] উৎসুক।

নাম করলে সকলেই চিনতে পারবেন; তা' ছাড়া মানহানির আশঙ্কা আছে। অতএব সভ্যদের নাম গোপন করাই ভালো। আমি প্রত্যেককে, তাঁর পেশা (অর্থাৎ তিনি নিজেকে যা' মনে করেন) ধরে উল্লেখ করব। কিছুই বাদ নেই; ইঞ্জিনীয়ার, সঙ্গীতবিদ, জর্ণালিষ্ট, বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক, প্রফেসার, প্রফেসার-পত্নী ও তাঁর অনুজা। প্রফেসার-পত্নী এই চক্রের প্রতিষ্ঠাত্রী। উদ্দেশ্য মহৎ,—সভ্যদের মধ্যে প্রীতি-সম্পর্ক সুদৃঢ় করা। এবং এ যে সফল হয়েছে তা বলতে সুখী, কেননা প্রত্যহ সন্ধ্যার পরে আমরা এখানে সমবেত হয়ে চা খাই, এবং ঘণ্টা দুয়েক সময় পূর্ব্বোক্ত ভাবে ব্যয় করি। আজ অসুবিধা হয়েছে এই যে 'কমন-বাচ্' অনুপস্থিত; এবং অপর সকলেই এত সতর্ক হয়ে আছে যে আক্রমণের ছিদ্র পাওয়া যাচ্ছে না।

এ রকম অবস্থায় রাগ হবারই কথা। প্রফেসার-পত্নীর ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটবার উপক্রম হয়েছে এমন সময়ে বাঙলা দৈনিকের এক পয়সার সান্ধ্য সংস্করণ হাতে করে শ্রীমতী অনুজা আবির্ভূত হল। উত্তেজিত কণ্ঠে বললে,—"দেখেছেন, আজ বিকেলেও তিনজন মেয়েকে পুলিস অ্যারেষ্ট করেছে; বড়বাজার দিয়ে প্রসেশন করে যাচ্ছিল—"

কথা বলবার উপলক্ষ্য পেয়ে সকলেই তৎপর হয়ে উঠল। জর্ণালিষ্ট লাফিয়ে উঠে বললে—"তাই নাকি? তার পর? তারপর?—"

অনুজা বললে—"কোর্টে নিয়ে গিয়েছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট ওয়ার্নিং দিয়ে ছেড়ে দিয়েছে।"

জর্ণালিষ্ট পুনরায় বসে পড়ে বললে—"তা' আমি আগেই জানতাম।"

অনুজা চটে বললে—"তার মানে?"

"মানে মেয়ে বলেই অত সহজে রেহাই পেয়েছে—

এর পরে সভা সরব হয়ে উঠতে দেরী হল না।

প্রফেসার-পত্নী নারী-প্রগতির পাণ্ডা। মাসিক পত্রে এ সম্বন্ধে তাঁর প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে। ছোটখাটো (মেয়েদের) সভায় বক্তৃতাও করেছেন অনেক। সম্প্রতি কিছু অসুস্থ; এবং সেইজন্যে এবারকার 'মুভমেণ্টে' যোগ দিতে পারছেন না বলে স্বামীর প্রতি তাঁর আক্রোশের সীমা নেই। অনুজা তাঁর উপযুক্তা শিষ্যা। খদ্দর ছাড়া পরে না; একবারও জেলে যেতে পারে নি বলে নিরতিশয় দুঃখিত। সে এ কথায় বোমার মত ফেটে পড়ল।—"আহা! মেয়ে বলেই ছেড়ে দিয়েছে! এবারকার মুভমেণ্টে মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে কমটা কি করেছে শুনি?"

সঙ্গীতবিদ মেয়েদের প্রতি অতিশয় সহানুভূতিসম্পন্ন। সে একবার একটা সম্পূর্ণ কাল্পনিক কারণ দেখিয়ে অনুজার দুঃখে এমন গভীর সমবেদনা দেখিয়েছিল যে অনুজা সত্যিই মনে করেছিল—দুঃখের কারণ বাস্তবিকই ঘটেছে, কিন্তু সে টের পায়নি। সে বললে—"কিছুমাত্র নয়! স্বয়ং মহাত্মাজীও বলেছেন—"

বৈজ্ঞানিক সঙ্গে সঙ্গে অবিচলিত স্বরে বললে—"অনেক।"

প্রফেসার-পত্নী ভ্রূ-কুঞ্চিত করে বললে—"কি কি শুনতে পাই না?"

বৈজ্ঞানিক বললে—"ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল ডিটেল জর্নালিষ্ট দেবে। কিন্তু অনেক কম করেছে। পুরুষের চেয়ে তাদের শক্তি কম,—এই বৈজ্ঞানিক কারণে কম করতে তারা বাধ্য। এর ওপরে মহাত্মারও হাত নেই—"

অনুজা জলে উঠল। "ওটা আপনাদের একটা বুলি। হয়ত

একমাত্র শরীরের শক্তিতে একটু কম,—তাও আজকাল আমেরিকান মেয়েরা—”

বৈজ্ঞানিক বাধা দিয়ে বললে—“সব শক্তিতেই কম। শাস্ত্র, পুরাণ, ইতিহাস, আর্ট, সায়েন্স—যে দিকেই তাকাবেন—উল্লেখযোগ্য কিছু—”

কথাটা শেষ হতে পেল না। “নিজেদের তৈরী শাস্ত্র আর পুরাণ-ইতিহাসের বড়াই আর করতে হবে না; খুব বাহাদুর! কিন্তু আর্ট আর সায়েন্সে—কেন লীলাবতী, খনা, মাদাম কুরি, সাফো, গ্রাৎসিয়া দেলেদ্দা—”

“এবং অনুজা—” সাহিত্যিক জুড়ে দিলে। জমে আসছে দেখে সে খুসী হয়ে উঠেছিল। সঙ্গীতবিদ্ গম্ভীর হয়ে পড়ল, এবং বৈজ্ঞানিক হেসে ফেললে।

“যুক্তিতে পেরে না উঠলে ঠাট্টা করা ছাড়া আর উপায় নেই। আপনাদের হাতে ক্ষমতা ছিল, তাই চিরকাল মেয়েদের ওপর প্রভুত্ব করে এসেছেন—”

প্রফেসার উচ্চ হাস্য করল। প্রফেসার-পত্নী ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে, ভয়ঙ্কর একটা কিছু বলবার উপক্রম করছেন,—এমন সময়ে মোটরের হর্ণ দিয়ে ডাক্তার এসে উপস্থিত। অতি মধুর প্রকৃতির লোক। ব্যস্ততা মোটেই ভালোবাসে না। মেয়েদের প্রতি বিশেষ পক্ষপাত দেখা যায়। সাধারণতঃ রাত্রি বারোটার পরে সান্ধ্যভ্রমণে বার হয়; এবং রাত্রি দুটোর সময় কারো বাড়ী গিয়ে চা' খেতে চায়। আজ খুব সকাল-সকাল এসে পড়েছে। মোলায়েম সুরে টেনে টেনে বললে—“কী—ব্যাপার কী? অত এক্সাইটেড হবেন না—এ অবস্থায়। এ দিকে তিনটি মাস—আর ও দিকে তিনটি মাস—

বুঝেছেন—এই ছ'টি মাস দেশের কাজ আর নারী-প্রগতি—ওসব একেবারে বন্ধ—বুঝেছেন—"

প্রফেসার বললে—"The greatest service you can do to the country—is to present her with handsome healthy children !"

জর্ণালিষ্ট বললে—"ঐ ত ! আপনাদের মেডিক্যাল সায়েন্স পুরুষ-দের তৈরী বলেই না মেয়েদের ওপর এত অবিচার ! থাকত মেয়ে-দের হাতে ক্ষমতা—"

তাহলে কি হত তা' আর সে বললে না। প্রফেসার-পত্নী তার দিকে একটি জলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন।

প্রফেসার বললে—"না, না, রাগের কথা নয়; সব ধর্ম্ম-শাস্ত্রেও দেখতে পাই,—প্রথমে পুরুষ সৃষ্টি হয়েছে, তার পরে মেয়ে। সুতরাং—"

ডাক্তার বললে—"পেল্লাদ দু' কাপ চা তৈরী কর, বাবা। (প্রফেসার পত্নীর প্রতি) ভয় নেই; আমি আপনার দিকে আছি।"

সাহিত্যিক বললে—"শুধু তাই নয়; মেয়েরা যে পুরুষের থেকে—কম—(বলতে যাচ্ছিল 'ছোট'—সামলে নিলে)—তার আরো প্রমাণ এই যে পুরুষের দেহের অংশবিশেষ নিয়ে মেয়ে তৈরী হয়েছে—"

অধ্যাপক পত্নী অম্বুজাএকসঙ্গে বললেন অর্থাৎ ?—মানে ?—

বৈজ্ঞানিক বললে—"কেন সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচনা করলে—"

প্রফেসার-পত্নী স্বামীর প্রতি চকিত দৃষ্টিপাত করলেন। অধ্যাপক তাড়াতাড়ি বললেন—"না না, আদিরসাশ্রিত কিছু নয়; ভয় নেই—"

জর্ণালিষ্ট ইতিমধ্যে কোথা থেকে একখানা Old Testament এনে হাজির করেছিল। একটা ঝগড়ার সূত্রপাত দেখে সে এত খুসী হয়েছিল যে সিগারেট বাক্স খুলে বৈজ্ঞানিককে একটা সিগারেট

দান করে ফেললে। তারপরে চট করে বাক্সটা পকেটে পুরে ফেলে বললে—"প্রমাণও হাজির।" বলে বাঙলা তর্জ্জমা করে পড়ে গেল।

"সৃষ্টি তত্ত্ব। প্রথম অধ্যায়। ১। আদিতে ঈশ্বর স্বর্গ ও পৃথিবী সৃষ্টি করিলেন।...

সঙ্গীতবিদ্ বিরক্ত হয়ে জানলার ধারে গিয়ে বসল। বৈজ্ঞানিক মেঝেতে পা ঠুকতে লাগল। ডাক্তার ঈজি-চেয়ারে আরাম করে বসল। জর্ণালিষ্ট পড়ে চলল—

"এবং ঈশ্বর বলিলেন—'তখন আলোক হউক; এবং তথায় আলোক হইল—"

"Must have been a great electrical engineer"—ইঞ্জিনীয়ার বলে উঠল।

"এইরূপে তিনি প্রথম দিনে দিন এবং রাত্রি সৃষ্টি করিলেন। তিনি দেখিলেন, ইহা উত্তম। দ্বিতীয় দিনে ঈশ্বর স্বর্গ ও মর্ত্ত সৃষ্টি করিলেন। তিনি দেখিলেন, ইহা উত্তম। তৃতীয় দিনে ঈশ্বর সমুদ্র, মাটি, গাছ, ফল, ঘাস এবং গুল্মসকল সৃষ্টি করিলেন। তিনি দেখিলেন, ইহা উত্তম।

"চতুর্থ দিনে প্রভু ঈশ্বর আলোক, দিবা এবং নিশি ও ঋতুসকল সৃষ্টি করিলেন; সূর্য্য চন্দ্র এবং তারা সকলকে সৃষ্টি করিলেন, এবং পৃথিবীকে আলোকিত করিবার জন্য, ও দিবা ও নিশিকে শাসন করিবার জন্য তাহাদিগকে আকাশে স্থাপন করিলেন।

"পঞ্চম দিবসে, প্রাণীসকল যাহারা জলে অবস্থান করে, তিমি-মৎস্য ও মুরগী এবং অপর সকল জীবন্ত জিনিস; এবং কহিলেন—'ফলপূর্ণ হও, ও গুণ কর।

"ষষ্ঠ দিবসে ঈশ্বর গরু ভেড়া এবং অন্য সকল পশু সৃষ্টি করিলেন—"

প্রফেসার-পত্নী কঠিন সুরে বললেন—"কোনো সন্দেহ নেই।"

অনুজা বল্লে "কেবল গরু ভেড়া ছাড়া আর কিছু কি তিনি সৃষ্টি করেন নি?"

জর্ণালিষ্ট বললে—"হচ্ছে, হচ্ছে—" বলে পড়ে গেল।

"এবং ঈশ্বর বলিলেন, "আমাদিগকে আমাদের প্রতিবিম্ব ও প্রতিকৃতিস্বরূপ মানুষ সৃষ্টি করিতে দাও; এবং তাহাদিগকে সমুদ্রের মাছ, আকাশের মুরগী, গরু, ভেড়া ও সমুদায় পৃথিবীর উপর আধিপত্য করিতে দাও।'

"এইরূপে ঈশ্বর তাঁহার প্রতিবিম্বে মানুষ সৃষ্টি করিলেন। ঈশ্বরের প্রতিবিম্বে তিনি তাহাকে সৃষ্টি করিলেন। পুরুষ এবং নারী উভয়কেই তিনি সৃষ্টি করিলেন।

অনুজা বলে উঠল—"তবে—?"

জর্ণালিষ্ট তার দিকে একবার চেয়ে নিয়ে পড়ে চলল—

"এবং ঈশ্বর তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলেন; এবং ঈশ্বর তাহাদিগকে বলিলেন 'ফলপূর্ণ হও, ও গুণ কর; এবং পৃথিবীকে পরিপূর্ণ কর; এবং পরাজিত কর; এবং সমুদ্রের মাছ, আকাশের মুরগী, এবং পৃথিবীর প্রত্যেক প্রাণীর উপর আধিপত্য কর।...এবং সকাল ও সন্ধ্যা ষষ্ঠ দিবসে হইল।"

সঙ্গীতবিদ্ বলে উঠল—"প্রীচিং থামাও এইবার, এ যে পাদ্রী সাহেব হয়ে উঠলে—"

অনুজা বললে—"বেশ ত হল; এ থেকে প্রমাণ হচ্ছে কি?"

জর্ণালিষ্ট থামবার পাত্র নয়। "আসছে, আসছে" বলে আবার

সুরু করলে। ডাক্তার একাই দু'কাপ চা শেষ করে একটা সিগার ধরালে। বৈজ্ঞানিক মাটিতে পা ঠুকে ঠুকে একটা গানের তাল বাজাতে লাগল।

"এবং প্রভু ঈশ্বর মাটির ধূলা হইতে মানুষ সৃষ্টি করিলেন; এবং তাহার নাসারন্ধ্রে জীবনের নিঃশ্বাস নিঃশ্বাসিয়া দিলেন, এবং মানুষ জীবন্ত আত্মা হইল।

"এবং প্রভু ঈশ্বর মানুষকে লইয়া ইডেন-উদ্যানে স্থাপন করিলেন, ইহাকে পোষাক পরাইতে এবং রাখিতে।

"এবং প্রভু ঈশ্বর বলিলেন—'ইহা ভাল নয় যে মানুষ একা থাকিবে; আমি তাহাকে তাহার জন্য একটি সাহায্যকারিণী তৈয়ার করিব।"

বৈজ্ঞানিক পা ঠোকা থামিয়ে মন দিয়ে শুনছিল। বলে' উঠল— "Splendid!" সঙ্গীত-বিদ্ ভ্রূকুঞ্চিত করলে। জর্ণালিষ্ট গ্রাহ্য না করে পড়ে চলল—

"এবং প্রভু ঈশ্বর আদমের উপর একটি গভীর সুপ্তি আনয়ন করিলেন; এবং সে ঘুমাইল; এবং তিনি তাহার পাঁজরাগুলি হইতে একখানি হাড় খুলিয়া লইলেন, ও মাংস ঢাকিয়া দিলেন।

"এবং প্রভু ঈশ্বর মানুষ হইতে যে পাঁজরা লইয়াছিলেন, তাহাকে তিনি নারী প্রস্তুত করিলেন, এবং মানুষকে প্রদান করিলেন।

"এবং আদম কহিলেন—'এই এখন আমার অস্থি হইতে অস্থি এবং মাংস হইতে মাংস, তাহাকে woman বলা হইবে; কারণ তাহাকে manএর দেহ হইতে লওয়া হইয়াছে।"

সাহিত্যিক এতক্ষণ চুপ করে ছিল। সে এইবার বলে উঠল— "এতক্ষণ তো চমৎকার সাধু-বাঙলায় বলছিলে; এ দু'টো কথার আর বাঙলা জুটলো না?"

জর্ণালিষ্ট প্রফেসারের দিকে তাকাল; এবং দু'জনেই একসঙ্গে হেসে উঠল।

জর্ণালিষ্ট বললে—"শুনলেন?"

প্রফেসার-পত্নী ঠোঁট উলটিয়ে বললেন—"সব বাজে।"

জর্ণালিষ্ট লাফিয়ে উঠে বললে—"সৃষ্টিতত্ত্ব বাজে? ভগবানও মানেন না তা' হলে?"

প্রফেসার-পত্নী থতমত খেয়ে বললেন, "তা কেন? তবে ঐ মানুষের হাড় নিয়ে মেয়েমানুষ তৈরী, ওকথা আর আজকের যুগে চলবে না। পুরুষ আর মেয়ে দুই ভগবান আলাদা আলাদা সৃষ্টি করেছেন।"

বৈজ্ঞানিক এতক্ষণ একমনে সিগারেট খাচ্ছিল। ধোঁয়া ছেড়ে বললে—"ঠিক! ওটা আন্-সায়েন্টিফিকও বটে। মাটির ধূলো দিয়ে যদি ভগবান মানুষ গড়ে থাকতে পেরে থাকেন,—তা হলে মেয়ে গড়বার বেলাতেই তাঁর মাল-মসলার অভাব হল?—তা' নয়; আসল কথা হচ্চে—"

অনুজা উৎফুল্ল হয়ে উঠল। বৈজ্ঞানিকের সমর্থন পাওয়া কম কথা নয়। প্রফেসার-পত্নী শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। কারণ মিথ্যে কথা বলতে এবং মুখে মুখে চমৎকার গল্প বানিয়ে বলতে—জর্ণালিষ্ট ছাড়া ওর আর জুড়ি নেই। বললেন—"আর আসল কথায় কাজ নেই। মিথ্যে একটা গল্প বানিয়ে বলবেন তো?" ডাক্তার বললে "ভয় নেই; আমি আপনার ব্রিফ নিচ্চি।"

বৈজ্ঞানিক বললে—"সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে Genesis যা বলেছে তার মধ্যে কিছু প্রক্ষিপ্ত আছে। এ সম্বন্ধে আমার একটা থিয়োরি আছে। আপনি ঠিকই ধরেছেন। মানুষের হাড় থেকে ঈশ্বর স্ত্রীলোক সৃষ্টি

করলেন,—এ কথা অবৈজ্ঞানিক। জগৎ এবং মানুষ একজন ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন, এ কথা স্বীকার করে নিলেও পরের ব্যাপারগুলো নিশ্চয়ই একটু অন্য রকম হয়েছিল। মানুষ-সৃষ্টির পরবর্ত্তী সায়েন্টিফিক এবং র‍্যাশন্যাল কন্সিকোয়েন্স গুলো অনুধাবন করে আমি এই থিয়োরি দাঁড় করিয়েছি। ডাক্তার, ভুল হলে সংশোধন করে দিও।"

প্রফেসার-পত্নী ও অনুজ্ঞা যুগপৎ ডাক্তারের দিকে তাকালেন। ডাক্তার বললেন—"নির্ভয়ে থাকুন; আমি আছি।" বৈজ্ঞানিক সুরু করলে—

"আপনারা শুনেছেন, প্রভু ঈশ্বর প্রথম দিনে দিন এবং রাত্রি, দ্বিতীয় দিনে স্বর্গ ও মর্ত্ত, তৃতীয় দিনে সমুদ্র, মাটি গাছ ফল ঘাস এবং গুল্মসকল, চতুর্থ দিনে আলোক, দিবা ও নিশি, ঋতু চন্দ্র সূর্য্য তারা, পঞ্চম দিনে প্রাণীসকল যাহা জলে অবস্থান করে, তিমি-মৎস্য ও মুরগী এবং অপর সকল জীবন্ত জিনিস এবং ষষ্ঠ দিবস গরু ভেড়া এবং অন্য সকল পশু সৃষ্টি করলেন। অর্থাৎ এক কথায় মানুষ ছাড়া এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের সবই তিনি খেটেখুটে ষষ্ঠদিন বেলা নটা দশটার মধ্যে সৃষ্টি করে ফেলেছিলেন। এতে তাঁর বেশ শ্রান্তি হবার কথা। তিনি যে এর পর একটু জিরিয়ে নেবার জন্যে নদীর ধারে হাত পা মেলে বসেছিলেন,—এ কথায় আশা করি আপনারা আপত্তি করবেন না। সকলেই জানেন এ রকম অবস্থায়—অর্থাৎ কঠিন পরিশ্রমের পর বিশ্রাম করতে বসলে মানুষ lonely feel করে; নিজের মনের মত আর একজন এ রকম সময়ে থাকলে ভালো হয়। এর আগে প্রভু ঈশ্বরের মনে মানুষ সৃষ্টি করবার কোনো রকম স্পষ্ট ইচ্ছা বা ধারণা ছিল না। কিন্তু এখন একা একা ঠেকাতে, তিনি নদীর পাড়ের নরম মাটি দিয়ে নিজের প্রতিকৃতিস্বরূপ, এবং নিজের

সমতুল্য মানুষ তৈরী করলেন, এবং তার নাসারন্ধ্রে জীবনের নিঃশ্বাস নিঃশ্বাসিয়া দিলেন।'

প্রফেসার-পত্নী বললেন, "আপনার বলবার চমৎকার ভঙ্গী ছাড়া—এতে অভিনবত্ব কিছু পাওয়া যাচ্চে না।"

বৈজ্ঞানিক বললে—"But it is more rational. তার পরে শুনুন। প্রভু ঈশ্বর নিশ্চয়ই তাঁর এই প্রথম শিল্পরচনায়—আর্ট মানেই হচ্চে imitative creation—এই শিল্পরচনায় বিস্মিত ও পুলকিত হয়েছিলেন। এই প্রথম শিল্পবস্তুটির প্রতি যে তিনি বিশেষ মমতা বোধ করেছিলেন—তা বুঝিয়ে বলবার দরকার নেই। আনন্দের আতিশয্যে তিনি মানুষকে সমস্ত পৃথিবী এবং গাছের ফল, আকাশের মুরগী, জলের মাছ, ও জমির ভেড়া প্রভৃতির উপর অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও একচ্ছত্র আধিপত্য করতে দিলেন। অতঃপর সপ্তম দিবসে তিনি তাঁর স্বর্গস্থ বাসভবনে বিশ্রাম করতে গেলেন।

"এ কথা বলবার দরকার নেই যে আসমুদ্র-বিস্তৃত ধরণীর একাধিপত্য লাভকরে মানুষ যথাসাধ্য গর্ব্বিত ও আনন্দিত হয়েছিল। কিন্তু সে আনন্দ বেশীক্ষণ স্থায়ী হতে পায়নি; কারণ সে শীঘ্রই আবিষ্কার করলে—সম্পত্তি পাওয়া যতটা লোভনীয়—রক্ষা করা ততটা নয়; 'প্রাণ রাখিতে সদাই প্রাণান্ত!' এদিকে ভগবানের প্রতিবিম্বস্বরূপ সে ভগবানের আমীরী মেজাজটি পূরো মাত্রায়ই পেয়েছিল।

অনুজা আর থকতে পারলে না। বললে "ঈশ্বরের আমীরী মেজাজ! নতুন আবিষ্কার বটে!"

বৈজ্ঞানিক বললে—"আবিষ্কার নয়; inference. একজন তালুক-দারের চেয়ে একজন জমিদারের চাল বেশী; আবার আমাদের দেশে রাজার চেয়ে মহারাজার মেজাজ চড়া। এইভাবে arithmetical

progressionএ ধরলেও শুধু সসাগরা পৃথিবীর নয়—সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের যিনি মালিক—তাঁর মেজাজটা কি পরিমাণ আমীরী হওয়া উচিত হিসেব করে দেখ—”

ডাক্তার ঈজি চেয়ারে চোখ বুজে সিগার টানছিল ; বলে উঠল—“হিসেব আমার তেমন আসে না। কিন্তু আমি সেটা অনুভব করতে পারছি—”

প্রফেসার-পত্নী চটে উঠলেন—“এই বুঝি আমার ব্রিফ নেওয়া হয়েছে ?—Hostile counsel !”

ডাক্তার উঠে বসল। বললে—“ওঃ, খেয়াল ছিলনা। আচ্ছা, আর ভুল হবে না।”

“ভুল ধরবার কথা আপনার—সে কথা ভুলে গেলে আমাদের কি ভুল হবে—মনে রাখবেন।”—অনুজ্ঞা বললে।

বৈজ্ঞানিক বলে চলল—“সুতরাং দেখতে পাচ্ছি, আদি মানুষের মেজাজটি যথেষ্ট আমীরীই হয়েছিল। সে বললে—গাছ থেকে ফল পেড়ে খাওয়া, নদী থেকে জল আনা, মুরগী ধরে রোষ্ট বানানো—এত হ্যাঙ্গামা আমার পোষাবে না—এই সাফ বলে দিলুম। বলে একটা আপেল গাছের তলায় চুপ চাপ শুয়ে রইল। কেবল খুব খিদে পেলে হাত বাড়িয়ে যে দু’ একটা আপেল পাওয়া যায়—তাই কুড়িয়ে খেতে লাগল।

“এদিকে ভগবান মিনিট দশেক (মানুষের হিসাবে সম্ভবতঃ বছর দশেক) বিশ্রাম করেই ভাবলেন, দেখে আসি আমার প্রিয় পুত্র কেমন সুখে কাল কাটাচ্ছে। ইডেন ইদ্যানে পৌছে দেখলেন—মহা বিশৃঙ্খলা—বাগান জঙ্গল হয়ে গিয়েছে, মুরগীগুলো বুনো হয়ে গিয়েছে, এবং গরু ভেড়া সব জংলী হয়ে গিয়েছে। আর মানুষ নির্ব্বিকার চিত্তে

আপেল গাছটির তলায় শুয়ে আছে। এবং প্রভু ঈশ্বর বললেন—হে আমার প্রিয়পুত্র, তোমার সর্ব্বাঙ্গীন কুশল তো? সমস্ত পৃথিবীর আধিপত্য লাভকরে বেশ আরামে দিন কাটচে তো?

"আর মানুষ বললে—"প্রভু ঈশ্বর, মোটেই নয়। আপনি তো আমার মেজাজ ভালই জানেন। নদী থেকে জল আনা, মুরগী রোষ্ট করা, গরু ভেড়া সামলান, ঘাসের বিছানা করা, ফল ছাড়িয়ে খাওয়া—এসব আমার পোষায় না, এত পরিশ্রম করে বেঁচে থাকা বড়ই কষ্টকর। প্রভু, আপনি এর একটা বিহিত করুন।'

"ঈশ্বর বললেন—"ঠিক, ঠিক, আমারই গোড়ায় ভুল হয়ে গেছে। তোমায় যে ঠিক আমার মতই মেজাজও দিয়েছি। এত পরিশ্রম করা তোমার পোষাবে কেন? দাঁড়াও, এর ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।'

"এই বলে প্রভু ঈশ্বর ধুলো মাটি দিয়ে ঠিক আদমের মত আর একটি মানুষ তৈরী করলেন। এবং খুব খুসী হয়ে বললেন—"এই নাও; ঠিক তোমার মত আর একটি মানুষ। এই মানুষটি তোমার সব কাজ করবে;—তুমি এর প্রভু! এইবার তোফা আরামে দিন কাটাতে পারবে।' এই বলে তিনি তাঁর স্বর্গস্থ প্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন করলেন। প্রথম মানুষ খুব খুসী হয়ে ভাবল—'যাক বাঁচা গেল; দিব্যি আরামে ঘুমিয়ে আর হুকুম চালিয়েই দিন কাটানো যাবে। এই ত জীবন!' কিন্তু সুবিধে হল না।

"প্রথম একটা scheme work করতে গেলে অনেক ভুল ভ্রান্তি গোড়ায় হয়। ঈশ্বরেরও হয়েছিল। তিনি অনভিজ্ঞতার দরুন দ্বিতীয় মানুষটিকেও হুবহু প্রথম মানুষের মতই করেছিলেন; অর্থাৎ তার শরীরে বল, মনে বুদ্ধি আর আমীরী মেজাজ ঠিক প্রথম মানুষের সমান ছিল। আদম যখন এর ওপর প্রভুত্ব চালাতে চাইল, ও তখন

আদমের ওপর মুরুব্বিয়ানা চাল দিতে লাগল ; আদম যখন ওকে কাজ করতে হুকুম করলে—ও তখন আদামকে দিয়ে পা টিপিয়ে নিতে চাইলে ; এবং আদম যখন ওকে মুরগীর রোষ্ট বানাতে বললে, ও তখন চিৎ হয়ে শুয়ে পা নাচাতে নাচাতে আপেল কামড়াতে লাগল। ফলে —কি দাঁড়াল তা' আর বলবার প্রয়োজন নেই।

"আগের মত মিনিট দশেক—অর্থাৎ মানুষের হিসাবে বছর দশেক যেতে না যেতেই ঈশ্বর আবার ভাবলেন—'আহা, এইবারে আমার প্রিয়পুত্র নিশ্চয়ই পরম আরামে আছে ; একবার দেখে আসা যাক।' এইবলে ঈশ্বর পুনর্ব্বার ইডেন উদ্যানে এসে হাজির হলেন। দেখলেন, বিপর্য্যয় কাণ্ড! উদ্যানের অর্দ্ধেক গাছ ধ্বংস হয়েছে ; বাগান লণ্ডভণ্ড এবং মানুষ দুটি ক্ষত বিক্ষত ও রক্তাক্ত দেহে, গাছের ডাল ও পাথর দিয়ে একটি করে পাহাড় তৈরী করে তার পেছনে গুঁড়ি মেরে বসে আছে ; আর মাঝে মাঝে চকিতে মাথা উঁচু করে অপরের মাথা লক্ষ্য করে প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ করছে। ত্রিসীমানায় একটিও জন্তু জানোয়ার নেই। কেবল মাথার ওপর গোটা কতক শকুন উড়ছে। ঈশ্বর তাদের মধ্যে এসে দাঁড়াতেই, ঠাঁই করে একটা পাথর এসে তাঁর হাঁটুতে লাগল। আদম একটা দুইমণ পাথর অতিকষ্টে দু'হাতে তুলে ছুঁড়তে যাচ্ছে, দেখে তিনি ছুটে গিয়ে তাকে ধরলেন। দু'হাতে দু'জনকে ধরে ধমকে বললেন—'এ কি হচ্ছে? তোমরা দু'জনে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকবে বলে ওকে তৈরী করলাম—আর দশ মিনিট যেতে না যেতেই এই কাণ্ড! ভারী অন্যাই! ভা-রী অন্যাই!!'

"আদম হাঁপাতে হাঁপাতে বললে—'প্রভু, সর্ব্বনাশ! আপনি 'মিনিট পরে এলে আর আমাকে দেখতে পেতেন না। ও কে ঠিক আমার-সমান শক্তি ও বুদ্ধি আর আমার মত

মেজাজ দিয়ে আপনি বড়ই ভুল করেছেন। ব্যাটা ঠিক সাক্ষাৎ-শয়তান হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি ওর ওপর প্রভুত্ব করব কি—ওই আমার ওপর হুকুত চালাতে চায়। প্রভু, এর একটা বিহিত করতে হয়।'

"প্রিয় পুত্রের দুর্দ্দশা দেখে প্রভু ঈশ্বর নিরতিশয় ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। তিনি হাতের উপর চিবুক রেখে রদ্যাঁর ল্য পাঁসিভ মূর্ত্তির মত তের মিনিট গভীরভাবে চিন্তা করলেন। তার পরে ডান হাত দিয়ে বাঁহাতে একটা প্রচণ্ড ঘুষি মেরে বললেন—"ঠিক হয়েছে!" তারপরে কাজে লেগে গেলেন। আদম দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল।

"প্রভু ঈশ্বর প্রথমেই দ্বিতীয় মানুষের গোঁফ দাড়ি নির্ম্মূল করে দিলেন। তারপরে একটি কীনার আর কিছু নরম কর্দ্দম নিয়ে তাকে রিমোল্ড করতে সুরু করলেন। আদম আনন্দের আতিশয্যে চোখ বিস্ফারিত করে দেখতে লাগল,—প্রভু তাকে ছেঁটে কেটে এবং চেঁছে ছুলে অনেকটা ছোট এবং রোগা করে ফেললেন; তারপরে সর্ব্বাঙ্গে নরম কাদার একটা কোটিং লাগিয়ে দিলেন; এবং কিছু কিছু addition-alterationও করলেন। ঠিক তের মিনিট পরে কাজ শেষ করে প্রভু হেসে বললেন—'প্রিয় পুত্র, দেখ কেমন হয়েছে।'

"আদম পুলকিত হয়ে দেখতে লাগিল। প্রভু বললেন; 'এখন এই মানুষটির আগের থেকে—মানে তোমার থেকে—height ঠিক সাত ইঞ্চি কমিয়ে দিয়েছি; fore arm, biceps, triceps, mastoid, deltoid, rhomboid, pectoral, latissimus dorsi, rectus-abdominus, thigh, calf প্রভৃতি big muscle গুলোর স্থূলতাও পঁচিশ পার্সেণ্ট কমিয়ে দিলাম। হাড় এত সরু আর ছোট হয়েছে

যে ওপর থেকে বিশেষ দেখতেই পাওয়া যাচ্ছে না; এবং ওজনও প্রায় ২৫।৩০ পাউণ্ড কমে গেছে।"

অনুজা চকিতে ডাক্তারের দিকে চাইলে। ডাক্তার নির্ব্বিকার ভাবে ঈজি চেয়ারে শুয়ে পা নাচাচ্ছে।

"প্রভু বললেন—'এখন আকারে ও শক্তিতে সব দিক দিয়েই এ তোমার চেয়ে খাটো হল। তবুও কখনো কখনো তোমাকে দু' এক ঘা দিলেও যাতে তোমার না লাগে, সেইজন্যে এর পেশীগুলো কোমল করে দিয়েছি; আর নরম চর্ব্বি দিয়ে ঢেকে দিয়েছি; তা' ছাড়া দেখ, দৌড়ে না পালাতে পারে, তাই গতি মন্থর করবার জন্যে জায়গায় জায়গায় additional weightও দিয়ে দিয়েছি,—pelvic mass, bust—"

"আদম তার প্রতিদ্বন্দ্বীটিকে ভালো করে দেখে নিলে। তারপর বললে—কিন্তু প্রভু, মুখের বড় বড় চুলগুলো ধরে মারবার ভারি সুবিধে ছিল;—এগুলো বাদ দিলে—"

"প্রভু বললেন—'ঠিক, ঠিক, আমার খেয়াল ছিল না;—এই যে—' বলে সেই লম্বা চুলগুলি নিয়ে এই মানুষটির মাথায় এঁটে দিলেন।

"এবার আদম খুসী হয়ে বললে—"Splendid! প্রভু, আর কোন খুঁত নেই। এবং ঈশ্বর নিজের এই আশ্চর্য্য বুদ্ধিতে অতিশয় সন্তুষ্ট বোধ করে স্বর্গ রাজ্যে প্রস্থান করলেন।"

প্রফেসার-পত্নী ব্যঙ্গ করে বললেন—এর পরে নিশ্চয় পরম আরামে পায়ের ওপর পা দিয়ে প্রভুত্ব করে মানুষের সময় কেটেছিল?"

বৈজ্ঞানিক বললে—"তা হলে আর ভাবনা কি ছিল? এখনও সবটা বলা হয় নি; শুনলেই বুঝতে পারবেন।"

"আবার মিনিট দশেক যেতেই ঈশ্বর ভাবলেন—এইবার একবার

দেখে আসা যাক। ওরা নিশ্চয়ই পরম সুখে আছে। এই বলে প্রভু ইডেন উদ্যানে নেমে এলেন। কিন্তু কাউকে কোথাও দেখতে পেলেন না। অনেক খোঁজাখুঁজি করে দেখতে পেলেন—নদীর ধারে গাছতলায় আদম একা বসে আছে; মুখ বিমর্ষ, কপালে চিন্তার রেখা।

"প্রভু সহাস্যে বললেন—হে আমার প্রিয়পুত্র, তোমার সর্ব্বাঙ্গীন কুশল তো?"

"আদম হতাশ কণ্ঠে বললে—হায় প্রভু, আপনার সাধ্য নয়! গায়ের জোর কমিয়ে দিলে হবে কি, বুদ্ধিতে তো আমার চেয়ে কম যায় না; জব্দ করতে গেলেই নানা রকম ফন্দী খাটিয়ে এড়িয়ে যায়—তার ওপর মেজাজটিও ঠিক আমারই মতন রয়েছে,—আমি যা খেতে চাই ও-ও তাই খাবে—দেখুন কি ভীষণ অন্যায়! আর, আমার জন্যে আপনি অনেক করেছেন; কিন্তু আপনার সব কৌশলই ব্যর্থ হল। এই রকম লোক নিয়ে আমার পোষাবে না—"

"প্রিয় পুত্রের এবম্বিধ অশান্তি দেখে নিরতিশয় ব্যথিত হলেন। যিনি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন, তিনি একমাত্র প্রিয় পুত্রের সুখ-শান্তি বিধান করতেও অক্ষম হচ্ছেন! প্রভু আবার পূর্ব্ববৎ ঠিক তের মিনিট চিন্তা করলেন। অবশেষে প্রসন্ন হাসিতে তাঁর মুখ ভরে উঠল। তিনি আদমের কানে কানে চুপি চুপি কি বললেন।

'আদম লাফিয়ে উঠে বললে—"Eureka! প্রভু ঈশ্বর, বিংশ শতাব্দীতে জন্মালে আপনি নিশ্চয় নোবেল প্রাইজ পেতেন।"

"প্রভু সস্নেহে হাস্য করলেন; এবং মিনিট দুয়েকের মধ্যেই কাজ শেষ করে প্রস্থান করলেন।

"এর পরে ঈভকে বশে রাখতে আমাদের খুব বেশী বেগ পেতে

হয় নি ; এবং সেই থেকেই মেয়ে, পুরুষের অধীনে থাকতে বাধ্য হয়েছে।”

বৈজ্ঞানিক চুপ করলে। কিন্তু অনুজা আর থামতে পারল না। বললে—“অহো ! চমৎকার ! !—তা প্রভুর এই শেষ অপারেশনটি কি ?

বৈজ্ঞানিক বললে—‘বিশেষ কিছু নয় ; প্রভু ঈভের মাথা থেকে আউন্স চারেক ব্রেন বার করে নিয়েছিলেন মাত্র। অর্থাৎ যে অংশে যুক্তি আর উদ্ভাবনী শক্তি থাকে—”

প্রফেসার-পত্নী আর অনুজা যুগপৎ ডাক্তারের দিকে চাইলেন। ডাক্তার হতাশ ভাবে মাথা নাড়লে।

সাহিত্যিক বললে—“এর পরে প্রভু ঈশ্বর আর তাঁর প্রিয় পুত্রকে দেখতে আসেন নি ?

জর্ণালিষ্ট বললে—“একবার এসেছিলেন। আদম তাঁকে ঈভের জিভের তীক্ষ্ণতা কমিয়ে দিতে অনুরোধ করেছিল তিনি রাজী হন নি ; তিনি ন্যায়বান কারো প্রতি অবিচার করতে পারেন না।”

অনুজা দস্তুর মত চটেছিল। বললে—“এ সবটাই আপনাদের ষড়যন্ত্র ! নইলে সঙ্গে সঙ্গে বাইবেল এল, ডাক্তার এলেন। এ সবই আগে থেকে ঠিক করা ছিল। কেবল আমাদের জব্দ:করবার জন্যে—”

মাস তিনেক একটু বাইরে গিয়েছিলাম। ফিরে প্রফেসারের ওখানে গিয়ে দেখি—কেউ কোথাও নেই। প্রফেসার-পত্নী একা চেয়ারে বসে আছেন। কোলে একটি ক্ষুদ্র মানবক। স্নেহে-আনত শীর্ণ মুখে অপার্থিব জ্যোতিঃ।

———

নূতন যুগের কবি

নূতন যুগের কবি, লইয়ো প্রণাম!
তব নাম
আছে কোথা সংগোপনে, আজি নাহি জানি
তাহে নাই হানি,
যেদিন উদিবে সূর্য্য নবীন দিনের
সঞ্চারিবে নব আশা জীবন-হীনের
ঘোর তূর্য্য-রবে
নিয়ো তবে
আমার বন্দন।

আজি হেথা বাঁধে মোরে সহস্র বন্ধন
ঘেরি' দশ দিক্ হ'তে,
জীবন-যাপন-গ্লানি বহি কোন মতে—
মিথ্যা-ধূলি-সমাচ্ছন্ন বায়ুর মণ্ডলে,
কর্দ্দম-উৎক্ষেপ-ক্লিন্ন পঙ্কিল কোন্দলে,
চিরন্তন যাহা কিছু বাণী
শত দীর্ণ খণ্ডে খণ্ডে হানি'
জীবনের হর্ষ খুঁজি মাংসের কলুষে,
তারি গীতি ঘোষে
আজিকার কবি।

সদ্যঃস্নান-সেক-স্বচ্ছ-বসনার ছবি ;
নির্জ্জন নদীর তটে লোভাতুর ভাষা—
কানে কানে গুঞ্জরিত ভিক্ষুক পিপাসা ;
চলিয়া যাওয়ার পরে উন্মনে চিন্তন ;
চাপা হাস্য নিকুঞ্জের ছায়ে সায়ন্তন !
ধূম্র-ম্লান-আর্দ্র-জীর্ণ-কক্ষতল-বাসী
জঠরাগ্নি-সেক দেওয়া ভালবাসাবাসি
গৃহ-চ্ছাদ-রন্ধ্র-চ্যুত খানিক চন্দ্রিমা ;
—আজিকার সঙ্গীতের এই হ'ল সীমা।

অ-জাত গায়ক,
তবে আনো তব গান সুতীক্ষ্ণ সায়ক
দুর্দ্দম নিষ্ঠুর বলে বিদ্ধ করি' পঙ্গুর কামনা,
সরীসৃপ-জিহ্বাবৎ বিলোল-রসনা ;
ধিক্কৃত বিশ্বের
কল্পনাকুহকভোজী উৎসব নিঃস্বের—
তারি 'পরে আনো তব খরতর সুর।
বিদায়-বিধুর
ব্যথার রাগিণী আর যত আর্ত্ত ধ্বনি,
নপুংসক রিরংসার বিচিত্র কাঁদনি ;
নিঃশেষে মিলাক্,
লভি' তব বাক্।
তোমার লেখনী-মুখ হ'তে
বহে যেন স্রোতে,

তিমির-রেখার সারি—
যে-আঁধার-বারি
ভাসায় আসন বক্ষে চতুর্দ্দশ ভুবনের পোত—
ভাষায় তোমার এনো তারি কান্না বিচিত্র অদ্ভুত—
দোলায়িত লহরে লহরে—
যে-ক্রন্দন ঝরে
আলোকিত ধরণীর বর্ণে গন্ধে গানে
মরণ-নেশায়-মাতা চিরঞ্জীব প্রাণে।
তোমার নূতন ছন্দে সে সুরার সুর
বাজায়ো মধুর।
ক্লৈব্যখিন্ন রূপপায়ী নয়ন-পল্লবে
নিবিড় অঞ্জন যেন লভে
গভীর কালোর,
জ্যোৎস্নার রাতে আর দিবসে আলোর॥

"Yes," said the chairman, sadly, "our temperance meeting last night would have been more successful if the lecturer hadn'nt been so absent-minded." "What did he do ?" he was asked. "He tried to blow some imaginary froth from a glass of water !" was the reply.

ভেন্‌ডেটা

১

ত্রিশ-চল্লিশ বছর আগেকার কথা।

ওলগোবিন্দ ঘোষ ও কুঞ্জকুঞ্জর কর পাশাপাশি জমিদার ছিলেন। উভয়ের নামই বিস্ময়-উৎপাদক। আসল কথা, ওলগোবিন্দবাবু ছিলেন ওলাই চণ্ডীর বরপুত্র; এবং কুঞ্জকুঞ্জরবাবু শাক্তভাবাপন্ন বৈষ্ণব-বংশের সন্তান।

চারপুরুষ ধরিয়া দুই বংশে কলহ চলিতেছিল। শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে কুঞ্জকুঞ্জরের বৃদ্ধ পিতামহ ওলগোবিন্দের বৃদ্ধ পিতামহের পুত্রের (অর্থাৎ পিতামহের) বিবাহে বৌভাত উপলক্ষে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিয়া, নববধূ দেখিয়া প্রশংসাচ্ছলে বলিয়াছিলেন,—'ছেলের কথা কিছু বলব না, বাপকা বেটা; কিন্তু ভায়া, বৌ হয়েছে যেন মুক্তোর মালা।'

রসিকতাটি বুঝিতে বরপক্ষের একটু দেরী হইয়াছিল, সেই অবকাশে রসিক ব্যক্তিটি নিজের জমিদারীতে ফিরিয়া গিয়াছিলেন।

তারপর হইতেই পুরুষ-পরম্পরায় কলহ চলিয়া আসিতেছে।

বর্ত্তমানে, ওলগোবিন্দের সহিত আদালতে ছাড়া কুঞ্জকুঞ্জরের সাক্ষাৎ হইত না—তাহাও কালেভদ্রে। কিন্তু দেখা হইলে, যুযুধান ষণ্ডের মত উভয়ে ঘোর গর্জ্জন করিতেন।

উভয়ের পার্ষদ ও শুভানুধ্যায়ীগণ উভয়কে দূরে দূরে রাখিত।

কিন্তু বিধির বিধান কে খণ্ডন করিতে পারে?

ওলগোবিন্দ একদা দেওঘরে এক বাড়ী খরিদ করিলেন। বাড়ীর চারিধারে প্রকাণ্ড বাগান—পাঁচিলে ঘেরা। বাগানে ইউকালিপ্টাস, ঝাউ পেঁপে কলা—নানাবিধ গাছ।

ওলগোবিন্দ সপরিবারে একদিন হেমন্তকালে নব-ক্রীত বাড়ীতে আসিয়া উঠিলেন। তাঁহার ভারি বাগানের সখ—বাগান দেখিয়া অত্যন্ত হরষিত হইলেন।

পাঁচিলের পরপারে আর একটা বাড়ী; অনুরূপ বাগানযুক্ত। সন্ধ্যাকালে ওলগোবিন্দ দরোয়ান সঙ্গে সেই পাঁচিলের ধারে বেড়াইতে বেড়াইতে পাঁচিলের ওপারে আর একটি মূর্ত্তি দেখিয়া স্তম্ভের মত দাঁড়াইয়া পড়িলেন।

তারপর ওলগোবিন্দ ঘোর গর্জ্জন করিলেন।

প্রত্যুত্তরে কুঞ্জকুঞ্জর ঘোরতর গর্জ্জন করিলেন।

কিন্তু মধ্যে পাঁচিলের ব্যবধান—তাই সেযাত্রা শান্তিরক্ষা হইল।

ওলগোবিন্দ নিজের দরোয়ানের দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—'ভেঁপু সিং, এই বুড়্‌ঢাকো রাস্তামে পাওগে ত টাক ফাটা দেওগে।' বলিয়া ভেঁপু সিংএর হাতে একটি কোদালের বাঁট ধরাইয়া দিলেন।

ওদিকে কুঞ্জকুঞ্জর নিজের দরোয়ানকে বলিলেন,—মৃদং সিং, ঐ বুড়্‌ঢাকে রাস্তামে দেখোগে ত ভুঁড়ি ফাঁসা দেওগে।' বলিয়া মৃদং সিংএর হাতে একটি ভোঁতা খুরপি ধরাইয়া দিলেন।

এইরূপে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া দিয়া উভয়ে স্ব স্ব গৃহে প্রবেশ করিলেন। ওলগোবিন্দ নিজের পুত্র প্রিয়গোবিন্দকে বলিলেন,—'কুঞ্জ শালা পাশের বাড়ীতে উঠেছে।' কুঞ্জকুঞ্জর নিজ কন্যা সুধামুখীকে বলিলেন,—'ওলা শালা পাশের বাড়ীতে আড্ডা গেড়েছে।'

২

স্ত্রীজাতির কৌতূহলের ফলে জগতে অসংখ্য অঘটন ঘটিয়া গিয়াছে। পাশের বাড়ী সম্বন্ধে মেয়েদের কৌতূহল আজ পর্য্যন্ত কেহ রোধ করিতে পারে নাই; বৃথাই অবরোধ-প্রথা, হারেম, ঘোমটা, বোরখার সৃষ্টি হইয়াছে।

ওলগোবিন্দের বাড়ীতে তিনটি স্ত্রীলোক;—ওলগোবিন্দের স্ত্রী ভগিনী ও দুই কন্যা। কন্যা দুটি বিবাহিতা—গিন্নি-বান্নী জাতীয়া। প্রিয়গোবিন্দ তাহাদের কনিষ্ঠ।

কুঞ্জকুঞ্জরের গৃহে তাঁহার স্ত্রী ও পাঁচ কন্যা। তাহাদের মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠা সুধামুখীই কেবল অনূঢ়া।

দুই পরিবারের একুনে নয়টি স্ত্রীলোকের কৌতূহল একসঙ্গে জাগ্রত হইয়া উঠিল। পাঁচিলের আড়াল হইতে উঁকিঝুঁকি আরম্ভ হইল।

ক্রমে মুখ চেনাচিনি হইল।

ভামিনী অন্যপক্ষের কর্ত্তা সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিলেন,—'মিন্‌ষের ঝ্যাঁটার মত গোঁপ দেখলেই ইচ্ছে করে ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করে দিই।'

গৃহিণী সম্বন্ধে বলিলেন,—'মরণ আর কি!'

সুধামুখী সম্বন্ধে বলিলেন,—'বেশ মেয়েটি!'

কুঞ্জকুঞ্জরের গৃহিণীও মত প্রকাশ করিলেন; ওলগোবিন্দ সম্বন্ধে বলিলেন,—'মিন্‌ষের পেট দেখনা—যেন দশমাস!'

গৃহিণী সম্বন্ধে—'মরণ আর কি!'

প্রিয়গোবিন্দ সম্বন্ধে—'বেশ ছেলেটি!'

তারপর সুগোপনে রমণীদের মধ্যে আলাপ হইয়া গেল কর্ত্তারা কিছুই জানিলেন না।

কেহ যদি মনে করে, নারীরা স্বামীর শত্রুকে নিজের শত্রু বলিয়া ঘৃণা করে—তবে তাহারা কিছুই জানেনা। হিন্দুনারী স্বামীর চিতায় সহমরণে যাইতে প্রস্তুত; কিন্তু শত্রুপক্ষের নারীদের সঙ্গে গোপনে ভাব করিবার বেলা তাহাদের নীতিজ্ঞান সম্পূর্ণ পৃথক। এই জন্যই কবি ভর্তৃহরি বলিয়াছেন—; কি বলিয়াছেন এখন মনে পড়িতেছে না। তবে প্রশংসাসূচক কিছু নয়।

৩

ওদিক কর্ত্তারা পরস্পরকে জব্দ করিবার মৎলব আঁটিতেছেন।

উকিল-মোক্তার হাতের কাছে নাই, তাই মোকদ্দমা বাধাইবার সুবিধা হইল না। উভয়ে অন্য উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

জগতে একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখা যায়, শত্রুর কথা অহর্নিশি চিন্তা করিতে করিতে চিন্তার ধারাও একই প্রকার হইয়া যায়। তাই পরস্পরের অনিষ্ট চিন্তা করিতে করিতে ওলগোবিন্দ ও কুঞ্জকুঞ্জর একই কালে একই সঙ্কল্পে উপনীত হইলেন।

গাছ!

বাগান নির্ম্মূল করিয়া দাও!

চিন্তাকে কার্য্যে পরিণত করিবার সময় কিন্তু দেখা গেল ওল-গোবিন্দই অগ্রণী। ইহার গুটিকয় কারণ ছিল। প্রথমতঃ ওলগোবিন্দ পুত্রবান—সুতরাং তাঁহার তেজ বেশী। কুঞ্জকুঞ্জর উপর্য্যুপরি পাঁচটি কন্যার পিতৃত্ব লাভ করিয়াছেন। সকলেই জানেন, ক্রমাগত কন্যা

জন্মিতে থাকিলে উৎসাহী ব্যক্তিরও কর্ম্মপ্রেরণা কমিয়া যায়। দ্বিতীয় কথা, ওলগোবিন্দকে শত্রুদলন কার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য সাবালক পুত্র ছিল—কুঞ্জকুঞ্জরের তাহা ছিল না।

ফলে, একদিন গভীররাত্রে ওলগোবিন্দ সাবালক পুত্রের হাতে একটি কাটারি দিয়া বলিলেন,—'ঝাউগাছ গুলো !—একেবারে সাবাড় করে দিবি—একটাও রাখবিনা।'

কর্ত্তব্যপরায়ণ পুত্র পিতার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া কাটারি হস্তে প্রস্থান করিল। প্রিয়গোবিন্দকে দেখিলে কাসাবিয়ানকার কথা মনে পড়ে। কর্ত্তব্যে কঠোর! The boy stood on the burning deck!

৪

পরদিন প্রাতঃকালে কুঞ্জকুঞ্জর দেখিলেন, তাঁহার ঝাউগাছগুলি কাতরভাবে কাৎ হইয়া শুইয়া আছে। তাঁহার গোঁফ ঝাউয়ের মতই কণ্টকিত হইয়া উঠিল; মাথায় চুল ছিলনা বলিয়াই কিছু কণ্টকিত হইতে পাইল না।

তিনি চলনোন্মুখ ইঞ্জিনের মত শব্দ করিতে লাগিলেন।

তারপর দরোয়ানকে ডাকিয়া বলিলেন,—'মৃদং সিং, দেখ্‌তা হায়?'

মৃদং সিং বলিল,—'হুজুর!'

কুঞ্জকুঞ্জর বলিলেন,—'ঐ বুড্‌ঢা কিয়া।'

'আলবাৎ। বে-শক্‌।'

'হাম্‌ভি বুড্‌ঢাকো দেখ লেঙ্গে!'

মৃদংসিং বলিল,—তাঁবেদার মোজুদ হ্যায়।'

কুঞ্জকুঞ্জর ভাবিলেন, মৃদং সিংকে দিয়াই প্রতিশোধ লইবেন। কিন্তু

কিছুক্ষণ বিবেচনার পর দেখিলেন তাহা উচিত হইবে না। চাকরকে দিয়া বে-আইনী কাজ করানো মানেই সাক্ষীর সৃষ্টি করা। তাহাতে কাজ নাই। যাহা করিবার তিনি নিজেই করিবেন।

ওলগোবিন্দ সে রাত্রি সুখনিদ্রায় যাপন করিলেন। প্রাতঃকালে উঠিয়া দেখিলেন, তাঁহার কদলীকুঞ্জে কুঞ্জকুঞ্জর প্রবেশ করিয়া একেবারে তচনচ্ করিয়া গিয়াছে। কলাগাছগুলি নিতম্বিনীর নিতম্বের মত পাশাপাশি পড়িয়া আছে।

পদ্মাবতী-চরণ-চারণ-চক্রবর্ত্তী শ্রীজয়দেব কবি এদৃশ্য দেখিলে হয়ত একটা নূতন কাব্য লিখিয়া ফেলিতেন। কিন্তু ওলগোবিন্দের চক্ষুর্দ্বয় লাট্টুর মত বন্ বন্ করিয়া ঘুরিতে লাগিল।

তিনিও চলনোন্মুখ ইঞ্জিনের মত শব্দ করিলেন।

তারপর বাড়ীর ভিতর হইতে বন্দুক আনিয়া দমাদম্ আকাশ লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িতে লাগিলেন।

কুঞ্জকুঞ্জরও হটিবার পাত্র নয়। তিনিও বন্দুক আনিয়া আকাশ লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িলেন। হতাহতের সংখ্যা শূন্যই রহিল।

বীরত্ব প্রকাশ শেষ করিয়া দুইজনে আবার চিন্তা করিতে বসিলেন। ওদিকে স্ত্রীমহলে কি ব্যাপার চলিতেছে কেহই লক্ষ্য করিলেন না।

৫

যুদ্ধ-বিগ্রহ একটু ঠাণ্ডা আছে।

কারণ, দুই পক্ষই বন্দুক লইয়া সারারাত বারান্দায় বসিয়া থাকেন এবং মাঝে মাঝে আকাশ লক্ষ্য করিয়া গুলি ছোঁড়েন।

কিন্তু দুইপক্ষই সুযোগ খুঁজিতেছেন।

ওলগোবিন্দের লক্ষ্য কুঞ্জকুঞ্জরের পুষ্পবর্ষী শিউলী গাছটির উপর।

কুঞ্জকুঞ্জরের নজর ওলগোবিন্দের সুন্দর কৃশাঙ্গী তরুণীর মত ইউকালিপ্টাস গাছের উপর।

একদিন ওলগোবিন্দের স্ত্রী আসিয়া বলিলেন,—'কী ছেলেমানুষের মত ঝগড়া করছ—মিটিয়ে ফেল। সুধা মেয়েটি চমৎকার—প্রিয়র সঙ্গে—'

ওলগোবিন্দ চক্ষুর্দ্বয় লাট্টুর মত ঘূর্ণিত করিয়া বলিলেন,—'খবরদার!'

ওদিকে কুঞ্জকুঞ্জরের গৃহিণী বলিলেন,—'বুড়োয় বুড়োয় ঝগড়া করতে লজ্জা করেনা—মিটিয়ে ফেল। প্রিয় ছেলেটি চমৎকার—সুধার সঙ্গে—'

কুঞ্জকুঞ্জর গুম্ফ কণ্টকিত করিয়া বলিলেন,—'চোপরও!'

কিন্তু প্রিয়গোবিন্দ এসব কিছুই জানেনা (সুধা জানে।) প্রিয়-গোবিন্দ পিতৃভক্ত যুবক, তার উপর কর্ম্মকুশলী। ওলগোবিন্দ যখন কেবল শূন্যে বন্দুক ছুঁড়িতে ব্যাপৃত ছিলেন, প্রিয়গোবিন্দ সেই অবকাশে শিউলী গাছ কাটিবার উপায় স্থির করিয়া ফেলিয়াছে।

প্রিয়গোবিন্দ লক্ষ্য করিয়াছিল যে রাত্রি তিনটার পর কুঞ্জকুঞ্জর আর বন্দুক ছোঁড়েন না। অতএব তিনটার পর তিনি ঘুমাইয়া পড়েন সন্দেহ নাই। প্রিয়গোবিন্দ স্থির করিল, পিতাকে না বলিয়া শেষ রাত্রে অভিযান করিবে। পিতাকে বলিলে তিনি হয়ত তাহাকে বন্দুকের মুখে যাইতে দিবেন না।

সেদিন চাঁদিনী রাত্রি—কৃষ্ণপক্ষের তৃতীয়া কি চতুর্থী। ভোর

রাত্রে উঠিয়া প্রিয়গোবিন্দ করাত হাতে লইল ; তারপর নিঃশব্দে পাঁচিল ডিঙাইয়া কুঞ্জকুঞ্জরের বাগানে প্রবেশ করিল।

জ্যোৎস্না ফিন্ ফুটিতেছে ; কেহ কোথাও নাই। প্রিয়গোবিন্দ পা টিপিয়া টিপিয়া শিউলী গাছের দিকে অগ্রসর হইল।

শিউলী গাছের তলায় উপস্থিত হইয়া দেখিল—

৬

একটি মেয়ে ফুল কুড়াইতেছে !

প্রিয়গোবিন্দ পলাইবার চেষ্টা করিল।

কিন্তু পলাইবার সুবিধা হইল না। সুধাও তাহাকে দেখিয়া ফেলিয়াছিল। এবং চিনিতে পারিয়াছিল। প্রিয়গোবিন্দ সুধাকে আগে দেখে নাই।

আমাদের দেশের পুরুষেরা স্ত্রীলোক দেখিলে উঁকিঝুঁকি মারে এরূপ একটা অপবাদ আছে ; মেয়েদের সম্বন্ধে কোনো অপবাদ নাই, অথচ—

ত্রস্ত সুধা জিজ্ঞাসা করিল,—'কি চাই ?'

প্রিয়গোবিন্দ করাত পিছনে লুকাইল ; বলিল,—'কিছু না।'

সুধা বলিল,—'তুমি আমার শিউলী গাছ কাটতে এসেছ !' বলিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

প্রিয়গোবিন্দ স্তম্ভিত হইয়া বলিল,—'মানে—এ গাছ কার ?'

'আমার !'

'মানে—তুমি কে ? এ গাছ ত কুঞ্জর বাবুর !'

'আমি তাঁর ছোট মেয়ে। আমার নাম সুধা।'

'ও—মানে, তা বেশ ত।'

সুধা চক্ষু মুছিয়া বলিল,—'তোমরা কেন আমাদের ঝাউ গাছ কেটে দিয়েছ?'

প্রিয়গোবিন্দ ক্ষীণস্বরে বলিল,—'আমাদের কলা গাছ—'

'তোমরা ত আগে কেটেছ!'

প্রিয়গোবিন্দ নীরব। সুধার মুখে একটু মেয়েলি চাপা হাসি দেখা দিল। বিজয়িনী! পুরুষ ও-হাসি হাসিতে পারে না।

সুধা আবার আঁচলে ফুল কুড়াইয়া রাখিতে লাগিল; যেন প্রিয়গোবিন্দ নামক পরাভূত যুবক সেখানে নাই!

প্রিয়গোবিন্দ বোকার মত এক পায়ে দাঁড়াইয়া রহিল। একবার করাত দিয়া পিঠ চুল্‌কাইল।

শেষে ঢোক গিলিয়া বলিল,—তুমি রোজ এই সময় ফুল কুড়োতে আসো?'

সুধা মুখ তুলিয়া বলিল,—'হাঁ—কেন?'

প্রিয়গোবিন্দের কান ঝাঁ ঝাঁ করিয়া উঠিল; সে তোৎলাইয়া বলিল,—'তবে আ-আমিও রোজ এ-ই সময় গাছ কাটতে আসব।' বলিয়া এক লাফে পাঁচিল ডিঙাইয়া পলায়ন করিল।

সুধা আবার হাসিল। বিজয়িনী!

৭

অন্দরমহলের ষড়্‌যন্ত্র ভিতরে ভিতরে জটিল হইয়া উঠিতেছে। The plot thickens!

একদিন কুঞ্জকুঞ্জরের কুলপুরোহিত হাওয়া বদলাইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার হঠাৎ ডিস্‌পেপ্‌সিয়া হইয়াছে।

ওদিকে কর্ত্তারা রাত্রি জাগিয়া ও বন্দুক ছুঁড়িয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। সাতদিন পরে দু'জনেই ঘুমাইতে গেলেন। মৃদং সিং ও ভেঁপু সিং বাগান পাহারা দিতে লাগিল।

তিন দিন ঘুমাইবার পর দুই কর্ত্তা আবার চাঙ্গা হইয়া উঠিলেন। তখন আবার তাঁহাদের প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি চাগাড় দিল।

ইতিমধ্যে প্রিয়গোবিন্দ রোজ শেষরাত্রে শিউলী গাছ কাটিতে যাইতেছিল। ওলগোবিন্দ তাহা জানিতেন না; তাই তিনি তাহাকে ডাকিয়া পরামর্শ করিলেন। প্রিয়গোবিন্দ শিউলী গাছের প্রতি দারুণ বিদ্বেষ জ্ঞাপন করিয়া জানাইল, ওদিক তাহার নজর আছে; সুবিধা পাইলেই সে শিউলী গাছের মূলে কুঠারাঘাত করিবে।

ওলগোবিন্দ হৃষ্ট হইলেন।

ওদিকে কুঞ্জকুঞ্জর একজন মন্ত্রী পাইয়াছেন—পুরোহিত মহাশয়। তিনি ইউকালিপ্টাস্ গাছ সম্বন্ধে নিজের দুরভিসন্ধি প্রকাশ করিলেন।

পুরোহিত মহাশয় অত্যন্ত সাদাসিধা লোক, তার উপর ডিস্পেপসিয়া রোগী; তিনি বলিলেন,—'এর আর বেশী কথা কি! ভাল দিন দেখে কেটে ফেল্‌লেই হল। দাঁড়াও আমি পাঁজি দেখি।'

পাঁজি দেখিয়া পুরোহিত বৃক্ষছেদনের উৎকৃষ্ট দিন দেখিয়া দিলেন; এমন সহৃদয় অথচ ধর্ম্মপ্রাণ সহায়ক পাইয়া কুঞ্জকুঞ্জরের উৎসাহ শতগুণ বাড়িয়া গেল।

স্থির হইল সোমবার রাত্রি একটার সময় শুভকর্ম্ম সম্পন্ন হইবে। গুলি গোলা বন্ধ আছে, ওলগোবিন্দটা নিশ্চয়ই এখনো ঘুমাইতেছে; সুতরাং নির্ব্বিঘ্নে কার্য্য সম্পন্ন করিবার এই সময়।

৮

কিন্তু শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি।

বিশেষত নারীজাতি একযোট হইয়া যাহাদের পিছনে লাগিয়াছে তাহাদের জয়ের আশা কোথায় ?

রাত্রি একটার সময় কুঞ্জকুঞ্জর করাত লইয়া নির্ব্বিঘ্নে পাঁচিল পার হইলেন। কিন্তু ইউকালিপ্টাস গাছের কাছে গিয়া যেমনি দাঁড়াইয়াছেন, অমনি ওলগোবিন্দ আসিয়া তাঁহাকে দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করিয়া ধরিলেন। কুঞ্জকুঞ্জর করাত দিয়া তাঁহার কান কাটিয়া লইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সে চেষ্টা সফল হইল না। ভেঁপু সিং দরোয়ান তাঁহাকে পিছন হইতে আলিঙ্গন করিয়া ধরিল।

এই ভাবে বুকে-পিঠে আলিঙ্গিত হইয়া কুঞ্জকুঞ্জর বাড়ীর মধ্যে নীত হইলেন। তাঁহাকে একটি চেয়ারে বসাইয়া, তাঁহার পায়ে দড়ি বাঁধিয়া দড়ির অন্য প্রান্ত নিজ হস্তে লইয়া ওলগোবিন্দ আর একটি চেয়ারে বসিলেন। বন্দুক তাঁহার কোলের উপর রহিল।

দুইজনে পরস্পরের মুখ অবলোকন করিলেন।

চারি চক্ষুর ঠোকাঠুকিতে একটা বিস্ফোরক অগ্ন্যুৎপাত হইয়া গেলনা, ইহাই আশ্চর্য্য। ওলগোবিন্দ চক্ষু ঘূর্ণিত করিয়া বলিলেন,—বুদিনানা অফ্ দি ব্রঙ্কাইটিস্ দি ঘুল্‌ঘুলি অফ্ দি ইন্ট্ চাট্‌নি কাবাব। তেরে কেটে গদি ঘেনে ধা—! গিজিতাকৃশিন্ !'—তাঁহার উদর জীবন্ত ফুটবলের মত লাফাইতে লাগিল

কুঞ্জকুঞ্জর কিছুই বলিলেন না।

ওলগোবিন্দ তখন ঈষৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া ভেঁপু সিংকে বলিলেন,—'প্রিয়কে ডাক !'

প্রিয় আসিল।

ওলগোবিন্দ গর্জ্জন করিয়া বলিলেন,—'শিউলী গাছ !'

কাসাবিয়ানকা তৎক্ষণাৎ পিতৃ-আজ্ঞা পালন করিতে ছুটিল।

৯

পনের মিনিট কাটিয়া গেল। ওলগোবিন্দ দুই মিনিট অন্তর ফুটবল নাচাইয়া হাসিতে লাগিলেন,—'হিঃ! হিঃ! হিঃ!'

তারপর ওলগোবিন্দ বলিলেন,—'ভেঁপু সিং, থানামে খবর দেও! এই চোট্টাকে জেলমে ভেজেঙ্গে !'

'যো হুকুম' বলিয়া ভেঁপু সিং প্রস্থান করিল।

আরো পনের মিনিট অতীত হইল। ওলগোবিন্দ পূর্ব্ববৎ দু' মিনিট অন্তর হাসিতে লাগিলেন।

কুঞ্জকুঞ্জর কেবল ঘন ঘন নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন।

হঠাৎ উভয়ের কর্ণে দূর হইতে একটা শব্দ প্রকাশ করিল—'লু—লু—লু—'

দু'জনে শিকারী কুকুরের মত কান খাড়া করিলেন। শব্দটা যেন কুঞ্জকুঞ্জরের বাড়ী হইতে আসিতেছে।

ওলগোবিন্দ একটু অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলেন। দুপুর রাত্রে ও আবার কিসের শব্দ! শেয়াল নাকি? প্রিয় এতক্ষণ ওখানে কি কি করিতেছে?

তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিতে লাগিলেন অনুসন্ধান করিতে যাইবারও উপায় নাই—কুঞ্জকুঞ্জর পলাইবে।

এমন সময় ভেঁপু সিং হাঁপাইতে হাঁপাইতে ফিরিয়া আসিল; বলিল,—'আয়্ হুজুর, আপ বৈঠা হ্যায়?'

ওলগোবিন্দ রাগিয়া বলিলেন,—'বৈঠা রহেঙ্গে নেইত কি লাফাঙ্গে? ক্যা হুয়া?'

ভেঁপু সিং জানাইল, ও বাড়ীর মাইজী লোগ দাদাবাবুকে পাকড়িয়া লইয়া অন্দর মহলে প্রবেশ করিয়াছে!

দুই কর্ত্তা এক সঙ্গে লাফাইয়া উঠিলেন। ওলগোবিন্দের কোল হইতে বন্দুক পড়িয়া গেল।

ভোঁপু সিং তখনো বার্ত্তা শেষ করে নাই, সাক্ষাতে বলিল সে উক্ত মাইজীলোগ কেবল দাদাবাবুকে ধরিয়া লইয়া গিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, সকলে মিলিয়া উচ্চৈঃস্বরে তাঁহাকে 'উল্লু উল্লু' বলিয়া গালি দিতেছে।

এই সময় কর্ত্তারা সকলেই শুনিতে পাইলেন—'উলু—উলু—উলু—'

দু'জনে পরস্পরের মুখের দিকে চাহিলেন; তারপর, যেন একই মন্ত্রের দ্বারা চালিত হইয়া দৌড়িতে আরম্ভ করিলেন। কুঞ্জকুঞ্জরের পায়ের দড়ি অজ্ঞাতসারেই ওলগোবিন্দের হাতে ধরা রহিল।

তাঁহারা যখন কর্ম্মস্থলে উপস্থিত হইলেন, তখন ডিসপেপ্সিয়া রোগাক্রান্ত পুরোহিত মহাশয় শুভকর্ম্ম শেষ করিয়াছেন।

দুই বাড়ীর গৃহিণীই উপস্থিত ছিলেন। কর্ত্তাদের মূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহারা পরস্পরের গায়ে হাসিয়া ঢলিয়া পড়িলেন; বলিলেন,—'আ মরে যাই! বুড়ো মিন্‌ষেদের রকম ছ্যাখ না! যেন সঙ্!'

—'চন্দ্রহাস'

চণ্ডীদাস-প্রসঙ্গ

এতদিনে রবীন্দ্রনাথ চণ্ডীদাসকে স্কন্ধে লইয়া বাউল নৃত্য আরম্ভ করিবার অভিপ্রায় করিয়াছেন। চণ্ডীদাসী কবচও নাকি বিলি হইবে। চণ্ডীদাস-স্মৃতিরক্ষা সমিতির নিকট আবেদন করিলে এ কবচ পাওয়া যাইবে। এ কবচ একটি সান্যাল মহাশয়কে কিছুদিন পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছিল। ইহার কল্যাণেই সান্যাল মহাশয় প্রস্থানের পথে রাণীর দেখা পাইয়াছিলেন।

*　　　*　　　*

সঙ্গে সঙ্গে বীরভূমবাসীর মজিবার লক্ষণ দেখা দিয়াছে। বাউল সম্প্রদায়ের একটি নৃত্য গত ৭ই পৌষ বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারে হইয়া গিয়াছে। ভক্ত নাকি অনেক জুটিয়াছিল। গান হইয়াছিল—

আজি হ'তে শত বর্ষ পরে।

এবং—হৃদয় আমার নাচেরে।

কিন্তু সেদিন পরলোকতত্ত্বের একটি চক্রে চণ্ডীদাস নাকি আবির্ভূত হইয়া বলিয়াছেন—এ সুরাপাত্র আমি ওষ্ঠ পর্য্যন্তই—বুঝলে রবি ভায়া?

কারণ পা টলিলে রামী রাগ করিবে।

চণ্ডীদাসের স্মৃতি-রক্ষা অতি উত্তম প্রস্তাব—আর প্রস্তাব অনুযায়ী কাজ হইলে ত কথাই নাই। কিন্তু ইতিমধ্যে যে এক গোল বাধিয়া বসিয়া আছে। বাঁকুড়া হইতে বিদ্যানিধি ও রায় বাহাদুর সাহানা মহাশয় চণ্ডীদাসকে লইয়া এক স্বত্বের মামলা রুজু করিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহারা ছত্না হইতে নব নানুর পর্য্যন্ত আবিষ্কার করিয়া

ফেলিয়াছেন। তাঁহারা ইন্‌জাংশন প্রার্থনা করুন। স্বত্ব ত' ভূয়া—বেদখল হইলে স্বত্বের মূল্য শুধু হাঁ করিয়া চাহিয়া দেখা।

* * *

বীরভূমের তরফের এ মামলার তদ্বিরকারক সুপণ্ডিত সাহিত্যরত্ন মহাশয় হুঁসিয়ার লোক। তিনি ত' চণ্ডীদাসকে তিন টুকরায় ভাগ করিয়া বসিয়া আছেন—দীন—দ্বিজ—বড়ু। হাত দুইটা—দুই হাতে দুই টুকরা লইয়া গেলেও এক টুকরা পড়িয়া থাকিবে। তাহাতেই মহাপীঠ বানানো চলিবে।

* * *

বঙ্গীয় কংগ্রেস পার্লামেণ্টারি বোর্ড সম্প্রতি এ বিষয়ে একটি সংশোধনী প্রস্তাব পাঠাইবেন স্থির করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন এ বাঁটোয়ারার যুগে টুকরা আরও বাড়ান হউক। বর্ণ ভাগ করিয়া ভাগ করা হউক—অচ্—অণ্ড্—ইদ্—আস। কারণ দুই দিন পরেই মুসলমান ভায়ারা চণ্ডীদাসের ভাগ দাবী করিবেই। তখন তাহারা লইবে অণ্ড—এবং ইদ। অচ্—এবং আস—বীরভূম বাঁকুড়া ভাগ করিয়া লইবে। কোন গোল থাকিবে না।

* * *

আমরা একটা কথা বলি। সংসারে ব্যাস-কাশী অধিক সৃষ্টি করিয়া লাভ নাই। চণ্ডীদাসের জন্মস্থান একটা থাকাই ভাল। চণ্ডীদাস বাঙালী—তাঁহার পদাবলী বাঙালী মাথায় করিয়া রাখিলেই তাঁহার সত্যকার স্মৃতি-রক্ষা করা হইবে। তবে তাঁহার জন্মস্থান প্রকৃত কোথায়—সেই সত্য নির্দ্ধারিত হওয়াও প্রয়োজন। তাহাতে বাংলা সাহিত্যের মর্য্যাদা রক্ষিত হইবে। এ বিষয়ে বীরভূম বাঁকুড়ায় 'টাগ্ অব ওয়ার' আমরা চাহি না। চাই সত্যের নির্দ্ধারণ

বীরভূমে—নানুরে এবং কীর্ণাহারে দুইটা ধ্বংস স্তূপ আছে—একটি চণ্ডীদাসের ঢিপি—অপরটি সমাধি বলিয়া খ্যাত। এই দুইটিকে খনন করিয়া দেখিলে হয়ত কাজ হইতে পারে। হয় ত' বাংলা সাহিত্যে নব সম্পদেরও সংস্থান হইতে পারে। সেইটি সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। পাঁঠা কাটিয়া নাচাই ভাল।

অমৃতং বালভাষিতম্

ছোটো ছেলের কাছে তাহার বাবাই হইলেন সকলের সেরা। কি গায়ের জোরে, কি কলে-কৌশলে আর কেহই তাঁহার মত নয় এই হইল শিশুমনের একান্ত প্রিয় বিশ্বাস; সে বিশ্বাস এত প্রবল যে ছোট ছেলে সময়ে অসময়ে এসম্বন্ধে কিছু বলিয়াও ফেলে। কিন্তু পরিণত বয়সের সাধারণ বুদ্ধির কোন লোকে নিজ পিতার সম্বন্ধে যথেষ্ট ভক্তি রাখিলেও তাঁহার অপ্রতিদ্বন্দ্বী গায়ের জোর বা গুণপণায় বিশ্বাস করে না এবং যদি দৈবাৎ কারো বাপ অন্য দশজনের চেয়ে কোন বিষয়ে বিশেষত্ব লাভ করিয়াও থাকেন, পুত্র বাজারে দাঁড়াইয়া তাঁহার সম্বন্ধে কিছু প্রশংসাবাদ করিতে লজ্জা অনুভব করে। তাই ১৩৪১ সালের আশ্বিনের উত্তরায় অতুলপ্রসাদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি দানের সুযোগ লইয়া দিলীপকুমার তাঁহার নিজ পিতার যে উৎকর্ষ খ্যাপন করিয়াছেন তাহাতে আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি।

* * *

আমাদের হয়ত ভুল হইতেছে।

পিতার প্রতি প্রশংসাবাদটাও হয়ত অতুলপ্রসাদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের মত গৌণ। তাঁহার সমস্ত প্রবন্ধের আসল ইঙ্গিত হয়ত এই যে, দেখ আমি শ্রীদিলীপকুমার, সেরা 'সুরকার' ডি. এল. রায়ের পুত্র, তার উপর মিউজিকের ডিপ্লোমা আছে; কাজেই সঙ্গীত সম্বন্ধে আমিই অদ্বিতীয় সমজদার। জানি না আমাদের এ ধারণা সমূলক কিনা। সমূলক হইলে বলিতে হইবে দিলীপবাবু শ্রীঅরবিন্দের আশ্রমে প্রবেশ করিবার সময়ে লজ্জাকে সঙ্গের সঙ্গিনী করেন নাই। তাহাতে হয়ত আশ্রমপীড়ার আশঙ্কা ছিল। তাঁহার সমনামী (namesake) দিলীপ-রাজাও বশিষ্ঠের আশ্রমে প্রবেশ করার সময়ে নিজের পরিচায়ক ও সৈন্যাদি সঙ্গে লইতে পারেন নাই, পাছে আশ্রম পীড়া হয়।

* * *

আমরা এত দিন জানিতাম রবীন্দ্রনাথই বাঙলার অদ্বিতীয় কবি, কেবল সাহিত্যিকই নন, পরন্তু সঙ্গীতস্রষ্টাও। কিন্তু কল্পিত পিতৃ-গৌরবস্ফীত দিলীপকুমার বাংলার শ্রেষ্ঠ সুরস্রষ্টা (তাঁহার ভাষায় সুরকার) দের কথা বলিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথকে এক পাশে ঠেলিয়া রাখিয়াছেন এবং প্রকারান্তরে বলিয়াছেন যে রবীন্দ্রনাথ শ্রেষ্ঠ সুরস্রষ্টা নহেন ; শ্রেষ্ঠ সুরস্রষ্টা মাত্র এক অতুলপ্রসাদ আর অপর ডি, এল, রায়। অতুলপ্রসাদের প্রতি দিলীপবাবু যে সুবিচার করিয়াছেন তাহার কারণ তাঁহারই গুণগান উপলক্ষে নিজ বাপের মহিমা কীর্ত্তনের সুযোগ পাওয়া যাইতেছে।

* * *

কোন সঙ্গীতজ্ঞ (musical expert) ইতিপূর্ব্বে ডি. এল. রায়কে এত বড় সার্টিফিকেট দিয়াছেন বলিয়া শুনি নাই, দিলীপবাবুও শুনিয়াছেন

বলিয়া মনে হয় না, কারণ তাহা শোনা থাকিলে তিনি পিতার অসাধারণ সঙ্গীত-পারদর্শিতা সম্বন্ধে সাক্ষ্যস্বরূপ, মাত্র ঔপন্যাসিক শরচ্চন্দ্র ও সাহিত্যিক ব্যারিষ্টার প্রমথ চৌধুরী ওরফে বীরবলের উক্তি উদ্ধৃত করিতেন না।

*　　　*　　　*

শরচ্চন্দ্র বা প্রমথ চৌধুরী ডি. এল. রায়ের সঙ্গীতপ্রতিভা সম্বন্ধে যে উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন তাহার সহিত আমরা এক মত না হইলেও তাঁহার সম্বন্ধে কোন অশ্রদ্ধা পোষণ করি না। যেহেতু নিজ নিজ ক্ষেত্রে তাঁহারা যথেষ্ট বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়াছেন কাজেই বিশেষজ্ঞ না হইয়াও ডি. এল. রায়ের সঙ্গীত সম্বন্ধে তাঁহারা যাহা বলিয়াছেন তাহা মূল্যহীন নহে। ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে ডি. এল. রায়ের সঙ্গীতপ্রতিভা একেবারে তুচ্ছ নহে। কিন্তু গরজের দায়ে অনুরূপ আচরণ করিলেও দিলীপবাবুর কাছে এই শ্রেণীর মতামতের কোন মূল্য নাই এবং এই শ্রেণীর মতকে তিনি বিশেষ তিরস্কার-যোগ্য মনে করেন।

*　　　*　　　*

বাংলা দেশের কোন সঙ্গীতজ্ঞকে প্রশংসা করিয়াছেন বলিয়া দিলীপবাবু স্নীতি চাটুজ্যেকে অত্যন্ত অশোভন আক্রমণ করিয়াছেন (উত্তরার প্রবন্ধে)। তিনি এই প্রসঙ্গে বলেন—"এই শ্রেণীর অনধিকারীরা সব দেশেই সব তাতেই কথা বলে থাকেন—কোন একটা বিষয়ে প্রতিষ্ঠালাভ-করা তকমার জোরে।"

কিন্তু শরচ্চন্দ্র ও প্রমথ চৌধুরী যে কিসের জোরে সঙ্গীতে অধিকারিত্বের দাবী করিতে পারেন দিলীপবাবুর পিতৃগৌরব তথা আত্ম-গৌরব খ্যাপনের তাড়নায় তাহা ভাবিবার অবকাশ পান নাই। আর

ভাবিয়াও কোন ফল হইত কিনা তাহাতে সন্দেহ আছে। দিলীপবাবু যেমন এলোমেলো ভাবে সুনীতি চাটুজ্যেকে আক্রমণ করিয়াছেন তাহাতে ভাবিতে হয় তিনি বুঝি লজ্জার সঙ্গে সঙ্গে যুক্তি তর্কেরও মাথা খাইয়া তবে আশ্রমে প্রবেশ করিয়াছেন। আমাদের যতদূর মনে হয় শ্রীঅরবিন্দ এই দুইটি জিনিষকে আশ্রমের বাহিরে রাখিবার কোন বিধান করেন নাই।

যাক্, সুনীতি চাটুজ্যের উপর দিলীপবাবু তাঁর ক্রোধের একটা কারণ দেখাইয়াছেন কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কোন অপরাধে তাঁর অবজ্ঞাভাজন হইলেন তাহা বুঝিতেছি না। ডি. এল. রায়ের আনন্দ বিদায়ের ভূত যে তাঁহার পুত্রের কাঁধেও শওয়ার হইয়াছে একথা আমরা বিশ্বাস করিতে নারাজ। যতদূর জানি রবীন্দ্রনাথ দিলীপবাবুকে স্নেহের চক্ষে দেখেন, তবে কেন তাঁহার প্রতি দিলীপবাবুর বক্রভাব? এ বিষয়ে ভাবিয়া আমরা কিছুই সিদ্ধান্ত করিতে পারি নাই। তবে কথা প্রসঙ্গে কোন বন্ধুর কাছ হইতে নিম্নোদ্ধৃত রবীন্দ্র-দিলীপ সংবাদের যে কাহিনীটি পাইয়াছি তাহা হয়ত এ সম্বন্ধে খানিকটা আলোকপাত করিতে পারে।

প্রায় ছয় সাত বৎসর আগে একবার দিলীপবাবু শান্তিনিকেতনে গিয়াছিলেন। তখন সেখানে তিনি হার্মোনিয়ম বাজাইয়া রবীন্দ্রনাথের এবং ডি. এল. রায়ের এবং অন্যান্যদের গান মাঝে মাঝে গাহিয়া আশ্রমের ছাত্রাদি সকলকে শোনাইয়াছিলেন। তাহাতে প্রথম দুই একদিন শ্রোতাদের উৎসাহ বেশ ছিল কিন্তু যে কোন কারণেই হোক পরে ক্রমেই তাঁহার শ্রোতৃবর্গের সংখ্যা কমিয়া গিয়াছিল। জানিনা এজন্য তিনি রবীন্দ্রনাথকে বা তাঁহার গানকে দায়ী করিয়াছিলেন কিনা। দায়ী না করিবারই কথা। ইহার পরে রবীন্দ্রনাথের

রচিত কোন একটি প্রসিদ্ধ গানে দিলীপবাবু নিজস্ব সুর যোজনা করিয়া গাহিতে চাহিলে রবীন্দ্রনাথ মৃদুভাবে অথচ দৃঢ়তার সহিত আপত্তি জানাইয়াছিলেন। কবিকে আমরা এ বিষয়ে দোষ দিতে পারি না, কারণ নিজের পাঁঠাকে সকলেই লেজের দিকে কাটিবার স্বাধীনতা রাখে।

* * *

কৌশলে রবীন্দ্রনাথের হাত হইতে জয়পত্র আদায় করার ফন্দীটা যে ব্যর্থ হইল এজন্য হয়ত দিলীপবাবু কবিকে ক্ষমা করিতে পারেন নাই। কারণ ইহার পরে আর তিনি শান্তিনিকেতনে কবি তথা অন্য বাঙালী শ্রোতাদের জন্য কোন গান করেন নাই। তাহার বদলে ছোট মজ্‌লিস্ করিয়া গুজরাতী তামিল তেলেগু আদি অবাঙালী ছাত্রদের নিকটে তাঁহার গীতসুধা পরিবেষণ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য অবাঙালী ছাত্রমহলে দিলীপবাবুর গান খুব প্রিয় ছিল। কেনই বা তাহা না হইবে!

বড়ই দুঃখের বিষয় বঙ্গের এই অসাধারণ সঙ্গীতজ্ঞটি বাঙালী শ্রোতার অভাবে কিষ্কিন্ধ্যার ওপারে গিয়া আত্মনির্ব্বাসন করিয়াছেন এবং সঙ্গীতের আলাপ ছাড়িয়া সজ্জননিন্দার প্রসঙ্গে প্রলাপ বকিতেছেন।

* * *

আরও অনেক কিছু লিখিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু একজন বন্ধু হঠাৎ শকুন্তলা খুলিয়া আমাকে শোনাইতে বসিলেন। যখনি শুনিলাম "আশ্রমমৃগোঽয়ং ন হন্তব্যো ন হন্তব্যঃ।" তখনি প্রবৃত্তিকে প্রতিসংহার করিলাম। কারণ মৃগ দূরের কথা আমাদের শাস্ত্রে শাখামৃগকেও অবধ্য বলা হইয়াছে।

পেশা পরিবর্ত্তন

অষ্ট্রেলিয়ান্ বুমেরাং ছোঁড়া শিখি,
নবীন লেখক আমি,
রচনা পাঠাই সম্পাদকের কাছে
ফিরে আসে পুনরায়—
বাঁকা বুমেরাং ঠিক।
আবার পাঠাই লেখা
আবার ফিরিয়া আসে,—
হাত পাকিয়াছে বুমেরাং নিক্ষেপে!

পাঠাই কবিতা লিখে—
—প্রেম-পিচ্ছিল চুমু-চট্‌চটে লেখা—
সেও ফিরে চলে আসে
সম্পাদকেরে করিয়া প্রদক্ষিণ।
গল্প লিখিয়া লালসায় জরজর
লালা-নিষিক্ত পণ্যনারীর জীবনের খুঁটিনাটি—
ভাবি এইবার কাবু করিয়াছি শেষে
নিরেট সম্পাদকে।
সম্পাদকের ঝামা-কর্কশ প্রাণে
গল্পের রস পশেনা একেবারে—
গল্প ফিরিয়া আসে
নীড়-প্রত্যাশী ডানা-ভাঙা পাখী সম।

লিখিয়া লিখিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়ি ;
ওরে ও সম্পাদক,
কিছুতেই তুই ঘায়েল হবিনা কিরে ?
শেষে একদিন নেহাৎ বেজার হয়ে
এগারো ইঞ্চি থান ইট একখানা
নিক্ষেপ করি সম্পাদকের শিরে।

সাবাস! কম্ম ফতে!
এগারো ইঞ্চি ফিরিয়া আসেনা আর।
এ ত বুমের‍্যাং নয়,
গল্পও নয়—নয় কবিতার খাতা!
একটি ইটের সবেগ সঞ্চালনে
সাবাড় সম্পাদক!

বুঝিয়াছি নিঃযশ
ইট ঢের ভাল গল্প কবিতা হতে।
সাহিত্য সেবা ছেড়ে
ধরিব এবার গুণ্ডামি-করা পেশা—
নাম হবে—কালু সেখ!

—"চন্দ্রহাস"

"দৌড়চ্ছ কেন?" "দুজন ছেলেকে মারামারির হাত থেকে বাঁচাচ্ছি।" "কোন দুজনকে?" "আমাকে আর কালুকে।"

দরদী গদা

সে ছিলো এক তরুণ।

ফুলের গন্ধ শুঁকতো আর লিখতো কবিতা।

একদিন সে আন্‌লো একটা গোলাপ ফুল—কোন্‌-এক অনামা তরুণীর বিনামার তীর্থ-রেণুমাখা সে ফুল।...

সাত দিন ধরে সে লিখছে এক করুণ-কাব্য—সেই ফুলে চুমো দিয়ে, বুকের বাঁ-দিকের পঞ্চম পাঁজরে চেপে ধ'রে, নিজের বেদনাশ্রুর ধারায় সঞ্জীবিত রেখে।...

দেখে দেখে গদা তার থাঁদা নাক চুল্‌কাতে লাগল বারবার; 'উপায় কী, উপায়?'

বহুকালের বৃদ্ধ ভৃত্য সে, কবিকে সে ভালোবাসে আপনারই ছেলের মতো—যদিও ছেলে তার নেই একটাও।

মূর্খ সে, তবু তার আছে সহজ-বুদ্ধি; আর এক-কালে তারও ছিল তারুণ্য—দীর্ঘ নিঃশ্বাসে বাতাস ভারী ক'রে তুলতো সে-ও।

সে বুঝলো কবির অভাব!

ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে দিলো সে রুগ্নমান কবির রুক্ষ চুল-ভরা মাথায়, করুণা-সিক্ত কণ্ঠে বললো, 'দুঃখ কোরোনা, খোকাবাবু, আমি এনে দোব।'

কবিরা চমকায় না কখনো; তাই সে ধীরে ধীরে নিজের ঘাড়টা পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রী বাঁয়ে বেঁকিয়ে আপনার চোখ দু'টো গদার মুখের উপর তুলে ধ'রলো, সীমাহীন ব্যথার সাগর দোল খাচ্ছে সেই চোখে!

কবি যেন মাকড়সার জালে ঝঙ্কার তুলে অপূর্ব্ব মোলায়েম স্বরে প্রশ্ন করলো, 'তুমি জানো বাস্তবিকই?'

গদা মৃদু হাস্য করলো মাত্র—সেই চিরন্তন, মোনালিসা-মার্কা রহস্যময় পেটেণ্ট হাসি!

কবি তা দেখলো, বললো, 'পারবে তুমি। জানি আমি তুমি আমার মরমী বন্ধু, দরদী দাস—ক্ষমা করো যদি তোমার প্রাণে আঘাত লেগে থাকে এ-কথায়!'

আবার হাসলো সে,—ক্ষমাসুন্দর হাসি! বললো, 'কিছু নাঃ; তুমি মাঠে একটু ঘুরে এসো, এমন করে থাকলে বাঁচবে না।'

কবি তার দিকে চাইলো করুণ দৃষ্টিতে, বললো, 'সত্যি, সে না এলে বাঁচবো না আমি, অথচ আমার বাঁচা দরকার, আমি বাঁচতে চাই।'

গদা তাড়াতাড়ি বললো, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, বাঁচবে, সন্ধ্যার পর এসে দেখবে সব ঠিক।'

কবি হাত চালিয়ে দিলো তার গায়ের সোয়েটারের তলায়, বুকের কাছ থেকে টেনে বার করলো সেই গোলাপ ফুলটি। দুচোখ বুজে পরম আগ্রহে সেটি ঠোঁটে ঠেকিয়ে রেখে দিলো টেবিলের ধারে কানাভাঙা রেকাবিখানার উপরে, মনে মনে বললো, 'দেবী, তুমি এসে দেখো, একটু করুণা কোরো!''

তারপর তিপ্পান্ন পাতার অসম্পূর্ণ কাব্যখানাকে গুছিয়ে রেখে দিলো তার তলায়। শেষে উঠে দাঁড়িয়ে গদার হাজাধরা হাত দু'খানা চেপে ধ'রে কণ্ঠে আকুল কাকুতি ফুটিয়ে বললো, 'গদাদাদা, আমার স্বপন সফল করো!'

ধর্ম্মের ষাঁড়ের মতো একান্ত একা এই ছেলেটার এমন মর্ম্ম-ছেঁড়া মিনতি সে আশা করেনি হয়তো! ঘোলাটে চোখের ঘিঞ্জি দৃষ্টি

অশ্রুবাষ্পে আরো ঘুলিয়ে গেল, স্নিগ্ধ স্বরে চুণদগ্ধ দাঁত বার ক'রে সে অভয় দিলো, 'কোনো ভাবনা কোরো না, সন্ধ্যায় দেখে নিও।'

সন্ধ্যার শেষ।

কবির দুটি পায়ে জাগলো কম্পন। পকেট থেকে বার করে নিলো সে তার চিরুণী আর ছোট একটু আর্শী। চুলগুলি আঁচড়িয়ে নিয়ে সে বুকের পকেট থেকে বার করলো একটি শিশি—গন্ধ। ভুরুতে নাকের নীচে চাঁছা-গোঁফ ও হাতের আঙুল-কটির ডগায় গন্ধ মাখালো। শালখানি কাঁধের উপর থেকে টেনে আরেকটু নামিয়ে দিলো হাঁটুর নীচে পর্য্যন্ত লুটিয়ে। তারপর কোঁচাটা ধ'রে সিঁড়ি ভেঙে উঠতে লাগলো উপরে।

বৈদ্যুতিক আলোয় উজ্জ্বল ঘরখানার পানে চেয়ে কবি ইতস্ততঃ করলো একটু—তারপর নতমস্তকে গিয়ে দাঁড়ালো দরজায়।

বীণাবিনির্ন্দিত-কণ্ঠে কেউ তাকে অভ্যর্থনা করলো কী ?

না।

চোখ তুলেই স্তম্ভিত হয়ে গেলো কবি !

বিস্ফারিত দৃষ্টিতে সে দেখলো টেবিলের উপরকার রেকাবিতে সেই গোলাপ ফুলটি নেই, তার পরিবর্ত্তে একগাদা গাঁদা ফুল হাতে ক'রে পাশে ঘমিয়ে আছে দরদী গদা! গদা উদ্দেশ্যের ভারে কাবু, অথচ উদ্দেশ্যটা বোঝা গেল না।. কেবল নাক ডাকছে।

—বি-কু-বড়াল

হনুমানায়ণ

আজিমগঞ্জ ষ্টেশনের পাঁচ ছয় মাইল দূরে একটি গণ্ডগ্রামের মধ্যে জনশূন্য আম বাগানের নিকটে আমার তাঁবু পড়িয়াছিল। সেট্‌ল্‌মেণ্ট-এর কার্য্যোপলক্ষে আমাকে সেখানে অবস্থান করিতে হইয়াছিল। বড়দিনের ছুটি না পাইয়া হতাশ ভাবে নিজের ডেক্ চেয়ারে বসিয়া সিগারেট ফুঁকিতেছিলাম। দিনের বেলায় লোকজনের হট্টগোলে এবং কুটিল আইনের গোলমালে মাথাটা যে বিশেষ সুস্থ ছিল, তাহা বলিতে পারি না। বড়দিনের বন্ধে কলিকাতায় যে সব উৎসব সমারোহ হইতেছে, খবরের কাগজে তাহার বিবরণ পড়িয়া মনে মনে কল্পনা করিতেছিলাম ও নিজের অদৃষ্টের অপরিসীম পরিহাসের কথা ভাবিতেছিলাম। সম্মুখের "টিপয়ে"র উপরে রক্ষিত চা কখন যে ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে, খেয়াল নাই। কুণ্ডলীকৃত ফুৎকারিত, উদ্‌গারিত ধূমরাশির স্বচ্ছন্দ বক্রগতি দেখিয়া অঙ্কশাস্ত্রের vortex theoryর যুক্তিতর্ক মনে মনে আলোচনা করিতেছিলাম। অস্তগামী সূর্য্যের রক্তিমাভ আলো তখনো আম গাছ ত্যাগ করে নাই। হঠাৎ একজন কিম্ভূতকিমাকার ভিক্ষুক আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল ও সেলাম করিয়া বলিল, হুজুর, আমার একখানা দরখাস্ত আছে। আমি বিরক্ত ভাবে মুখ খিঁচাইয়া বলিলাম, কিসের দরখাস্ত! বে'র হও এখান থেকে। এই চাপ্‌রাশী, ইস্‌কো নিকালো। আমি সেট্‌লমেণ্টে এর হাকিম আমার কাছে কেহই চালাকী করিয়া যাইতে পারে না। লোকটার নিশ্চয় কোন কু-মতলব আছে—নচেৎ এমন সময় গোপনে আমার কাছে

দরখাস্ত দিতে আসে! লোকটার গায়ে তালি দেওয়া একটা ছেঁড়া কাঁথার জামা। তালিগুলি আবার নানা রঙের। পরনে কটিবাস—হাতে বাঁকা একটি শেওড়াগাছের লাঠি। চেহারা দেখিয়াই মনে হইল, নিশ্চয় সে একটা চোর, বদমায়েস, দাগী বা গুণ্ডা। কিন্তু আমার হাকিমী তাড়া খাইয়াও লোকটি চুপ করিয়া রহিল, যেন কি একটু ভাবিল ও পরে আস্তে আস্তে বলিল, হুজুর, ভগবান্‌, আল্লা, বিষ্ণু আপনার মঙ্গল করুন—আমার ওপর "অনুরাগ" করবেন না। আমি ফকির মানুষ—দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা করি—বড় বিপদে পড়েই আপনার কাছে এসেছি। দোয়া করে' আমার আরজটা শুনুন। তাহার মুখের ভাবভঙ্গী দেখিয়া সত্যই যেন আমার কিছু দয়া হইল। তবু আমি একজন হাকিম, সে কথা ভুলিলে চলিবে কেন? উষ্ণ স্বরেই বলিলাম, চট্‌ চট্‌ বলে' ফেলো—আমার অত সময় নাই। ফকির দরখাস্ত খানি আমার হাতে দিল। আমি পড়িয়া ফেলিলাম, তাহাতে লেখা আছে—

হুজুর ধর্ম্মবতার আমার আরজ জানিবেন! আমাদের বাপ ফকির ছিল ভিক্ষা করিয়া দিন গুজরান করিতেন। সম্প্রতি তিনি মারা গিয়াছেন। আমার এক ভাই আছে—সে বাবু-মানুষ। কোনো দিন ভিক্ষা করে নাই। এখন আমার বাপের যে সব ভিক্ষার যজমান ছিল—সে ভাই আমার কাছে তাহার ভাগ চায়। শুনেছি আপনারা পরচাতে লোকের সব স্বত্ব লিখে দেন। হুজুরের কাছে আমি তাই দরখাস্ত করি যে আমার ভিক্ষাবৃত্তির যে চিরস্থায়ী স্বত্ব আছে তাহার জন্য একটা পরচা দিয়া স্বত্ব কায়েম মকৃরর করিয়া দিতে আজ্ঞা হয়, হুজুরমালীক নিবেদন ইতি।

নিবেদক শ্রীধর্ম্মদাস ফকির

দরখাস্ত খানি তিন চার বার পড়িলাম ও ফকিরের মুখের দিকে

তাকাইলাম। সে ভিজা বিড়ালটির মত, কাঁদ কাঁদ ভাবে হাত যোড় করিয়া দাঁড়াইয়া আছে—তাকাইলাম ও দরখাস্ত পড়িলাম। সমস্ত প্রজাস্বত্ব আইনটি আমার মুখস্থ। কিন্তু কোন ধারার মধ্যে এই দরখাস্ত খানি পড়িবে তাহাও বুঝিলাম না। অথচ তাহার "ভিক্ষাবৃত্তির চিরস্থায়ী স্বত্ব" যে আছে বা থাকিতে পারে তাহাই বা অস্বীকার করি কেমন করিয়া? লোকটার উপর রাগ করিতে পারি না, আমারও মাথা ঘুরিয়া উঠিল। ফকির যেন তাহা লক্ষ্য করিল। সে বলিল, হুজুর, বহুদূরে বাড়ী, সময় মত আসতে পারি নাই। আজ যদি আপনার সময় না হয় আর একদিন আসব। এ কয়দিন গাঁয়েই কাটাবো। আমি বলিলাম, আচ্ছা তাই হবে, পাঁচ ছয় দিন পরে এসো। ফকির যাওয়ার সময় বলিল, হুজুর বেয়াদবি মাপ করবেন আপনি এখানে একা একা থাকেন—শরীরও আপনার ভাল নয় দেখছি। বাড়ীতে অনেক দিন যান নাই; ছাওয়াল, পোয়াল ত আছে। আপনাকে খুব খাটনি খাটতে হয়। আমি একটা দাওয়াই দিচ্ছি মধ্যে মধ্যে খাবেন, বেশ ভাল থাকবেন। কিছু সন্দেহ করবেন না। বুড়ো ফকিরের কথায় বিশ্বাস রাখবেন। সে আমার "টিপয়ের" ওপর একটি কাগজে মোড়ক করা কতকগুলি "পাউডার" রাখিয়া চলিয়া গেল। "ছাওয়াল পোয়াল" ও "শরীর ভাল না"—"বেশী খাটুনি"—এই সব কথা মনে করাইয়া দেওয়াতে আমি একটু অন্যমনস্ক হইয়া গিয়াছিলাম। সে সেলাম করিয়া চলিয়া গেল লক্ষ্য করি নাই। সমস্ত রাত্রি ভাবিলাম— "ভিক্ষাবৃত্তির চিরস্থায়ী স্বত্ব" ইহা কি রকম ও তাহা কি ভাবে পরচাতে লেখা যায়। এ স্বত্ব কি তাহার একার না আরও এমন অনেক দরখাস্ত আসিবে?

পরের দিন স্নানাহার করিয়া আমার আফিসে বসিব এমন সময় আমার পোষা কুকুর "টমি" একটি হনুমানের লেজ কামড়াইয়া ধরিয়াছে দেখিলাম। ধ্বস্তাধ্বস্তি করিয়া হনুমানটি ক্ষত লেজ লইয়া আম গাছের একটি উচ্চ শাখায় গালে হাত দিয়া বসিয়া রহিল। আমি "টমি"কে ডাকিয়া আনিলাম ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিলাম। হনুমানের গালে হাত দিয়া বসিয়া থাকা দেখিয়া মনে কষ্টও হইল। যথারীতি আফিসে আসিয়া বসিলাম কিন্তু কাজে মন লাগিল না। দুই তিন ঘণ্টার মধ্যে লোকদের বিদায় করিয়া তাঁবুতে ফিরিলাম ও কুকুরকে ভৎর্সনা করিলাম। তাহার দোষে আমাকে grievous hurtএর chargeএ পড়িতে না হয় সেই দুভাবনা হইল। ডেক চেয়ার বাহির করিয়া চা ও সিগারেট পানে সময় অতিবাহিত করিব মনে করিলাম। শরীরটাও যেন একটু খারাপ বোধ হইতে লাগিল। তাকাইয়া দেখি যে আমগাছে আহত হনুমান গালে হাত দিয়া বসিয়া আছে ও তাহার আশে পাশে তাহার বাপ, মা, ঠাকুর্দা, মাসী, পিসি, ভাই, মামাত পিসতুত ভাই সব ঘিরিয়া বিভিন্ন ভাবে বসিয়াছে। কেহ পায়ে হাত বুলাইতেছে, কেহ কলা প্রভৃতি খাওয়ার জন্য সাধ্যসাধনা করিতেছে। অপেক্ষাকৃত ছোকরা হনুমান কয়েকটি আমার তাঁবুর কাছে আসিয়া ঘুঁষি পাকাইতেছে ও মুখ ভেংচাইতেছে। হনুমান 'পরিবারের' দুঃখ ও সমবেদনা, সহানুভূতি দেখিয়া বিশেষ আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। "বেয়ারা" চা দিয়া গেল ও জিজ্ঞাসা করিল, ফকির সাহেবের দাওয়াইটা দিব কি? আমি একটু অন্যমনস্ক ভাবে বলিলাম, আচ্ছা, দাও। চায়ের সঙ্গে মিশাইয়া তাহা একটু একটু করিয়া খাইলাম ও খবরের কাগজ উল্টাইতে লাগিলাম। একটি সিগারেট ধরাইলাম। ঔষধ কি ভাবে

খাইতে হইবে তাহা ফকির সাহেব বলেন নাই—আমিও জিজ্ঞাসা করি নাই। চায়ের tannin, theine, প্রভৃতি বিভিন্ন কেমিক্যাল-এর সঙ্গে মিশিয়া ও সিগারেটএর নিকোটিনের সঙ্গে একত্র সে ঔষধ কি রকম কি ক্রিয়া করিল জানি না। কিছুক্ষণ পর আমার যেন চোখ জুড়িয়া আসিতে লাগিল। জোর করিয়া তাহা তাড়াইতে চেষ্টা করিলাম ও আর এক পেয়ালা কড়া চা পান করিলাম, শরীরে যেন ঘাম ছুটিয়া গেল, কিন্তু হঠাৎ অনুভব করিলাম, হনুমানদের ভাষা যেন বুঝিতে পারিতেছি। কানে নূতন ধরণের কথাবার্ত্তা প্রবেশ করিল—যথা—

কুচপরোয়া নেই ; লেজের জন্য দুঃখ! রক্ত মাংসের লেজ যদি যায় যাক্—আধ্যাত্মিক লেজ গড়িয়ে দেব—সেই অদৃশ্য লেজে তুমি হনুমানকুলের মুখোজ্জ্বল করবে। তা যদি পছন্দ না কর তা হলে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লেজ আনিয়ে দেব—কত চাই?

ইহার পর যে সব কথা হইল তাহা ভয়ানক। উহারা দল বাঁধিয়া কুকুরকে সাবাড় ত করিবেই, উপরন্তু আমারও কিছু অনিষ্ট করিতে পারে এরূপ আলোচনা করিল।

উপরোক্ত কথাবার্ত্তা শুনিয়া মনে করিলাম, বাস্তবিকই বড় অন্যায় হইয়া গিয়াছে—আমি ক্ষমা প্রার্থনা করি ও তাহাদের ক্ষতিপূরণ দিই। কিন্তু আমি ত হনুমানের ভাষা বলিতে পারি না, কিছু বুঝিতে পারি মাত্র। কি ভাবে তাহাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলি ও অনুতাপ প্রকাশ করি! আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম এবং জোড় হাত করিয়া কিছু বলিবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু দেখিলাম, একটা গোদা হনুমান আসিয়া আহত হনুমানকে বুকের মধ্যে করিয়া সে গাছ হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া অন্য এক গাছে লইয়া গেল ও সঙ্গে সঙ্গে পরিবারের অন্যান্য

হনুমানগুলি তাহার পশ্চাতে গেল। দুইটি বাচ্চা আমার দিকে পুনরায় মুখ ভেংচী করিয়া পালাইল। আমি সিগারেটএর ধোঁয়ার সঙ্গের এই দৃশ্য উপভোগ করিতে লাগিলাম।

কয়েকদিন পর সরেজমিনে তদন্ত করিয়া ফিরিতেছি, দূর হইতে দেখিলাম, একদল হনুমান আমার তাঁবু দখল করিয়াছে। একজন আমার চেয়ারে বসিয়া লিখিতেছে—আর একজন আমার ডেক্ চেয়ারে দোল খাইতেছে—কেহ আমার বিছানাতে লম্বা হইয়াছে। কুকুরটি বাঁধা অবস্থায় ঘেউ ঘেউ করিতেছে। আমার চাকর লাঠি হস্তে দূর হইতে আস্ফালন করিতেছে। আমি কাছে আসিতেই একটা ছোক্‌রা হনুমান তড়াক্ করিয়া লাফাইল ও আমার মাথা হইতে টুপী লইয়া মাথায় দিয়া ছুটিয়া মজা দেখিতে লাগিল।

হায় আমার হাকিমত্বের গর্ব্ব ও আস্ফালন! বন্দুকটি তাঁবুর মধ্যে আছে—তাহা আনিতেও পারিলাম না। লোকজন ডাকিয়া আনিলাম ও Phalanx attack করিব পরামর্শ করিলাম। ইতিমধ্যে একটা গোদা হনুমান লাফাইয়া, একটা বিরাশী সিক্কা ওজনের চড় আমার গালে বসাইয়া দিল। চড় খাইয়া পড়িয়া গেলাম ও দুই তিন বার গড়াগড়ি করিয়া উঠিলাম। উঠিয়া দেখি ফকির সাহেব সম্মুখে দাঁড়াইয়া, সে গোদা হনুমানের কান মলিয়া দিতেছে ও আমার নিকট ধরিয়া আনিতেছে। তাহার হুকুমে ছোক্‌রা হনুমানটি আমার টুপী যথাস্থানে রাখিয়া গেল। অন্যান্য সকলে আমগাছে আশ্রয় লইল—শুধু লেজকাটা হনুমানটি আমার দিকে ভেংচা ও ঘুঁষি দেখাইল। ফকির সাহেব গোদাকে আনিয়া বলিল, হুজুর, এ বেয়াদব আপনাকে যেরূপ অপমান ও লাঞ্ছনা করেছে তার শাস্তি আপনি নিজেই দিন। এ বেটা বড় বেয়াড়া। আমি তাকাইয়া দেখিলাম গোদা হাত যোড়

করিয়া দাঁড়াইয়া আছে—তাহার দুই চোখে জল ঝরিতেছে। আমি তাহাকে বেত মারিব মনে করিলাম ও বেত আনিতে গেলাম। কিন্তু মনে হইল, আমাকে ত আরও কিছুদিন ইহাদের সঙ্গে বাস করিতে হইবে—রাগাইয়া দেওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ হইবে না—বরঞ্চ বন্ধুত্ব করা ভাল

রাজকার্য্যে এতদিন থাকিয়া রাষ্ট্রনীতি কিছু কিছু বুঝিয়াছি—কাজেই ফকির সাহেবকে বলিলাম, ফকির সাহেব, দোষ আমারই বেশী—কারণ আমার কুকুর একটা হনুমানের অঙ্গহানি করে greivous hurt করেছে, আমি শাস্তি দিতে চাই না। আপনি যাহা হয় ব্যবস্থা করুন। কিন্তু একটা কথা—আপনি এদের বশ করলেন কি ভাবে?

ফকির সাহেব হাসিয়া বলিলেন, হুজুর, আমরা বনে জঙ্গলে এদের সঙ্গে বসবাস করি—আমার পিতা ইহাদের আদর করত ও খেতে দিত। ক্রমে এদের ওপর আমার শ্রদ্ধা ও ভক্তি হয়। ক্রমে তাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তাও বলি। আমি আশ্চর্য্য হইয়া বলিলাম—এদের ভাষা আপনার ঔষধের গুণে কিছু কিছু বুঝতে পারি—কিন্তু বলতে পারি না। আমাকে তা শিখিয়ে দেবেন? লক্ষ্য করিলাম, গোদা আমার কাছে কাকুতি মিনতি করিয়া বলিতেছে, আমাকে মারবেন না—আমি ক্ষমা চাই—আপনার যথেষ্ট উপকার করব—আমি মাপ চাই। ফকির সাহেব গোদাকে ডাক দিলেন ও তাহার কানে কানে কি যেন বলিলেন। গোদা আমার দিকে তাকাইয়া কি যেন ভাবিল ও ফকির সাহেবকে ইসারা করিল। তাহারা অল্পক্ষণ পরেই চলিয়া গেল। আমি তাঁবুর মধ্যে ঢুকিতেই দেখি টেবিলের ওপর আমার যে writing pad ছিল তাহাতে হনুমানী ভাষাতে কতকগুলি আঁচড় টানা আছে।

হাত মুখ ধুইয়া চুল ব্রাশ করিয়া একটা সিগারেট ধরাইয়া ডেক্‌-চেয়ারে হেলান দিয়া বলিলাম ও হনুমানদের এই ধৃষ্টতার প্রতিশোধ কি ভাবে লওয়া যায় তাহা চিন্তা করিতে লাগিলাম। সেদিন আর অন্য কোন কাজ করিতে পারিলাম না। সান্ধ্যভ্রমণের পর আসিয়া দেখিলাম, গোদা আমার টেবিলের উপর একটি পেয়ারা রাখিয়া গিয়াছে। তাহার গায়ে নখ দ্বারা কত কি যেন লেখা রহিয়াছে। কৌতূহলবশতঃ তাহা তুলিয়া লইয়া খাইলাম—অতি মনোরম ও সুস্বাদু বোধ হইল। সকালে উঠিয়া মনে হইল আমার শরীরের বল যেন দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে, আমার যেন কোন দিন কোন রোগ হয় নাই—হইতেও পারে না। মনের স্ফূর্ত্তিতে শিস্‌ দিতে লাগিলাম ও নিজের খেয়ালে গান ধরিলাম। হাতমুখ ধুইয়া বাহির হইয়া দেখি গোদা তাঁবুর সম্মুখে দাড়াইয়া আছে। আমাকে সে অভিবাদন করিল ও বলিল, প্রাতঃপ্রণাম—কেমন আছেন? আমার মুখ হইতে হনুমানী ভাষায় প্রত্যুত্তর বাহির হইল, কি, তুমি এত সকালে এসেছ? আমি বেশ মনের আরামে ঘুমিয়েছি—আজ বেশ ভালই বোধ হচ্ছে। গোদা বলিল, কাল আপনাকে পেয়ারা খেতে দিয়ে মনে ভয় হয়েছিল—আপনি মানুষ, আমাদের খাদ্য খেয়ে পাছে আপনি পাগল হয়ে যান—সে ভয়ে সারা রাত্রি ঘুমোতে পারি নি। আমি বলিলাম, না সে ভয় নাই। বরঞ্চ ভাল ফলই হয়েছে।

আমি তাহাকে তাঁবুর কাছে আসিতে বলিলাম ও একটি প্যাকিং বাক্সের উপর বসিতে দিলাম। বেয়ারাকে চা ও বিস্কুট আনিতে বলিলাম ও তাহার সঙ্গে গল্প গুজব করিতে লাগিলাম। বেয়ারা ইঙ্গিত মত সব কাজ করিল। কিন্তু গোদাকে চা বিস্কুট দিতে রাজী হইল না। আমি চা ঢালিয়া তাহাকে দিলাম। গোদা

বলিল, "অত গরম জিনিষ খাওয়া ত আমাদের অভ্যাস নাই। ঠাণ্ডা জল ঢেলে দেন ত খেতে পারি। আমি বলিলাম চা গরম গরম sip করে খেতে হয়, একটু খেয়েই দেখ। আমি যেরূপ ভাবে চা খাইলাম সেও তাহা অনুকরণ করিল। চা পান ও বিস্কুট ভক্ষণ শেষ হইলে আমি তাহাকে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কাল আমার writing padএ কি লিখে গিয়েছ? আমার কাছে হনুমানী ভাষায় মধ্যে ইংরেজী কথা শুনিয়া গোদা তীব্র বক্র দৃষ্টি করিয়া বলিল, আপনাদের দোষই এই যে সোজা ভাষা ব্যবহার করতে পারেন না—ইংরেজি কথা না দিলেই চলে না? আমি প্রত্যুত্তরে বলিলাম, (হনুমানী ভাষায় ও হনুমানী উচ্চারণে) ইংরেজি এবং বাংলা মিশিয়ে talk করাটা আমি ও একেবারেই পছন্দ করি না—তবে কি জান ইংরেজি হচ্ছে আমাদের court language, না বললে আমাদের প্রেস্‌টিজ্ থাকে না। বাংলা ভাষাটা বড় একঘেয়ে নোংরা—ওতে লোককে ধমক দেওয়ার ও chastise করার কোন শব্দই নাই।

গোদা writing padটি হাতে লইল ও অর্দ্ধস্ফুট স্বরে বলিল, আপনার গুষ্টির মাথা! কি চমৎকার ভাষাই আমাকে শোনালেন? বরঞ্চ যদি "উর্দ্দোস্কৃত" কিছু বলতেন তবু বুঝিতাম। আমি তাহার কথাটা বুঝিতে পারিয়া বলিলাম, তোমরা কি উর্দ্দোস্কৃত ভাষা ব্যবহার কর না কি? তবেনা বলছিলে তোমাদের হনুমানী ভাষা এত সুন্দর মোলায়েম ও perfect? গোদা বলিল, কি করি বলুন, সেদিন একটি গাছ হইতে শুনলাম, একটা ছোট ছেলে পড়ছে—জিয়াফত খাইতে গিয়া দেখি, খ্যান্ কুটুম্ব সব তখনও জমায়েৎ হয় নাই। উজু করিতে তালাবে যাইয়া দেখি, তাহার পানি কি ঠাণ্ডা এ ভাষা শুনে অনেকক্ষণ ভাবলাম বাংলা ভাষা তো

কিছু বুঝি—কিন্তু এ আবার নূতন কি ভাষা এরা শিখছে। ফকির সাহেবকে খুঁজে বের করলাম ও জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বোঝালেন এই মানুষ গুলো নূতন একটা ভাষা সৃষ্টি করেছে। সেই থেকে আপনাদের উপর আমাদের অত্যন্ত ঘৃণা হল। পাছে আমাদের হনুমানী ভাষাও নষ্ট হয় তার জন্য আমরা একটা মহতী সভা করব মন্তব্য করলাম। আমি গোদার কথাতে মোহিত হইয়া গেলাম। তাহাদের ভাষা লইয়াও তরে মহতী সভা হয়! আমি বলিলাম তুমি বিকালের দিকে একবার এসো—তোমাদের সাহিত্যের কথা শুনব। গোদা সে writing padটি হাতে করিয়া বলিল, আমার এ দরখাস্তখানা আপনি নেবেন না? আমি বললাম, তুমি পড় আমি শুনি, যদি উপযুক্ত মনে করি নিশ্চয় মঞ্জুর করব। গোদা পড়িতে লাগিল, (হনুমানী ভাষায় লেখা—অনুবাদ করা হইল)।

ধর্ম্মাবতার,

অধীনের নিবেদন এই যে, হুজুর সকলের প্রজাস্বত্ব লিখিয়া পরচা দিয়া তাহাদের স্বার্থ চিরস্থায়ী করিয়া দিতেছেন। আমি দিগ্‌বিদিক্ দলের অধিপতি—আমাদের যে ফলকর বনকর স্বত্ব আছে তাহার জন্য লিখিত পরচা দরকার—কারন আমাদের পূর্ব্বপুরুষ খটখটি বংশের অধস্তন বংশধরগণ, তাহারা আমাদের অধিকৃত এলাকার মধ্যে প্রবেশ করিয়া মধ্যে মধ্যে বড় গোলমাল সৃষ্টি করে। পরচা থাকিলে তাহা দেখাইয়া তাহাদের শাসন করিতে পারিব। হুজুরের আদেশে আমাদের "স্বাধীন ভোগ করার স্বত্ব" লিপিবদ্ধ করিয়া চিরস্থায়ী করিয়া দিতে আজ্ঞা হয়। ইতি—"

(আগামী বারে সমাপ্য)

কে-ডী-বা

সংবাদ-সাহিত্য

প্রবাসীর বিশেষ নৃত্য-সংখ্যাটি দেখিয়া পুলকিত হইলাম। গত আশ্বিন সংখ্যা হইতেই কতকগুলি নারী মলাটের উপরে নাচিতে স্বরু করিয়াছিল—পৌষ সংখ্যায় তাহারা দলে ভারি হওয়াতে ভিতরেও প্রবেশ করিয়াছে। প্রথম ছবি উর্ব্বশীর নৃত্য। জাদুকর গণপতির তাসের ম্যাজিকের মত উর্ব্বশী কতকগুলি শাদা ফুল লইয়া ম্যাজিক দেখাইতেছে, এবং উক্ত দলের নর্ত্তকীর মত বলের উপর নাচিতেছে। ৩২৩ পৃষ্ঠার লেজুড়-ছবিতে একটি গাভী খাল পার হইতেছে—পশ্চাতে এক যুবক ও যুবতী দাঁড়াইয়া—যুবক বাঁশী বাজাইতেছে। সম্ভবত খাল পার হইয়া সেও নাচিবে। ইহার পরেই নৃত্য-ধর্ম্ম। উদয়শঙ্কর ও সিমকি, উদয়শঙ্কর ও কনকলতা, এবং সদলবলে উদয়শঙ্কর। প্রবন্ধে লেখা হইয়াছে—"ভারতবর্ষে "দেবগণ হইতে এই নৃত্যের প্রথম প্রচলন।" আমাদের বিশ্বাস ছিল, দেবগণ হইতে যাহার আরম্ভ ঠাকুরগণে আসিয়াই তাহার শেষ হইবে, কিন্তু আমাদের ধারণা ঠিক নহে। প্রবাসীতে ছবি ছাপাইবার জন্য বাঙালীর আরো কিছুকাল নাচিবার আবশ্যকতা আছে। দেবনৃত্য এদেশে এতকাল অপদেবতাতেই নিবদ্ধ ছিল, কিন্তু ঠাকুরগণ পুনরায় তাহা দেব-শ্রেণীতে উন্নীত করিয়া দেওয়ায় আমাদের সকলেরই বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে প্রবাসীর শিক্ষামত থিয়েটার দেখা বন্ধ করিব ভাবিয়াছিলাম—কিন্তু নটরাজ প্রলয়-নাচন নাচিবার পর সকল বাঁধন খুলিয়া গিয়াছে, এখন হয়ত প্রবাসীকেই

নৃত্যের হাত হইতে বাঁচাইবার জন্য আমাদের প্রাণ দিতে হইবে।

—

প্রবাসীর ৪২০ পৃষ্ঠায় আরো দুইটি নৃত্যের ছবি। ইহা শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্র রায়ের আরতি-নৃত্য। দেখিয়া মনে আশার সঞ্চার হইল। বাংলা দেশের সকল যুবক-যুবতী যদি এইভাবে নৃত্য করিতে আরম্ভ করে তাহা হইলে দেশ যে অচিরাৎ স্বর্গে পরিণত হইবে এবিষয়ে সন্দেহ নাই। নৃত্য ছাড়া আরো একটি বিষয় আছে। এদেশে মদ্যপানও দেবগণ হইতে প্রথম প্রচলিত হইয়াছে। দেবগণ সুরাপান প্রচলন করেন বলিয়া ইহার ব্যাপক পুনরুজ্জীবন বাঞ্ছনীয়। মদ্যপানবিষয়ে হিন্দুর বিশেষ রীতিনীতি কি, কিরূপ পাত্রে, কি পরিমান মদ্য পান করা উচিত, মাতাল হইলে কতবার বমি করতে হইবে, মাতাল না হইলে প্রায়শ্চিত্ত কি, মাতাল বলিতে কি বুঝায়, হিন্দু মাতালের বৈশিষ্ট্য কি, এবিষয়ে গবেষণা হইলে দেশের সংস্কৃতি আর এক ধাপ অগ্রসর হইবে।

—

পৌষের বিচিত্রায় শ্রীমতী মালতীশ্যাম দেবী নামক লেখিকা নারী-নৃত্য সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার বক্তব্য—

> আধুনিক শিক্ষায় নারীজাতির মধ্যে স্বাতন্ত্র্যবোধ জাগিয়াছে। আমরা লক্ষ্য করিতেছি নারী-নৃত্য এই আধুনিক শিক্ষিত নারীগণ ক্রমশ গ্রহণ করিতেছেন। এতকাল নারীর হিতচিন্তা পুরুষজাতি করিয়াছেন কিন্তু এখন নারী-সমাজের এই ধারণা জন্মিয়াছে যে আত্মমর্য্যাদা-ক্ষেত্রে তাঁহাদেরও একটা কর্ত্তব্য আছে।…পুরুষের সমর্থন পাইয়া

> সমাজের বাহিরে কুৎসিত আবহাওয়ার মধ্যে নৃত্য নারীকে অবলম্বন করিয়া বাঁচিয়া আছে। ইহা সমাজের স্বাস্থ্যের লক্ষণ নহে।...নারী-নৃত্য ও সঙ্গীতের দ্বারা সমাজের কাম-প্রবণতার কতকটা অন্তত পশম (উ-?) হয় ইহা মনো-বিজ্ঞান সম্মত কথা। মনের মধ্যে কামকে চালিত করিয়া তাহার উর্দ্ধগতি দিতে পারিলে নারীজীবনের মর্য্যাদা বর্দ্ধিত হইবে। যে গণিকাবৃত্তি নারীজাতির অমর্য্যাদার চরম. দৃষ্টান্তস্বরূপ বিরাজ করিতেছে সমাজের কামকে কল্যাণের পথে পরিচালিত করিতে না পারিলে এই হীনতা হইতে মুক্তি •াই।

লেখিকার উদ্দেশ্য ভাল। যে নৃত্য দেখিতে ভদ্রলোকেরা গণিকালয়ে যান, সেই নৃত্য যদি গণিকাদের নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া সমাজে ছড়াইয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে নারীসমাজের মর্য্যাদা বৃদ্ধি হইবে, কামও উর্দ্ধগতি লাভ করিয়া ধন্য হইবে। কিন্তু আশঙ্কা হইতেছে গণিকালয়ের নৃত্যের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সমাজের নারী-নৃত্য নাও জিতিতে পারে; আত্মরক্ষা-ধর্ম্মে গণিকারাই অধিকতর নিপুণতা দেখাইবে এইরূপ মনে হয়। আপাতত neutratizalion-ব্যাপারটি নৃত্যের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার ফলাফল দেখিবার জন্য আমরা উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিলাম।

—

এদিকে অধ্যাপক রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় দিব্য আসর জমাইয়া তুলিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বেই অনুমান করিয়াছিলাম গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইলে সৃষ্টি লোপ পাইবে—অসহ ছাড়িয়া লোকে এরূপ উগ্র সহযোগিতা আরম্ভ করিবে যদ্দ্বারা

স্থান কাল পাত্র কিছুই জ্ঞান থাকিবে না। ফলেও তাহাই হইয়াছে। অধ্যাপক মহাশয় বলিয়াছেন—

> সহ-শিক্ষার সাহায্যে সেক্স-রিপ্রেশনের অতিক্রিয়াটাও অনেকটা বন্ধ করা সম্ভব। ছেলে মেয়েরা এক সঙ্গে স্কুলে সময় কাটাইলে অজানিতে মনে মনে আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তি করিতে পারে।

বাপ্! একে মনে মনে, তাহাতে আবার স্কুলের ছেলে মেয়ে! রিপ্রেশনের অতিক্রিয়াটা তাহা হইলে অধ্যাপক মহাশয় এককালে খুবই ভোগ করিয়াছেন দেখিতেছি। দেখিতেছি বটে, কিন্তু রিপ্রেশনের অতিক্রিয়াটা কি বস্তু তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।

—

বিচিত্রায় স্রোতের ফুল লইয়া কাড়াকাড়ি করিয়াছেন শ্রীমতী পুর্ণশশী দেবী ও শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। ফুলের কোন্ অংশের জন্য কাহাকে ধন্যবাদ দিব ভাবিয়া পাইতেছি না। সবিতা পাশের বাড়ির অলকের প্রেমে পড়িল, কিন্তু তাহার জন্য তাহাকে অবিবাহিতা মাতার কন্যারূপে পরিচিত করাইয়া লেখক-লেখিকা বোধ হয় সামাজিক বিবেক বাঁচাইয়াছেন।

> মনে পড়ে তার একটি দিনের কথা…
>
> …শিউরে ওঠে, আবার তারই বিভোরে মগ্ন হয়ে যায়…
>
> আনন্দের স্রোত বয়ে যায় তার মরমের ভেতর দিয়ে।

নায়িকা নায়কের "বিভোরে" মগ্ন হয়। এই মগ্নামগ্নির ব্যাপারে হাতযশ কাহার? লেখিকার, লেখকের না বিচিত্রা-সম্পাদকের?

—

কিন্তু ভাষা শেষ পর্য্যন্ত মগ্নে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে পারে নাই; ডুবিয়াছে।

নিজের জন্য নয়, সে তো ডুবেইছে…এই বিষম ঘূর্ণাবর্ত্তে শুধু হাবুডুবু খেয়ে মরতে হবে—জেনেও…এখন এই ডোবাতেই সুখ যে তার!…

রবিবাবুর 'হৃদয় যমুনা'র মত লাজ ভয় মান অপমান সব ত্যাগ করেই সে ঝাঁপ দিয়েছে—এই দুকূলপ্লাবী ভরা যমুনার উচ্ছ্বসিত ফেনিল স্রোতে—তার নিতল তলে তলিয়ে যেতে—কিন্তু…

ওর সঙ্গে সঙ্গে অলক ডোবে কেন?

হাজার দশেক ফুটকি ও ড্যাশ যুক্ত করিয়া লেখক-লেখিকা বহু প্রকার ব্যাপার প্রকাশ করিয়াছেন। ফুটকি ইঙ্গিতাত্মক নহে, সব কথা খোলাখুলি প্রকাশ করিয়াই ফুটকি বসান হইয়াছে। দেখিয়া মনে হইতেছে এক পাল শূকর ফাঁকা জমি গুলি খুঁড়িয়া গিয়াছে।

অথবা যেন Electro-cardiographএর ছবি দেখিতেছি। কাগজের উপর হৃৎপিণ্ড তাহার ভাষা লিখিয়া গিয়াছে—ফুটকির ভাষা!

—ওঃ! ঢের ভেবেছি সবি! আর আমি পারি না… ভাববার, বোঝবার শক্তি আমার লোপ হয়ে গেছে। এবার সত্যি আমি পাগল হয়েছি! তুমি আমাকে নাও…আমি আর…

প্রমত্ত হিয়ার উচ্ছ্বল (?) আবেগে অলক সবিতাকে বুকের মধ্যে টেনে নেয় সবলে…বাধা দিতে বৃথাই প্রয়াস

> পায় সবিতা…পাতলা ঠোঁট দুখানির আকুল কাঁপন তার থেমে যায় অলকের আতপ্ত অধরের চাপে…শুধু দেহেই নয় অন্তরেও তীব্র শিহরণ অনুভব করে সবিতা—সেই প্রথম দিনের মত…আজও তেমনি…না, তার চেয়েও নিবিড় অন্ধকার; তখন একটু আলোর আভাস ছিল যেন…এখন অতল…অশেষ…

আমাদের ভুল হইয়াছিল; Cardiograph নহে, Seismograph! "আকুল কাঁপন" ভূমিকম্প ছাড়া হয় না।

—

বিচিত্রার হিমাচ্ছন্ন ছবিখানিতে একটি স্ত্রীলোক এবং একটি কিশোরী হঠাৎ পদ্মদীঘির ধারে পড়িয়া আছে কেন বুঝা যায় না। স্ত্রীলোকটি রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের হরিণশিকার-ভঙ্গিতে মেয়েটির ঘাড়ে টপকাইয়া পড়িয়াছে। জনৈকা বৃদ্ধা একখানি রামপুরী চাদর দিয়া উহাদিগকে ঢাকিয়া দিতেছে। খুব সম্ভব, মাতা-কন্যার সহমরণের ছবি, কিন্তু এরূপ স্থানে কেন মৃত্যু হইয়াছে তাহা স্বয়ং চিত্রকরও বলিতে পারিবেন না, কেননা মৃত্যুর উপরে কাহারও হাত নাই। মাতা ও কন্যার ছবিতে sex appeal বেশ পরিস্ফুট হইয়াছে, সেজন্য চিত্রকরকে ধন্যবাদ।

—

সাঁতারু শান্তিপাল বিচিত্রায় সাঁতার সম্বন্ধে যে উপদেশাদি দিয়াছেন তাহা পালন করা যে বিশেষ সুসাধ্য নহে তাহাই মনে হইতেছে। তিনি একস্থানে লিখিতেছেন—

> (সাঁতার অবস্থায়) নিদ্রার বেগ আসিলে কফি কিংবা

কোকেন দিবে। অন্যান্য সময় সাঁতারুর পছন্দ অনুযায়ী তালিকা-অন্তর্গত দ্রব্যগুলি দিবে।

মনে করিয়াছিলাম সাঁতার শিখিব, কিন্তু সদিচ্ছা ত্যাগ করিলাম। পূর্ণজ্ঞান থাকা সময়ে ইচ্ছামত খাদ্য পাইব অথচ ঘুম পাইলেই কোকেন, ইহা বড় ভয়ানক। কোকেন কোথায় কিরূপ ভাবে কিনিতে হইবে, তাহা জানিতে হইলে কোথায় অনুসন্ধান করিতে হইবে?

—

ছন্দের গঠন লইয়া বিচিত্রার বিতর্কিকা আরম্ভ হইয়াছে। আমাদের মনে হয়, এরূপ তর্ক আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে তার্কিকদের কান ঠিক আছে কিনা ইহা নিরূপিত হওয়া আবশ্যক। এমন কি তাঁহাদের কানের ফোটোগ্রাফও লেখার সঙ্গে মুদ্রিত হইলে ভাল হয়। একজন রবীন্দ্রনাথের কবিতা হইতে অনেকগুলি ছত্র উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন ইহাতে "প্রচলিত ছন্দরীতি" লঙ্ঘিত হইয়াছে। "প্রচলিত ছন্দ" কি? রবীন্দ্রনাথ যখন সোনার তরী, ছবি ও গান প্রভৃতি লিখিয়াছিলেন তখন কি ছন্দ প্রচলিত ছিল? যদি সোনার তরী বা ছবি ও গানের কোনো কবিতা প্রচলিত ছন্দোরীতি লঙ্ঘন করিয়া থাকে তাহা হইলে সেই লঙ্ঘনে নূতন ছন্দোরীতির সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু এরূপ না হইয়া কোনো কবিতার ভিতরকার একটি কি দুইটি ছত্র "প্রচলিত" ছন্দোরীতি লঙ্ঘন করিল কি উপায়ে?

(১) সংসারের দশদিশি ঝরিতেছে অহর্নিশি
ঝর ঝর বর্ষার মত।

(২) যুগান্তরের ব্যথা প্রত্যহের ব্যথার মাঝারে
মিলায় অশ্রুর বাষ্পজাল।

(৩) মণি কেঁদে বলে তবে
শুধু কি রইবে বাকি কান্নার খেলা ?

(৪) বিষয়টা ঘটেছিল আমারি আমলে
পাস্তি ঘাটায়।

(৫) রাঙা রাঙা অধর ছুটি কেঁপে কেঁপে ওঠে কতো
করতলে সকরুণ মুখ

(৬) তাপস নিঃশ্বাস বায়ে মুমূর্ষুরে দাও উড়ায়ে
বৎসরের আবর্জ্জনা দূরে দূর হয়ে যাক।

* * *

(৭) রসের আবেশ-রাশি শুষ্ক করি দাও আসি
আনো আনো আনো তব প্রলয়ের শাঁখ।

(৮) দিনেরে মাভৈঃ বলে যেমন সে ডেকে নিয়ে যায়
অন্ধকার অজানায় (ইত্যাদি)

এক "মাভৈঃ বাজে নৈরাশ্য নিশীথে" প্রচলিত ছন্দোরীতি নহে, ছন্দোরীতিই লঙ্ঘন করিয়াছে—তাহা ছাড়া উপরে উদ্ধৃত কোনোটাই কোনো রীতি লঙ্ঘন করে নাই। রবীন্দ্রনাথের ছন্দোরীতি উহার প্রত্যেকটিতেই বজায় আছে। কিন্তু একজন বলিতেছেন ইহা "প্রচলিত ছন্দ-রীতি" লঙ্ঘন করিয়াছে—অপর জন বলিতেছেন, এগুলি ত রবীন্দ্রনাথের অপরিণত বা অতি-পরিণত বয়সের রচনা, সেইজন্য ইহার ছন্দ ঠিক নাই—যৌবনের রচনার ছন্দ ঠিক আছে। আমরা উভয় মহাত্মাকেই নমস্কার করিতেছি।

—

জনৈক রোগী বহুকাল না খাইয়া খাইয়া এত লোভী হইয়া পড়িয়াছিল যে সারাদিন তাহার নিকট কেহ ভাল ভাল খাবারের

গল্প না করিলে তাহার চলিত না, চীৎকার করিয়া কাঁদিতে থাকিত। চিৎপুরের বাবুদেরও অনেকটা সেই ব্যাপার দেখিতেছি। কাপ্তেনীসুলভ ভাষায় যে লোলুপ হ্যাংলামির পরিচয় দিয়াছেন তাহা ও-পাড়ার উপযুক্তই হইয়াছে।

—

কাপ্তেনবাবুরা ডজন ডজন বাঙালী মেয়ের সঙ্গে হোটেলে, রেস্তরাঁয়, গাড়িতে, মদ খান, কথায় কথায় রোল্‌স্‌রয়েস চড়েন, মিঃ সেনের অনুপস্থিতিতে মিসেস্‌ সেনকে লইয়া ভাগেন—

পড়েছে তো প্রেমে ওমোলা গুপ্তা
যাকে পারে নাই কেও
আমার ব্রাকের সাইড কারেতে
বেড়িয়ে এসেছে সেও।

কেহই না কি বাদ যায় নাই।

—

কাপ্তেন বাবু বলিতেছেন—

মেয়েদের পিছু ছুটিয়াছি আমি
সারাটা জীবন ভোর
একটার পর একটা এসেছে
এমনি ভাগ্য মোর।
ফুরিয়ে গেল না—

ফুরাইবে কেমন করিয়া? তুমিও কেবল দুধ ছাড়িয়াছ, চিৎপুর রোডও একটুখানি নহে।

—

"জোড়াসাঁকো" নামটি রবীন্দ্রনাথেই শেষ হইল। সুভগ চিৎপুরেরই সৌভাগ্য সূচিত করিতেছে। যুগবিভাগও দুই নামেই করা যাইবে। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত, ঠাকুর-পরিবারে যত কামনা-বাসনা অপূর্ণ রহিয়া গিয়াছে তাহার সবগুলি ক্ষুধিত পাষাণের মত একত্র আসিয়া মূর্ত্তি ধরিয়াছে সুভগের মধ্যে। কিন্তু হায়! এমন মুহূর্ত্তেই মূর্ত্তি ধরিল যখন এক গলাবাজি করা ছাড়া আর কোনো উপায়ই অবশিষ্ট রহিল না!

—

রবীন্দ্রনাথের মুখোস।

তাই বলি আজ যে মানুষ চেঁচাচ্ছে "রিলিজান অব ম্যান" বলে, "মহামানবের সাগরতীরে" যে মানুষ মানুষকে আহ্বান জানাচ্ছে— এগুলো মুখোস ভিন্ন আর কি?

—

(গান্ধির?) কারিকুরি করা কাপড়।

মানুষের মৌখিক স্বার্থত্যাগের, তার অহিংসা আন্দোলনের, ধর্ম্মের আর নীতি কথার কারিকুরিকরা কাপড়খানা খুলে যদি তাকে নগ্ন করে দেওয়া যায়,—তবেই ত সটাং আমরা সন্ধান পেতে পারি মানুষের সাথে সত্যের সম্বন্ধ কতখানি।

—

আমি না আমার যৌবন।

ওকি আপনি এখানে কি চান—অ্যানি বিছানায় উঠে বসল।

গোবর্দ্ধন দৃঢ় কণ্ঠে উত্তর দিল—আমি? আমি কিছু চাইনা আমার যৌবন চায় তোমাকে, বলেই গোবর্দ্ধন অ্যানির বিছানার একপ্রান্তে বসে পড়্‌লো।

আপনি জানেন এর ফল কি হবে? অ্যানি দাঁতের সঙ্গে দাঁতের বাজনা বাজিয়ে উঠল।

* * অ্যানি! অনেক লাঞ্ছনা তোমাদের গোবর মাষ্টার সহ্য করেছে—কিন্তু তার যৌবন তা' করতে শেখেনি।

—

"দেশ"—(পুস্তক পরিচয়)

"এত অল্প দামে যে কি করিয়া এরূপ সুন্দর কাগজ বাহির করা যায়, তাহাতে বিস্মিত হইতে হয়।"

আশা করি দেশ আর বিস্মিত না হইয়া এই বিদ্যাটা আয়ত্ত করিয়া লইবেন।

—

দেশের দুইটি হেড-লাইন ও লেখক—

"কৃষককে শোষণ করে কে?" শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

"গণেশ-জননীর আহার।" শ্রীগণেশ ভট্টাচার্য্য।

—

ভবিষ্যদ্বাণী—(ডঃ ধরের পত্নী সম্বন্ধে—"দেশ")

এই কৃতী মহিলাটি রসায়নে ডক্টর উপাধির জন্য গবেষণা করিয়াছেন এবং শীঘ্রই ঐ উপাধিতে অলঙ্কৃতা হইবেন। ভারতবর্ষে মহিলাদিগের ভিতর ইনিই প্রথম রসায়নে ডক্টর হইবেন। কালে যে ইনি এদেশের ম্যাডাম কুরী হইবেন, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

মাল্! মাল্! শুধু মাল্! (ভবিষ্যৎ)

পা ফেলবার ফাঁকটুকু পর্য্যন্ত নাই, দৃষ্টিরও তেমনি দুর্দ্দশা। শুধু মালের ছড়াছড়ি। সহরে যারা পড়ে রইল, তারা না জানি থাকবে কি করে। চলতি পথে পিছনের ভাবনা কেই বা ভাবে? মাল প্রবেশ হচ্ছে।...

—

সংসারের ব্যাসটানি

আমার অত্যন্ত কাছে ঘেঁসে এসে বেব্‌সি বলল—আচ্ছা! দুজনে যদি একেবারে একটা ফাঁকা গাড়িতে আজ যেতে পারি...তবে কেমন হয় বল দেখি? * * * না সত্যিই আজকার এই রাতটাকে ইচ্ছা করছে জীবনের একটা বিশেষ রাত করে নিতে! এর পরে—সংসারের ব্যসটানিতে প্রাণটা যদি কখনও হাঁপিয়ে ওঠে তখন এই রাত্রির স্মৃতিই দেবে আমাকে বেঁচে থাকবার মত সান্ত্বনা, উত্তেজনা।

—

গণনালয়

একটি যুবক জিজ্ঞাসা করল—মহাশয়ের গণনালয়টা কোথায়? নিষ্প্রভ দৃষ্টিটা কোনরূপ বাগিয়ে বৃদ্ধ বক্র কটাক্ষে তাকালেন —গণিকালয় মানে?

সকলেই জ্যোতিষাচার্য্যের কথায় বিস্মিত হইল। বোঝা গেল শ্রবণশক্তিরও তার কিছু ঘাটতি আছে।

—আজ্ঞে গণিকালয় নয়, গণনালয়। ওঃ! কেন, সেই যে হেদুয়া পুকুরের ধারে মেয়েদের স্কুলের দরজায়।

—

খোলা চিঠি (খেয়ালী)

> দুর্গাদাস, কিন্তু আমি বলি তুমি এ প্রৌঢ় বয়সে আর নায়ক সেজোনা, তাতে তোমার এতদিনকার কষ্টার্জ্জিত সুনাম নষ্ট হবার সম্ভাবনা আছে। তোমাকে এখন আমরা বয়স্থ লোকের ভূমিকায় বা "ভিলেন" রূপে দেখতে চাই।

শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী প্রভৃতি এখনও খোলা চিঠি পান নাই।

—

প্রতিভা ("নবশক্তি"-বুদ্ধদেব বসু)

> আমরা আমাদের প্রতিভাকে গোপন কোন পাপের মত পালন করি। রাস্তায় খবরের কাগজের কি সভাসমিতির লোক, তার কোন রকম উল্লেখ করলে কর্ণমূল আরক্ত হয়ে উঠতে চায়।

আমরাও শুনিয়া লজ্জা অনুভব করিতেছি।

—

অভিভাষণ (রবীন্দ্রনাথ—"প্রদীপ"-এ মুদ্রিত)

> সেকস্‌পীয়র, বায়রণ, মেকলে, বর্ক তাঁরা প্রবল উত্তেজনায় আবৃত্তি করে যেতেন খাতার পর পাতা। * * *
>
> তখন অন্তঃপুরে বটতলার কাঁকে কাঁকে দুর্গেশনন্দিনী, মৃণালিনী, কপালকুণ্ডলা সঞ্চরণ করছে দেখতে পাই।

—

বৃহত্তর-বঙ্গ শাখার সভাপতির অভিভাষণে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার মহাশয় বলিয়াছেন—

> বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে এখন যে জীবন সংগ্রামের সমস্যা প্রকট হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে আশঙ্কা হইতেছে, ভবিষ্যতে

> বাঙ্গালী জাতির সাহিত্য সেবার উদ্যম যথেষ্ট প্রবল হইবে না। বাঙ্গালী-জীবনের সমস্যা হইতে তাহার সাহিত্য বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলে চলিবে না। জীবনধারার রূপই আমরা সাহিত্যে দেখিতে পাই, তাই সাহিত্যকে প্রাণবন্ত করিতে হইলে জীবনকে যে-সকল সমস্যা আজ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে তাহার প্রতি আমাদিগকে অবহিত হইতে হইবে।

কিন্তু বাঙালী এখন আর মানুষ নহে, সে উদ্ভিদে পরিণত হইয়াছে। তাহার নড়িয়া চড়িয়া বেড়াইবার ক্ষমতা নাই ; সে যেখানে বাড়িয়া উঠে সেখানেই গোটাকত শাখা বিস্তার করিয়া পত্র প্রকাশ করিতে থাকে। এই পত্র প্রকাশই আপাতত বাঙালী-জীবনের সমস্যা। ইহার প্রতি অবহিত হওয়ার অর্থ আর একখানি কাগজ বাহির করা। সে বিষয়ে বাঙালীকে উস্কাইয়া দিতে হইবে না।

—

শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছেন—

> বঙ্কিমকে আমরা হারিয়েছি মাত্র চল্লিশ বৎসর। এরি মধ্যে শুনতে পাচ্ছি, তাঁর উপন্যাসাদি নাকি আদর্শ ও নীতিমূলক, যা কাব্য বা সাহিত্য সৃষ্টি ক্ষেত্রের উৎকৃষ্ট রীতি নয়,—অর্থাৎ দোষস্থ। তাতে প্রকৃত বস্তুর বা সাহিত্যের বিকাশ ঘটনা, সুতরাং দেশ কিছু পায় না। তাঁর নায়ক নায়িকারা সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে যে পথ যে নিত, তাকে সে পথে তিনি নিয়ে যেতে পারেন নাই। অর্থাৎ তাঁর লেখার পশ্চাতে উদ্দেশ্যের প্রভাব প্রকট; Art for art's sake—এ নয়!

> স্বীকার করতে আমার কিছুমাত্র লজ্জা সঙ্কোচ নেই যে, শেষের ঐ ইংরেজী 'বয়েদ'টি আজো আমি ঠিক বুঝতে পারি নি।

কেদারবাবু বোধ হয় শ্রীযুক্ত দিলীপকুমারের ঠিকানা জানেন না। অন্তত ধূর্জ্জটীপ্রসাদের নিকট একখানি পোষ্টকার্ড লিখিলেও উক্ত বয়েদটি বুঝিতে পারিতেন। এখনও সময় আছে।

—

অন্নদাশঙ্কর রায় মহাশয় "তারুণ্যের জোর" আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহার নিজের তারুণ্যের জোরে এখন আর তাঁহার তেমন আস্থা নাই মনে হইতেছে। উপদেশ বাণী-মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। পঞ্চাশোর্দ্ধে বানপ্রস্থ এবং বাণী-প্রস্থ দুইই বাঙালীর অবলম্বন। ইহা তাহার একরূপ পেশা দাঁড়াইয়া গিয়াছে। পঞ্চাশোর্দ্ধের আর দরকার হয় না—তারুণ্য ভাঙাইয়া দুই চারিখানি বই ছাপাইতে পারিলেই বাণী বিলাইবার কাল উপস্থিত হয়। আর সব দেশে যৌবন-ধর্ম্মই জাতির কাম্য—তাহারা জড়ত্ব এবং স্থবিরত্বকে ভয় করে, কিন্তু আমাদের কাম্য, তারুণ্য। না হইলে মাসিকপত্র চালানো যায় না। যৌবন-ধর্ম্মে। আমাদের ভীতি, কেননা ইহা মানুষকে কর্ম্মক্ষেত্রে আহ্বান করিতে চায়। তারুণ্য চায় অপকর্ম্মের ক্ষেত্রে। তারুণ্য অর্থাৎ পাকামি। ইহাতে কোনো দায়িত্ববোধ থাকে না, যাহা খুশী করা যায়, তাই ত যত অকর্ম্মার দল তরুণ সাজিবার জন্য ব্যস্ত! সাহিত্যও তারুণ্যের সাহিত্য—বিশুদ্ধ সাহিত্য নহে! ইংরেজিতে যেমন বিজ্ঞাপন, লিটারেচর; রেলোয়ে টাইম টেবল, লিটারেচর; তেমনি আমাদের দেশে তরুণ-লিটারেচর, ইহার জের এখনো মিটে নাই।

—

আই-সি-এস সম্প্রদায় কি সাহিত্যক্ষেত্রে কোনো আসন না পাইয়া "তরুণ-সাহিত্যে" ভিড়িয়াছেন? পরস্পর পিঠ চুলকাইবার ভঙ্গি দেখিয়া ত ইহাই মনে হয়। কিন্তু আই-সি-সি-এস সম্প্রদায় তাঁহাদের যৌবন কাহাকে দান করিলেন? যৌবন না থাকিলে হয় বৃদ্ধ আর না হয় তরুণ, অর্থাৎ চিরশিশু। যৌবনের মন উন্মুক্ত, সে সত্যের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত, মহৎ আদর্শ তাহাকে চঞ্চল করে; কিন্তু তরুণের আদর্শ কোথায়? সে অর্ব্বাচীন, সে অপগণ্ড, সে মূঢ়। ইহাও ভাল, কিন্তু এই তরুণ যদি হঠাৎ নিজের তারুণ্য সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠে, যদি সে বলিতে আরম্ভ করে যৌবন কিছু না তারুণ্যই সব—কেননা সে সাহিত্য-মন্দিরকে urenal করিতে পারে—প্রাণ খুলিয়া মুখখিস্তি করিতে পারে—আর ইহাই ত প্রকৃত বিদ্রোহ, প্রকৃত জীবনধর্ম্ম! তাহা হইলে ইহার প্রতিকার কি?

—

তারুণ্যের জোর দেখুন—

এবার যদি সুধাও লীলাভরে
আমায় ভালোবাসো?
লবো তোমার একটি পাণি বুকে
যতই তুমি হাসো।
তনের বাণী তন সে বোঝে ঠিক
মনের বাণী মন
মনের বাণী বিমৌনতা আর
তনের পরশন। (লীলাময় রায়)

ঊর্দ্ধতন এবং অধস্তন সকলেরই বাণী শুনিতেছি। অধস্তনের বাণীই তারুণ্যের বাণী, ইহাই তাহার জোর।

—

কবিতা বলিতে কি বুঝায় তাহা জনৈক কাব্যনীতির ছাত্র আমাদিগকে বুঝাইতে আসিয়াছিল। তাহার মত এই যে মানুষ তাহার কর্ম্মফল ভোগ করে, সুতরাং কবিতা যাহারা লেখে তাহাদেরও ইহা কর্ম্মফল। কর্ম্মের ফল ইহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু কি কর্ম্মের ফল তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। অন্নদাশঙ্করের তারুণ্যের পরেই দিলীপকুমারের "পৌরুষ"! দিলীপকুমার সহজ বিনয়ের বশে ইহাকে পৌরুষ আখ্যায় ভূষিত করিয়াছেন, আসলে ইহা অপৌরুষেয়। কারণ, মানুষের চৌদ্দ পুরুষে এরূপ লিখিতে পারে না—

হও অন্তরায় সে ফল্গুনোদয়ে করকার অভিনন্দি'
তাই আফোটা কোরকদল মুদে, বাস—মুক্তির পথে বন্দী,
তুমি নহ কৃতজ্ঞ মর্ম্মে,
চাও হাতে হাতে ফল—কর্ম্মে,
আজো প্রকৃতির কাছে শিখিলেনা তাই—প্রতি ফুল নীলসন্ধী
কত কঙ্কর-জয়ে তবে উঠে রবি-সঙ্গমে সৌগন্ধী।

কিন্তু ফল যে হাতে হাতেই ফলিতে আরম্ভ করিল! আজীবন অপেক্ষা করিতে পারিব বলিয়া যে স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলালের নিকট আমরা কথা দিয়াছিলাম!

কিন্তু দিলীপকুমারের মতে, আমরা নাকি আমাদের আত্মবিলাসী নির্ঝরকে আজ্ঞা দিয়াছি—

সদা স্বেচ্ছা-প্রণালী খুঁজিয়া
বাঁকি' চলিতে;

নির্ঝরকে পৌঁজা চালানো যে কি কষ্ট তাহা যদি দিলীপকুমার জানিতেন তাহা হইলে আমাদের স্বেচ্ছা-প্রণালী অনুসরণকারী বক্রগতিকে তিনি বহুপূর্ব্বেই ক্ষমা করিতেন !

—

শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য্যের প্রথম চারিটি প্রশ্নের আমরা যথাসাধ্য উত্তর দিতেছি। তাঁহার প্রশ্ন—

আকাশের ভাষা বুঝিতে কি পার নীড় নিবাসী ?
অমাবস্যার প্রাক্-সন্ধ্যার নীল আকাশ ?
নীরন্ধ্র নীলে যখনো ফোটেনি তারার হাসি,
আসন্ন নীল, প্রসন্ন নীল
অনন্ত নীল, অনন্য নীল
সে নীলের মাঝে মনের ভাষার পাও আভাস ?

উত্তর—১। না ২। ঈষৎ পারি ৩। না ৪। একটু পরিবর্ত্তন করিলে পাই : নীলের স্থলে শীল করিয়া কয়েকটা নাম একটু পরিবর্ত্তন করিলে দাঁড়ায়—আনন্দ শীল, প্রসন্ন শীল, অনন্ত শীল এবং অনন্যা শীল। এই পরিবারের সঙ্গে আমাদের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা আছে। ইহাদের নিকট হইতে বহু টাকা ধার করিয়াছি, কাছে গেলেই মনের ভাষার আভাস সর্ব্বদা পাইয়া থাকি। কিন্তু তাহা প্রকাশ করিতে লজ্জা বোধ করিতেছি।

—

খেয়ালী (২৫শে পৌষ ১৩৪১) সংখ্যায় "রবীন্দ্রনাথ আর একবার" নামক একটি রচনা ছাপা হইয়াছে। উহার নীচে লেখা আছে, রেডিওতে পঠিত 'কথা'র সারাংশ। লেখকের নাম শ্রীশেফালেন্দু

বস্থ। লেখক চুরিবিদ্যায় এখনো পাকা হন নাই বলিয়া মনে হয়। পাকা হইলে ধরা পড়িবার এরূপ সুযোগ সৃষ্টি করিয়া রাখিতেন না। অন্যের লেখা গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত সমস্তই নিজের নামে চালাইতে গেলে নানারূপ অসুবিধা আছে। নিজের নামটিও যে গোলমেলে। শেফাল+ইন্দু! আমরা রেডিও বক্তৃতা শুনি নাই, খেয়ালীতে ছাপার অক্ষরে পড়িয়া ধরিয়া লইতেছি রেডিওতে উহা পঠিত হইয়াছিল। চোরাই মাল হয়ত উভয় স্থানেই বিক্রয় হইয়াছে, হয়ত শেফাল+ইন্দু দুই পয়সা লাভ করিয়াছেন।

—

রেডিওতে যাঁহাদিগকে প্রবন্ধ পাঠ করিতে দেওয়া হয় তাঁহাদের বিদ্যা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়া দেওয়া হয় কি? যে লোকটি অপরের লেখা চুরি করিয়া নিজ নামে চালায় তাহার বিদ্যার একটা খ্যাতি নিশ্চয়ই রেডিও কর্তৃপক্ষের নিকট পৌঁছায় নাই। কিন্তু কি ভাবে উক্ত শেফাল+ইন্দু রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠের অধিকারী হইল? ঐ প্রবন্ধটি গত ১৩৩৮ সালের পৌষ-সংখ্যা "বঙ্গলক্ষ্মী"তে "তোমায় করিগো নমস্কার" এই নামে প্রকাশিত হয়, উহার লেখক শ্রীপরিমল গোস্বামী।

—

ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্ট একজিবিশনের ক্যাটালগের প্রথম পৃষ্ঠায় দেখিতেছি—

Gogonendranath Tagore	Not for sale
Abanindranath Tagore	Not for sale

M. K. Gandhi	Rs.	50.
Dr. Rabindranath Tagore	Rs.	35.

আমরা এরূপ মূল্যনির্দ্ধারণ সমর্থ করি না।

—

জিরাও-সম্পাদক দুই তিন সংখ্যা কাগজ বাহির করিয়াই আত্মার দ্বৈত পরিচয় লাভ করিয়াছেন। আত্মপ্রতিভা সম্বন্ধে এরূপ আত্মপ্রত্যয় ইতিপূর্ব্বে আমরা আর দেখি নাই। ইহা "দেখন"ও যেমন চমৎকার "ভাবন"ও তেমনি মধুর। দ্বিধাবিভক্ত ভূপেন্দ্রকিশোর ক্রমশ ত্রিধা হইবেন এবং ত্রিধা হইতে ক্রমশ নিজের বিশ্বরূপ দর্শন করিবেন এ বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নাই। তারুণ্যের জোর থাকিলে একদিকে জিরাও অন্যদিকে অ্যাপেণ্ডিক্স—কিছুই অশোভন হয় না। জিরাও-জনক ভূপেন্দ্রকিশোর লিখিতেছেন—

মোর মাঝে বাসা করে দুই জন—
আমি আর ভূপেন্দ্রকিশোর
আত্মা আর আত্মীয় দুজন
পুরুষ-প্রতিভা দুই নামে।

পুরুষটিকে আমরা দেখি নাই, প্রতিভার পরিচয় পাইলাম।

—

পরিচয়ের নানাপ্রকার রূপ আছে—তন্মধ্যে "ফলেন" পরিচয় সকল পরিচয়ের সেরা। কিন্তু এরূপ পরিচয় লাভ সকলের ভাগ্যে ঘটে না, কেননা ফল না বাহির হইতেই অনেক ক্ষেত্রে পরিচয় বাহির হইয়া পড়ে। পরিচয় নামক একখানি ত্রৈমাসিকের সঙ্গে আমাদের পূর্ব্বে

কিছু পরিচয় ছিল, কিন্তু যাঁহারা চালক স্বরেশ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পরিচয় লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের পক্ষে অন্য পরিচয়ের আবশ্যকতা নাই বিবেচনা করিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয় পরম নিশ্চিন্তে পোষ্টেজ বাঁচাইতেছেন।

—

আমরা সে জন্য দমি নাই। ইতিমধ্যে অন্য পরিচয় লাভ করিয়াছি। সম্প্রতি প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মিলন উপলক্ষে প্রবাসী বাঙালীদের জন্য "কলিকাতা পরিচয়" নামক একখানি ১৩৯ পৃষ্ঠার সচিত্র পুস্তিকা বাহির হইয়াছে। মলাটের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় মূল্য লেখা আছে একটাকা মাত্র। ইহার নীচে আর একখানি পুস্তকের নাম এবং দাম লেখা আছে। পুস্তকের নাম "ধাই"—মূল্য পাঁচ সিকা। ইহা কাহার রচিত বা কি জন্য রচিত তাহার উল্লেখ নাই।

—

ভূমিকায় শ্রীযুক্ত রামানন্দবাবু লিখিয়াছেন,—প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের দ্বাদশ অধিবেশনের অভ্যর্থনা-সমিতির অনুরোধে শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ এই পুস্তকখানি অল্প সময়ের মধ্যে লিখিয়া দিয়াছেন * * * শেঠ মহাশয়ের সম্মতি অনুসারে তাঁহার পাণ্ডুলিপিটির স্থানে স্থানে কিছু পরিবর্দ্ধন ও পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র বাগচী, শ্রীযুক্ত অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন ও শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ ইহা করিয়া দিয়া অভ্যর্থনা সমিতির কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। * * * এই পুস্তকখানি কলিকাতার এবং তাহার নাগরিকের সম্পূর্ণ পরিচয় নহে। যথেষ্ট সময় পাইলে এবং পুস্তক যথেষ্ট বৃহদায়তন করিতে পারিলে গ্রন্থকার ইহা পূর্ণতর করিতে

পারিতেন। ইহাতে যে-সব অসম্পূর্ণতা ও ত্রুটি পরিলক্ষিত হইবে, তাহার জন্য সময়ের অল্পতা ও পুস্তকের আয়তন বহু পরিমাণে দায়ী। * *

—

কিন্তু সময়ের অল্পতা এবং পুস্তকের নির্দ্দিষ্ট আয়তনে কি-জাতীয় ত্রুটি ঘটিতে পারে? আয়তন বাড়াইবার উপায় না থাকিলে অনেক জরুরি বিষয় বাদ পড়িতে পারে, এবং সময় অল্প হইলে প্রুফ দেখায় ভুল থাকিতে পারে। এ ত্রুটি নিশ্চয়ই ক্ষমার্হ। যদিও এরূপ ত্রুটি ঘটিলে, পরে এরূপ কৈফিয়ৎ দিয়া আত্মদোষ ক্ষালন করাও অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু আমরা যে কয়েকটি ত্রুটি লক্ষ্য করিলাম তাহার সঙ্গে আয়তনের কোনো সম্পর্ক নাই। সময়ের আছে বটে, কিন্তু তাহা এই প্রকার: ধরুন কলিকাতা কর্পোরেশনের জন্য অনেকগুলি নূতন আইন প্রণয়ন করা দরকার। আইন-প্রণয়নের ভার দেওয়া হইল প্রাইমারি স্কুলের তিনজন ছাত্রের উপর। তাহারা আইন করিল, এবং তাহা এই বলিয়া গৃহীত হইল যে যদিও এই আইনে অনেক গলদ আছে, কিন্তু তাহা নিতান্তই সময়াভাবের জন্য। অর্থাৎ যে পঁচিশ ত্রিশ বৎসর সময় পাইলে বাছারা বড় হইয়া উপযুক্ত আইন রচনা করিতে পারিত, ইহারা সে সময় পায় নাই; নাগরিকগণ এজন্য ইহাদিগকে ক্ষমা করিবেন।

—

এরূপ অনুরোধ করিলে ক্ষমা না করিয়া থাকা যায় না। আমরাও ক্ষমাই করিলাম, কেননা প্রবাসী বাঙালীর জন্য আমরা যেটুকু করিয়াছি

তাহাই যথেষ্ট। সাহিত্যের জন্য আমাদের দুর্ভাবনা থাকুক বা না-থাকুক প্রবাসী বঙ্গের জন্য যে নাই ইহা এক প্রকার নিশ্চিত। সপ্তদশ শতকে ইংলণ্ডের গ্রাম্য কোনো ধনী লণ্ডনে আসিলে 'বাঙাল' পাইয়া তাহাকে পাঁচজনে ঠকাইয়া গজভুক্ত কপিত্থবৎ করিয়া ছাড়িয়া দিত। বিংশ শতাব্দীর প্রথমে বঙ্গদেশও অনেকটা এইরূপ ছিল। মফঃস্বলের বহু লোককে কলিকাতা আসিয়া হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া ফিরিয়া যাইবার কথা শুনিয়াছি। প্রবাসী-বঙ্গের তুলনায় বঙ্গদেশও অনেকটা তদ্বৎই দেখা যাইতেছে। প্রবাসী-সম্পাদক মহাশয় প্রবাসী-বঙ্গকে অনুরোধ করিয়া যে কলিকাতা-পরিচয় তাহাকে দান করিলেন তাহাতে সে কতখানি উপকৃত হইল, তাহা তাহার প্রয়োজন না থাকিলেও আমাদের জানা প্রয়োজন।

—

সাহিত্য-সম্মিলন উপলক্ষে রচিত কলিকাতা পরিচয়ে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ছবি না থাকিয়া ভালই হইয়াছে, কেননা উহাতে অযথা খরচ বাড়িত—অপর পক্ষে, কলিকাতা পরিচয়ে প্রবাসী-বাঙালীগণ কলিকাতা বঙ্গীয় পরিষদের ছবির পরিবর্ত্তে নিজেদের ফোটোগ্রাফ পাইলেন ইহাও কম লাভের কথা নহে। প্রবাসী-সম্পাদক মহাশয় ত ex-officio প্রবাসী বাঙালী, তাঁহার কথা ছাড়িয়াই দিলাম, কিন্তু প্রবাসীর সঙ্গে বিশেষ কোনো সম্বন্ধ নাই এরূপ অপ্রবাসীও সুযোগ বুঝিয়া পরিচয়ে আশ্রয়লাভ করিয়াছেন। সাহিত্য সম্মিলনের স্মারক হিসাবে যে পুস্তিকা মুদ্রিত হইল, সময়ের নিতান্ত অভাব এবং স্থানাভাববশত তাহাতে রেস্-কোর্স-এর-ছবি ছাপা হইয়াছে—কিন্তু সাহিত্য-পরিষদের ছবি ছাপা হয় নাই। সময়ের অভাববশত সংবাদ-ভাস্কর সম্পাদক

গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশের নাম উল্লেখ করা হয় নাই। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপীমোহন ঠাকুর, গোপীমোহন দেব, আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রভৃতির নাম উল্লেখ নাই—কিন্তু অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক গ্রেট ইণ্ডিয়া ইনশিওর‍্যান্সের ডাঃ সুরেশচন্দ্র রায় ও সহকারী সম্পাদক শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষের ছবি ছাপা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ মহাশয় কিছুদিন পূর্ব্বে "বঙ্গলক্ষ্মী" কাগজে লিখিয়াছিলেন, সার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের জন্ম ১৮শ শতাব্দীতে। তখন হইতে ইনি আমাদের স্মরণীয়।

—

কলিকাতা পরিচয়ে আরো যে সকল ত্রুটি স্থানাভাববশত ঘটিয়াছে, মধ্যে—"(ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর) প্রথম ফোর্ট উইলিয়াম্‌স্‌ কলেজে পাঁচ টাকা বেতনে প্রধান পণ্ডিতের কার্য্যে নিযুক্ত হন।" (৬১ পৃঃ)। ৬২ পৃঃ দেখিতেছি "ঈশ্বরচন্দ্রের সম্পাদকতায় 'সংবাদ প্রভাকর' সাপ্তাহিক আকারে প্রকাশিত হয়।...'প্রভাকর' নামে একখানি সুবৃহৎ মাসিকও তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন।" ৬৮ পৃঃ কাশীপ্রসাদ ঘোষের কাগজের নাম "হিন্দু ইণ্টেলিজেন্স"—৭৫ পৃঃ জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননকে সরকার '৭০০ টাকা বৃত্তি দিতেন'—৭৬ পৃঃ জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের "মৃত্যু তারিখ ১৮০৬"।—১০৫ পৃঃ রামনারায়ণ তর্করত্নের জন্ম ১৭৪৫, মৃত্যু ১৮৮৬।" (জীবিত কাল ১৪১ বৎসর!)—১০০ পৃঃ "মনোমোহন বসু "মধ্যস্থ" নামক সাপ্তাহিক, পরে পাক্ষিক ও মাসিকপত্র প্রকাশ করেন।"—৮৬ পৃঃ "প্যারিচরণ সরকার এডুকেশন গেজেটের প্রথম সম্পাদক।"—১০৬ পৃঃ, "ব্রাহ্ম-সভা"। ১১২ পৃঃ রামনিধি গুপ্তের

৪র্থ সংখ্যা] মাঘ, ১৩৪১ [৭ম বর্ষ

কাজের স্বরূপ

আমাদের জাতীয় জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা বড় দৈন্য ইহা নয় যে, অনেক বিষয়ে পৃথিবীর অনেক জাতি অপেক্ষা আমরা বহু পশ্চাদ্বর্ত্তী, অথবা ধন-সম্পদ, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য—তুলনায় আমাদের নাই বলিলেই হয়। আমাদের মধ্যে যে পৌর-চেতনা আজও সম্যক জাগ্রত হয় নাই; সংঘবদ্ধভাবে কাজ করিবার মূল্য ও প্রয়োজনীয়তা যে জাতি হিসাবে আজও আমরা উপলব্ধি করিতে পারি নাই, আমাদের সকল দৈন্যের মধ্যে তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা বড় দৈন্য। এবং আমাদের অন্য সকল দুঃখ দূর করিবার কলে তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা দুর্লঙ্ঘ্য বাধা। আমাদের জাতীয় জীবনের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় হিতকর কার্য্য হইতেছে, বিভিন্ন উপায়ে আমাদের গতানুগতিক জীবন-যাত্রাকে আঘাত করিয়া, চাঞ্চল্য ও উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়া আমাদের মধ্যে সার্ব্বজনীন ভাবকে জাগ্রত করিবার চেষ্টা করা। বর্ত্তমানে আমাদের মধ্যে অগ্রগতির যে

সকল লক্ষণ লক্ষিত হইতেছে, উত্তেজনার মধ্য দিয়াই তাহা জন্মলাভ করিয়াছে, এবং তাহাই আবার অধিকতর ও ব্যাপকতর চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়া আমাদের জাতীয় জীবনকে প্রসারিত করিতেছে।

এই কথাটা বিশেষভাবে সত্য হইলেও,—সাধারণতঃ এই সত্যটা আমাদের দৃষ্টি এড়াইয়া যায় বলিয়া, কোন প্রকার উত্তেজনা বা 'হুজুগ'কে কতকটা অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতে এবং তাহার যতটুকু কাজের মধ্যে রূপ গ্রহণ করে, তুলনায় তাহাকে অনেক অধিক মূল্য দিতে আমরা অভ্যস্ত হইয়াছি,—যদিও ইহার প্রথম অংশটাই প্রধান এবং এই অংশ বর্জ্জিত হইলে দ্বিতীয় অংশ প্রাণ ও শক্তিহীন হইয়া পড়ে। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমাদের স্বদেশী আন্দোলনকে গ্রহণ করিলে দেখা যাইবে যে, ইহার বিপুল উন্মাদনাকে লক্ষ্য করিয়া আমাদের বুদ্ধিমান ও কাজের লোকেরা বরাবরই বলিয়াছেন, হুজুগ যথেষ্ট হইতেছে কিন্তু কাজের কাজ কই? অর্থাৎ কাজের কাজ বলিতে ইঁহারা বুঝাইতে চাহিয়াছেন, চরকা, তাঁত, মিল, কারখানা, কৃষিক্ষেত্র, জাতীয় বিদ্যালয় প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা। এ সকল প্রতিষ্ঠার যে প্রয়োজন নাই, অথবা ইহাতে দেশের কোন উপকার হইবে না এমন কথা বলা লেখকের উদ্দেশ্য নহে; কিন্তু আপেক্ষিক মূল্যের কথা ভুলিলে চলিবে না। ইহার ফলে আর্থিক বা অন্যবিধ জাগতিক লাভ যতটা হয়, তদপেক্ষা ইহাকে অবলম্বন করিয়া যে সামাজিক জীবন গঠিত ও দৃঢ়ীভূত হয় তাহার মূল্য কম নহে। যাঁহারা এই আন্দোলনের উদ্যোক্তা ছিলেন, তাঁহারা যদি হুজুগের অংশটা বাদ দিয়া তাঁহাদের শক্তি ও উদ্যম দুই একটি মিল বা ঐরূপ কোন প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার চেষ্টায় ব্যয় করিতেন, তাহা হইলে, তাহাতে দেশের কতটা

উপকার হইত, এবং ইহাতে প্রস্তুত জিনিসের চাহিদাই বা কি পরিমাণ থকিত, তাহা ভাবিয়া দেখিবার।

এই আন্দোলন আমাদের মধ্যে যে দেশাত্মবোধ জাগাইয়াছে, অর্থাৎ আমাদের সকলেরই যে দেশের প্রতি কিছু কর্ত্তব্য আছে আমাদের অনেককে এই বুদ্ধি দিয়াছে। দেশের বহুলোকের এই মন ও বুদ্ধির ঐক্যই আমাদের জাতীয় জীবন। কোন একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যদিও এই জাতীয় জীবন সংঘবদ্ধ হইয়া উঠে না, তবুও এই বুদ্ধি ও মনের ঐক্য নানা প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়া নানা উদ্দেশ্যে লোককে ঐক্যবদ্ধ করে। এই সংঘবদ্ধভাবে কার্য্য করিবার শক্তিই ইহার বড় দান। আমাদের বহুলোকের মধ্যে যে স্বদেশী জিনিস কিনিবার, দেশের অন্য নানা কার্য্য করিবার ইচ্ছা জাগিয়াছে, দলবদ্ধ ও বিচ্ছিন্নভাবে নানা কাজ করিবার যে প্রচেষ্টা দেখা দিয়াছে ইহা প্রকৃতপক্ষে আমাদের জাতীয় জীবনে শক্তি সঞ্চারের প্রমাণ দিতেছে।

সব সময়েই সকল নূতন কর্ম্ম ও প্রচেষ্টার পুরোবর্ত্তী থাকে নূতন চিন্তা ও নূতন ভাব। এইজন্য যখনই ব্যাপক ভাবে আমরা কোন কাজ করিতে চাই, তখনই তাহার জন্য প্রচার আবশ্যক হইয়া পড়ে। কিন্তু সুশৃঙ্খল ও সুসংবদ্ধ গণজীবন দেশে না থাকিলে, এই প্রচার বিশেষ দুঃসাধ্য হইয়া উঠে এবং তাহার কর্ম্মে রূপ গ্রহণ করিবার সম্ভাবনা বিশেষ থাকে না বলিলেও চলে। অন্যদিকে, সুসংবদ্ধ ও সুশৃঙ্খল গণজীবন থাকিলে ভাব প্রচার এবং তদনুযায়ী কর্ম্মের প্রসার অনেক সহজসাধ্য হইয়া পড়ে।

আমাদের দেশে গণজীবন নাই বলিয়া কোন চিন্তা ও ভাব দেশের মধ্যে সমাজের সর্ব্বস্তরে বিস্তার লাভ করিতে পারে না; নূতন ভাবকে

মুক্তি দিবার জন্মে নূতন কর্ম্মক্ষেত্র কদাচিৎ গড়িয়া উঠে। শুধু মাত্র যে সকল ভাব লোকের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি করিতে পারে, অর্থাৎ যাহারা নিজেদের প্রতিষ্ঠার জন্য গণজীবন কতকটা সৃষ্টি করিয়া লইতে পারে, সেই সকল ভাবই জনসাধারণের কতকাংশের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিতে পারে। নানা নূতন চিন্তা ও ভাব দেশের মধ্যে প্রচারিত হইয়া এবং তাহার ফলে দেশের প্রায় সর্ব্বত্র নানা কর্ম্ম-প্রচেষ্টার উদ্ভব হইতেছে বলিয়া আমাদের যতটা উপকার হইয়াছে, তাহার চেয়ে অনেক বেশী উপকার হইয়াছে এই সকল ভাবের আঘাতে দেশের মধ্যে যে উন্মাদনার সঞ্চার হইয়াছে, এবং তাহাতে আমাদের গণজীবন যে অনেকটা দানা বাঁধিয়াছে, সেই দিক দিয়া। আমাদের রাজনীতিক আন্দোলনগুলি দেশকে অন্য কিছু সুফল দান যদি নাও করিয়া থাকে, তাহা হইলেও, একথা অস্বীকার করা যাইবে না যে দেশের বহুসংখ্যক লোকের মনে ইহা রাজনৈতিক চেতনা জাগাইয়াছে। কিন্তু এই রাজনীতিজ্ঞ-চেতনাকে একটু বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, অধিকতর প্রসারিত ও সংহত গণ-জীবনকেই আমরা বর্দ্ধিত রাজনীতিক চেতনার আখ্যা দিতেছি। খুব বেশীর ভাগ লোকেরই, দেশ, দেশের ভবিষ্যৎ, কোন বিশেষ রাষ্ট্রিক আদর্শ, বিশেষ কোন কর্ম্ম বা কর্ম্মপদ্ধতি এবং তাহার ফলাফল সম্বন্ধে বিশেষ কোন স্পষ্ট ধারণা নাই। আদর্শের পরিবর্দ্ধন হইয়াছে, কর্ম্মপদ্ধতি বদলাইয়াছে কিন্তু তাহা আমাদের বিশেষ স্পর্শ করিতে পারে নাই। ইহা বিশেষ কোন চেতনাকে না জাগাইয়া যে আমাদের মধ্যে গণজীবনই গড়িয়া তুলিয়াছে, তাহার প্রধান প্রমাণ ইহার ফলে সমাজের সর্ব্বস্তরের লোকের মনে এক প্রকার উন্নতির আকাঙ্ক্ষা জন্মে নাই। কেহ চাহিয়াছে নিজেদের অসম্মানের অবস্থা দূর করিতে, কেহ চাহিয়াছে আর্থিক

উন্নতি, কেহ চাহিয়াছে রাষ্ট্র-পরিচালনায় বর্দ্ধিত অধিকার, কেহ চাহিয়াছে শিক্ষা, কেহ চাহিয়াছে ঋণমুক্তি, কেহ চাহিয়াছে শ্রমের হ্রাস ও বেতন বৃদ্ধি; এই সংখ্যাতীত দাবী। রাজনীতিক আন্দোলন ব্যতীত এ সকলের পশ্চাতে আরও বহুবিধ কারণের সমবায় রহিয়াছে। কিন্তু ইহাদের সকলেরই প্রধান উপকার হইতেছে যে, ইহারা আমাদের মধ্যে গণজীবনের সাড়া আনিয়াছে। দেশের মধ্যে গণ-জীবন গড়িয়া উঠিয়াছে বলিয়াই, যাহাদের যে দুঃখ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী, সেই দুঃখ দূর করিবার জন্য তাহাদের মধ্যে সঙ্ঘবদ্ধতার চেষ্টা দেখা দিয়াছে।

যে সকল স্বাধীন জাতির মধ্যে গণজীবন বিশেষ সুগঠিত ও সমুন্নত, তাহাদের পক্ষেও, যুদ্ধ প্রভৃতি কোন কাজের জন্য বিশেষ প্রকার ত্যাগ ও সংঘবদ্ধতার প্রয়োজন উপস্থিত হইলে, উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়া গণজীবনকে অধিকতর শক্তিশালী করিয়া লইতে হয়। এই উত্তেজনার সৃষ্টি করিতে না পারিলে দলে দলে লোক কখনই নানা প্রকার দুঃখ এবং মৃত্যু পর্য্যন্ত বরণ করিতে কখনই অগ্রসর হয় না। অবশ্য যাহাদের সুগঠিত গণজীবন আছে, তাহাদের পক্ষে এই কাজ অপেক্ষাকৃত অনেক সহজ।

আমাদের চক্ষের সম্মুখে কংগ্রেসের আন্দোলনের ন্যায় দেশব্যাপী বিরাট আন্দোলন হইয়া গিয়াছে। ইহার গতি লক্ষ্য করিলেও আমরা দেখিতে পাইব যে, এই আন্দোলন দেশকে যাহা দিয়াছে উত্তেজনার মধ্য দিয়াই মাত্র তাহা দিতে পারিয়াছে। সংঘর্ষের মধ্য দিয়া যে উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছিল, কংগ্রেস কর্ম্মীরা হৈ হৈ করিয়া দেশের লোকের মনে যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাঁহাদের আপাত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যহীন ছুটলা দ্বারা আমাদের নিরুপদ্রব পারিবারিক জীবনের প্রান্তে যে আঘাত লাগিয়াছিল, এই আন্দোলনের গঠনমূলক কাজ অপেক্ষা

আমাদের জাতীয় জীবনের উপর তাহার প্রভাব গভীরতর। এই আন্দোলনের ফলে আমাদের সাধারণের মধ্যে যে রাজনীতিক চেতনা জাগিয়াছে তাহা ব্যতীত, দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের মনে প্রবল আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টিও করিয়াছে। চিনি এবং বস্ত্রের ব্যবসায়ে আমরা ইতি-মধ্যেই অনেকটা অগ্রসর হইয়াছি। ছোট খাটো অন্য নানা প্রকার শিল্পেও হাত দিয়া আমরা আংশিক সফলতা লাভ করিতেছি। গত আন্দোলনের উত্তেজনার মধ্য দিয়া আমাদের মধ্যে যে পৌর-চেতনা ও সঙ্ঘবদ্ধ-জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা জাগিয়াছে, তাহার জন্যই ইহা সম্ভব হইয়াছে।

এই আন্দোলনের প্রবর্ত্তকেরা উত্তেজনা সৃষ্টিকে অকাজ মনে করিয়া যদি আদর্শ স্থাপনের চেষ্টায় মনোনিবেশ করিতেন, অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ উদ্যম করিয়া দুই একটি কাপড়ের কল স্থাপন করিতেন, নিজেরা চরকা কাটিতেন, বা চিনি প্রস্তুত করিবার চেষ্টা করিতেন এবং শুধুমাত্র এই সকল কথা শান্ত ভাবে প্রচার করিয়া নিজেদের কর্ত্তব্য সমাপন করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের চেষ্টা সরকারি আদর্শ কৃষিক্ষেত্র অপেক্ষা অধিক ফলপ্রসূ হইত না। আরও বহুদিন ধরিয়া নানা উপায়ে সমাজের সর্ব্বস্তরে আঘাত পৌছাইয়া দিতে পারিলে সর্ব্বপ্রকার নূতন মত ও চিন্তা সকলের নিকট পৌছাইয়া দেওয়া সহজ হইবে এবং কর্ম্মে তাহারা রূপ পরিগ্রহ করিবে।

হিন্দু সমাজ হইতে অস্পৃশ্যতা দূর করিবার চেষ্টা হইতেছে। এই চেষ্টার ফলে এই দুষ্ট প্রথার মূল অনেক শিথিল হইয়াছে। অস্পৃশ্যতার অনিষ্ট-কারিতার কথা, হিন্দু সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের অনেকেই বহুপূর্ব্বে বলিয়াছেন এবং তাঁহাদের মত প্রচারের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন, অনুন্নতদের উন্নতির জন্যও অল্পবিস্তর চেষ্টা হইয়াছে, কিন্তু, কার্য্য তাহাতে অধিক দূর অগ্রসর হয় নাই। এই উপলক্ষে মহাত্মাজীর

জন্য দেশব্যাপী যে উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছিল, প্রকৃতপক্ষে তাহাতেই সুফল পাওয়া গিয়াছে। কেহ কেহ বলিতেছেন যে, (এবং সে অনুযায়ী কিছু কিছু কাজও হইয়াছে) অনুন্নতদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে, তাহাদিগকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও সদাচার শিক্ষা দিতে হইবে, এবং এইরূপে সামাজিক বৈষম্য দূর হইবে। শিক্ষাদান প্রভৃতির প্রয়োজনীয়তা নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু, অস্পৃশ্যতা দূর করিবার সহিত তাহার সম্পর্ক কতটা তাহাই বিশেষভাবে বিবেচ্য। এই কথা বরং বলা যাইতে পারে, অস্পৃশ্যতা দূর হইলে শিক্ষাদান ও অন্যান্য উন্নতির ব্যবস্থা অপেক্ষাকৃত সহজে করা যাইবে। সাফল্য লাভের জন্য আঘাতের পর আঘাতই দিতে হইবে ; অতীতেও মাত্র ইহার মধ্য দিয়াই সুফল পাওয়া গিয়াছে।

প্রাত্যহিক জীবনের সহজ মৃদু গতির মধ্যে যে অভ্যাস ও সংস্কারের গণ্ডী অতিক্রম করা সম্ভব হয় নাই, উত্তেজনার মূহূর্ত্তে সহজেই তাহা ডিঙাইয়া যাওয়া গিয়াছে এবং জাগ্রত গণ-জীবন জাতীয় মঙ্গলের কাছে ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও শ্রেণীগত স্বার্থ বিসর্জ্জন দিতে আমাদের উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। এই আঘাতের ফলে অনুন্নতের মধ্যে যে সমষ্টির চেতনা জাগিয়াছে, অর্থাৎ সমষ্টিগতভাবে নিজেদের দুর্দ্দশার প্রতি লক্ষ্য পড়িয়াছে, তাহাই তাঁহাদিগকে সংঘবদ্ধ করিবে এবং নিজেদের মর্য্যাদা ও অধিকার পূর্ণমাত্রায় আদায় করিয়া লইবার শক্তি দিবে। এই উৎসাহের ফলে তাঁহাদের মধ্যে শিক্ষালাভের অন্যবিধ উন্নতির ইচ্ছা বৃদ্ধি পাইবে এবং অন্যদিকে আবার এই উৎসাহেরই ফলে, বহু আত্মত্যাগী এই শ্রেণীর লোকের সেবা ও মঙ্গল সাধনের জন্য আত্মনিয়োগ করিবেন এবং এই কার্য্যকে ক্রমেই অগ্রসর করিয়া দিবেন।

এইরূপ যে কোন আন্দোলনের দৃষ্টান্তই আমরা গ্রহণ করি না কেন,

সেখানেই দেখিতে পাইব, উত্তেজনা, চাঞ্চল্য ও বিক্ষোভের মধ্য দিয়াই কার্য্য অগ্রসর হইয়াছে। ইহারই আবর্ত্তে পড়িয়া যদিও নানা প্রতিষ্ঠান ও প্রচেষ্টার উৎপত্তি হয়, তবু তাহার স্থান জাতির সম্মুখে পদক্ষেপের পক্ষে নিতান্তই গৌণ। তাহারও আবার প্রধান কার্য্য হইতেছে গতানুগতিক জীবন যাত্রাকে আঘাত দান। কাজেই, যাঁহারা কার্য্যের নগদ ফলাফল পরিমাপ করিয়া, তাহার মূল্য নির্দ্ধারণ করিবেন, এবং আপাত ফলপ্রসূ কার্য্যের নির্দ্দেশ দিবেন, তাঁহারা মূল নীতিতেই ভুল করিবেন। অন্যান্য দেশেরও যে কোন ঐতিহাসিক পরিবর্ত্তনের পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনাগুলি বিশ্লেষণ করিলেও এই একই প্রমাণ পাওয়া যাইবে।

শুধুমাত্র কাজের দৃষ্টান্তের দ্বারা যে লোককে কাজে উদ্বুদ্ধ করা যাইবে না, পক্ষান্তরে, উপযুক্ত মনোভাব সৃষ্টিদ্বারা যে লোককে কাজে প্রবৃত্ত করান যাইতে পারে ও সেই কাজ রক্ষা করিবার মত উৎসাহ ও শক্তি যে তাহারা তাহাতে লাভ করিতে পারে তাহা বুঝাইবার জন্য ছোট একটি দৃষ্টান্তের সাহায্য গ্রহণ করা যাক। আমাদের পল্লীজীবনের পক্ষে ভাল রাস্তার বিশেষ আবশ্যকতা আছে, শুধু যাতায়াতের সুবিধার জন্য, অথবা কিছু আরাম ভোগ করিবার জন্য নহে (যদিও সে কারণ দুর্ব্বল নহে) অন্যস্থানে উৎপন্ন দ্রব্য যাহাতে সহজে সকল পল্লীতে প্রবেশ করিতে পারে, পল্লীতে উৎপন্ন জিনিষ যাহাতে সহজে বাজারে উঠিতে পারে, বিভিন্ন পল্লীর মধ্যে যাহাতে যোগাযোগ কতকটা সহজ হয়, তাহার জন্যও ভাল এবং সুগম্য রাস্তা অপরিহার্য্য। কিন্তু, আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায়, যদি কেহ কোন কোন পল্লীতে দুই চারিটা রাস্তা বাঁধাইয়া দেন এবং ইহার উপযোগিতার কথা প্রচার করিতে থাকেন, তাহা হইলে, তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসৃত হইবার সম্ভাবনা বিশেষ

কম থাকিবে। ইহাতে পল্লীবাসীদের মধ্যে নূতন রাস্তা প্রস্তুত করিবার জন্য উদ্যম দেখা দিবে না, এমন কি প্রস্তুত রাস্তাগুলিও রক্ষা করিবার উদ্যম থাকিবে না। কারণ ইহার জন্য যে দলবদ্ধতার প্রয়োজন, তাহা না গড়িয়া উঠা পর্য্যন্ত ফললাভের আশা অনেকটা মিথ্যা। অপর পক্ষে যিনি রাস্তা বাঁধাইবার চেষ্টাকে লক্ষ্য স্বরূপ ব্যবহার না করিয়া পল্লী-বাসীদের মধ্যে গণজীবন গড়িয়া তুলিবার উপলক্ষ্য হিসাবে ইহাকে ব্যবহার করিবেন, তিনি যদি তাঁহার শেষোক্ত উদ্দেশ্যে সফল হন তবে, তাহার ফলে পল্লীবাসীদের মধ্যে যে শুধু রাস্তা বাঁধাইবার উদ্যম দেখা দিবে তাহা নহে, ইহারা নিজেদের অন্য সকল কষ্ট দূর করিবার জন্যও সচেষ্ট হইবে।

মানুষের যত প্রকার দুঃখ কল্পনা করা যাইতে পারে, তাহার সবগুলিই আমাদের আছে। রাষ্ট্রে আমরা পরমুখাপেক্ষী, সমাজ আমাদের মৃত, অধিকাংশ লোক আমাদের নিরক্ষর; অকাল মৃত্যু, রোগ-প্রবণতা, স্বাস্থ্যহীনতা, প্রভৃতিতে পৃথিবীর জাতিসমূহের মধ্যে আমরা সর্ব্বাগ্রবর্ত্তী; আমাদের অন্ন, বস্ত্র, গৃহ, অর্থ, এমন কি পানীয় জল পর্য্যন্ত নাই; বন্যা, দুর্ভিক্ষ ও রোগের কবলে আমরা অসহায় ভাবে আত্মসমর্পন করি। কিন্তু, এ সকলের জন্য আমাদের চরিত্রের কোন্ বিশেষ দুর্ব্বলতাকে দায়ী করা যাইবে, তাহা ভাবিবার বিষয়।

ভারতীয়দের মধ্যে কোনদিন বীরত্ব, শৌর্য্যবীর্য্য, ত্যাগ বা দেশ-প্রেমের অভাব ঘটে নাই। বিজয়ী দেশগুলির জনশক্তি ভারতের তুলনায় অতি সামান্যই ছিল। তবুও কিন্তু, আমরা পরাধীন হইয়াছি। ইহার প্রধান কারণ, দেশের গণশক্তি নিদ্রিত ছিল; রাজ্য হস্তান্তরিত হইয়াছে, দেশের স্বাধীনতা নষ্ট হইয়াছে কিন্তু, দেশের জনসাধারণ সর্ব্বাবস্থাতেই নির্ব্বিকার রহিয়াছে। অবশ্য এরূপ ঘটনায় দেশের

লোক দুঃখ পায় নাই, অথবা তাহারা দুঃখ এবং নির্য্যাতন ভোগ করে নাই, এরূপ বলিলে হয়ত অন্যায় হইবে। কিন্তু, ইহার বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ ভাবে উঠিয়া দাঁড়াইবার শক্তি ইহাদের ছিল না এবং কোন প্রকার গণজীবন না থাকায়, বহু একের ইচ্ছা মিলিত হইয়া কার্য্যকরী হইবারও সুযোগ ছিল না। ঐতিহাসিক যুগে তদানীন্তন বৈদেশিক রাজশক্তির বিরুদ্ধে, যে সকল অভ্যুত্থান হইয়াছে, তাহাতেও জনসাধারণের যোগ ছিল না, অথবা সে সকল জনসাধারণের ইচ্ছা বা চেষ্টাপ্রসূত ছিল না। এইজন্য এ সকল প্রচেষ্টা বিফল হইয়াছে এবং স্থায়ী হইতে পারে নাই। যে সকল লোক ও লোকসমষ্টির রাজ্য বা প্রভুত্বের লোভ-মিশ্রিত দেশপ্রেম অথবা হৃত বংশ-গৌরব উদ্ধারের চেষ্টা ইহার পশ্চাতে ছিল, তাঁহাদের ভুল, পরাজয়, ক্ষমতালোপ বা তিরোভাবের সহিত এই সকল প্রচেষ্টারও শেষ হইয়াছে।

বর্ত্তমানেও আমরা দেখিতে পাই, পরাধীনতা—আমাদিগকে কি দুঃখ দিতেছে, ইহার অবসান হইলে আমাদের কি লাভ হইবে, কোন্ পন্থায় কি কার্য্য করিতে পারিলে আমাদের স্বাধীনতা ফিরিয়া আসিতে পারে সে সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান না থাকিলেও, পরাধীনতা যে বাঞ্ছনীয় অবস্থা নয়, এ জ্ঞান দেশের অধিকাংশ লোকের আছে। কিন্তু গণ-জীবন না থাকায় এই ইচ্ছা শক্তি সঞ্চয় করিয়া আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া লইতে পারে নাই। বিশেষ কর্ম্মপন্থা যখন নির্দ্দিষ্ট হইল, দেশের একাংশ যখন তাহা লইয়া ভাবের বন্যাস্রোতের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িল, দেশের উপর দিয়া নিষ্পেষণের চক্র চলিল, দেশের অধিকাংশ লোক তখন অপেক্ষাকৃত শান্তচিত্তে দূরে দাঁড়াইয়া এই বিক্ষোভ দর্শন করিল। দেশের জনসাধারণের মধ্যে তেজস্বিতা, মর্য্যাদাবোধ এবং

শৌর্য্যের অভাব যে নাই, ইহারা যে ত্যাগ করিতে, বিঘ্ন-বিপদের সম্মুখীন হইতে, মনুষ্যত্বের পরিচয় দিতে, মর্য্যাদা রক্ষার জন্ত স্বার্থ বিসর্জ্জন দিতে, মৃত্যু বরণ করিতে, স্ত্রীপুত্র, অর্থের মায়া কাটাইতে পারে, তাহার প্রমাণ আমরা ইহাদের বক্তিগত ও পারিবারিক জীবনের প্রাত্যহিক বহু দৃষ্টান্তের মধ্যেই পাইতে পারি। কিন্তু, তাহা হইলেও, স্বাধীনতা আন্দোলনে ইহারা যোগ দিতে পারিল না কেন, তাহা বিশেষ ভাবে ভাবিয়া দেখিবার।

স্বাধীনতা লাভে যে ইহাদের সর্ব্বপ্রকার দুঃখ ঘুচিতে পারে, দেশের প্রতি তাহাদের যে কর্ত্তব্য আছে, স্বাধীনতা লাভ না হইলে যে কোন প্রকার উন্নতি লাভ সম্ভব নহে, যাঁহারা এই কার্য্যে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, কোন সঙ্কীর্ণ স্বার্থসিদ্ধি যে তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিলনা, এসকল কথা ইহারা ভালভাবে বুঝিতে পারেন নাই বলিয়া আন্দোলনকারী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সহিত ইহারা কতকটা বিচ্ছিন্ন-যোগ হইয়া পড়িয়াছে এবং এইজন্যই যে এই আন্দোলনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ইহারা যোগ দিতে পারে নাই, একথা আংশিক সত্যমাত্র। ইহাদের মধ্যে ব্যক্তিগত ভাবে যে সকল সদ্‌গুণের পরিচয় পাওয়া যায়, দেশের উপকার করিবার যে অস্পষ্ট এবং ক্ষীণ ইচ্ছা আছে বহু 'একেরই' সেই ইচ্ছা এবং মিলিত হইবার সুযোগ না থাকায় তাহা কার্য্যকরী হইতে পারে নাই। মিলিত হইবার সুযোগ থাকিলে, সেই সম্মিলনের শক্তিই আবার প্রতি ব্যক্তিকে প্রভাবিত ও প্রবুদ্ধ করিত এবং তাহাই আবার সম্মিলনের শক্তিকে বাড়াইত, এবং এইরূপে কার্য্য ও কারণ উভয়ই উভয়কে শক্তিশালী করিয়া জাতীয় উন্নতির কার্য্যে বিশেষ সহায় হইতে পারিত।

যে সকল কথা বুঝিতে না পারায় ইহারা এই সকল আন্দোলনে

যোগ দিতে পারে নাই বলিয়া মনে করিবার কারণ হইয়াছে, বর্ত্তমানে ইহাদিগকে সে সব কথা কোন প্রকারে বুঝান যাইত না। ইহাদের শিক্ষা নাই বলিয়া বুঝান যাইত না, তাহা নহে। মধ্যবিত্তদের অশিক্ষিত এবং অর্দ্ধশিক্ষিত অনেক লোক এই আন্দোলনের সমর্থন ও সাহায্যকারী ছিলেন, অথচ, ইহাদের সমস্থানীয় সাধারণ শ্রেণীভুক্ত লোকেরা ইহার সমর্থক হইতে পারে নাই। তাহার প্রধান কারণ, এই সকল কথা বুদ্ধি দিয়া কোন প্রকারে নেওয়া অনেকের পক্ষে অসম্ভব না হইলেও, ইহাকে আপনার করিয়া লইবার জন্য যাহা প্রয়োজন তাহা হইতেছে গণজীবনের প্রেরণা। রাজনীতিক স্বাধীনতা লাভ হইলে সকল প্রকার দুঃখ দূর হইবে, এই বিশ্বাস থাকিলে এবং যাঁহারা এই আন্দোলনের প্রবর্ত্তক ছিলেন তাঁহাদের উপর আস্থা থাকিলেও যে ইহারা এই আন্দোলনে যোগদান করিতে পারিত না তাহার প্রমাণ, ইহাদের নিজেদের নিতান্ত প্রত্যক্ষ যে সকল দুঃখ দুর্দ্দশা আছে, তাহার প্রতিবিধানেও ইহারা সচেষ্ট হইতে পারেন না—এই সকল দুঃখ দূর করিবার জন্য যে সকল আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছে, ইহাদের সমর্থন ও সহযোগিতার অভাবে তাহা যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করিতে পারিতেছে না। নানা আঘাতে এবং নানা কারণের সম্মিলনে যাহাদের মধ্যে গণজীবন পূর্ব্ব হইতেই অনেকটা গড়িয়া উঠিয়াছিল, সেই শ্রেণীর লোকই ইহার প্রাণস্বরূপ ছিলেন। অবশ্য এই আন্দোলনই আবার গণজীবন সম্বন্ধে ইহাদিগকে বিশেষ ভাবে সচেতন করিয়া তুলিয়াছে। ইহাদের এই অতি সচেতন গণজীবনই সমগ্র দেশে সমষ্টি জীবন গড়িয়া তুলিবার পক্ষে সহায়তা করিবে। ইহাদেরই বহু সংখ্যক লোক প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে অনুন্নতদের সংঘবদ্ধ করিবার কার্য্যে নিযুক্ত হইবেন। এবং ইহারা কতকটা অনুকূল ক্ষেত্র প্রাপ্ত হইবেন। কেননা, এই আন্দোলন,

সমাজের নিম্নস্তরে ব্যাপ্তিলাভ করিতে না পারিলেও সম্পূর্ণভাবে কেহই ইহার প্রভাবের বাহিরে থাকিতে পারে নাই। কাজেই গণজীবন গড়িয়া তুলিবার ক্ষেত্র অনেকটা অনুকূল হইয়া রহিয়াছে। যাঁহারা এই কার্য্যে অবতীর্ণ হইবেন, সফলতার জন্য তাঁহাদিগকেও হৈ চৈ ও বহু ঘৃণিত হুজুগের আশ্রয় লইতে হইবে।

স্বদেশী জিনিষ ব্যবহার করা যে ভাল, এই সহজ কথাটা বুদ্ধি দিয়া বুঝিতে আমাদের এতদিন লাগে নাই। কিন্তু, বহুসংখ্যক লোকের এই 'বুঝা' একত্রিত হইলে যে শক্তির সৃষ্টি হয়, তাহাই মাত্র আমাদিগকে কোন কাজ করিবার মত, বিশেষ কোন সংকল্প গ্রহণ করিবার মত দৃঢ়তা দিতে পারে। বর্ত্তমান আন্দোলন আমাদিগকে সেই দৃঢ়তা দান করিতে পারিয়াছে বলিয়াই, নানাবিধ শ্রমশিল্পের উদ্ভব এবং দেশে তাহার চাহিদা-সৃষ্টি সম্ভব হইয়াছে।

যদি কেহ আন্দোলনের মধ্য দিয়া দেশ স্বাদেশিকতার দিকে কতটা অগ্রসর হইয়াছে তাহার হিসাব লইবার জন্য, প্রত্যক্ষভাবে এই আন্দোলনের আওতায় কতগুলি এবং কি ধরণের শ্রমশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে, চরকায় কি পরিমান সূতা উৎপন্ন হইতেছে, বিদেশী দ্রব্যের আমদানি কি পরিমানে হ্রাস পাইয়াছে, অথবা আর একটু অগ্রসর হইয়া দেখিতে চান দেশে কত সংখ্যক মিলের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তাহাদের উৎপাদিত জিনিষের মূল্য, গুণ এবং কাটতি বিদেশী জিনিষের তুলনায় কেমন তাহা হইলে একস্থানে তাঁহাদের বিশেষ ভুল হইবে। ইহার মধ্যে ভবিষ্যতের যে সম্ভাব্যতা নিহিত আছে তাহা হইতেই ইহার সফলতার সঠিক পরিমাপ পাওয়া যাইবে।

আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে একদিন আমাদের দেশে লক্ষ লক্ষ চরকা ঘুরিত, হাজার হাজার তাঁতে বহু সংখ্যক তাঁতি দেশের

লোককে বস্ত্র যোগাইত এবং অন্যান্য প্রায় সর্ব্ব প্রকারের প্রয়োজনীয় দ্রব্যই আমাদের দেশে প্রস্তুত হইত। কিন্তু, সে সময়েও জাতি হিসাবে আমাদের অবস্থা উন্নত ছিলনা এবং তাহা দ্বারা আমরা রাজনীতিক স্বাধীনতা অথবা আর্থিক সমৃদ্ধি কোনটাই রক্ষা করিতে পারি নাই। কুটীর শিল্প থাকা সত্ত্বেও কেন আমরা রাজনীতিক স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারি নাই; প্রতিযোগিতার সম্মুখে আমাদের দেশীয় শ্রমশিল্প কেন আত্মরক্ষা করিতে পারিল না; আবার কোন শক্তির বলে এবং কি আশায় আমরা আমাদের শ্রমশিল্পের পুনঃপ্রতিষ্ঠার (যদিও প্রতিযোগিতা তীব্রতর হইয়াছে) আশা করিতেছি; যে প্রতিষ্ঠিত শ্রমশিল্প আমাদের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারে নাই, তাহার পুনরুজ্জীবনের দ্বারা আমাদের স্বাধীনতা লাভে সহায়তা কিরূপে হইবে; এ কথাগুলিও ভাবিয়া দেখা দরকার। আমাদের প্রত্যেকের ঘরে একদিন চরকা এবং অনেকের ঘরে তাঁত ছিল বটে, আমাদের ঘরে ঘরে একদিন গুড়, চিনি তৈয়ারী হইত, তাহা সত্য, আমাদের নানাবিধ হস্তশিল্পের সূক্ষ্মতা এবং বিস্ময়কর নৈপুণ্য একদিন সমগ্র বিশ্বের ধনী ও আভিজাতদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল সত্য, কিন্তু অপরের সংঘবদ্ধ প্রতিযোগিতার হাত হইতে আত্মরক্ষা করিবার মত সংঘশক্তি ভারতবাসীদের ছিল না। এ সকলই চলিত কারিগরদিগের প্রত্যেকের একক শক্তির দ্বারা; আর, আমরা এ সকল জিনিস কিনিতাম, হাতের কাছে ইহার চেয়ে সস্তা এবং ভাল জিনিস পাইতাম না বলিয়া। যখন আমরা সস্তা জিনিস পাইতে লাগিলাম, তখন ব্যক্তিগত সুবিধার জন্য কোন প্রকার দ্বিধা না করিয়া তাহা কিনিতে লাগিলাম। ইহাতে দেশের যে শেষ পর্য্যন্ত সমূহ অনিষ্ট হইবে, একথা হয়ত অনেকেই বুঝিয়াছিলেন। কিন্তু, এই

আশঙ্কাকে বহু লোকের মধ্যে ব্যাপ্ত করিয়া দিবার, এবং সংঘবদ্ধভাবে ইহার প্রতিকারকল্পে কিছু করিবার সম্ভাবনা ছিল না বলিয়া, কেহই ব্যক্তিগত সুবিধা ছাড়েন নাই এবং জাতীয় মঙ্গল সম্বন্ধে অসাড়তার এবং কোন সংঘবদ্ধ কার্য্য করিবার ক্ষমতার অভাবে ক্রমে দেশীয় শিল্পের বিনাশ হইয়াছে। শিল্পীরাও ক্রমে ক্রমে দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহাদের প্রস্তুত মাল আর বাজারে বিকাইতেছে না, সস্তার প্রতিযোগিতায় তাঁহারা দাঁড়াইতে পারিতেছেন না, অথচ তাহার প্রতিকারের উপায় তাঁহাদের হাতে নাই, তখন ক্রমে নিজ নিজ ব্যবসা ছাড়িয়া তাঁহারা কৃষি অবলম্বন করিতে লাগিলেন।

বর্ত্তমানে, বাহিরের প্রতিযোগিতা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে; সকল ক্ষেত্রে যে সকল জাতির সহিত আমাদিগকে প্রতিযোগিতায় নিযুক্ত হইতে হইবে, তাহাদের সংঘবদ্ধ শক্তির বিরুদ্ধে বিচ্ছিন্নভাবে দাঁড়াইবার সাধ্য কাহারও নাই। আজ যদি মায়ামন্ত্রবলে কেহ পূর্ব্বের অবস্থা ফিরাইয়া আনিয়া দিতে পারেন, তাহা হইলেও তাহাকে পূর্ব্বাপেক্ষাও সহজে পরাজয় স্বীকার করিতে হইবে। (অবশ্য 'হৈচৈ' দ্বারা যে লাভটুকু হইয়াছে, সেটুকু বাদ দিয়া ধরিতে হইবে।) আমাদিগকে এই কথাটাই বিশেষ করিয়া ভাবিয়া দেখিতে হইবে যে, যে বৈদেশিক প্রতিযোগিতার প্রথম আক্রমণেই আমাদিগকে হটিয়া আসিতে হইয়াছিল, তাহা যখন দেশের মধ্যে দৃঢ়ভাবে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়াছে তখন তাহার সেই দৃঢ়মূল শক্তির বিরুদ্ধতা করিয়া আমরা কতকটা সাফল্য লাভ করিলাম কিরূপে। রাজনীতিক এবং অন্যান্য আন্দোলনের উন্মাদনা ও চাঞ্চল্য আমাদের দৈনন্দিন জীবনের গতানুগতিক বিচ্ছিন্নতাকে আঘাত করিয়া আমাদিগকে কতকটা একতাবদ্ধ করিয়াছে এবং আমাদের এই আংশিক সংঘবদ্ধ

জীবনের সম্মিলিত ইচ্ছাই, ব্যক্তিগত ও পারিবারিক স্বার্থের ক্ষতি করিয়াও দেশী জিনিস কিনিবার জন্য বহু লোককে মতি দিয়াছে, বহুলোককে পৃথকভাবে অথবা দলবদ্ধভাবে নানা প্রকার শ্রমশিল্পে আত্ম-নিয়োগের উৎসাহ দিয়াছে। ইহাতে জীবিকাসংস্থানের সহিত দেশের উপকার হইবে বলিয়া অর্থহীন দেশপ্রেমিক লোকদিগকে অপেক্ষাকৃত অল্প লাভে অধিক দিন কর্ম্মে লিপ্ত থাকিয়া তাহাকে সফল করিয়া তুলিবার ধৈর্য্য ও নিষ্ঠা এই স্বদেশী আন্দোলনই দান করিয়াছে। নূতন নূতন পথে যদি আমরা দেশকে আরও সমগ্রভাবে নাড়া দিতে পারি, এবং সেই চাঞ্চল্যের সুযোগে কাজ করিয়া আমাদের মধ্যে গণ-জীবনকে স্থায়ী করিয়া তুলিতে পারি, তবে, জাতিকে কোন বিশেষ পথে লইয়া যাইবার জন্য বিশেষ কোন কাজ গড়িয়া তুলিবার জন্য আমাদিগকে ভাবিতে হইবে না।

জাতীয় জীবনের যে দিকেই আমরা দৃষ্টিপাত করিনা কেন, সর্ব্বত্রই উহার সংখ্যাতীত দৃষ্টান্ত পাইব। আমাদের বর্ত্তমান সমাজ ব্যবস্থায় নারীদের যে কেনও স্থান নাই, তাহাদের উপর অনুষ্ঠিত এই অবিচার যে মনুষ্যত্ব ও জাতীয় মঙ্গল কোন দিক দিয়াই সমর্থনযোগ্য নহে, তাহা আমাদের প্রধান ব্যক্তিদের অনেকে অনেক দিন পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলেন। আমাদের বর্ত্তমান জাতীয় জীবনের উপর, আমাদের ভবিষ্যৎ বংশীয়দের শিক্ষা ও চরিত্রের উপর উহার অনিষ্টকর প্রভাবের কথাও অনেকেই বুঝিতে পারিতেছিলেন। প্রথমে যাঁহারা একথা বুঝিয়াছিলেন, তাঁহারা ইহা প্রচার করিতে, আদর্শ দেখাইতে ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু, বর্ত্তমান সময়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত নারীদের মধ্যে স্বাধীনতা অথবা শিক্ষা বিস্তার অতি সামান্যই হইয়াছিল। রাজনীতিক আন্দোলনে বহু নারী যোগদান করায় এইদিক দিয়া সমাজের গায়ে যে আঘাত লাগিয়াছে, এবং এই সকল

আন্দোলনের ফলে আমাদের গণজীবনের যে সম্প্রসারণ ঘটিয়াছে, তাহারই ফলে নারীদের শিক্ষা ও স্বাধীনতা কতকটা অগ্রসর হইতে পারিয়াছে।

আমাদের সকল কাজের সাফল্য নির্ভর করিতেছে, কাজের প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয়ের উপর। আমরা বর্ত্তমানে যাহাকে কাজ বলিয়া মনে করিতেছি। অর্থাৎ একটা না একটা কিছু খাড়া করা, কোন কিছু গড়িয়া তুলা এবং দেশের কাজ মনে করিয়া নিজেরা ব্যক্তিগত জীবনে চরকা কাটা, কার্পাসের চাষ করা, নিজেদের প্রয়োজনোপযোগী দ্রব্যাদি নিজে বা নিজেরা করিয়া লইয়া স্বাবলম্বী হইবার চেষ্টা করা প্রভৃতির দ্বারা বিশেষ কোন ফল পাওয়া যাইবে না। অবশ্য ফল যে কিছুই পাওয়া যাইবে না এমন নহে। এই সকল চেষ্টার মধ্য দিয়া দেশে যে সকল জিনিষ উৎপন্ন হইবে, তাহা হইতে আর্থিক লাভ কিছু হইতে পারে; তাহা অপেক্ষা বড় লাভ হইবে যে গত আন্দোলনে সকলের মধ্য দিয়া আমাদের গণজীবন আজ পর্যন্ত যতটা প্রসারিত হইয়াছে, পূর্ব্বোক্ত কাজসমূহে নিযুক্ত লোকেরা তাহাকে ধরিয়া রাখিবার কার্য্যে কতকটা সহায়তা করিবেন। নিজেদের ব্যক্তিগত বা পারিবারিক কোন স্বার্থ নাই, এমন কাজে লিপ্ত থাকিয়া, এবং নিজেদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক স্বার্থ ব্যতীত শুধু দেশের স্বার্থ আছে এমন অনেক কাজ করিয়া ইহারা জাতীয় জীবনকে সজীব রাখিবার কাজে সহায়তা করিবেন। ইহাদের কাজে অন্য বৃহত্তর লাভটিও হইবে; অর্থাৎ ইহাদের সকল কার্য্যের ফলাফল শুধুমাত্র কার্য্য-ক্ষেত্রের সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকিবে না; ইহা অন্য লোককে উদ্বুদ্ধ করিয়া দেশের কথা, সমাজের কথা ভাবাইবে, নিজেদের পারিবারিক কর্ত্তব্যের বাহিরেও যে কর্ত্তব্য আছে, সে সম্বন্ধে চেতনা দান করিবে—যদিও খুব

বেশীদূর পর্য্যন্ত এই শেষোক্ত ফল ইহাদের কার্য্যের দ্বারা পাওয়া যাইবে না।

কিন্তু, ইহার ফলাফল বিচারের সময় সর্ব্বদাই আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, এই সকল কার্য্যের নগদ লাভের দিক অপেক্ষা পূর্ব্ববর্ণিত পরোক্ষ লাভেরই মূল্য অনেক বেশী। ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, যে সকল কাজ সমাজের মধ্যে ব্যাপকভাবে চাঞ্চল্য ও উন্মাদনার সৃষ্টি করিয়া প্রত্যক্ষ ভাবে এই সকল লাভের কারণ হইবে, সেই সকল কাজকেই বর্ত্তমানে দেশের পক্ষে অধিক ফলপ্রস্‌ বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে।

যাঁহারা বলেন, বাঙালীরা ভাবপ্রবণ জাতি, শুধুই হুজুগ সৃষ্টি করিতে পারে—কাজের কাজ কিছুই করিতে পারে না, তাঁহাদের কথার উত্তরে এই বলিবার আছে যে বাঙালীরা কাজের কাজ যদি নাও করিতে পারিত, তাহাতে ততটা আসিয়া যাইত না, যতটা আসিয়া যাইতেছে এইজন্য যে হুজুগ সৃষ্টি করিলেও যতটা দিন হুজুগ স্থায়ী হইলে গণজীবনকে অনেকখানি প্রসারিত করিয়া দিতে পারে এবং যাহা দিলে নানা কাজের আকারে এই হুজুগ আত্মপ্রকাশ করিতে পারে, হুজুগকে বাঙালীরা ততদিন চরিত্রগত দুর্ব্বলতার জন্য বাঁচাইয়া রাখিতে পারিতেছে না। এই হুজুগকে সমাজের সর্ব্বস্তরে ছড়াইয়া দিতে না পারাও তাহার অন্যতম কারণ।

কাজের যে রূপকে প্রকৃতপক্ষে আমরা কাজ আখ্যা দিয়া থাকি, ব্যাক্তিগত ভাবে তেমন কাজ বহু শতাব্দী ধরিয়া আমরা করিয়া আসিয়াছি। অর্থাৎ সাধারণ বাঙালীরা জীবিকার্জ্জন বা অন্য প্রকার স্বার্থের জন্য কাজ করে না, এমন কথা কেহ বলিতে পারেন না, কিন্তু তাহা আমাদের দুর্দ্দশাকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারে নাই। বাঙালী

কৃষক ও শ্রমিকেরা আরও কাজের জীবন যাপন করে, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিজেদের প্রয়োজনীয় জিনিসের অতি সামান্য অংশের জন্যই তাহারা পরমুখাপেক্ষী থাকে; কিন্তু দুর্দ্দশা তাহাদের আরও বেশী। নিজেদের অধিকাংশ কাজ নিজেরা করিয়া লইয়া খাওয়া এবং সামান্য কটি-বস্ত্র পরিধান করা ব্যতীত, অন্য সকল অভাব অস্বীকার করিয়া এবং বিলাস-ব্যসন ও কৃত্রিম জীবন হইতে নিরাপদ ব্যবধানে থাকিয়াও তাহারা দুঃখের হাত হইতে পরিত্রাণ পায় নাই। কাজেই, শুধুমাত্র এই প্রকার কাজের দ্বারা যে আমাদের দুঃখ দূর হইবে না, তাহা সুনিশ্চিত। অন্যান্য দেশের দিকে যদি আমরা দৃষ্টিপাত করি এবং তাহার সহিত নিজেদের অবস্থার তুলনা করি তাহা হইলে সেখানেও এই কথারই সমর্থন পাইব।

আমাদের মধ্যে প্রচলিত ধারণা এই যে, আমরা যদি প্রত্যেকে নিজ নিজ ভালর জন্য চেষ্টা করি, নিজ নিজ দুঃখ দুর্দ্দশা দূর করিবার কাজে মনোযোগ প্রদান করি তাহা হইলে—আমাদের সকলকে লইয়াই জাতি বলিয়া—একদিন সমগ্র জাতি সকল দিকে উন্নত হইয়া উঠিবে। কিন্তু, কথাটা যে সম্পূর্ণ বিপরীত দিক হইতে দেখিতে হইবে, আমাদের কল্পিত সুপদ্ধতি ও সুকাজের সহিত আমাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ জড়িত থাকে বলিয়া সে কথাটা সহজেই আমাদের দৃষ্টি এড়াইয়া যায়। আমরা চিরদিনই পরস্পরের সহিত সহযোগিতাহীন, স্বার্থের সুরক্ষিত সীমার অন্তর্গত কাজ করিতেই অভ্যস্ত। সহসা যখন এমন কোন কাজ আসিয়া পড়ে যাহা আমাদের এই নিরুপদ্রব চিরাভ্যস্ত জীবনকে অতিক্রম করিয়া যাইতে চায়, অথচ, বুদ্ধি দিয়া যাহাকে ভাল না বলিয়া পারি না, এবং যুক্তিযুক্ত বলিয়া সমর্থন না করিয়া পারি না, তখন সেই কাজ এবং আমাদের চিরাভ্যস্ত জীবনের মধ্যে আমরা একটা সামঞ্জস্য

খুঁজিতে যাই এবং তাহার ফলেই এইরূপ নানা অদ্ভুত অসামঞ্জস্যের সৃষ্টি হয়।

আমাদের সকলকে লইয়া জাতি গঠিত বলিয়াই জাতীয় উন্নতি হইলে যে আমাদের সকলেরই লাভ হইবে, জাতির শক্তি বৃদ্ধি হইলে যে আমরা সকলে তাহার আশ্রয়ে বাঁচিয়া যাইব, এই সহজ কথাটার পরিবর্ত্তে উল্টা দিক হইতে আমরা বলি,—আমাদের সকলকে লইয়া যখন জাতি গঠিত, তখন আমাদের সকলের উন্নতি হইলে জাতির উন্নতি হইবে। কিন্তু, উন্নতি লাভের পথে যে সকল বাধাবিঘ্ন আছে আমাদের সকলের বিচ্ছিন্ন শক্তিতে তাহা অতিক্রম করা যায় না বলিয়া, চেষ্টা সত্ত্বেও ব্যক্তিগত উন্নতিও আমাদের লাভ হয় না। এই সংঘবদ্ধ জীবনের অভাব, একত্রিত হইয়া কাজ করিবার এই অক্ষমতা আমাদের সকল দৈন্য ও ত্রুটির মূলে।

আমরা সেবাপরায়ণ ও আত্মীয়বৎসল জাতি; পাশ্চাত্য দেশবাসীদের এই সকল গুণ নাই, সাধারণতঃ এমন কথা বলিয়া নিজেদের নানা প্রকার হীনাবস্থার মধ্যেও, গুণগত এই আপেক্ষিক উৎকর্ষের জন্য গৌরব অনুভব করিয়া থাকি। রোগীর সেবাকে আমরা ধর্ম্ম বলিয়া জানি, রোগগ্রস্ত আত্মীয় স্বজনের যথোপযুক্ত সেবা করিতে না পারাকে আমরা নিদারুণ অধর্ম্ম বলিয়া মানি এবং ধর্ম্মাধর্ম্ম না থাকিলেও অন্ততঃ লোকনিন্দার ভয়ে এবং প্রাণের টানে এইরূপ কর্ত্তব্যে কখনও অবহেলা করিতে পারি না। অথচ, আমাদের যথাসাধ্য যত্ন সত্ত্বেও আমাদের কয়টি রোগী যথাযথ ঔষধ, পথ্য ও শুশ্রূষা পাইয়া থাকেন, তাহা আমাদের অজ্ঞাত নাই। কিন্তু, যাহারা নিজ নিজ বাড়ীর কথা না ভাবিয়া সকল রোগীর কথা এক সঙ্গে ভাবিল,—এবং সকলের কথা ভাবিল বলিয়া সকলকে সঙ্গে পাইবার সুবিধা হইল—

তাহাদের দেশে চিকিৎসার অভাবে, সেবার অভাবে রোগী রাস্তায় পড়িয়া মরে না। আমাদের সকল স্নেহ ও সামর্থ্য দিয়া ঘিরিয়া রাখিয়াও নিজেদের প্রিয়জনদের সুস্থ রাখিতে পারি না, আর যাহারা নিজের কথা না ভাবিয়া দেশের সকলের স্বাস্থ্যের কথা ভাবিয়াছে, তাহারা দেশকে, যাহার মধ্যে নিজেরাও আছি, সম্পূর্ণভাবে রোগমুক্ত করিয়াছে। আমাদের দাক্ষিণ্য ও স্বজনপ্রীতি আমাদের সম্বলহীন, কর্ম্মহীন আত্মীয়দের বাঁচাইতে পারিতেছে না, কিন্তু যাহারা নিজের আত্মীয়দের কথা নিজে না ভাবিয়া সকলে একসঙ্গে সকলের কথা ভাবিয়াছে, তাহাদের সামান্য সংখ্যক লোকের অপেক্ষাকৃত অনেক সামান্য কষ্টে রাজসরকার বিচলিত হইয়া উঠে।

বর্ত্তমান সভ্যতার যুগে প্রতিযোগিতায় বাঁচিয়া থাকিতে হইলে, আমাদিগকে ব্যক্তিগত কার্য্যের নীতি পরিত্যাগ করিয়া সকল কার্য্যের জন্য সংঘবদ্ধ হইতে হইবে। সভ্যতার প্রথম যুগে যখন সংঘবদ্ধতার পরিধি বিশেষ বিস্তৃত হয় নাই, তখন নিজের প্রয়োজনীয় সকল কাজ মানুষের নিজেরই করিতে হইত। সংঘের পরিধি বিস্তৃত হইবার সহিত মানুষ নিজ নিজ প্রতিভা ও ক্ষমতানুযায়ী, সমাজের কোনও একটি বিশেষ প্রয়োজন মিটাইবার কাজে নিযুক্ত হইতে লাগিল। ইহা হইতেছে শ্রমবিভাগ অর্থাৎ পারস্পরিক সাহায্য, আমাদের সামাজিক জীবন ও সভ্যতা আরও অগ্রসর হইবার সঙ্গে সঙ্গে এক শ্রেণীর এবং এক বৃত্তির লোকদের কাজের জন্য একত্রিত হইবার প্রয়োজন উপস্থিত হইতে লাগিল, ইহাই হইতেছে সমবায়। আমরা কোন অবস্থাতেই আদিম যুগের দিকে ফিরিয়া যাইতে পারি না। গেলেও তাহাতে আমাদের মঙ্গল হইবে না। কিন্তু এই সকল কার্য্যের জন্য প্রয়োজন জাগ্রত গণজীবনের ; ইচ্ছা করিলেই এই সকল প্রতিষ্ঠান দেশের মধ্যে

প্রসঙ্গ কথা

বিজ্ঞাপনের কথা দিয়াই আরম্ভ করিলাম। সাময়িকপত্রের জীবন বিজ্ঞাপন পাওয়ার এবং ব্যবসার জীবন বিজ্ঞাপন দেওয়ার উপরে নির্ভর করে বিজ্ঞাপনদাতা দেশের জনসাধারণের নিকট হইতে অর্থলাভ করেন, সাময়িকপত্র বিজ্ঞাপনদাতার নিকট হইতে অর্থলাভ করেন। সাময়িকপত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়ার উদ্দেশ্য এই যে বহুলোকে সাময়িকপত্র পাঠ করিয়া থাকে, সুতরাং বহুলোকের নিকট বিজ্ঞাপনের বার্ত্তা অল্পসময়ে অল্পখরচে পৌঁছাইয়া দিবার ইহাই উৎকৃষ্ট উপায়। সুতরাং এক্ষেত্রে বিজ্ঞাপনদাতার চেয়ে পত্রপরিচালকের দায়িত্ব অধিক।

* * *

আমরা ইংরেজী সংবাদপত্রসমূহের বিজ্ঞাপন অনেকদিন হইতে লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি। কিন্তু ভদ্ররুচিবিগর্হিত একটি বিজ্ঞাপনও আজ পর্য্যন্ত ইংরেজী কাগজে আমাদের চোখে পড়ে নাই। দৈনিক সাপ্তাহিক মাসিক কোথায়ও না। পক্ষান্তরে আমাদের দেশের সাময়িকপত্রসমূহে অনেক বিজ্ঞাপন এরূপ দেখা যায় যাহা অমার্জ্জিত বিকৃতরুচির পরিচায়ক। এরূপ কেন হয়? কাগজ-পরিচালকগণ সকলদেশেই লাভের আশায় বিজ্ঞাপন লইয়া থাকেন; বিজ্ঞাপনদাতাগণও সর্ব্বত্র লাভের আশায় বিজ্ঞাপন দিয়া থাকেন। কিন্তু আমাদের দেশে বিজ্ঞাপনের ভাষায় এরূপ অসভ্য রুচিবিকার সম্ভব হইল কেমন

করিয়া? ইহাতে প্রমাণ হয়, ইংরেজ-জনসাধারণের সৌন্দর্য্যবোধ এবং রুচি আমাদের সৌন্দর্য্যবোধ ও রুচি অপেক্ষা অধিকতর উৎকর্ষপ্রাপ্ত।

* * *

সর্ব্বত্রই সংবাদপত্রসমূহের একটা মূলনীতি আছে। তাহা জনমত-গঠন এবং জনসেবা। যেসব কাগজ জনসেবার জন্য আত্মনিয়োগ করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ (সাময়িকপত্রের মধ্যে সংবাদপত্রই বিশেষভাবে এই দাবী করে) সেই সব কাগজ যখন বিজ্ঞাপনদাতার স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া জনসেবার মূলে কুঠারাঘাত করিতে বিন্দুমাত্র ইতস্তত করে না, তখন স্বতঃই মনে হয়, এদেশে দেশপ্রেম, জনসেবা প্রভৃতি শব্দ-গুলি জনগণকে প্রতারিত করিবারই এক একটি উপায় মাত্র, ইহার বেশি কিছু নহে। কেন না, ঘরে ঘরে অশ্লীল ভাষার বিজ্ঞাপন প্রচার দ্বারা জনসেবা হয় না; কুরুচিপূর্ণ ভাষার বিজ্ঞাপন ছাপিয়া জনমত গঠন করিবার প্রয়াসও ব্যর্থ হয়।

* * *

সভ্যতা ও অসভ্যতার মধ্যে যদি কিছু পার্থক্য থাকে তবে জনসেবার দায়িত্ব যাঁহারা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের উচিত জনসাধারণের মধ্যে অসভ্যতার প্রচার বন্ধ করা। আমাদের দেশ অর্দ্ধ-শিক্ষিতের দেশ। ছাপার অক্ষরে যাহা দেখে এদেশের লোক তাহাই বিশ্বাস করে। সুতরাং সংবাদপত্র-পরিচালকগণ নিজেরা শিক্ষিত হইয়া শুদ্ধমাত্র অর্থ-লাভের জন্য নীতিধর্ম্মের পরিপন্থী কাজ করিবেন না। এবিষয়ে ইংরেজী কাগজই আমাদের আদর্শ হওয়া উচিত। য়ুরোপ আমেরিকার সংবাদপত্র-পরিচালকগণ রুচি এবং সংস্কৃতির দিক দিয়া এমন একটা স্তরে

পৌঁছিয়াছেন যেখান হইতে নীচে নামা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব নহে। অথচ ব্যবসায়ী হিসাবে তাঁহারা আমাদের অপেক্ষা কম বুদ্ধিমান এমন কথা কেহই বলিতে পারে না। অপরপক্ষে আমাদের দেশের সংবাদপত্র পরিচালকগণ ব্যবসার জন্য বিজ্ঞাপনের পাতায়, মিথ্যা জানিয়াও মিথ্যা জিনিষের এবং অশ্লীল জানিয়াও অশ্লীল ভাব এবং ভাষার বিজ্ঞাপন দিনের পর দিন ছাপিয়া চলিতেছেন। যে পাতায় বিজ্ঞান-কনফারেন্সের বক্তৃতা—সেই পাতাতেই বশীকরণ কবচের বিজ্ঞাপন ছাপা হইতেছে; যে পাতায় ছাত্রছাত্রীর ক্রীড়াকৌতুকের সংবাদ—সেই পাতাতেই ধ্বজভঙ্গ এবং পুরুষত্বহানির বিজ্ঞাপন ছাপা হইতেছে। বিখ্যাত দৈনিকপত্রে "ছাত্রবন্ধু" নাম দিয়া ধ্বজভঙ্গ এবং গনোরিয়ার বিজ্ঞাপন ছাপা হইয়াছে! ইহা শুধু যে অসভ্যতা তাহা নহে, ইহা তাহার চেয়েও বেশি,—ইহা স্বার্থান্ধ শিক্ষিত লোকের জ্ঞানকৃত শঠতা—দেশকে বর্ব্বরতার খোঁটায় আবদ্ধ রাখিবার ইহা একটি চমৎকার লাভজনক ফন্দি।

* * *

ইংরেজ পরিচালিত "ষ্টেটস্‌ম্যান" দেখিতেছি। শতশত বিজ্ঞাপন প্রতিদিন বাহির হইতেছে—কই, সেখানে ত কোনোদিন কোনো অসভ্যভাষার বিজ্ঞাপন বাহির হয় না! কোন হাতুড়ি-আচার্য্য বা স্বপ্নদর্শক এরূপ অব্যর্থ ঔষধের বিজ্ঞাপন দিতে সাহস করে না! ইহার কারণ এই যে ভারতীয় পরিচালিত কাগজে যে আবদার চলে, এবং ভারতীয় সংবাদপত্র-পরিচালক টাকা পাইলেই যাহা অম্লানবদনে ছাপেন ইংরেজ-পরিচালিত কাগজে সেরূপ সুবিধা নাই। "ষ্টেটস্‌ম্যান" ভদ্রস্ত্রীপুরুষের হাতে যাইবার স্পর্দ্ধা রাখে—দেশী কাগজের সে স্পর্দ্ধা

নাই। যে কোনো ভদ্রলোক শুদ্ধমাত্র ঐ বিজ্ঞাপনের জন্য দেশী কাগজ ঘরে লইতে আপত্তি করিবেন। এবিষয়ে দেশের শিক্ষিত প্রকর্ষমনা ব্যক্তিবর্গের মনোভাব স্পষ্টরূপে ব্যক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয় মনে করি।

* * *

আর একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। যে সব বিজ্ঞাপনে এরূপ অশ্লীল ইঙ্গিত বা খোলাখুলি অশ্লীলতা থাকে না, এই সব বিজ্ঞাপনের পার্শ্বে সেই সব বিজ্ঞাপনের মূল্য কমিয়া যায়—অসৎ সংসর্গে তাহাদের অসম্মান ঘটে। যাহারা ব্যাধিমুক্তির "গ্যারান্টি" দিয়া থাকে তাহাদের উগ্রতার পার্শ্বে সংযত ভাষার গ্যারান্টি-আস্ফালনহীন কথাগুলি অত্যন্ত নীরস বলিয়া বোধ হয়;—বোধ হয়, যেন ইঁহারা ভয়ে ভয়ে কথা বলিতেছেন—যেন ইঁহাদের ঔষধের উপর ইঁহাদের নিজেদেরই কোনো আস্থা নাই। অথচ শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই জানেন, যাঁহারা বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা করেন তাঁহারা কোনো ব্যাধিমুক্তি সম্বন্ধেই গ্যারান্টি দিতে পারেন না। এরূপ গ্যারান্টির কোনো মূল্য থাকিলে পৃথিবী হইতে ব্যাধি নির্ম্মূল হইয়া যাইত। কিন্তু তাহা হয় নাই, এবং শীঘ্র হইবে বলিয়াও কোনো সম্ভাবনা নাই। যাহাদের দায়িত্বজ্ঞান কম তাহারাই অসুখ সারাইতে গ্যারান্টি দিবার স্পর্দ্ধা করে। শিক্ষিত চিকিৎসক এরূপ করিতে পারেন না। কাজেই বিজ্ঞানসম্মত ঔষধের বিজ্ঞাপন স্বভাবতই সংযত ভাষায় লেখা হইয়া থাকে বলিয়া গ্যারান্টিওয়ালাদের তুলনায় সাধারণের নিকট তাহা কম কার্য্যকরী হয়।

* * *

সম্প্রতি ঔষধের বিজ্ঞাপনের আরো একটি নূতন রূপ এদেশে দেখা দিয়াছে। বিজ্ঞাপনের রূপ যে কি কুৎসিত হইতে পারে তাহা

দেখিতেছি। বিজ্ঞাপনের পাতায় অথবা পাঠ্য বিষয়ের সঙ্গে বিজ্ঞাপন ছাপিবার রীতি সকল দেশেই প্রচলিত আছে। গল্পে বা প্রবন্ধেও কোনো বিখ্যাত জিনিসের নাম উল্লেখিতমাত্র হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা বিজ্ঞাপন নহে। কিন্তু কোনো কাগজে বিজ্ঞাপন দিবার সময় যদি বিজ্ঞাপনদাতা সর্ত্ত করিয়া বসেন যে আমার বিজ্ঞাপিত জিনিষ বিষয়ক একটি প্রবন্ধকে অন্যান্য প্রবন্ধের সঙ্গে স্থান দিতে হইবে এবং এমন ভাবে দিতে হইবে যাহাতে লোকে টের না পায় যে ইহা বিজ্ঞাপন—তাহা হইলে এরূপ সর্ত্তে রাজি হওয়া অপেক্ষা হীনতর কার্য্য আর কিছু হইতে পারে না। সম্পাদক কোনো জিনিসের গুণাগুণ সম্বন্ধে সম্পাদকীয় স্তম্ভে মন্তব্য প্রকাশ করিতে পারেন—প্রশংসাপত্র দিতে পারেন, সমালোচনা করিতে পারেন, কিন্তু এ সমস্ত মামুলি প্রথাকে অগ্রাহ্য করিয়া বিজ্ঞাপন এখন ছদ্মবেশে স্বতন্ত্র প্রবন্ধ আকারে সাময়িক পত্রিকাসমূহে প্রকাশিত হইতেছে।

* * *

বিজ্ঞাপনকে বিজ্ঞাপন-হিসাবে জানিতে পারিলে বিজ্ঞাপনপাঠক নিজের দায়িত্বে জিনিসের গুণাগুণ পরীক্ষা করিয়া লইতে পারেন। কাগজের সম্পাদক সে ক্ষেত্রে কোনোমতেই দায়ী হন না। কিন্তু টাকার অসাধ্য আর কিছুই রহিল না। সম্প্রতি "সিরোলিন রচি" নামক একটি পেটেণ্ট ঔষধ সম্বন্ধে উপাধিধারী ডাক্তারের লেখা প্রবন্ধ বহু কাগজে প্রকাশিত হইতেছে। একই ডাক্তার একাধিক পত্রিকায় একই প্রবন্ধ ছাপাইতেছেন। ভাষার পরিবর্ত্তনও আবশ্যক বোধ করেন নাই! স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে ইহা বিজ্ঞাপন। কিন্তু যদি বিজ্ঞাপন না হয়, এবং ডাক্তারের নাম যদি কাল্পনিক না হয় তাহা হইলে আরো দুঃখের বিষয়। কেননা লেখার ধরণ দেখিয়া ইহা কখনই মনে হয় না

যে উহা গবেষণামূলক প্রবন্ধ বা যক্ষ্মা নিবারণের জন্য একটা ব্যাপক আয়োজনমূলক কিছু। আধুনিক বিজ্ঞানের মতে, যক্ষ্মার কোন অব্যর্থ ঔষধ নাই। মোট কথা স্বাস্থ্যকর আবহাওয়ায় উপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ এবং আনুষঙ্গিক কতকগুলি নিয়মপালন দ্বারা যক্ষ্মারোগ চিকিৎসিত হইয়া থাকে। কোনো উপাধিধারী ডাক্তার যক্ষ্মা সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিলে সর্ব্বপ্রথম এই স্বাস্থ্যকর আবহাওয়া প্রভৃতির কথাই লিখিবেন। যদি কোনো ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়া থাকে তবে তাহা গভর্ণমেণ্ট পরিচালিত হাসপাতাল সমূহে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় কিনা দেখিতে হইবে। ইহা না দেখা পর্য্যন্ত কোনো ডাক্তার কেমন করিয়া লেখেন, "বহু বৎসরাবধি ব্যবহারের পর ইহা বলা যাইতে পারে যে যক্ষ্মারোগগ্রস্ত স্ত্রীপুরুষ কিংবা শিশুদের পূর্ণ স্বাস্থ্য লাভ করাইতে "সিরোলিন" রচিই একমাত্র সক্ষম"? আর যদি ইহা প্রচ্ছন্ন বিজ্ঞাপন হয় তাহা হইলে এইরূপ গুপ্ত পন্থা অবলম্বন করিবার অর্থ কি?

* * *

কোনো ঔষধ একমাত্র সক্ষম কিনা তাহা প্রমাণ করাও যেমন শক্ত অপ্রমাণ করাও তেমনি শক্ত। কাজেই ডাক্তারবাবুদের এইরূপ উক্তির বৈজ্ঞানিক মূল্য কিছুই নাই। "একমাত্র সক্ষম" দূরের কথা মোটেই সক্ষম কিনা তাহার বিচার বহু বৎসর ধরিয়া করা আবশ্যক। ডাক্তারবাবুগণ না হয় লিখিয়াই দায়িত্ব এড়াইয়াছেন, সম্পাদকগণ ইহা ছাপিয়াছেন কেন? বিজ্ঞাপন ছাপার ইহা যদি সর্ত্ত হয়, তবে অন্যান্য বিজ্ঞাপন দাতাগণ কি দোষ করিয়াছেন?

* * *

সিনেমার টিকিটের দাম কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পাইবে শুনিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। আশা করা যায় এইবার দেশী ফিল্মের কিছু উন্নতি

হইবে। দর্শনী বেশি হইলেই লোকে ভালমন্দের বিচার করিতে শিখিবে এবং তখন যে কোনো ছবি তুলিয়া শুধু ঢাকঢোল বাজাইলেই বিক্রয় হইবে না। এইরূপে যদি ভাল ছবির চাহিদা বাড়ে তাহা হইলে ষ্টুডিও-মালিকগণের হুঁস হইবে। তবে ইহাতে ভাল ছবি শস্তায় দেখিবার যে সুযোগ ছিল তাহা অবশ্যই কিছু নষ্ট হইবে, কিন্তু মোটের উপর ক্ষতির চেয়ে লাভই বেশি হইবে। আমোদের জন্য কিছু বেশি খরচ করিলে ক্ষতি কি? ট্যাক্স ত আর চাল ডালের উপর বসিতেছে না!

* * *

দর্শনী যতই বাড়ুক সিনেমা দেখা কখনই বন্ধ হইবে না। যেমন করিয়াই হউক পয়সা জুটিবেই। আর যদি অতিরিক্ত পয়সা না জোটে তাহা হইলে পাঁচবারের জায়গায় চারি বার দেখিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। যাহারা সপ্তাহে পাঁচবার দেখে তাহারা সপ্তাহে চারিবার দেখিবে, যাহারা মাসে কুড়িবার দেখে তাহারা মাসে ষোলবার দেখিবে ইহাই তফাৎ। তবে ইহাতে একদিকে ক্ষতি হইতে পারে। সপ্তাহে একবার বা মাসে চারিবার কম দেখার জন্য অনেকের মন এবং স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইতে পারে সুতরাং মনের জন্য বিশেষ কিছু না হইলেও স্বাস্থ্যভঙ্গ হইলে কিঞ্চিৎ ঔষধপত্র খাওয়া আবশ্যক। এই ঔষধ খরচটাই একমাত্র ক্ষতি।

* * *

কিন্তু যাঁহাদের ভাল ছবি দেখাইবার শক্তি আছে—তাঁহাদের কিছু মাত্র ভয়ের কারণ নাই। ভাল ছবি দেখিবার জন্য লোকে পাগল। পাগল হইলে খরচ সম্বন্ধে কোনো কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান থাকে না। আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি টিকিটের মূল্য শ্রেণীনির্ব্বিশেষে যদি দ্বিগুণ

বাড়াইয়া দেওয়া যায় তাহা হইলেও দর্শকসংখ্যা কিছুমাত্র কম হইবে না।

*   *   *

তামাকের উপরে শুল্ক বসিলেও সুবিধা। দুর্ব্বল ফুসফুসের দেশে যদি তামাক খাওয়া কিছু কমে তবে আপত্তির কিছুই নাই। কিন্তু আশঙ্কা হয় মূল্য বাড়িলেও তামাক খাওয়া কমিবে না। অনেক ভারতবাসী প্রতিদিন আট আনা হইতে এক টাকার তামাক খাইয়া থাকেন, ইহার উপর খরচ কিছু বাড়িলে উহা বোঝার উপর শাকের আঁটি হইবে। ঐ সঙ্গে বেশি দামের তামাক খাইবার গর্ব্বও বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু গর্ব্বের চেয়েও যদি অসুবিধা বৃদ্ধিই বেশি হয় তাহা হইলে সেরূপ অসুবিধা বৃদ্ধি হওয়াই ভাল। কেননা বর্ত্তমানের অসুবিধা ভবিষ্যৎ বংশধরদিগকে হয়ত কোনো তামাকহীন রাজ্যে উত্তীর্ণ করিয়া দিবে। অতএব তামাকের উপর শুল্কধার্য্য না হইলেও আমরা তামাক খাইব, হইলেও তামাক খাইব, ভবিষ্যতে কি হইবে না হইবে তাহার বিচার করিব না।

মৃন্ময়ী

ধরিয়া খোকার কান
তর্জ্জন করি খোকার জননী বলে—
বজ্জাত ছেলে, খালি ধূলো নিয়ে খেলা
চলত তোমায় এখনি নাইয়ে দেব।

চীৎকার করে খোকা কাঁদে আর কহে—
ধূলো নিয়ে খেলা খেলতে যে ভাল লাগে !
—হায়, খোকা মোর তিন বছরের ছেলে !
ধূলা-মাখা দেহ কোলেতে তুলিয়া লয়ে
জিজ্ঞাসা করি—বল ত খোকন মণি,
ধূলো নিয়ে খেলা কেন এত ভাল লাগে ?
খোকা কাঁদে খালি, কারণ ত জানেনা সে।
অনেক কষ্টে থামাই কান্না তার।
মা এসে তাহার ধোয়ায় হাত পা মাথা
আর বলে—তুমি ছেলের মাথাটি খেলে।
আমি বলি—খোকা, শুনছ ত মা'র কথা ;
কথ্খনো আর খেলো নাকো মাটি নিয়ে।

মিনিট পনের পরে
খোকা কোথা গেল খুঁজিতে খুঁজিতে দেখি—
হায় হতোস্মি ! আবার বাগানে গিয়ে
বসিয়াছে খোকা ধূলির স্তূপের মাঝে।
মুখে মাখিয়াছে বুকে মাখিয়াছে ধূলি
মুঠি মুঠি মাটি মাথায় দিতেছে তুলে !
স্তব্ধ হইয়া ভাবি
মৃন্ময়ি, তব একি এ নিবিড় মায়া ?
এতটুকু শিশু, তারো কচি বুক খানি
ভরিয়া দিয়াছ তোমার গহন প্রেমে ?

চন্দ্রহাস

———

স্ত্রী-কান্ত

অপরাহ্ণ বেলায় আফিংএর নেশাটি যখন জমিয়াও জমিতে চাহে না, এবং ঘন ঘন হাই উঠার সহিত মনে হয় আমার দুই চক্ষু ও এই পরিক্ষীণ জগতের মধ্যে সমুদায় আদান প্রদানের ছিদ্রগুলি যেন ক্রমশঃ বুজিয়া আসিতেছে, যেন কিয়ৎকাল পরে একটি বস্তুবর্ণহীন অখণ্ড অন্ধকারে ঝিম্‌ হইয়া বসিয়া থাকা ব্যতীত কোন কর্ম্মই থাকিবে না,—সেই অবসরটির অন্তরালে, আজ এই বার্দ্ধক্যের উপকূলে দাঁড়াইয়া কত কথাই না মনে পড়িয়া যায়! আজ কি আমার এত শীঘ্রই বুড়া হইবার কথা ছিল? কিন্তু জ্ঞান হইবার পূর্ব্ব হইতেই এই কয়খানি হাড়ের উপর কি নির্দ্দয় অত্যাচারটাই না করিয়াছি! কৈশোর আসিয়াছিল কি আসে নাই তাহা মনে পড়ে না, যৌবন ব্যাটা আসিতে না আসিতেই চোখে ধূলা দিয়া পলাইয়াছে, একদিন সকালে হঠাৎ জাগিয়া দেখি ঘুণধরা বাঁশের মত আগাগোড়া জীর্ণ হইয়া গিয়াছি। তথাপি, সেই বারো হইতে আজ এই বাষট্টি অবধি মেছুনি হইতে ভিস্তিওয়ালা পর্য্যন্ত সকলেই আমাকে দেখিবামাত্র "ছিছিছিছি" করিয়া উঠিয়াছে এবং হোটেল, মুদিখানা অথবা মাংসওয়ালার দোকানে উপস্থিত হইলেই পরিচিত অপরিচিত সব লোক একবাক্যে ধিক্কার দিয়া আসিয়াছে। আজ ত সবই ছাড়িয়াছি, আফিং ব্যতীত কোন সম্বলই নাই, তথাপি এই বাষট্টি বৎসর সেই সব স্মৃতি ও বিস্মৃতির শিকলে টান পড়িয়া সন্ধ্যাবেলার মৌতাতটা জমিয়াও জমিতেছে না, আর মনে হইতেছে বিড়িওয়ালা এবং পানওয়ালীরা

এই "ছিছি"টাকে যত বড় করিয়া দেখিয়াছে,—তা' হয়ত সত্যই তত বড় ছিল না! ভগবান তাঁহার আবগারি ডিপার্টমেণ্ট ও আনুষঙ্গিক প্রতিষ্ঠানগুলির ঠিক মাঝখানটিতে যাহাকে টান দেন, তাহাকে ভাল ছেলে হইয়া একজামিনে পাস করিবার সুবিধাও দেন না, বুদ্ধি হয়ত কিছু দেন কিন্তু সাধারণ লোকেরা তাহাকে দুর্ব্বুদ্ধি বলে এবং তাহাদের প্রবৃত্তি এমন সব স্থানে তাহাদিগকে লইয়া যায়, তাহাদের উপভোগের বিষয়বস্তু নিজেদের জীবনকে এমনই আপৎ-সঙ্কুল করিয়া তুলে যে তাহার বর্ণনা করিতে গেলে ভদ্র ব্যক্তিরা ভয়েই আঁৎকাইয়া উঠিবেন। তারপর সেই লোকটি কেমন করিয়া সবার চক্ষুর অন্তরালে একদিন বেমালুম সরিয়া পড়ে এবং বহু বৎসর শ্রীঘরবাসের পর হঠাৎ একদিন একমুখ দাড়ি লইয়া এবং দাড়ির নিম্নে 'একজিমা' লইয়া দেশে ফিরিয়া আসে,—কেহ তাহার কোন পাত্তাই পায় না।

অতএব থাক এসকল কথা। যাহা বলিতেছিলাম তাহাই বলি। কিন্তু বলিব বলিলেই ত আর বলা হয় না! তাহার জন্য লিখিবার ক্ষমতা থাকা চাই, কল্পনার দৌড় চাই। সে যে শক্ত কাজ! বাবুই-পাখীর বাসাকে আমি ত কখনও শরতের চাঁদ মনে করিতে পারি নাই, মাছিকে মাছিই মনে হইয়াছে—কোকিল মনে হয় নাই, বিছা কামড়াইলে কেউটে সাপ দংশন করিয়াছে—এরূপ কখনও ভাবি নাই, ধেনো খাইতে বসিয়া একথা বলিয়া মনকে ভুলাইতে পারি নাই যে শ্যাম্পেনের পাত্রে চুমুক দিতেছি। অতএব সহজ ভাষায় সত্য কথাই বলিব, তাহাতে যদি কাহারও রুচিবিভ্রাট ঘটে তবে তিনি সুনীতি-সঙ্ঘের সভ্য হইয়া তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিবেন, আমাকে দিক্ করিবেন না।

লিখিতে বসিয়া অনেক সময় আমি আশ্চর্য্য হই এই ভাবিয়া যে

ঘটনাগুলি যখন ঘটিয়াছিল তখন ত তাহারা এমন স্পষ্ট করিয়া ঘটে নাই! ঘন কুয়াশার মধ্যে আবছা দেখার মত অথবা মাতৃগর্ভ হইতে বহির্জগতের কথাবার্ত্তা শুনিবার মত যাহা ঘটিয়াছিল তাহা সঠিক আমার পঞ্চেন্দ্রিয়কে আশ্রয় করিয়া ঘটে নাই. স্রোতের আবর্ত্তে ঘুরিতে ঘুরিতে তীরস্থ দৃশ্যাবলি আমার ঘোলাটে দৃষ্টির সম্মুখে কখন তলাইয়া যাইত, তাহার খবর আমি রাখিতাম না। কিন্তু মনের তলায় গাঢ় কর্দ্দমের নিম্নস্তরে অতীতের যে মৃত ঘটনাগুলি বিস্মৃতি-ভূমির চাপে কয়লা হইয়া গিয়াছে, আফিং জিনিষটার এমনই মাহাত্ম্য যে, সে অভিজ্ঞ নৃতত্ত্ববিদের ন্যায় বহু কষ্টে আজ সেগুলির উদ্ধার করিয়া ফিরিতেছে। তাই প্রভু আফিং আমাকে যাহা বলাইবেন তাহাই বলিব, যাহা করাইবেন তাহাই করিব; এবং ইহার কোনও কৈফিয়ৎ আমি পাঠককে দিব না, দিতে বাধ্যও নহি।

এমনি একটি বেকৈফিয়তী ঘটনা আজ হঠাৎ মনে পড়িয়া যাওয়ায় বড়ই বিস্ময় বোধ করিতেছি। প্রথমেই যদি বলি ইহা একটি প্রেমের ইতিহাস তবে হয়ত পাঠক তখনি হাসিয়া বলিবেন, ওই চেহারায় প্রেম হয় না কি? কিন্তু এই চেহারা লইয়া নানারূপ পূজায় মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়াও যে আমার চিত্তের অনেকখানি উদ্বৃত্ত থাকিয়া গিয়াছে এবং তাহাই অকাতরে পাত্রাপাত্র নির্ব্বিশেষে আমি বিলাইয়া দিয়াছি—শুধু যে নেশার ঝোঁকে তাহা নয়,—সেই কথাই আজ বলিব। তবে বলিতে বলিতে যদি আমার ঝাপসা দৃষ্টিতে বড়কে ছোট এবং ছোটকে বড় ও চ্যাপ্‌টা বস্তুকে লম্বা এবং লম্বা বস্তুকে চ্যাপ্‌টা দেখায়, সেজন্য দায়ী আমি নই, দায়ী তাহারা যাহারা এজগতে গাঁজার চাষ প্রথম সুরু করিয়াছিল।

উপরোক্ত দ্রব্যটি যখন বাল্যকালে প্রথম অভ্যাস করিতেছিলাম

তখন যে কয়জন ছোকরা স্কুল হইতে বিতাড়িত হয় তন্মধ্যে আমার প্রধান সাকরেদ ছিলেন একজন জমিদার পুত্র। তাঁহার বয়স তখন ষোলো। বত্রিশ বৎসরের এক রজকিনীকে লইয়া সেই যে তিনি একদিন রাত্রিকালে কলিকাতায় রওনা হইলেন, আর ফিরিলেন না। আমিও কলিকাতায় গিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইব—এইরূপ কথাবার্ত্তা ছিল, কারণ এ কীর্ত্তি তাঁহার একার প্রচেষ্টায় হয় নাই,—কিন্তু বহুকষ্টে যদিও রজকিনীর সন্ধান মিলিল—বহুদিন পরে, কলিকাতার কোন নামজাদা পল্লীতে বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া, বন্ধুর সন্ধান আর মিলিল না। তাহার মুখে শুনিলাম তিনি পরদিবসই তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া পাশের বাড়ীতে ঢুকিয়াছিলেন এবং তারপর আর সে তাঁহার কোন খবর রাখে নাই। তিনি যেখানেই থাকুন, যদি আজিও বাঁচিয়া থাকেন তবে বন্ধু ও গুরুর মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন ইহা আমার অনেকবার মনে হইয়াছে। আমার অনুমান মিথ্যা নহে তাহা বুঝিলাম সেদিন হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁহার নিমন্ত্রণ পাইয়া। পিতৃত্যক্ত এষ্টেটের মালিক কুমার সাহেবরূপে আখ্যাত হইয়া তখন তিনি দুই হাতে স্ফূর্ত্তি লুটিতেছেন। শিকারের উপলক্ষ্যে বহুদূরে এক শূন্য নদীর তীরে তাঁহার তাঁবু পড়িয়াছে। উষ্ট্রপৃষ্ঠে আমি সেদিন সন্ধ্যায় সেখানে পৌঁছিয়া দেখি একেবারে চাঁদের হাট বসিয়াছে। পনের হইতে পঞ্চান্ন অবধি বয়সের বিভিন্ন জাতীয়া বাইজীদের তাঁবুর ঠিক মাঝখানটিতে তাঁহার তাঁবু পড়িয়াছে। পারিষদবৃন্দ পরিবেষ্টিত হইয়া তিনি তাকিয়ায় ঠেস দিয়া বসিয়া আছেন, চতুর্দ্দিকে রকমারি বোতল, গ্লাস ও অর্দ্ধভুক্ত লুচি-মাংসের পাত্র। পারিষদবর্গের সকলেই কেহ সম্পূর্ণ শয়ান, কেহ বা অর্দ্ধশয়ান। অনেকের চক্ষু মুদ্রিত, যিনি চাহিয়া আছেন তিনি কোন নির্দ্দিষ্ট বস্তু দেখিতেছেন না, শূণ্যমার্গে তাঁহার

চক্ষুদ্বয় ফ্যাল ফ্যাল করিতেছে। মধ্যস্থলে বহুমূল্য ফরাসের উপর একটি প্রৌঢ়া বাইজী তখন নৃত্যরতা। তাহারও কণ্ঠস্বর অস্পষ্ট এবং নৃত্যোদ্যমে ডাইনে অথবা বাঁয়ে কখন কাত হইয়া পড়িবে—বলা কঠিন। হারমোনিয়ামওয়ালা বহুক্ষণ বেলো বন্ধ করিয়া দুই হাতই রীডের উপর যদৃচ্ছাক্রমে চালাইতেছে, বোধ হয় এতক্ষণে মনে প্রাণে বুঝিয়াছে "Heard melodies are sweet; those unheard are sweeter ;" তবলচি ডুগিতবলা উল্টাইয়া ধরিয়া উভয় যন্ত্রের পশ্চাদ্দেশ বাদ্য করিতেছে। প্রবেশমাত্র আমার চোখের দৃষ্টিতে ঘোর লাগিয়া গেল। বাইজী সাহেবা জড়িতচরণে আমার দিকে অগ্রসর হইয়া বিকৃত কণ্ঠে গাহিল—

"মাশুক বেবফায়ো আব্‌কে জবানেওয়ালে—এ—এ—এ"

এবং নৃত্যের উদ্দেশ্যে ঘাঘ্‌রার প্রান্তদেশ উত্তোলন করিতে গিয়া আমার সম্মুখে শুইয়া পড়িল ও দুই হাত বাড়াইয়া আমার পদদ্বয় ধারণ করিয়া—"মাশুক বেদরদে"—পর্য্যন্ত বলিয়া ভুক্ত দ্রব্যগুলি আমার পায়ের উপর উজাড় করিয়া ঢালিয়া দিল। তাহাকে অতিক্রম করিয়া আমি কুমার সাহেবের সন্নিধানে গেলাম ও তাঁহাকে ঝাঁকানি দিয়া চাঙ্গা করিবার চেষ্টা করিলাম। তিনি বিহ্বল নেত্রে আমার পানে তাকাইয়া বলিলেন—

"বাওবা খাসা মাল, আমার বাঙা ঘরে চাঁদের আলো।" আমি অগত্যা তাঁহাকে ছাড়িয়া বোতলগুলির অবশিষ্ট এবং পাত্রগুলির ভুক্তাবশেষের প্রতি মনোনিবেশ করিলাম। তারপর সে রাত্রে কি হইয়াছিল তাহার খবর অন্তর্যামী বলিতে পারেন, আমরা ত তাঁহার খেলার পুতুল মাত্র, আমাদের জ্ঞান আর কতটুকু ?

পরদিন প্রভাতে কুমার সাহেবের তাঁবুর সহিত আমরাও পরিষ্কৃত হইলাম। আমার জন্য একটি স্বতন্ত্র স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল, সেখানে গিয়া গত রাত্রির কাপড়চোপড় পরিত্যাগ করিয়া ভৃত্যদ্বারা সর্ব্বাঙ্গে তেল মালিশ করাইতেছি এমন সময় একজন অত্যন্ত খর্ব্বাকৃতি লোক দ্বারপ্রান্তে আসিয়া সেলাম জানাইল। লোকটির নাসা-পর্ব্বতটি যেন কে ডিনামাইট দিয়া উড়াইয়া দিয়াছে, চোখ দুইটির মাঝখানে এতটা ফাঁক যে প্রথম দর্শনেই মনে হয়—যেন চক্ষুনাসিকাহীন একটি মুখমণ্ডল গুড়ের কলসীর উপর বসিয়া অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। রাত্রি হইলে ভয় পাইবার কথা ছিল,—হুঁকাটা মুখ হইতে নামাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"কি চাও ?"

আগন্তুকের মুখগহ্বর হইতে একটি জমাট আওয়াজ বাহির হইয়া আসিল "এজ্ঞে, আমার নাম বদন।"

নামের সার্থকতা আছে বটে—কহিলাম, "তা'ত দেখতেই পাচ্ছি, কিন্তু কি মনে করে আসা হয়েছে ?"

"বাইজী সাহেবা সেলাম জানিয়েছেন।"

ঠিক এইটি আশাও করিতেছিলাম, আশঙ্কাও করিতেছিলাম। প্রকাশ্যে বলিলাম বটে—"যাচ্ছি, যাও",—বুকের ভিতরটা যেন কাঁপিয়া উঠিল, দক্ষিণের বাতাসে কচি পাতা যেমন করিয়া কাঁপে সেরূপ নহে—বুড়া পাতা ঝরিয়া পড়িবার পূর্ব্বে শীতের বাতাসে যেমন কাঁপিয়া উঠে,—এ ঠিক সেই প্রকার। তথাপি সেই কাঁপনের মধ্যেই কত আশা, কত ভয়, কত কুণ্ঠা ও কত লজ্জা! তাহার যে শিরা উপশিরা

পাকিয়া হলুদবর্ণ হইয়াছে, তাহারই অন্তরে অন্তরে নিত্যকাল ব্যাপিয়া সবুজ আকাঙ্ক্ষার জয়োল্লাস ধ্বনিত হইতেছে, তাহা আমি ত এই বয়সে বেশ বুঝিতে পারিয়াছি। অতএব কেন আর বিড়ম্বনা, বাইজীর আমন্ত্রণ রক্ষা করাই শ্রেয়। ভৃত্যকে তেলের বাটি লইয়া অনুসরণ করিতে আদেশ দিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম।

তাঁবুর দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া দেখি বাইজী বিছানায় বসিয়া গড়গড়ার নলে সুখটানটি দিয়া কল্যকার সেই তবলচির হাতে নলটি ছাড়িয়া দিল। আমাকে দেখিয়া জিভ কাটিয়া মাথার উপর কাপড়টা টানিয়া দিয়া পরিষ্কার বাংলায় কহিল, "ওমা ছিছি, তোমার সামনেই যে তামাকটা টেনে ফেললাম, হতভাগা বোদেটাও হয়েছে এমনি যে,— দৌড়ে এসে খবরটা দিলেই হত।"

বাস্তবিক, বাইজীর মুখ নাক হইতে সুখটানের ধোঁয়াটা তখনও রহিয়া রহিয়া বাহির হইতেছিল। কিন্তু আমি বড় দ্বিধায় পড়িয়া গেলাম। কাল রাত্রে বোধ হইয়াছিল বাইজী খাঁটি লক্ষ্ণৌএর লোক, তাহা নহে, বাইজী বাঙালী, এবং কথার টানে বোধ হইল আমাদেরই অঞ্চলের লোক। বয়স চল্লিশ অথবা পঁয়তাল্লিশ—বলা কঠিন। রংটি কালোও বলা চলে না, অথচ ফর্সাও নহে, শ্যামবর্ণই বা তাহাকে বলি কি করিয়া? চোখ দুটি ছোট কি বড় সে প্রশ্ন মনে জাগে না। কেবল সমুখের সিঁথিটা প্রশস্ত হইয়া টাকের আকার ধারণ করিয়াছে। নাকটি বাঁশীর মত অথবা খাঁড়ার মত তাহা ভাবিয়া লাভ নাই। বাইজীর উপরের ওষ্ঠটি দ্বিধা-বিভক্ত হইয়া নাসিকার তলদেশে সংযুক্ত হইয়াছে এবং উপরের পাটীর নাতিক্ষুদ্র দন্তচতুষ্টয় সর্ব্বদাই বিকশিত হইয়া আছে। ত্রিভুজাকার মুখখানি যেন হাসি হাসি করিতেছে। জন্মাবধি বাইজীর মুখভঙ্গি এবম্প্রকার অথবা কোন সময় অস্ত্রোপচার হেতু এরূপ

হইয়া গিয়াছে—এ প্রশ্নও নিরর্থক। কিন্তু এই বয়সেও বাইজীর শরীরের বাঁধুনি অক্ষুন্ন আছে, পঁয়তাল্লিশ ত মনেই হয় না, পঁয়ত্রিশ, এমন কি পঁচিশ এবং সময় বিশেষে পনের বলিয়াও ভ্রম হইতে পারে। মনের সঙ্গে তর্ক করিয়া কিন্তু তাহাকে বুঝাইতে পারিলাম না যে সত্যই ইহাকে আর কখনও দেখি নাই। কিন্তু কবে এবং কোথায় দেখিয়াছি, কে ঠিক এমনি করিয়া বার বার তাহার জিহ্বার প্রান্তদেশ উন্মুক্ত দাঁতগুলির উপর বুলাইয়া লইত এবং কেবলই দাঁত দিয়া অধর দংশন করিত,—তাহা মনে পড়িয়াও পড়িল না। সবিনয়ে কহিলাম, "আমার বহুভাগ্য যে বাইজী সাহেবা সকাল বেলাতেই স্মরণ করেছেন।"

সে ক্ষণকাল উন্মুক্ত দন্তপংক্তিদ্বারা অধর চাপিয়া মিহি গলায় কহিল—"আর সকলে আমায় বাইজী বলে বলুক, তুমি কেমন করে বল ক্যাব্‌লা-দা ?"

চমকিয়া উঠিলাম। বাল্যকালের বিস্মৃত নাম এই সুদীর্ঘকাল পরে অপরিচিতা নারীর মুখে শুনিলে কে না চমকিত হয় ? আমার এই নামটি পাঠশালার পণ্ডিত মশাইএর দেওয়া, তিনি স্ত্রী-কান্ত না বলিয়া ক্যাব্‌লা-কান্ত বলিয়া ডাকিতেন। ছেলেবেলায় নাকি আমার নাক দিয়া সদা সর্ব্বদা সিক্‌নির ধারা ঝরিত ও দাঁড়াইলে অথবা চলিতে গেলে আমার পিঠে, কোমরে ও হাঁটুতে তিনটি বাঁক দেখা দিত, জোরে দৌড়িতে গেলে লোকে বলিত যেন লাটিমের মাথা টলিয়া পড়িবার পূর্ব্বে পাক খাইতেছে। পণ্ডিত মশাই আমাকে তাঁহার গরু ও ছাগলের হেপাজতে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, আমিও মনকষার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া বাঁচিয়া গিয়াছিলাম ও গোয়াল পরিষ্কার করিবার ছুতায় প্রায়ই পণ্ডিত মশায়ের হুঁকাটি তথায় লইয়া গিয়া স্বচ্ছন্দে টানিয়া বাঁচিতাম। যেদিন পণ্ডিত মশাইএর তামাক কম পড়িত, আমাকে গলাধাক্কা দিয়া

দূর করিয়া দিতেন। বলিতেন, "ক্যাব্‌লা ব্যাটার জ্বালায় এবার তামাক খাওয়া ছাড়তে হ'ল দেখছি।"

বিস্মৃত অতীত মনের মধ্যে হুটপাট করিয়া উঠিল, অথচ দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিল না। বাইজী কহিল, "ওকি, দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বোসো। তুমিও যে তামাক খাও তা জানি, কিন্তু দেব কিসে? জেনে শুনে ত আর আমার মুখের নলটা তোমায় ধরিয়ে দিতে পারি না। আচ্ছা বর্ম্মা-চুরুট আনিয়ে দিচ্ছি—"

"থাক্ থাক্, বর্ম্মা চুরুট আমার কাছেই আছে।"

"আছে? বেশ, তা হ'লে ধরিয়ে একবার কাছে এসে বোসো—ঢের কথা আছে। বাবা ভালো আছেন?"

"না, তিনি মারা গেছেন।"

"এঁ্যা মারা গেছেন, মা?"

"তিনি আগেই গেছেন।"

"ও: তাইতেই—" বলিয়া বাইজী ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। এই প্রৌঢ়া রমণীর অন্তরে হঠাৎ আমার প্রতি এতখানি বাৎসল্যরস কেন জাগিয়া উঠিল তাহাই ভাবিয়া আকুল হইলাম।

"এখন তা হ'লে এই রকম বেহারী জমিদারের মোসাহেবি ক'রেই কাটাচ্চ বল!"

শুনিয়া তৎক্ষণাৎ পিত্ত অবধি জ্বলিয়া গেল। রুক্ষকণ্ঠে বলিলাম, "আচ্ছা কে তুমি? কাল রাত্রে ত প্রথম দেখলাম তোমায়, তখন তোমার যে অবস্থা তাতে চেনাশুনা হওয়া দূরে থাক, কাছে দাঁড়ানও নিরাপদ ছিল না, তবে সে কথা তোমার মনে পড়বে না। যাক, কিন্তু আমার সম্বন্ধে এ সব জেনে তোমার লাভ কি?"

"সংসারে লাভ-ক্ষতিটাই কি সব ক্যাব্‌লা-দা? স্নেহ, মায়া, মমতা

—এ সব কি কিছুই নয়, ভালবাসার কথাটা না হয় নাই বললাম। তাই বটে, তা না হ'লে ছেলেবেলায় যাকে দেখলেই পেটের উপর ধাঁ ক'রে তিন লাথি মেরে দিতে, সে যদি কোন কারণে কাল রাত্রে তোমার পায়ের উপর একটু অত্যাচার ক'রে থাকে, সে নিয়ে এমন খোঁটা দিতে না।"

বিস্মৃতির আগল ধড়াস্ করিয়া খুলিয়া গেল। তখন আমার বয়স বারো কি তেরো। আমাদের পাড়ার পুরলক্ষ্মী ও কুললক্ষ্মীর বিধবা মাতা যখন একটি ছুতার-মিস্ত্রীর সহিত একদিন রাত্রে কোথায় চলিয়া গেলেন—দুইটি মেয়েরই ভরণপোষণের ভার পড়িল তাহাদের এক জ্ঞাতি খুড়ার উপর। পুরলক্ষ্মীর পৃষ্ঠে ছিল একটি কুঁজ এবং কুললক্ষ্মীর মুখখানি ছিল একটি খরগোসের মত। তাহারা উভয়েই পাঠশালার ছাত্রী ছিল। পুরলক্ষ্মীর কুঁজটা কতক সহ্য হইত, কিন্তু কুললক্ষ্মীর উদ্গত ওষ্ঠদ্বয় দেখিলেই ক্রোধে আমি জ্ঞানশূন্য হইতাম। তাহার উপর ইহার পেটটি আসন্নপ্রসবা স্ত্রীলোকের মত ফুলিয়া থাকিত, হাত-পা ঠিক ঝাঁটার কাঠির মত, মাথায় চুল ছিল না বলিলেই হয়,—যাহা ছিল তাহাও অজস্র উকুনে ভরা। সে বছরটা দারুণ পাঁচড়ায় আমার সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া গিয়াছিল, কুললক্ষ্মী প্রত্যহ নিমপাতার জল দিয়া আমার ঘা ধুইয়া দিত এবং পুরস্কারস্বরূপ অবশেষে তাহার স্ফীত উদরের উপর ঝাড়িয়া লাথি মারিতাম। সে কাঁদিয়া আকুল হইত, তথাপি কোনদিন বলিত না—"ক্যাব্‌লা-দা আর লাথি মেরো না।"

সেই সাত বছরের মেয়ে যে নীরবে এত অত্যাচার কেন সহ্য করিত তাহা তখন বুঝিতে পারি নাই। কোনদিন হয়ত বলিতাম, দেখ কুলি, আজ যেখান থেকে পারিস আমার জন্য

বিশটা ল্যাঠামাছ ধরে আনবি, তাড়ির চাট করতে হবে। আর যদি না পারিস ত রাত্রি পর্য্যন্ত এই শীতে একগলা জলে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।” বেচারা হয়ত উনিশটি যোগাড় করিয়াছে, তথাপি রাত্রি দশটার এক মিনিট আগে জল হইতে উঠিতে দিতাম না, বেত লইয়া পাড়ের উপর দাঁড়াইয়া থাকিতাম। ক্রমশঃ আমার অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়া উঠিল,—কোনদিন একঠ্যাং তুলিয়া সারাদিন দাঁড় করাইয়া দিতাম, কোনদিন কুকুরের মত তাহাকে দুই হাতে দুই পায়ে হাঁটিয়া বাড়ী ফিরিতে হইত। শেষে একদিন বলিয়া বসিলাম শুধু কুকুরের মত হাঁটলেই হবে না, তোকে যখনই ব'লব, কুকুর ডাকতে হবে। সে তাহাই করিত। আমি তাহাকে ডাকিবামাত্র সে বলিত “কেঁউ” আর পাঠশালার ছেলেরা হাসিয়া খুন হইত। শেষে এমন হইল যে অন্যলোকের আহ্বানেও ইহাই তাহার সাড়া দিবার পদ্ধতি দাঁড়াইয়া গেল। তাহার জ্ঞাতিখুড়া একদিন নেশার মাথায় ইহাতে অত্যন্ত অপমানবোধ করিয়া তাঁহার খড়মের একটি ঘা মারিলেন ইহার মুখে, ফলতঃ কুললক্ষ্মীর উপরের ঠোঁটটি দুই ফাঁক হইয়া গেল। কিন্তু তাহাতেও খুড়া মহাশয়ের ক্রোধ প্রশমিত না হওয়ায় তিনি পাড়ার ভেলি কুকুরকে ধরিয়া আনিয়া সেই রাত্রেই তাহার সহিত পুরলক্ষ্মীও কুললক্ষ্মীর উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া দিলেন। পৌরহিত্য করিলেন তিনি স্বয়ং এবং বিবাহবাসরে নিমন্ত্রিত হইল গ্রামের যতগুলি চতুষ্পদ প্রাণী। এখনও আমার মনে পড়ে, সেরাত্রে কুকুরের চীৎকারে পাড়ায় টেকা দায় হইয়াছিল। বিবাহান্তে ভূরিভোজনের ফলেই হউক অথবা অভাগীদের কপালে স্বামীসুখ নাই বলিয়াই হউক, ভেলি ইহার দুইতিন দিন পরেই পরলোক গমন

করিল এবং উভয় ভগিনীর হাতের নোয়া ও সিঁথির সিঁদুর ঘুচিল। নিদারুণ শোক সহিতে না পারিয়া পুরলক্ষ্মী ইহারই কয়েকদিন পরে স্বামীর অনুগমন করিল। আরও কিছুদিন পরে শুনিলাম কুললক্ষ্মী অন্তঃস্বত্ত্বা। যথাসময়ে সে এক শিশু সন্তান প্রসব করিল বটে, কিন্তু তাহার আকৃতি আদৌ মানুষের মত নহে, আমাদের গ্রামে সারমেয় অবতার জন্মগ্রহণ করিয়াছেন—এইরূপ একটি জনরব চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র হইয়া যাওয়ায় গ্রামান্তর সমূহ হইতে লোকজন তীর্থযাত্রীর মত তাহাকে দেখিতে আসিল। অতিরিক্ত ভিড়ের চাপে সর্দ্দিগর্ম্মী হইয়া অকালে শিশুটি ইহলীলা সাঙ্গ করিল। সেদিনকার দৃশ্য আমি আজিও ভুলি নাই। চতুর্দ্দিকে খোল করতাল লইয়া বহুলোক সঙ্কীর্ত্তন করিতেছে, মধ্যস্থলে চন্দনমাল্যভূষিত সারমেয়-অবতারের মৃতদেহ কোলে লইয়া ম্যাডোনার মূর্ত্তির মত বসিয়া আছে কুললক্ষ্মী; তাহার দুই গণ্ড বহিয়া অবিরল ধারায় অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছে। কিন্তু যাক সে কথা, যাহা বলিতেছিলাম তাহাই বলি। পুত্রশোকবিধুরা মাতা কুললক্ষ্মী ইহারই কিয়দ্দিবস পরে আমাদের পাড়ার জগা নাপতের সহিত মনের দুঃখে দেশান্তরে চলিয়া গেল—আর তাহার কোন নির্দ্দেশ পাওয়া গেল না। কয়েক বৎসর পরে একদিন জগা ফিরিয়া আসিয়া গ্রামে রাষ্ট্র করিয়া দিল যে কুললক্ষ্মী কাশীর গঙ্গায় ডুবিয়া মরিয়াছে, সে স্পষ্ট দেখিয়াছে কুকুরের ন্যায় একটি জানোয়ার হঠাৎ ভাসিয়া উঠিয়া তাহাকে জলের মধ্যে টানিয়া লইয়া গিয়াছে।

আজ যাহার সম্মুখে এইক্ষণে বসিয়া বর্ম্মা চুরুটে টান দিতেছি—এ সেই কুললক্ষ্মী,—বর্ত্তমানে "কচুরি বাই" নামে অভিহিতা। তাহা না হয় হইল। সারমেয়-বিলাসিনী কুললক্ষ্মী মরিয়া না হয় কচুরি বাই হইয়াছে, কিন্তু বাল্যে যে ক্যাবলা-দার নেশার খোরাক যোগাইতে

না পারিয়া তাহার লাঞ্ছনার সীমা থাকিত না, যাহার পদাঘাতে প্রত্যহ তাহার পেট ফাটিবার উপক্রম হইত, সে যে সঙ্গোপনে তাহার সেই ক্যাব্‌লা-দাকেই এমন নিরতিশয় আত্ম-সমর্পণ করিয়াছিল এবং তাহার এই সুদীর্ঘ জীবনের অবকাশে, কত দেশ কাল ও পাত্রের সংঘর্ষের মাঝখানে, কত সহস্র রজনীর প্রেমোৎসবের কোলাহলে এবং কত কত ধনীর পুত্রকে ফকিরে পরিণত করিবার আয়োজনের অন্তরালে,—সে যে তাহার বাল্যপ্রেমের শিশুলতাটিকে মারিয়া ফেলে নাই, পক্ষান্তরে তাহাকে আপন বক্ষমধু দিয়া সুপুষ্ট করিয়া তুলিয়াছে, এবং আজ যখন এই পঁয়ত্রিশ বৎসর পরে আমার সম্মুখে তাহার মনের কপাট অতর্কিতে খুলিয়া গেল—আমি অবাক্ হইয়া চাহিয়া দেখি যে সেই শিশু-লতাটি এতদিনে সকাণ্ড বৃক্ষে পরিণত হইয়াছে—তখন বিস্ময়ে হতবাক হইয়া চুরুটের ধূমোদ্গীরণ করা ব্যতীত আর উপায় আছে কি? তাই বলি হে রাধানাথ, আরও না জানি কত আশ্চর্য্য ঘটনা তুমি আমাকে দেখাইতে চাও!

লোকে বলে, ওঃ অমুক জায়গায় কি ব্যাপার চলিতেছে তাহা আর জানিতে বাকী নাই, অমুক লোক কিরূপ চরিত্রের তাহাও কি বুঝাইতে হইবে? একথার মানে কি তাহা সবিশেষ জানা আছে। কিন্তু আমি, নিজের জীবন আলোচনা করিয়া, এই সব শুনিয়া তাহাদের লজ্জায় আপনার মাথাটা তুলিতে পারি না, ধূলায় লুটাইয়া পড়ি ও চক্ষু বুজিয়া আপনার মনে মনে বলি, হারে আমার পোড়া কপাল। তুমি মনে কর এই যাহা চোখের সম্মুখে ঘটিতেছে, তাহা ব্যতীত আর কিছুই ঘটে নাই! একবার একটু নির্জ্জলা মাল টানিয়া লও দেখি, কেমন দেখিতে পাও কি না—তাহা ছাড়া আরও কত ব্যাপার ছায়াবাজীর মত খেলিয়া যাইতেছে! দুইএ দুইএ চার, কোদালটা

কোদাল, নাকটা কান নহে নাকই, এই ত তোমাদের জ্ঞান? কিন্তু আমি কতবার মনে মনে ভাবিয়াছি হয়ত ইহাই অভ্রান্ত নহে, ইহারও ব্যতিক্রম হইতে পারে। সে কথা প্রকাশ করিয়া বলি নাই, কারণ তদ্দণ্ডেই তোমরা বলিয়া বসিবে "ব্যাটা গুলিখোর!" এইত? কিন্তু এটাও কি মনে পড়ে না যে পৃথিবীর সব লোকই যদি এক সঙ্গে নেশা করে তবে তাহারা ব্যতিক্রমটাই নিয়মস্বরূপ দেখিতে থাকিবে? তাহা যদি হয় তবে কোনটা সত্য আর কোনটা মিথ্যা—এ লইয়া তোমরা বড়াই কর কি বলিয়া? ছি ছি, একথা মনে রাখিয়ো যে মানুষের মধ্যে যিনি আত্মা আছেন—তিনি আত্মরস অশেষ প্রকারে পান করিতে চান, তোমরা যেটাকে নেশায় বেঘোর অবস্থা বল, তাহা সেই রসেরই প্রকারভেদ মাত্র। যাক, যাহা বলিতেছিলাম তাহাই বলি, তোমাদের সহিত তর্ক করিব না, কারণ আমি বিশেষরূপে টের পাইয়াছি যে মানুষ শেষ পর্য্যন্ত কিছুতেই তাহার সমস্ত পরিচয় পায় না। আজ যে ব্যক্তি সংসার ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের ধ্যানে মগ্ন হইয়াছে, সেই ব্যাটাই যে কাল লোকের গলায় ছুরি বসাইবে না, ইহা কেহ হলফ করিয়া বলিতে পারে না। কিন্তু যাক সে কথা। হাঁ, যাহা বলিতেছিলাম, কচুরি বাই। চোখ মেলিয়া দেখি আমার হাতের চুরুট হাতেই নিভিয়া গিয়াছে—কচুরি বাই কখন উঠিয়া গিয়াছে তাহা লক্ষ্য করি নাই। দারোয়ান বলিল, "বাবু সাব্ বাইজী সাহেবা রোতী থি।" তাহাকে শান্ত হইবার অবকাশ দিয়া নিঃশব্দে প্রস্থান করিলাম।

৩

সন্ধ্যার সময় তাজা হইয়া কুমার সাহেবের তাঁবুতে প্রবেশ করিয়া দেখি গল্পের মধ্যে সেরা গল্প—ভূতের গল্প জমিয়া উঠিয়াছে। প্রথমটা

খেয়াল করি নাই, কিন্তু বৃদ্ধ খোট্টা ভদ্রলোকটি শেষকালটা এমন জমাইয়া দিলেন যে তৎকালের জন্য আমার উভয় হস্ত দাড়ির অন্তর্নিহিত দাদের কাতর আহ্বান বিস্মৃত হইল। এই গ্রামেরই উপকণ্ঠে প্রায় দশ হাজার বৎসরের মহাশ্মশান বিরাজিত, এখানকার প্রথানুযায়ী পানাসক্ত ব্যক্তিগণের মৃতদেহ দাহ না করিয়া সেখানে নিক্ষেপ করিয়া আসা হয়। ফলে নরকঙ্কালের স্তূপ সেথায় পর্ব্বত-প্রমাণ উচু হইয়া উঠিয়াছে। রাত্রিকালে আজিও তাহারা মাংসচর্ম্মহীন কণ্ঠের আকুল তৃষ্ণায় শ্মশানের চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিয়া বেড়ায়, কোন পথিক যদি এই নিশীথ সময়ে পথ ভুলিয়া সেখানে যাইয়া পড়ে, তাহার নিস্তার নাই। সঙ্গে মদের বোতল থাকিলে তাহা সম্পূর্ণ উজাড় করিয়া শ্মশানভূমিতে ঢালিয়া দিতে হইবে, তৃষিত নরকঙ্কালের দল ভিড় করিয়া তাহাদের ওষ্ঠ-গণ্ডহীন দন্তরাজি দ্বারা সেইটুকু সুধার আস্বাদ পাইবার জন্য পরস্পর বিপুল রবে ঠোকাঠুকি সুরু করিবে, সেই ফাঁকে যদি সরিয়া পড়িতে পার ত রক্ষা, নচেৎ পৈতৃক প্রাণটি দিয়া আসিতে হইবে। ভূতের গোষ্ঠী এইরূপে উত্তরোত্তর বাড়িয়া যাইতেছে, শ্মশানে স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় তাহারা এদিক ওদিক ছড়াইয়া পড়িতেছে, এমন কি এখনও যে তাহাদের দুই একজন এই তাঁবুরই বাহিরে দাঁড়াইয়া এখানকার এই উগ্র গন্ধে ছটফট করিয়া মরিতেছে না, তাহাই বা কে বলিতে পারে? আমার ঠিক পিছনটিতে বসিয়া কচুরি ভূতের গল্প শুনিতেছিল, তাহার নিশ্বাস এতক্ষণ আমার কাঁধে পড়িতেছিল, বক্তার শেষ কথাটা শুনিবামাত্র সে সভয়ে আমাকে জাঁকিয়া ধরিল। তাহাকে ঠেলিয়া দিয়া আমি হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলাম, আমার দেখাদেখি বাকী সকলেও উচ্চৈঃস্বরে হাসিতে লাগিল,

সত্তে হাসিতে কেহ কেহ উপুড় হইয়া পড়িল, তথাপি হাসি আর থামে না।

বৃদ্ধ লোকটি আমার উপর চটিয়া কহিলেন, "বাবুসাব্ আপ্‌নে হাঁস্ দিয়া, আগর আপ ইসি বখ্‌ত ছুঁয়া যাকে আপোস আনে সেকেঙ্গে তব্ হম কহেঙ্গে হাঁ, আপ্ সেরকা বাচ্চা হ্যায়,—শূয়ারকা নেহি।" এতদ্ব্যতীত বাঙালী জাতির অশ্রাব্য ভাষায় নিন্দা সুরু হইল, আমরা নাকি পড়িয়া মার খাই, লাঠি দ্বারা পিটিলেও আমাদের পেট হইতে শব্দ বাহির হয় না এবং হিন্দুস্থানীরা যাহা করে তাহা বুক ফুলাইয়া করে,—অর্দ্ধেক গ্লাস সেবন করিয়াই আমরা নাকি বেহুঁস হইয়া পড়ি, তাহারা বোতলের উপর বোতল পান করিয়াও ঠিক থাকে, ইত্যাদি। সুস্থচিত্তে এসব সহ্য করা অসম্ভব। নিকটস্থ পানপাত্র তুলিয়া লইয়া তাহা এক চুমুকে নিঃশেষ করিয়া কহিলাম, "এহি দারুকা কসম হম অভি লে লিয়া, ইসি বখ্‌ত হম্ যাত্তেহেঁ, আগর নেহি আপোস আবেঁ তব্ হম্ ইস্ জিন্দিগীভর দারু পিনা ছোড় দেঙ্গে।"

ফিরিয়া না আসিতে পারিলে আমার শপথের মূল্য কি থাকিবে তাহা তখন সম্যক্ বুঝিবার মত মাথার অবস্থা আমাদের কাহারও ছিল না। যাহা হউক বাক্যব্যয় না করিয়া উঠিয়া পড়িলাম।

নিজের তাঁবুতে গিয়া গোটা তিনেক ভর্ত্তি বোতল পকেটে পূরিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। হঠাৎ আমার কাছায় টান পড়িল। ফিরিয়া দেখি—কচুরি বাই। রাগও হইল, হাসিও পাইল। কহিলাম, "আঃ ছাড়, এখন আর জ্বালিয়ো না।"

সে যে কাঁদিতেছিল অন্ধকারে তাহা বুঝিতে পারি নাই, ভারী গলায় সে কহিল—"তোমার যাওয়া হবে না।"

"হবে না? তার মানে?"

"মানে আবার কি, আমি যেতে দেব না।"

এ কথার কি জবাব দিব? সে কহিল, "যাকে এতদিন পরে শেষ বয়সে খুঁজে পেয়েছি, তাকে এত শীগ্‌গির ভূতের পেটে যেতে দেব না।"

"ভূত আমি মানি না।"

"ভূত নেই না কি যে তুমি মান না?"

"হাঁ আছে, আর তা সাম্‌নেই দেখতে পাচ্ছি।"

"তবে আর কি জন্যে যাবে? ফিরে গিয়ে বললেই হবে দেখে এলাম।"

"কিন্তু ভূতের জন্য যে মাল সঙ্গে নিয়েছি তা ত তাকে দেওয়া দরকার,"—বলিয়া একটি বোতলের মুখ খুলিয়া অর্দ্ধেকটা কচুরি বাইএর মুখ চিরিয়া ঢালিয়া দিলাম। সে তাহাতেও নিরস্ত হইল না, কহিল, "ক্যাবলা-দা, আমিও তোমার সঙ্গে যাব, তোমায় একলা যেতে দেব না।"

"বেশ চল।"

"আহাহা, তা হ'লে আর সুখ্যাতির অন্ত থাকবে না। এম্‌নিই ত শুঁড়ির দোকান ফেল মারিয়েছে বলে সুনাম আছে, তার ওপর কাল যখন চতুর্দ্দিকে রটে যাবে যে ক্যাবলাকান্ত কচুরি বাইএর হাত ধরে ভূত দেখতে বেরিয়েছিল—তখন আর কিছু বাকী থাকবে না! বলি ঘরে কি একেবারে আউট হ'য়ে গেছ নাকি? ছিছি তুমি ত এমন ছিলে না ক্যাবলা-দা, নেশাপত্রগুলোই না হয় করতে শিখেছিলে, তা ব'লে এতদূর বয়ে গেছ তা ত জানতাম না! হায় আমার পোড়া কপাল, তা না হ'লে আমি এতদিন হিন্দুস্থানীদের মুজরাতে নেচে বেড়াই! কথা শোনো ক্যাবলা দা—"

বার বার ক্যাব্‌লা ক্যাব্‌লা শুনিয়া মেজাজটা খারাপ হইয়া গিয়াছিল,—কচুরি বাইএর স্ফীত উদরের উপর ক্যাঁৎ করিয়া মারিলাম এক লাথি—সে আলুর বস্তাটির মত পায়ের কাছে পড়িয়া গেল, কোন সাড়াশব্দ করিল না। আমিও শ্মশানের পথে প্রস্থান করিলাম।

চলিয়াছি ত চলিয়াছিই, পথের আর শেষ নাই। মেজাজটা প্রথমে গোলাপী ধরনের হইয়াছিল, ক্রমশঃ তাহা ঘোর লাল হইয়া আসিতেছে।

"বাপ্‌"

চমকিয়া উঠিলাম। সম্মুখে চাহিয়া দেখি—বিস্তীর্ণ বালুচর ব্যাপিয়া নিস্তব্ধ অন্ধকার, কোথাও কোন সাড়াশব্দ নাই। দক্ষিণদিকটায় বোধ হইল একপাল লোক হিন্দুস্থানী প্রথায় মাথায় পাগড়ি বাঁধিয়া ও কম্বল মুড়ি দিয়া বাঁধের ধারে শৌচক্রিয়া করিতে বসিয়া গিয়াছে। বুঝিতে বাকী রহিল না যে এগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাশের ঝোপ। নিকটেই শীর্ণকায়া তটিনীর জল খাপে ঢাকা বাঁকা তলোয়ারের মত ঘুরিয়া ফিরিয়া অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। জলের সান্নিধ্যে আমার উপরোক্ত কল্পনাটির আনুকুল্য বাড়িবে বই কমিবে না মনে করিয়া গোঁফের আড়ালে একটু মুচকি হাসিয়া লইলাম। ক্রমশঃ অন্ধকারটা গাঢ় হইয়া চতুর্দ্দিক ভারী বোধ বোধ হইতেছে, বায়ুমণ্ডলের চাপ যেন হুহু করিয়া বাড়িয়া যাইতেছে, অথবা যেন আকাশপ্রমাণ উচু জলের নিম্নস্তর দিয়া হাঁটিতেছি, দুই হাত দুই পা দিয়া আর ঠেলিতে পারা যায় না। কিছুক্ষণ পরে প্রতীয়মান হইল—আমি সম্মুখে অগ্রসর হইতেছি না, কেবল বাঁধের উপর একবার দক্ষিণে পুনর্ব্বার বামে কালবৈশাখীর সন্ধ্যায় ঢেউএর বুকে পানুশী খানির মত দুলিতেছি; এমতাবস্থায় পাল নামাইয়া দেওয়া দরকার, নচেৎ উল্টাইয়া যাইব মনে করিয়া গায়ের চাদরখানি খুলিয়া দূরে নিক্ষেপ

করিলাম। এবার অনেকটা বেগ সঞ্চয় করিতে পারিলাম বটে —আবার কিয়ৎকাল পরে বোধ হইল প্রকৃতপক্ষে মাটির উপর দিয়া হাঁটিতেছি না, বাদুড়ের ন্যায় উপরে পা নীচে মাথা করিয়া ঝুলিতেছি। শরীরটাকে সোজা করা দরকার বিবেচনা করিয়া পদদ্বয় ও মস্তক পরস্পর বিপরীত দিকে ঘুরাইবার চেষ্টা করিলাম। অনেকটা হইল, তবে সম্পূর্ণ সফলকাম হইতে পারিলাম না, চিৎ হইয়া মাটির উপর শুইয়া পড়িলাম; যাই হোক স্বর্গের দিকে পা করিয়া দেবগণের অভিশাপ বহন করিতে হইবে না মনে ভাবিয়া আনন্দ অনুভব করিলাম, —এ বরং ভাল, একরকম মাঝামাঝি অবস্থায় আছি। কিন্তু আবার নূতন উপদ্রব সুরু হইল, মাথার উপর সিমুল গাছের ঘন ডালপালা যেন জটায়ুর মত পক্ষ মেলিয়া আমাকে ছোঁ মারিয়া উড়াইয়া লইয়া যাইবে, এবং আমি লোকটাও এমন অন্তঃসারশূন্য হইয়া গিয়াছি যে অচিরে আপনিই বেলুনের মত শূন্যমার্গে উঠিয়া পড়িব। অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলাম, আমার পকেটের বোতলগুলাও কি এত হাল্কা হইয়া গেল নাকি? তাহারা ত মালদার লোক, রীতিমত ভারী হইবার কথা! অথবা আমার অদৃষ্ট, শুনিয়াছি সময় বিশেষে স্বর্ণমুষ্টি ও ধূলিমুষ্টি হইয়া যায়! উপরে চাহিয়া দেখি আকাশের তারাগুলি আর তারা নাই, সহস্র ফণীর উজ্জ্বল চক্ষুর মত তাহারা ঠিক আমার মাথার উপরেই জ্বলিতেছে, এখনি উহাদের উদ্যত ফণাগুলি ঠিক আমার তেলোটির উপর পড়িল বলিয়া! ধাঁ করিয়া কাপড়টা খুলিয়া মাথায় জড়াইয়া ফেলিলাম, মাথাটা বাঁচানো চাই। অমনি মনে হইল তাহা ত নহে, এ ত আমি বাসুকী নাগের ফণার নীচে নীচে দেবকী-নন্দনকে কোলে করিয়া এক ঝড়ের রাত্রে নদী পার হইতেছি। পকেটের বোতলটি বাহির করিয়া তাহাকে শিশুর মত দুই হাতে বক্ষে ধারণ

করিয়া অগ্রসর হইব—এমন সময় ঠিক পিছন হইতে আওয়াজ হইল—

"গাঁক্"

হাসিয়া মনে মনে বলিলাম ষণ্ডরাজ, এতরাত্রে আর জ্বালিও না বাবা! কিন্তু দূর হইতে যেন একপাল ষাঁড় তাড়া করিয়া আসিল, উপায়ান্তর না দেখিয়া তাড়াতাড়ি পাশের খেজুর গাছটি বাহিয়া উঠিয়া পড়িলাম—ষাঁড়ের পর ষাঁড় কানের পাশ দিয়া ভীমবেগে দৌড়িয়া চলিল। আমার মুখে ও চোখে খর্জ্জুর-বৃক্ষ-বাসী পক্ষীকুল বার বার পুরীষোৎসর্গ করিবার পর জ্ঞান হইল, ইহা ষাঁড় নহে বাতাস। নামিয়া আবার পথ চলিতে সুরু করিলাম। ওই সেই শ্বেত কঙ্কালের স্তূপ নয়? হাঁ, তাই বটে, কিন্তু অদূরে ও কিসের আগুন? নিকটে গিয়া দেখি একটি নির্ব্বাপিতপ্রায় চিতা জ্বলিতেছে, আগুনটা মজিয়া আসিয়াছে। হঠাৎ মনে হইল সারা শ্মশানময় যেন চাপা অট্টহাসির কলরোল উঠিল, হাসির পর হাসি সে হাসি, আর থামে না। তাড়াতাড়ি একটি বোতলের মুখ খুলিয়া শূন্যে ছড়াইয়া দিলাম। বাস্, সব চুপচাপ। চিতার দিকে চাহিয়া দেখি যেন একটি অর্দ্ধদগ্ধ বিকলাঙ্গ ব্যক্তি অগ্নিশয্যার উপর অসহ্য যন্ত্রনায় ছটফট করিতেছে। আমারই দিকে উহার দৃষ্টিনিবদ্ধ এবং কি অতৃপ্ত আশার আর্ত্তনাদ উহার করুণ চাহনিতে! যদি এখনও লোকটিকে বাঁচাইয়া উহার আকাঙ্খা পূর্ণ করিতে পারি তাহাতেও লাভ আছে চিন্তা করিয়া চিতায় ঝাঁপ দিবার সঙ্কল্প করিলাম। অকস্মাৎ শ্মশানের মধ্যে যেন লক্ষ তাড়ির কলসী একসঙ্গে ফাটিয়া গেল, লক্ষ মদের বোতল একসঙ্গে চুরমার হইল, লক্ষ গাঁজার কলিকায় একসঙ্গে টান পড়িল;—চাহিয়া দেখি কি দারুণ অন্ধকার! চিতার আগুন দূরের অন্ধকারকে গাঢ়তম করিয়া তুলিয়াছে। সৃষ্টির সমস্ত আলো যেন কে পরক্ষণ করিয়া বাহির করিয়া লইয়াছে,

অন্ধকারের ভ্যাকোয়ামে নিশ্বাস ফেলিবার আর উপায় নাই। মনে হইল আমার নিশ্বাস ত পড়িতেছে না, তবে কি মরিয়া গেলাম না কি? কানে হাত দিয়া দেখি, না না, কান দিয়া শ্বাসপ্রশ্বাসের ক্রিয়া চলিতেছে, ভয়ের কারণ নাই। কে যেন কানে কানে বলিল—ওকি, আজ বহুদিন পরে তুই আমাদের তৃষ্ণা মেটালি, আয় একেবারে আমাদের মধ্যে এসে বোস, অমন অস্পৃশ্যের মত ওখানে দাঁড়িয়ে রইলি কেন? এই বলিয়া যেন কাহার পদধ্বনি আমার সম্মুখ দিয়া শ্মশানের মধ্যে মিলাইয়া গেল। আমিও গরুর মত টানা হইয়া মধ্যস্থলে আসিয়া দাঁড়াইলাম, অমনি অসংখ্য নরকঙ্কাল আমাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। আর সকলের দৃষ্টিই কি আমার বগলের অবশিষ্ট বোতলটির উপর! হতভম্ব হইয়া এটিকেও হাতছাড়া করিব কিনা ভাবিতেছি, এমন সময় তাহারা ফিস ফিস করিয়া পরস্পর কি কথাবার্ত্তা সুরু করিয়া দিল। তাহাদের কথাগুলা বাতাসের মধ্য দিয়া আমার বুক, পেট, ও পাঁজরা ভেদ করিয়া এপার ও পার হইতে লাগিল. যেন কয়েকটি বরফের করাত আমার স্নায়ু গুলিকে কাটিয়া কাটিয়া বসিয়া যাইতেছে। আমার কোমরে টান লাগিয়া দেহটি অগ্রপশ্চাৎ দুলিতেছে, অথচ মাথাটি ঠিক এক জায়গায় আছে। আর কি ভারী এই মাথাটা! যেন একটি লোহার তাল। এতক্ষণে ইহার ঢিপ করিয়া নীচে পড়িয়া যাওয়া উচিত ছিল, ইহা যে এখনও স্বস্থানে আছে, তাহাও এই প্রেতলোকের কীর্ত্তি। হঠাৎ বোতলটি স্খলিত হইয়া আমার পায়ের কাছে পড়িয়া গেল ও ছিপিটা খুলিয়া যাওয়ায় অভ্যন্তরস্থ মাল মৃদু শব্দ করিয়া নিষ্ক্রান্ত হইল। অমনি যেন অস্থিমুণ্ডের দল আমার পায়ের তলার মাটি শুষিতে লাগিল। বারে! আমিই শুধু বঞ্চিত হইব আর তোমরা স্ফূর্ত্তি করিবে, এত বোকা পাও নাই আমাকে! আমিও মাটিতে মুখ দিয়া শুষিবার চেষ্টা

করিলাম, কিন্তু দেখি প্রেতনিঃশ্বাসে মদ্যও জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে। আমার ঠোঁট রগড়ানোই সার হইল, একটুও গলা ভিজিল না। অথচ আর উঠিয়া দাঁড়াইবার শক্তি নাই, অগত্যা বোতলটাকে উপাধান করিয়া লম্বা হইয়া পড়িলাম, আমার বিশ্রামের প্রয়োজন অনুভব করিয়া দরদী বন্ধুগণ কিছু জায়গা ছাড়িয়া দিল। চক্ষু বুজিয়া দেখি, মরি মরি, কি বাহার! কে বলে যে আলোই সুন্দর আর কালো কুৎসিৎ! এত বড় মিথ্যা কথাটা কিরূপে এতদিন জগতের লোক মানিয়া লইয়াছে? মনে হইল গোঁফের চুল কালো, কালো কয়লায় জাহাজ চলে, কালো গরুতে বেশী দুধ দেয়, কালো বেরালের পয় আছে, কালো ছাগলের চর্ব্বি বেশী, কালো মেয়েমানুষের গা ঠাণ্ডা, তবে একটু বোট্‌কা গন্ধ, তা হোক। গুন গুন করিয়া গাহিতে লাগিলাম—

হায় গো কালো মন্দ কিসে
বিচার ক'রে দেখলে পরে
কালোই ভালো হয়গো শেষে।

মাথার কাছে ছুঁক ছুঁক আওয়াজ শুনিয়া চাহিয়া দেখি, ওরে বাবা, এযে সেই ভেলি কুকুর—যাহার সহিত কুললক্ষ্মীর বিবাহ হইয়াছিল! কি বিষম কালো ইহার রং! এমন সময় কোত্থেকে এলে বাবা! সে তাহার কৃষ্ণ জিহ্বা বাহির করিয়া আমার সর্ব্বাঙ্গ চাটিয়া দিল, আমিও প্রত্যুপকারস্বরূপ তাহার গাত্র চাটিয়া দিব মনে করিয়া মাথাটা তুলিয়া দেখি আমিও যে ভয়ঙ্কর কালো হইয়া গিয়াছি! একেবারে সয়তানের মত ঘুটঘুটে কালো। কেবল রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের মত আমার ভিতরকার লাল জল একটি রক্তিম আভা বিকীরণ করিতেছে, ঠিক কালো বোতলের মদ আলোর পাশে ধরিলে যেমন দেখায়। বেশ বাবা, শেষকালটা বোতলত্বপ্রাপ্তি হইল! একরকম মন্দ নহে, যাদৃশী ভাবনা যস্য

সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী। সত্যই ত আমার মাথাটা ছিপির আকার ধারণ করিয়াছে, হাত পা গলিয়া বোতলের উদর ও তলদেশ হইয়াছে। শেষে কি ভূতভায়ারা আমাকেই ধরিয়া চুমুক দিবে?

কিন্তু মাথায় হুড় হুড় করিয়া জল ঢালে কে? চোখ মেলিয়া দেখি, প্রভাত হইয়াছে, আমি একটি গরুর গাড়ীর মধ্যে শুইয়া আছি এবং আমার মাথার নিকট দাঁত বাহির করিয়া বসিয়া আছে কচুরি বাই। তাহাকে মুখ ভ্যাঙাইয়া আমিও একবার দাঁত দেখাইয়া দিলাম। সে বলিল, "একেবারে বেহুঁশ হ'য়ে শ্মশানে পড়েছিলে, আমি গাড়ী থেকে দেখতে পেয়ে তুলে নিয়ে এলাম। সুস্থ হ'লে নাবিয়ে দেব, এখন চোখ বুজে ঘুমোও দেখি।"

তাহার স্বরের অনুকরণ করিয়া মুখভঙ্গি সহকারে বলিলাম—"চোখ বুজে ঘুমোও দেখি।"

গরুর গলার ঘণ্টি অবিরাম কানে বাজিতেছিল—ঠুং ঠুং ঠুং—যেন পেয়ালায় পেয়ালায় নিরন্তর ঠোকাঠুকি চলিতেছে, উৎসবের আর শেষ নাই। জড়িত স্বরে বলিবার চেষ্টা করিলাম, "বাবা কচুরি, একটি পেয়ালা মুখে ঢেলে দাওনা বাবা, আর যে সইতে পারি না।" কিন্তু বলিতে পারিলাম না, গলা দিয়া শুধু খানিকটা আওয়াজ ঘড় ঘড় করিয়া বাহির হইয়া আসিল। (ক্রমশঃ)

—শ্রীপূর্ণগ্রাস

"বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছে যে, কি খুঁজছ ভাই?" "স্বামী খুঁজছি।" "কিন্তু তোমার ত একজন আছেন!" "আমি তাঁকেই খুঁজছি।"

পুরাতন পঞ্জিকা

শ্রীযুত সজনীকান্ত সদা নির্ব্বিকার
সার্থক সজনী নাম! শত জনে তার
সদাই করিছে খোঁজ; তিনি অনুক্ষণ
অন্তরের ভাবলোকে দেন সন্তরণ।
কেবলি তো ভাব নহে, জটিল হিসাব
(কোন্ ভাব সনে বল নাহিক অভাব!)
অমুকের কাছে এত, অমুক তারিখে,
—সুন্দর কবিতা বটে—যেতেছেন লিখে
ডায়ারির পাতে পাতে। সম্পাদক আছে?
কিরণ যাওনা ভাই দেখ গিয়ে কাছে
কবি কিম্বা ক্রেডিটার। গল্প এনেছেন?
মাঘ মাসে একবার সন্ধান নেবেন।
—পড়ুন পড়ুন গল্প; আবার কে ডাকে?
যাও ভাই দেখে এসো ড্যাশ লোকটাকে
কবি কিম্বা ক্রেডিটার? আছে নাকি গোঁফ?
আছে? বড়? একেবারে খেজুরের ঝোপ?
তবে বুঝি সেই বেটা! উদিল স্মরণে
গুম্ফযুক্ত একশত ক্রেডিটারগণে!
তাই বল রামবাবু! চেয়ার! চেয়ার!
—ক্রিং ক্রিং হ্যালো হ্যালো…আজ্ঞে…নমস্কার।

তবুও সজনীবাবু, সজনে বিজন ;
শীতের মধ্যাহ্ন-স্তব্ধ অন্তর-অজন
নাহি সেথা জনপ্রাণী। পাতা পড়িবার
এতটুকু শব্দ ক্ষীণ, পাখি নড়িবার
মৃদু মন্দ উসখুস, সব যায় শোনা
বনের নিশ্বাস স্পন্দ যায় যেন গোনা
এমনি নিভৃত সেথা। মন যেন তাঁর
আপন আলোয় বসি ছবি দেখে কার,
দেখে আর শোনে যেন একান্ত নির্ব্বাক
নিভৃতের বাণীরূপ শুদ্ধ ঘুঘু-ডাক।

কে ওই চেয়ারে মগ্ন নাহি ধারে ধার ?
চৌদ্দ বর্ষ পুরাতন সাব্ এডিটার।
নেহাৎ মানুষ তাই, নাহি হ'ল নাম,
ঘৃত হলে এতদিন বেড়ে যেত দাম
ষোল টাকা সের আহা।...কা'কে খোঁজা হয় ?
তুমি ও আপনি গুলি, রায় মহাশয়
যতনে এড়ায়ে যান। গল্প ? ওই খানে।
না, না, আমি সাব. এডি...তার কিনা মানে...
সজনী বা—নির্ব্বাচন, সব ইচ্ছা ওঁর।
বাঁচা গেল, গুড্ গড্ লোকটা কি bore !
বক্রহাস্য তবু তাহা জোনাকীর মত
স্মিত স্নিগ্ধ আলো দেয় নাহি করে ক্ষত।
ক্ষতির যা কিছু তার মিথিল দাসের
খিল ভাঙা কিল চড়ে বিষম ত্রাসের

যখন সঞ্চার করে! অমৃতে গরল
অসম্ভব নহে বুঝি! মুখে খল খল
অবিরাম হাসি আর হাতে চলে কিল
বহু দ্বন্দ্ব এ জীবন, এই তো নিখিল।

বড় সাহেবের কণ্ঠ, চেহারায় বড়,
টেলিফোঁ-ভাষণে তিনি সব চেয়ে দড়,
চাপা হাসি, আধ কথা, *yes, yes,*
—আজিকার কাজকর্ম্ম দেখি নিয়ে এস।

কে এলে বাড়ায় সবে নিজ নিজ হাত
ভবিষ্য-ভাষণে কেবা দেব জগন্নাথ?
অতিদূর ভবিষ্যৎ, সুদূর অতীত
এ দুটোয় স্পেশালিষ্ট; কে আছে পতিত-
পাবন এমনতরো! পারেন সুরেশ
সকলি বলিয়া দিতে নাহি ভ্রম লেশ
নাহি কোনো দাবী দাওয়া, নাহি কোনো ফিস্
চাহি গো চব্বিশ শুধু ঘণ্টার নোটিস্।

দু'ভ্যালুম ডান হাতে, দু'ভ্যালুম বামে
দু'ভ্যালুম ফেলে রেখে পথে কিম্বা ট্রামে
আলু থালু কেশ পাশ, কে দাঁড়ালো আসি
স্খলিত চাদর ওই বেদনা-বিলাসী?
দুঃখেরে কে আর্টরূপে করেছে অভ্যাস
সদাই নয়নে কার সন্ধ্যার আভাস?

বেদনার বৈতরণী-তরণী নাবিক
বিরহের অনলের কে মহা সাগ্নিক ?
আপনারা নাম বিনা একে চিনিবেন
স্বনামা পুরুষ ধন্য ইনি শ্রীনৃপেন।

অতি ব্যস্ত গতিত্রস্ত মুখে চোখে কথা
ঝট্ করে দ্বার খুলে ভাঙি নীরবতা
অজস্র খবর বহি বাক্য-নায়েগারা
হতভম্ব দর্শকেরে করে দিশেহারা
কে সেই সুতন্ব (?) বীর ! সব তাঁর জানা
ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুংরী, বন্দুক ও ছানা,
বিশ্বের যাবৎ তথ্য আছেন শিখিয়া
চতুর্দ্দশ সংস্করণ সাইক্লোপীডিয়া।
কেবল আকার ছোট, বলে মোর মন
ইণ্ডিয়া কাগজে ছাপা পকেটেডিশন।
কিন্তু তাঁর বেদ জেনো, বিস্তারে অলম্,
ষ্টেস্‌ম্যান কাগজের ধাঁধার কলম।

তোমারে ভুলিনি বন্ধু, তুমি জীবনের
অতিদীর্ঘ রসহীনে আছ লবণের
মত। তোমারে দেখিয়া মনে পড়ে যায়
কার কোথা কাজ আছে আজিকে সন্ধ্যায়।
উস্‌খুস্ করে সবে, উঠিতে নাচার
কেবলি অর্ডার গেছে সাত কাপ চা'র।

—'আজকে আশ্চর্য্য কাণ্ড পথে যেতে দেখি,'—
"দেখ ভাই আধুলিটা, সাঁচা বিম্বা মেকি ;"
"রেডিওতে গান আছে আমি উঠিলাম ;"
"আমারে কিনিতে হবে ওরিএণ্ট বাম ;"
"পোস্তায় চলিনু আমি কিনিবারে ঢেঁকি ;"
তবুও—'আশ্চর্য্য কাণ্ড পথে যেতে যেতে দেখি।'
বহুবার শ্রুত ওই বিরাট কাহিনী
শিবের বিবাহে বর-যাত্রীর বাহিনী
কখনো ট্রেনেতে ঘটে, কখনো শ্মশানে,
কন্ধে-পোড়া দাগ দেয় শ্রোতাদের প্রাণে।
শুনিতে না চায় কেহ, তুমি ছাড়িবে কি ?
'আজিকে আশ্চর্য্য কাণ্ড পথে যেতে দেখি !'
চেষ্টা কর, চেষ্টা কর, হে বীর পুরুষ
গল্প কথনের তুমি হে রবার্ট ব্রুস।

দীর্ঘ দেহ, দীর্ঘ কোট, দীর্ঘতর বাণী
শ্রীমৎ অতুলানন্দ ভারতী-ইরাণী।
উভয় ধর্ম্মেতে তিনি দিয়েছেন জোড়,
আগামী রিফর্ম্মে ভাই বড় মজা ওঁর।
বৃক্ষ শাখে দুই পাখী, হস্তে এক ঢিল,
একটু খুলিয়া বলি, ভেঙে দিয়া খিল
রূপকের। লিখেছেন একখানি বই
সাংসারিক উন্নতির অতি উচ্চ মই।
কম্যুনাল রিবার্ডের যাই হোক ফল
শ্রীমান অতুলানন্দ হবেনা নিস্ফল।

ঠুক্‌ ঠুক দ্বারে শব্দ ; দেখি ফাঁক দিয়ে
সুপুষ্ট মসৃণ পায়ে দুইখানা ইয়ে
(মিলের খাতিরে ওটা) দুইখানা জুতা।
'আসুন আসুন।' 'আরে স্বাগত খুদুদা!'
'কে আজ খাওয়াবে চা ? মোর টাকা নাহি।'
এত বলি মনিব্যাগে হস্ত অবগাহি
তুলিলেন তিনখানা শ' টাকার নোট
খুচরা কয়েকখানা, এই আছে মোট।

বিশ্ববাণী বাসা বাঁধে কার ভিত্তি গায়
হিব্রু হ'তে হিন্দুস্থানী কোথা লটকায়
দেয়ালের ধারে ধারে ? সংস্কৃতি-জেল
কাহার প্রাসাদ বল নবীন ব্যাবেল ?
ভাষাতত্ত্বে সেকেন্দার ভারতী-বাণীর
সুযোগ্য কে প্রতিনিধি ? কাহার গভীর
বচনের বাঁকে বাঁকে নবীন বিস্ময়
সুনীতিকুমার তিনি, অন্য কেহ নয়।
যাঁর সনে আলাপনে অর্দ্ধঘণ্টা কাল
আপনারে মনে হয় নেহাৎ বাঙাল
কিম্বা ইস্কুলের ছেলে! গর্ব্বমুক্ত মন
মূর্খতম পার্শ্বিকেরে গ্রীক কোটেশন
অসঙ্কোচে বলে যান। বিদ্যা ভরপূর
তবু কার ভাল লাগে ছোলা, চানাচুর,
শাস্ত্র হ'তে এ জীবন বড় কাছে যাঁর
সুবিখ্যাত অধ্যাপক সুনীতিকুমার।

জ্যৈষ্ঠের গরমে কেবা থামাইয়া fan
পাছে পুড়ে যায় বিড়ি মৃদু টান দেন
অতি সন্তর্পণে, বল ! কে কাটায় রাতি
টাইম টেবিল পড়ি, আছে যারা সাথী
তাদের বলিতে হবে ভ্রমণ কাহিনী ?
চিরন্তন শৈশবের স্মৃতি-অক্ষৌহিনী
সৈন্যের কে সেনাপতি ? নাম কিবা তার
বটানিক নভেলের খ্যাত গ্রন্থকার ?
বুড়ো হয়ে যবে তিনি ধরিবেন লাঠি
তখনো খুঁজিয়া দেখো পাবে চুষি কাঠি
মনের পকেটে যাঁর—বিভূতিভূষণ
সরলতা মূর্ত্তিমান্—Simpleton.

আনুবীক্ষণিক বীর ! কার তীব্র হাসি
তোমার অদৃষ্ট নভে, ভাই বঙ্গবাসী
কাল বৈশাখীর দূত ? ছোট সেতো নয়
বাঙালীরে ছোট বলে, বড় সেই হয়।
ভাই 'বঙালী"র শাপে কার স্থান হায়
অতিসূক্ষ্ম পাণ্ডিত্যের কণ্টক শয্যায় !
আমরা জানিনা বেশি, সুখে আছি তাই
অতিশয় জানিবার কি যে কষ্ট ভাই
দেখিতেছি অহরহ। জীবন-দুর্ভর
পাণ্ডিত্যের বর্জ্জাইস সমূর্ত্ত অক্ষর।

কে দুই অদৃশ্য গ্রহ উদয়াস্ত নভে
অলক্ষ্যে আলোক পাত করেন গৌরবে।

এক জন সমুচ্চত বিষম হাতুড়ি
কালাপাহাড়িয়া গর্ব্বে যান ভাঙি চুরি
হীনতার হিমালয়ে। আর জন ধীরে
ওষ্ঠাধর ধনুকের তীক্ষ্ণ-হাস্য-তীরে
অরাতিরে বধ করে। একজন যেন
বনস্পতি কাটিবার কুঠারের হেন
কঠোর লোহায় রচা! আর জন গড়া
দীপ্তোজ্জ্বল রজতের মীনা-কাজ করা
মূল্যবান্ সমাবেশে। একজন বল,
আর জন সাহিত্যের সস্মিত কৌশল।

কথার পথের মোড়ে রত্নাকর প্রায়
নীরবে কে বসি থাকে আলাপ সভায়
বক্তৃতার বিভীষণ? ছোট বড় সবে
হৃদয়ে শঙ্কিত কারে? কি জানি কি কবে?
বিশ্রব্ধ আলাপ মাঝে যে খুলিলে মুখ
দুর্দ্ধর্ষ বিজ্ঞেরো হায় বিকম্পিত বুক
জান কি তাঁহার নাম? নামে সুকুমার
কিন্তু যাঁর শ্লেষাঘাত, নহে সুখমার।
ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসে যাঁর আত্মরতি
কিন্তু তিনি সুপ্রসন্ন অধমের প্রতি।
ভাবী বঙ্গ-ভারতীয় কাব্য-ইতিহাসে
মোর নাম লিখিবেন, আছি সে আশ্বাসে।
দোষ তাঁর দোষ নহে, চন্দ্রের কলঙ্ক,
সুকুমার শতদল, পাণ্ডিত্যের পঙ্ক।

ভবিষ্যৎ বাঁধা দিয়া দিলাম দাদন
পুস্তক রচনা কালে রবে কি স্মরণ ?

বাসাহারাদের লাগি কে মরেন কেঁদে ?
ভ্রমিছেন পথে পথে চাঁদা সেধে সেধে ?
কার বাসা ? কারা তারা ? হরিজন নাকি ?
কত টাকা প্রয়োজন, কত টাকা বাকি
তাহাদের নাম কিবা শুধায় সবাই,
বৈজ্ঞানিক গোপালদা বলে হায় ভাই
তাদেরি লাগিয়া মোর যাহা কিছু শিখা
হতভাগ্য ভগ্নবাসা ক্ষুদে পিপীলিকা।

'এথিক্সের' জয় বার্ত্তা করিল ঘোষণা
মাণিক বিকালে যবে, ভাবিলাম অনা-
চার ক্রমে দেশ হতে হইবেক দূর
প্রত্যাসন্ন স্বর্ণ যুগ ; চিত্ত ভরপূর
দেখে যাব সত্য যুগ, দেরী আছে থোড়া।
শুনিলাম শেষে সেটা রেস-জয়ী ঘোড়া।

ঝাপা-তালে পা ফেলিয়া কে করে প্রবেশ
দীর্ঘ গাত্রে বিলম্বিত কাশ্মীরি সরেশ
শাল এক ? কিবা নাম সে শালীবাহন
পটুয়ার ? কার আঁকা শিল্প-বিজ্ঞাপন
মাসিকের পাতে আর বিস্কুট কৌটায়
চতুর্ব্বর্গ সার্থকতা ধরি শোভা পায়।

সব জানা হাসি কার, আলাপের শূল
যেন তিনি ধরেছেন বিধাতার ভুল।
ক্রেডিটার তাড়ানিয়া বিশ্বস্ত কুকুর
কার দ্বারে পাহারায় সারাটি দুপুর ?

শিল্পের আদর্শ লোকে জ্যোতিষ্কের মত
ভাব হতে ভাবান্তরে কেবা অবিরত
নিরন্তর ঘুরে মরে ? কে সেই রকেট,
কাটিবারে চায় কেবা ইন্দ্রের পকেট
তার কিছু কম নহে, নাহি কোনো দৈন্য
শুধু কাণ্ড জ্ঞান ছাড়া, নাম শ্রীচৈতন্য।

মফঃস্বল হ'তে কার চলে যাওয়া-আসা
কলমে অলম্ নাহি, মুখে নাহি ভাষা
কে লেখে অমর গ্রন্থ আয়ু চিরকাল
না পড়িয়া উপন্যাস কনুতিনাতাল।
রাই-কমলের সূর্য্য (কুয়াশা-মলিন)
ম্যালেরিয়া-ক্লিষ্ট কায় দেহখানি ক্ষীণ।
নাম নাই করিলাম। (নাহি মেলে ছন্দে)
সকলে জানে তাঁরে খ্যাতির সুগন্ধে।

গাই নন, তবু তিনি ভাগলপুরের;
শাল-কর নন, তবু হৃদয়-পুরের
কে শালীবাহন রাজ ? উদ্ভিদ নহেন,
বটানিক আখ্যা তবু স্বনামে বহেন ;

বৃন্দাবনে ছিল জোর নাম ডাক তাঁর,
বীজাণুবিজয়ী তিনি প্রসিদ্ধ ডাক্তার।
হাসিতে মধু-টি যার, কবিতায় হুল,
কাব্য-আগাছার গাছে যিনি বনফুল।
সাহিত্যিক সান্নিপাতগ্রস্ত ওগো দাদা,
তব ব্যবহার লাগি রচিনু এ ধাঁধা।
নামটি সাথেই দিনু, খুঁজে দেখো ভাই,
এক ছেড়ে দুই বার হয়েছে বলাই ॥

জানিতাম জল নাই সাঁতারের বেশী,
সে সাঁতারে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মোদের 'তিবেশী *
নেমেছেন এসে আজি কাব্য-সরসীতে,
বাণীর মরালগুলি হাসিতে হাসিতে +
যদিই বা উড়ে যায়, তাতে কিবা ক্ষতি,
মানস মরাল স্থলে দেবী সরস্বতী
মানুষ-মরাল পাবে ; যদি কভু দেবী,
আধুনিক সাহিত্যের উগ্র সুরা সেবি'
ঢলিয়া পড়েন জলে, শান্তি পান তাঁরে,
তুলিবেন জল হতে সুচিৎ সাঁতারে ॥

খ্যাতি আর অপখ্যাতি একত্রে জড়িত,
দূর চাঁদমারি সম : মধ্যভাগে স্থিত

---

* প্রতিবেশী (দৈলিপী প্রয়োগ) সুনীতিবাবু, নোট করিয়া লউন

+ আমরা অবগত আছি, সাধারণ হাঁস তো দূরের কথা, স্বয়ং সরস্বতীর হাঁসও হাসে না। কিন্তু কি করিব, মিলের অনুরোধে বড় কবি mill (বাসন্তী) খুঁজিয়া পান কিন্তু ছোটরা বাধ্য হইয়া হাঁসকে হাসায়।

ওই কালো বিন্দুটার নাম হল খ্যাতি,
আর যাহা চারিদিকে, যদিও বা জ্ঞাতি
ওই কালো বিন্দুটার, ছেড়ো লোভ তার,
হে নবীন কবি, তুমি ; হেথা প্রতিভার
বহু শত্রু ; খুলিও না বোতলের মুখ,
হয়তো বাহির হবে নাশি সব সুখ
আরব্যোপন্যাসী দৈত্য, রেখো প্রতিভায়
চরিত্রের চালে ঝোলা সংযম-শিকায়।
আর যত তাড়াতাড়ি পারো করো বিভা,
নতুবা তুমিও যাবে, যাইবে প্রতিভা।
অন্তরে বিঁধিবে শুধু বহুস্মৃতি-শেল,
বুধবারে শনিবারে ড্যা-ড্যাশ হষ্টেল।

পুরান পঞ্জিকা ব্যাখ্যা কত করি আর
সজনী-জগৎ গ্রহ যেন অবতার
জুটেছেন এক সাথে। এঁদের জীবন
লিখিবারে বহুদিন ব্যস্ত মোর মন।
থাকিত আমার যদি তেমন মগজ
তারো চেয়ে বেশি আহা ডিমাই কাগজ!
লিখিতাম মুক্তহস্ত দিবস প্রহর
এখনো লেখার পরে বসে নাই কর।
বসে নাই ট্যাক্স বটে, ডাকের মাশুল
(পত্রজীবী বিরহীর হৃদয়ের শূল)
তাহারে কেমনে ভুলি ? তাই থামিলাম
সম্মিলিত পদযুগে অনেক সেলাম।
পড়িবেন আগাগোড়া, অন্তরে সন্তোষ
শুধু ছাড়ি দিয়া মোর বর্ণাশুদ্ধি দোষ॥

ইতি

কস্যচিৎ ?

আর্টিষ্ট্

যা-হোক একটা কিছু করবার জন্মেই মানুষের জন্ম ; কিন্তু পুলকেশ পালধি জন্মেছিল একেবারে আর্টিষ্ট্ হবার জন্মে।

আর্টিষ্ট্ নানা জাতীয় ; গায়ক, ভাস্কর, অভিনেতা, সার্কাসওয়ালা ইত্যাদি। কিন্তু পুলকেশের ললাটে ছিল চিত্র-শিল্পীর ছাপ মারা।

সাবালক হতে না হতেই সে লম্বা চুল রাখতে আরম্ভ করেছিল, পূরো সাবালক হয়েই গোঁফ দিল উড়িয়ে। তারপর ঘটা করে জুল্‌পিও দিল বাড়িয়ে ; তদুপরি গায়ে চড়ল খাটো-ঝুল পাঞ্জাবী আর পরনে বাহান্ন ইঞ্চি ধুতি। এই সময়ে ম্যাট্রিক ফেল হয়ে সে লেখা-পড়া সাঙ্গ করল এবং বছর খানেক ধরে' যাচ্ছি যাব করতে করতে একদিন একটা ছোট কারখানায় ঢুকে পড়ল। পুলকেশ হ'ল শিক্ষানবীশ সাইন-পেইণ্টার-রূপে।

এই ভাবে তার আর্টের হাতে-খড়ি আরম্ভ হল।

আর্টিষ্টদের স্বভাবজাত শক্তি তার যতই থাকুক না কেন, কেবল খাটুনি আর খাটুনি। হোক খাটুনি—সিঁড়ি সে পেয়েছে, স্বর্গ যায় কোথায়? প্রতি মুহূর্ত্তেই সে অনুভব করতে লাগল বড় হতেই হবে।

এই ভাবে বছর চারেক কাটবার পর পুলকেশের হৃদয় একদিন গান গেয়ে উঠল—"আমি চলব—আমি চলব বাহিরে।"

পুলকেশ সত্যই বাহিরে চলে এল! এই হল তার স্বাধীন জীবনের সুরু।

কিন্তু তার প্রথম কাজটার ভাগ্যে সুফল জুটল না—একটা ছাতা মেরামতের বদলে সেখানা হাত-ছাড়া করতে হল; প্রথম কাজে এমন অবস্থা অনেক বিশ্ববিখ্যাত আর্টিষ্টদের বেলায়ও হয়েছে—পুলকেশ এ-কথা জান্‌ত বলে' কিছুমাত্র নিরুৎসাহ হল না। একটা ছাতার দোকানের গায়ে পুলকেশের এই প্রথম প্রচেষ্টা লট্‌কান আছে; সেটিতে রঙের বাড়াবাড়ি মোটেই নেই, কেবল লাল অক্ষরে লেখা আছে—'ছাদের মত মজবুত ছাতা।'

এর পর সে দ্বিগুণ উৎসাহে রং তুলি চালাতে লাগল। এই সময়কার প্রথম দিকে আঁকা তার 'চপ্‌ ও কাট্‌লেট'-খানা ছিদাম মুদির লেনের একটি চা-ঘরের দেওয়ালে আঁটা আছে। এই সময়ে সে কতকগুলি প্লেটে ফিনিশিং টচ্‌ও দিয়েছিল, যেমন, একখানা 'No admittance except on business' (১৩২৯); একখানা 'রাস্তা বন্ধ' (১৩২৭); এবং দু'খানা 'বাটী ভাড়া' (১৩৩১) ও আরও কয়েকখানি—আর্টের ইতিহাসে তাদের বিশেষ মূল্য নেই বলে' নামোল্লেখ করলাম না।

এই সময়ে সে এমন একটা দুঃসাহসিক পরীক্ষায় ব্যাপৃত হল যে যে-কোনও সত্যিকারের আর্টিষ্টের পক্ষেই তা গৌরবের; এর দ্বারা সে নিজের উপর বিশ্বাস স্থাপনের একটা সুযোগও পেল। তার এক মামা ঘর সাজাবার জন্যে নিজের এক বন্ধুর কাছ-থেকে একখানা ছবি নিয়ে এসেছিলেন। ছবিখানির প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে এই: সন্ধ্যার আবছায়ায় একখানা জীর্ণ বাড়ীর সামনে দু' ঘোড়ায় বাহিত একখানা গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে, বাড়ীখানার বারান্দা থেকে একখানা সাইন্‌-বোর্ড ঝুলছে, অনেক চেষ্টা করলে তাতে অস্পষ্ট অক্ষরে এই লেখাটি পড়া যায়—'ভোজনাগার।' ছবিখানি দেখে পুলকেশ অজ্ঞাতনামা

আর্টিষ্টকে তার অদূরদর্শিতার জন্যে উপহাস করল, তারপর রঙ ও তুলি নিয়ে সেই জায়গাটুকু সংশোধন করে' উজ্জ্বল করে' দিল। সকলে তখন সমস্বরে বলতে লাগল, "উঃ, পুলুর কী চমৎকার হাত! লেখাগুলো জলজলে হওয়ায় এখন ছবিটার মানে বোঝা গেল।"

একমাত্র তার মামাই কেবল গণ্ডগোল করলেন; তিনি যে পুলকেশের আর্টের সমঝদার নন এতে তা স্পষ্ট হয়ে উঠল। আর, প্রথম থেকেই পুলকেশের আর্টিষ্ট হওয়ায় তাঁর মত ছিল না, তিনি তাকে পাটের দালালীর কাজে ঢোকাবার চেষ্টা করেছিলেন।

যা হোক, এ-সব বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে' সে বিরাট জনসাধারণের মধ্যে পরিচিত হবার জন্যে সত্যিকারের প্রতিভাবানদের মত এক-নিষ্ঠ সাধনা করতে লাগল।

সুখের বিষয়, গত বছরে সে একটা সুযোগ লাভ করেছিল—এবং তার বহুদিনের সঞ্চিত আশা সে-দিন অল্প-বিস্তর পূর্ণ হয়েছিল;—অর্থাৎ আর্ট্ একজিবিশনে তার একখানা ক্যান্ভাস গৃহীত হয়েছিল! পুলকেশ এই সময়ে ভাল করেই বুঝতে পেরেছিল যে 'সবুরে মেওয়া ফলে' কথাটা আর্টিষ্ট-শ্রেণীর লোকের জন্যেই উচ্চারিত। Black and white বিভাগ থেকে বেরুবার দরজার কাঁধেই চৌকা ফ্রেমে বাঁধান ক্যান্ভাসখানা পুলকেশ পালধির; সাদা পট-ভূমির উপর কালো রঙে আঁকা সেখানি কারও দৃষ্টি এড়ায়নি; 'REFRESHMENTS', এর শেষের দিকে আধখানা হাত একটা আঙুল প্রসারিত করে' নির্ভুলভাবে একটা দিক্ নির্দ্দেশ করছে।

বড়দিন ও নব-বর্ষের ক'দিন হাজার হাজার নর-নারী পুলকেশ পালধির আঁকা সেই ক্যান্ভাসখানি নিশ্চয়ই দেখেছে, বিনা কষ্টে অর্থ বুঝেছে এবং, হয়ত, মনে মনে কত লোক সেখানির প্রশংসাও করেছে।

অথচ, প্রদর্শনীর যখন সমালোচনাদি কাগজে কাগজে বেরুল তখন দেখা গেল পুলকেশের নামে কেউ কিছু লেখেনি! নতুন এবং তরুণ প্রতিভা সম্বন্ধে আমাদের দেশের সমালোচকরা যে চিরকালই হিংসুক ও শত্রুভাবাপন্ন—সে বিষয়ে এর পর আমাদের একটুও সন্দেহ রইল না। পুলকেশ নিজেকে এই বলে সান্ত্বনা দিল যে এমন দিন নিশ্চয়ই—এবং অনতিবিলম্বেই আসবে যখন শিল্প-জগতে সে তার যথার্থ আসন দখল করে' সকলের বিস্ময় ও শ্রদ্ধা উদ্রেক করবে।

এর জন্যে কিন্তু তাকে বেশী দিন অপেক্ষা করতে হল না। গত সপ্তাহে 'বেঙ্গল এ্যাকাডেমী অব আর্টে'র তত্ত্বাবধায়ক স্যর চতুর্দোল চাকলাদার একটি ক্ষুদ্র, অথচ অতিশয় ভদ্রতাপূর্ণ পত্রে পুলকেশকে জানিয়েছেন যে গবর্ণমেণ্ট তাকে একটি কাজের অর্ডার দিয়েছেন। গড়ের মাঠে এ্যাকাডেমীর নব-নির্ম্মিত ভবনে পুলকেশের শিল্প-চাতুর্য্যের পরিচয় চিরস্থায়ী ভাবে রাখা হবে।

যাক্, অবশেষে বাস্তবিকই তার সুবিচার করা হল দেখে আমরা সুখী হলাম।

পূর্ণ পাঁচ রাত ও পাঁচ দিন ধরে' পুলকেশ কাজ করতে লাগল; শিল্পীর এই একাগ্র সাধনার সামনে ক্ষুধা-নিদ্রাও, বোধ করি লজ্জিত হল।

যা হোক, পেইন্টিং শেষ হবার পর যখন পুলকেশ দেখল যে তাতে কোনও খুঁৎ নেই তখন ক্যান্‌ভাসের ডান দিকে নীচের কোণে সে নিজের নাম স্বাক্ষর করে দিল, মনে মনে সুর করে বলতে লাগল; 'And, at last, towards immortality.' তারপর পাঁচসিকে খরচ করে সেখানিকে সুন্দর একখানা ফ্রেমে বাঁধিয়ে এ্যাকাডেমীর আফিসে দিয়ে এল।

স্যর চতুর্দ্দোল পুলকেশের এই ক্যান্‌ভাসখানির সমুচিত সুখ্যাতি করে' তা গ্রহণ করেছেন। তবে, তাঁর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে পুলকেশ ক্যান্‌ভাসের কোণ থেকে নিজের নামটি মুছে ফেলতে বাধ্য হয়েছে।

তোমরা যদি কখনও এ্যাকাডেমীতে যাও ত' দরজা পার হতেই পুলকেশ পালধির আঁকা লাল ফ্রেমে বাঁধান এই ক্যান্‌ভাসখানি দেখতে পাবে; 'ছাতা ও ছড়ি এইখানে রাখুন!' বুঝতে কষ্ট হবে না, কেননা ইণ্ডিয়া আর্টের মতই তাহা লম্বা এবং ভঙ্গিমাময়।

—বি-কু-বড়াল

নাম্নী

শ্যামলী

সে যেন শহুরে নদী
বহে নিরবধি—
অবিশ্রান্ত কলকলে;
তরঙ্গের ভঙ্গী আর নর্ত্তনের ছন্দ নিয়ে চলে;
নুয়ে পড়া তনুলতা, চুপ্‌সানো চেহারা বিকট,
বয়স বিশের থেকে বেশী-কম ত্রিশের নিকট।
থাকে কোনো লেডীজ্‌ হষ্টেলে
নিত্য তার বার্ত্তা আসে জরুরী পোষ্টালে.

আসলে লোকাল চিঠ
ডিলীশাস্, প্রিটি,
কারণ সেগুলি লেখে—কে লেখে তা না-ই বলিলাম
লেখক এবং আমি একই মেসে কদিন ছিলাম
তারি লাগি, অন্ত তার নাম
উহ্য রাখিলাম ;
এখন আসল কথা ; তরুণীও কলেজে পড়েন
বাসে চড়েন ;
কলেজেতে গতায়াত হেতু,
সে সময় মুগ্ধ মীনকেতু
দিয়েছে নজর,
তারি ফলে ওর
প্রেমে পড়েছেন সেই বিশিষ্ট তরুণ,
যা হোক্ তাহারা দু'য়ে যা কিছু করুন
তাতে কারো ক্ষতি কিছু নেই।
আমরা কেবল যাহা দেখে ফেলি তা-ই লিখিতেই—
মনস্থ করেছি, তাই ভাষাহীন ভাবনায় মন মোর ভরে
প্রেমিকের অব্যক্ত মর্ম্মরে।
সায়াহ্ন সমাপ্ত হলে মিলে দুজনায়
সিনেমাতে যায়
না হয় নতুন কোনো দেশী রেস্তঁরায়
Vimto চালায়।
স্ক্রীন-বীথিকার বাঁকে
পাশাপাশি ঘেঁসে বসে থাকে।

ফাঁকে ফাঁকে
দেখি আর মনে মনে বলি,
নাম কি শ্যামলী ?

কাজলী

প্রচ্ছন্ন দাক্ষিণ্যভারে আঁখি তার নত
স্তম্ভিত মেঘের মত,
ভাষাহারা,
তৃষার্ত্ত-চাতকীপ্রায় বিরহিণী প্যাটার্ণ চেহারা।
'সে যেন গো তমালের ছায়াখানি ;
অথবা বনানী
নিশীথ জ্যোৎস্নায়,
পুরানো পাতারে যবে ঘনীভূত কালো দেখা যায়
সে কালের সে যেন তমাল
কালো তার কাণ্ডসহ দুটি বাহু-ডাল।
তাতে দুটি চক্ষু যেন ফুটন্ত মল্লিকা
স্নিগ্ধ তবু তার মাঝে লুক্কায়িত বিদ্যুতের শিখা ;—
এ গেল ভূমিকা
এখন লিখিব মোরা মূলকাব্য সহ তার টীকা।

পোষ্ট গ্রাজুয়েট্ ক্লাসে পাঠরতা তরুণী মোদের,
এঁর
কাহিনী এখনো কিছু হয় নাই জানা,

পাইনি ঠিকানা ;—
বর্ত্তমানে লিখিছেন চাটুজ্জের ফিলজফি নোট
এবং তাহার সাথে যার পানে চাহিছেন সে নহে 'রিমোট'
বসিয়াছে মুখোমুখি হয়ে,
কি হবে তা ক'য়ে !
তারি সাথে ইদানিং জমিয়াছে ভাব ;
রসেতে পৌছেনি শুধু চলিতেছে অনুভাব এবং বিভাব।
ফুটন্ত মল্লিকা মাঝে বসিয়াছে ঘনকৃষ্ণ অলি
সে কেবলি
উড়ে যেতে চায়
যেথায়
সে তরুণ নীরবে বসিয়া
কটাক্ষ উত্তর শুধু জানাইছে দীর্ঘ নিঃশ্বসিয়া
তা' হেরে মল্লিকা ছুটি ক্ষণে ক্ষণে উঠিছে উজলি'
নাম কি কাজলী ?

—*—

হেঁয়ালী

যারে সে বাসেনি ভালো তারে সে নাচায়,
প্রেমের খাঁচায়
ক্ষণে ক্ষণে বদ্ধ করি' রেখে দেয় তারে,
আলো-অন্ধকারে
সংশয় বাধায় ;
অলক্ষ্যে হাসিয়া ফেলি' প্রেমিকেরে কেবলি কাঁদায়।

বিবাহিতা

আধুনিক সীতা

অযোধ্যা ছাড়িয়া হালে আসিয়াছে নব-বিদ্যালয়ে
নতুন রোমান্স আর পরচর্চ্চা লয়ে
কাটাবে কদিন,
এবং তাহার সাথে জীবনের বীণ
যদি কোনো নব-তারে পারে সে বাজাতে
যা'তে
সুশ্রী ধনী যুবা কোনো ভুলি' তার নারী-ইন্দ্রজালে
যদি ঢালে
তার পায়ে সিনেমা ও রেস্তর্ঁার টাকা
ফাঁকি দিয়ে কিছু কাল ভরি' তার হৃদয়ের ফাঁকা
কাটাবে সুখেতে—
মুখেতে
না বলি' কিছু।
তারপরে যদি সেই হতভাগ্য ধরে তার পিছু
তবে শেষ বেলা
পাগল হওয়ার তার এলোমেলো খেলা
সুরু হবে, সে যুবক নারিবে বুঝিতে
যে দিকে চালাতে যাবে চলিবে সে তারি বিপরীতে।
তারপরে পুনরায় অন্য একদিন
নব-তারে বাঁধি নিয়ে হৃদয়ের বীণ
নতুন যুবক ধরি'
অগ্রসরি'

তারি পায় প্রাণ মন দেবে ঢালি',—
নাম কি হেঁয়ালি ?

—*—

খেয়ালী

মধ্যাহ্নে বিজন বাতায়নে
বসি অন্য মনে
কি দেখে সে ফুটপাথে, অথবা ও পারে
নিরালা ছাদের নীচে দোতালার আধো অন্ধকারে,
যেখানে একটি ছেলে বসে আছে পুস্তক সমেত,
তারি সাথে চলেছে সঙ্কেত ;
হস্তে তার মেঘদূত, দৃষ্টি তবু কটাক্ষ হানিয়া
তরুণের হৃদয় ছানিয়া
কি যেন তুলিতে চায়, কি যেন কি ভাষা—
নহে সুনিবিড় প্রেম, নহে ভালোবাসা।
চুরি-করা চাহনিতে,
রিনি ঠিনি চুড়ির ধ্বনিতে
কেবল করিতে চায় তরুণেরে একটু চঞ্চল,
তারি লাগি খনে খনে উড়ায় অঞ্চল
অলস ঔদাস্য ভরে,
বক্ষ হতে সাড়ী খ'সে পড়ে ;
ইত্যাদি নানান উপাদানে
তারুণ্যে চঞ্চল করি' ভুলাতে সে জানে।

ক্ষণিকের কেলি শুধু, ক্ষণিকের ছল
আকুল বিহ্বল।
মনের খেয়ালে তা-ই করে,
অকস্মাৎ ক্ষণ পরে
নিজেরই খেয়াল মাঝে নিজেরে জড়ায়
বসি' নিরালায়
ওরি নামে
গুপ্তলিপি লেখে নীল খামে
লেখনীতে ভরি' লয়ে প্রচ্ছন্নের কাজলের কালী,—
—নাম কি খেয়ালী?

—*—

কাকলী

কলছন্দে পূর্ণ তার প্রাণ,—
নিত্য গর্জ্জমান
ভাষার কল্লোলে
জাগাইয়া তোলে
বারে বারে
গৃহিণীর বাতগ্রস্ত পঙ্গু-জড়তারে।
চীৎকারে তরঙ্গ তুলি'
কাংস্য-রবে ছোটে তার বাক্য-বাণ গুলি;
গৃহিণীর অন্তুতন ঝি সে
বুঝাইব কিসে

স্থূলাঙ্গী করিণী রূপা গৃহিনীরই new edition
দেখিতে ভীষণ
রামায়ণ-প্রকীর্ত্তিতা রাবণ-ভগিনী,
অভাগিনী
ঝি-গিরি ছাড়া কি আর মিলে নাই অন্য কোনো কাজ !
এমন বেলাজ
কিছুতেই দমিবেনা, নড়িতে চড়িতে ছয় মাস
নিয়ত কোন্দল করা তার কাছে মধুর বিলাস।
কিছু বলিলেই দেখি পঞ্চমে সে চড়াইবে গলা ;
এবং নির্জ্জলা
অনায়াসে বলে যাবে খাঁটি মিথ্যা কথা।
কিন্তু ভাবি, কি যে অপূর্ব্বতা
রহিয়াছে কণ্ঠেতে তাহার !
ইয়া মোটা গলা হতে কি চিক্কণ স্বর ক'রে বা'র
চিক্কণ এবং তাহা চড়ানো সপ্তমে ;
আর ক্রমে ক্রমে
ঝগড়ার শেষ ভাগে ক্লাইমেক্সে চড়ে,
মনে হয় বুঝি ভেঙে পড়ে
দেয়াল চৌচীর হয়ে,
ভেঙে যাক্, তবু বলি চুপে চুপে (এবং সংশয়ে)
গৃহিণীর উচ্চ কণ্ঠ আজ কাল কমই শোনা যায় ;
এতদিন যার লাগি বাড়ীতেই টেকা হতো দায় !
তিনি যে কেমনে
নৈঃশব্দ্যেরে বরিলেন মনে

তাহা আমি কিছুতে বুঝিনা।

তবু হায় ভয়েতে খুঁজিনা

ইহার কারণ,

ঝির সাথে হেরে যদি মোর সাথে সুরু হয় রণ ;—

দাদা, এই বেশ আছি,

ঝিয়ের কল্যাণে আমি হাঁফ ছেড়ে যেন বাঁচিয়াছি।

বুঝিলাম সার,

একমাত্র সেই পারে বিচূর্ণ করিতে মোর গিন্নীর power,

প্রতি নিমেষেই

শুন্‌ছি শুয়েই

বার বার,

বিরক্ত গিন্নীর কণ্ঠ জয় করি' ঝিএর ঝঙ্কার

সারা বেলা উঠিছে চঞ্চলি',—

—নাম কি কাকলী ?

—*—

নাগরী

রঙ্গ-সুনিপুনা

বাহিরে রয়েছে কাঁচা, অন্তরেতে হয়ে গেছে ঝুনা

ঝুনা নারিকেল সম ; কটাক্ষ বর্ষণ মাঝে

নির্দ্দয় বিদ্যুৎঘাত অকস্মাৎ মর্ম্মে এসে বাজে।

টর্পেডো সমান

যাহারে সে বিদ্ধ করে সে তরীকে করে খান খান ;

যুনিভার্সিটির মেয়ে
তারো চেয়ে
রহিয়াছে নানাবিধ অন্য পরিচয়।
বিগত কলেজ যুগে করিয়াছে গোটা পাঁচ ছয়
ছেলেরে ঘায়েল,
না না না পেয়োনা ভয়, মিছে কেন হও তুমি 'পেল্'
ঘায়েলের মানে তুমি অন্যভাবে লইয়াছ বুঝি';
অর্থ তার বোঝো সোজাসুজি—
ছয়টি ছেলের সঙ্গে এক সাথে চালায়েছে প্রেম!
আমিও ছিলেম
তাহাদের একজন।
কিন্তু হায় অবশেষে দেখা গেলো মেয়েটির মন
আমরা পাইনি কেউ!
তাহার প্রেমের ঢেউ
চলিয়াছে সাগর পারায়ে
সেথা কোন্ মিস্টার রায়ে
হরিয়াছে সে মেয়ের মন;
সে এসে যখন
আই-সি-এসের দলে ভিড়িবে বে-বাক্
তখন বিবাহ হবে, যাক্—
বর্ত্তমানে শ্রীমতীর রহিয়াছে অন্য ইতিহাস,
সেই দিন 'ফারপো'তে কিছু তার পেলাম আভাস;
হেরিলাম প্রসাধন-সাধন-চতুরা
ঢালিতেছে আরক্তিম সুরা

ডিকেণ্টার পরিপূর্ণ করি' !
হরি হরি
তার পাশে বসে আছে ইংরেজীর নব্য অধ্যাপক
বিলাতের ডিগ্রীধারী দুই দিকে দুজন স্তাবক !
ওদেরে চিনিনা,
বুঝি নাই cousin বা অন্য কিছু কি না।
জাদুকরী বচনে চলনে
গোপন সে নাহি করে আপন ছলনে।
অকপট লালসারে সোম-রসে করিয়া মধুর
'ভাবী'র বিরহ বুঝি করিতেছে দূর
অধ্যাপক-পুঙ্গবে খেলায়ে,
আকস্মিক কটাক্ষের ঘায়ে
তাহারে ঘায়েল করি',
জানে সে সময় এলে যাবে অগ্রসরি'
অতীতে পশ্চাতে ফেলি' ;
পশ্চাতের কেলি
রহিবে পশ্চাতে !
বিবাহের নবীন প্রভাতে
রাত্রিশেষ জ্যোৎস্নার মতন
অবাস্তব প্রেম আর স্বপ্নে ভরা মন
রেখে যাবে মৃত্যুহীন অমিতের হাতে
শেষ-কবিতাতে।
তারপরে
নূতন বাসরে
শোভনলালের বক্ষে মধু-নিশি রহিবে জাগরি'—
—নাম কি নাগরী ?

—কলেজ বয়

———

নূতন কাগজের প্ল্যান

সম্পাদক মহাশয়,

দোহাই আপনার, নূতন কাগজগুলির বিরুদ্ধে কিছু লিখিবেন না, তাহা হইলে আমার ব্যবসাটি মাটি হইবে। কিরূপে তাহা শুনুন। বেলা এগারোটা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আদালতে থাকি, কিন্তু তবুও সপরিবার অনাহারে মারা যাইতে বসিয়াছি। প্র্যাকটিস্ নাই। গানের গলা ছিল, উপায়ান্তরহীন হইয়া তাহারই সাহায্যে কিছু রোজগার করিয়া খাইতেছি। আপনারা সন্ধ্যার পর মুখে নকল দাড়ি বাঁধিয়া, রং মাখিয়া, নীল চশমা এবং যাত্রার দলের পোযাক পরিয়া যে লোকটাকে নাচিয়া এবং গাহিয়া দাঁতের মাজন বিক্রয় করিতে দেখেন এবং দেখিয়া প্রচুর আনন্দ উপভোগ করেন—সে লোকটা আর কেহই নহে, আমি। আমিই সারাদিন শ্রীপরাশর শর্ম্মা বি-এল, এবং সন্ধ্যার পরে শ্রীযুক্ত বিপিন কবিরাজের দাঁতের মাজন বিক্রেতা "বহুরূপী"! বলা বাহুল্য শ্রীযুক্ত বিপিন কবিরাজও আমি স্বয়ং। কিন্তু ইহাতেও পয়সা হয় না। আপনারা আমার নাচ গানে হাসেন, রহস্য করেন কিন্তু এক পয়সার একটা প্যাকেটও কেনেন না। নিরুপায় হইয়া মাসিক পত্রের এক প্ল্যান আবিষ্কার করিয়াছি, এবং তাহাই বেচিয়া বর্ত্তমানে কোনো রকমে সংসার চালাইব মনে করিয়াছি। আমি আজ দুই বৎসর হইল জার্ম্মানি ও জাপানের সঙ্গে পত্র ব্যবহার করিয়া তবে আমার প্ল্যানে কৃতকার্য্য হইয়াছি। আমি লক্ষ্য করিয়াছি, এবং আপনারা সকলেই লক্ষ্য করিয়াছেন, এদেশের বাজারে জাপানি ও জার্ম্মান মাল ছাড়া আর কিছু বড় একটা চলে না। ইহাতে আমার মনে হয়,

কোনো জাপানী বা জার্মান যদি বাংলা শিখিয়া বাংলা ভাষায় মাসিকপত্র ছাপাইয়া এদেশে পাঠাইতে পারে তাহা হইলে তাহাদেরও খুব লাভ হইবে, এবং আমিও তাহার সোল-এজেন্সি লইয়া লাভবান হইতে পারিব। কারণ উহাদের চেয়ে দেখিতে ভাল এবং শস্তা মাল পৃথিবীর আর কোনো জাতি দিতে পারে না। আমি জার্মানিতে যখন প্রথম চিঠি লিখি, তখন জেনারেল অর্ডার সাপ্লায়ার হের-গাইস্‌ল্যার তাহার উত্তরে লেখেন, মহাশয়, আপনার প্রস্তাব উত্তম কিন্তু আমিও ভারতের বাজার হইতে একটি দ্রব্য এদেশে চালাইতে চাই। আপনি যদি মাল আদান-প্রদানে ব্যবসা করিতে রাজি থাকেন, তাহা হইলে আমার পক্ষে খুব ভাল হয়। আমি আমার একজন কর্ম্মচারিকে আপনার প্রস্তাব-মত বাংলা শিখিবার জন্য আপনার নিকট পাঠাইব; সে যতদিন আপনার নিকট থাকিবে ততদিন আপনি আমার নিকট প্রতি সপ্তাহে এক টন করিয়া মুরগীর ডিম পাঠাইবেন। জার্মানিতে যেরূপ নারী-প্রগতি এবং নারী-আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে তাহাতে আমাদের দুর্দ্দশার চূড়ান্ত হইয়াছে। মহাশয় বলিতে লজ্জা হয়, এই আন্দোলন মুরগী সমাজেও প্রবেশ করিয়াছে এবং ফলে ডিমের দর অসম্ভব চড়িয়া গিয়াছে। এখনই এই, ভবিষ্যতে আরও কি হয় কে জানে! আমরা একমাত্র হাঁসের ডিমের উপর ভরসা করিয়া আছি। হাঁস খুব নিরীহ এবং রক্ষণশীল। কিন্তু এতগুলি ভক্ষণশীল উদরের দাবী একা হাঁস মিটাইতে পারিবে কেন? তাই মহাশয়ের নিকট অনুরোধ, মহাশয় আমার এই প্রস্তাবে রাজি হইয়া কার্য্য আরম্ভ করুন।

আমি ত চিঠি পাইয়া অবাক! জার্মানির পাল্লায় সেবার গোটা য়ুরোপ কাবু হইয়া পড়িয়াছিল, আর আজ এই-হের-গাইস্‌ল্যারের পাল্লায় পড়িয়া আমি কাবু হইবার উপক্রম! একটি জার্মানকে আমার

কাছে রাখিতে হইবে, তদুপরি সপ্তাহে একটন ডিম! রাজি হইতে পারিলাম না।

তখন জাপানে চিঠি লিখিলাম। অনেক চেষ্টার পর জাপান আমার প্রস্তাবে রাজি হইয়াছে। এখন দেশে মাল বিক্রয় করিতে পারিলে উভয় দেশেরই মুখরক্ষা হয়। যে জাপানীটি বাংলা শিখিয়া সম্প্রতি দেশে ফিরিয়া গিয়াছে, তাহার চিঠি পাইয়াছি। আমি তাহাকে একটি নমুনা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলাম, তাহা অনুসরণ করিয়া সে নিজে একখানি পত্রিকা সম্পূর্ণ করিয়াছে। কাগজখানি চল্লিশ পৃষ্ঠার হইয়াছে। দুইখানি রঙিন ও দশখানি একরঙা ছবি আছে। উহাতে চারিটি বিভাগ আছে। প্রথম বিভাগে দুইটি প্রবন্ধ, (১)দেশ সেবা (২)আর্ট ফর আর্ট‍্স সেক। দ্বিতীয় বিভাগে কবিতা, সংখ্যা তিন। তৃতীয় বিভাগে একটি সম্পূর্ণ গল্প ও একটি ক্রমশ-প্রকাশ্য উপন্যাস। চতুর্থ বিভাগে সাময়িক মন্তব্য। পত্রিকার মূল্য এক পয়সা। আমার বিশ্বাস, কিছুদিনের মধ্যে দেশী কাগজগুলি জাপানের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় হারিয়া যাইবে, কারণ এরূপ উৎকৃষ্ট ছাপা কাগজ এক পয়সা মূল্যে আর কেহই দিতে পারিবে না। প্রত্যহ নূতন কাগজ বাহির হওয়া ব্যাপারে আপনারা যে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিতেছেন, তাহাও আর দরকার হইবে না। আমার এই কাগজখানি বাজারে নূতন বাহির হইল বটে কিন্তু অতঃপর আর কোনো নূতন কাগজ বাহির হইতে পারিবে না। মাসিক খানা চালু হইলেই সাপ্তাহিক কাগজও জাপান হইতে আসিবে। চারি সপ্তাহের কাগজ একই সঙ্গে একই জাহাজে আনাইব—ইহাতে দাম খুবই কম পড়িবে। এই গরীবের দেশে আট আনা এক টাকা দিয়া মাসিকপত্র কেনা আর আত্মহত্যা করা একই কথা। আমরা জাপানী কাগজের বিজ্ঞাপন হিসাবে কিছু নমুনা এইখানে উদ্ধৃত করিতেছি।

প্রথম প্রবন্ধ

দেশ সেবা

দেশসেবা করিতে, চাই আত্মত্যাগ, স্বদেশী দ্রব্যের ব্যবহার এবং তেল। কিন্তু এই কথা প্রচার করিবার জন্য আমরা জাপান হইতে মাসিকপত্র ছাপাইয়া প্রচার করিতেছি কেন? কারণ, প্রচার করাই যেখানে উদ্দেশ্য সেখানে স্বদেশী-বিদেশীর প্রশ্ন উঠে না। আমরা চাই স্বদেশী ব্যবহারের বার্ত্তা ঘরে ঘরে প্রচারিত হউক। স্বদেশী কাগজে স্বদেশী যন্ত্রে ইহা ছাপা যায় বটে কিন্তু প্রচার হয় না। আমাদের এক পয়সার এই সুবৃহৎ মাসিক বাংলাদেশের ঘরে ঘরে প্রবেশলাভ করিবে, সুতরাং আমাদের বাণীও ঘরে ঘরে প্রচারিত হইবে। আমাদের উদ্দেশ্য যদি ঠিক থাকে তাহা হইলে উপায় লইয়া ভাবা অনুচিত। বাঙালী জাতির উদ্দেশ্যের ঠিক নাই। উদ্দেশ্য যদি খদ্দর প্রচার হয় তাহা হইলে খদ্দরই প্রচার করা চাই—উদ্দেশ্য যদি সাহিত্য প্রচার হয় তাহা হইলে সাহিত্যই প্রচার করিতে হইবে—পরিবর্ত্তে অন্য কিছু চলিবে না। চালাইলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। আমাদের মনে হয় খদ্দর প্রচার করিতে হইলে জাপান কিংবা জার্মানি কিংবা ইংলণ্ড হইতে শস্তা খদ্দর প্রস্তুত করাইয়া আনা প্রয়োজন। এরূপ ভাবে যদি এক জোড়া খদ্দর আট আনায় পাওয়া যায় তাহা হইলে বাকী দুই টাকা আমরা দেশের অন্য কাজে ব্যয় করিতে পারি। কথা একই। এক জোড়া দেশী খদ্দর আড়াই টাকা দিয়া কেনার অর্থ ঐ আড়াই টাকা দেশীয় লোককে দেওয়া। আমরা যদি আট আনায় বিদেশী খদ্দর কিনিয়া দুই টাকা দেশীয় লোককে দান করি তাহা হইলে দান করাও

হয়, অথচ দেশও কাপড় তৈয়ারীর খাটুনি হইতে নিষ্কৃতি পায়। দেশ সেবার এই নূতন ভঙ্গিটি সকলকে ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

এইরূপ কোনো বক্তা যদি মদ না খাইলে বক্তৃতা দিতে না পারেন তাহা হইলে তাঁহাকে মদ খাইতে দেওয়াই সমীচীন। বক্তৃতাই যেখানে উদ্দেশ্য সেখানে বক্তৃতার গন্ধ শুঁকিতে যাওয়া অন্যায়। কোনো বাগ্মী সুগন্ধ বা দুর্গন্ধ বক্তৃতা দিয়াছেন বলিয়া এপর্য্যন্ত শুনি নাই। (এতৎ-প্রসঙ্গে বলিতে চাই যে জাপানী বিয়ার খুব শস্তা।) প্রত্যেকটি কাজই উদ্দেশ্যমূলক হওয়া বাঞ্ছনীয়, কিন্তু বহু উদ্দেশ্য এক সঙ্গে জড়াইয়া ফেলা আবার বহু বিবাহের মতই বর্জ্জনীয়। প্রকৃত দেশসেবা মাসিক পত্র এবং তেলের কলে যতটা হয় শুধু মাসিকপত্রে বা শুধু তেলের কলে ততটা হয় না। উভয়ের উদ্দেশ্যই এক। বাজার হইতে তেল তুলিয়া দিলে মাসিকপত্রও উঠিয়া যাইবে, আবার মাসিক পত্র তুলিয়া দিলেও তেল উঠিয়া যাইবে। কিন্তু এইখানে প্রশ্ন উঠে, তেল কয় প্রকার? বেঙ্গল কেমিক্যাল ইহার উত্তর খানিকটা দিয়াছেন, কিন্তু সম্পূর্ণ দিতে পারেন নাই। সরিষার তেল তাঁহাদের প্রসাধন তালিকায় স্থান পায় নাই। এবং এই কারণেই বেঙ্গল কেমিক্যাল কোনো বাংলা মাসিকপত্র বাহির করেন নাই। করিলে বুঝিতে পারিতেন, সরিষার তেল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ভারতে পূর্ব্বে যে সমৃদ্ধি ছিল তাহার মূলে সরিষার তেল। এই সমৃদ্ধির মূল খুঁজিতে গেলেও সরিষার তেলের প্রদীপ চাই। আজ বিদ্যুতের আলো জ্বালিতেছি বটে, কিন্তু পিছু হটিতে আরম্ভ করিলে একশত বৎসরও যাওয়া চলিবে না, মাঝপথে বিদ্যুতের আলো নিভিয়া যাইবে। সুতরাং আমাদের এই জাপান হইতে মুদ্রিত কাগজও প্রধানত সরিষার তেল বিষয়ক হইবে। ইহার প্রধান কারণ, সরিষার তেল উদ্দেশ্য-মূলক;

ইহাতে আলো জ্বলে, আলু পটল ভাজা হয়, গাত্রে মর্দ্দন করা যায়—এমন কি ইহা দেব পূজাতেও লাগে।

কিন্তু সরিষা নামক বস্তু তেল প্রদান করে কেন? এক কথায় ইহার উত্তর দেওয়া যায় না। এই কথার উত্তর দিবার জন্যই এই স্থানটি নির্দ্দিষ্ট রহিল—এক বৎসর ধরিয়া ইহার মীমাংসা করিব। কিন্তু তৎপূর্ব্বে একটি কথা বলা আবশ্যক। আপনারা সকলেই জানেন সরিষা এক প্রকার গাছের ফল। কিন্তু এইক্ষণে জানিয়া রাখুন ইহা কর্ম্মফল। ইতি প্রথম পর্ব্ব। —শ্রীপুরুষকার।

কবিতা বিভাগ

আদাওয়ালা

আদা বেচে খেত' আদার ব্যাপারী নাম কড়মড় ভয়ঙ্কর,
আসল নামটা বাদ দিয়ে তাই লোকে নাম দিল শ্রীনটবর।
ভাগ্যে ডাঙায় উঠে আসে মাছ
আঙুল ফুলিয়া হয় কলাগাছ
ভাগ্যে নটুর টাকার বটুয়া—ক্রমে স্ফীত হয় তার উদর।
ক্রমে বটুয়ার পেট ফুলে ঢাক্
টিকি ঘিরে তার দেখা দিল টাক্
দেশের লোকের লেগে গেল তাক্—গোঁফে দেয় পাক্ শ্রীনটবর।
কিন্তু তবুও মনে রয় জ্বালা
সকলেই বলে নটু আদা ও'লা—
কানে দিলে তুলা লোকে ডেকে বলে—কান-ফুটো ন'টো আদা কি দর?

পঁচিশ বছর ভেবে নটবর শেষে একদিন করিল স্থির—
জাহাজ একটা কিনিয়া এবার জাঁকায়ে তুলিবে ব্যবসা ঘি'র।
যুগ যুগ হ'তে ভেজাল খাইয়া
দেশ জুড়ে হ'ল ডিসপেপ্‌সিয়া
দেশহিত ব্রত, খাঁটি গাওয়া ঘৃত দিব আমি, নটু করে জাহির॥
এ নহে ব্যবসা লাভের জন্য
দেশের দুঃখে রোচে না অন্ন,
টাকা নগণ্য, তাই পত্তন-দান লিমিটেড কোম্পানির॥

—শ্রীঅদৃষ্ট

হিতোপদেশ

পুরুষ বলিয়া যারে জানিতাম এতদিন
বীর্য্যহীন আচরণ তার।
ব্রাহ্মণ বলিয়া যারে ভেবেছিনু, দেখি আজ
বণিক সে নব সভ্যতার।

কুসুমের সুষমায় মুগ্ধ লুব্ধ মধুকর
কাছে গিয়া দেখে এ কি ভুল!
ছদ্মবেশে মিথ্যারূপে ভুলাইল তারে আজি
অতি ক্ষুদ্র কাগজের ফুল।

লক্ষ্মীর আরতি করি ভারতীর কৃপাকণা!
অঙ্কুশ হইতে কিশলয়!

ময়ূরের ডিম্ব ভেদি বাহিরায় সর্পশিশু ?
বিস্ময় যে হল বিষময়।

বিষ্ণুশর্ম্মা ডাক দিয়া কহিলেন, "ওরে বৎস
ভুলিস্ না পুরাতন পাঠ—
নীলবর্ণ শৃগালেতে পরিপূর্ণ এ সংসার
ভুলিলেই ঘটিবে বিভ্রাট !"

"লীলাময়"

গল্পবিভাগ

রক্তপথের যাত্রী

যক্ষ্মা হাসপাতাল। প্রকাণ্ড দোতালার ঘর, চারিদিক খোলা। ঘরের মাঝখানে পার্টিশন। পার্টিশনের উচ্চতা ছয় ফুট; উপরে ফাঁকা, হাওয়া খেলিবার সুবিধা। পার্টিশনের একদিকে পুরুষ, অন্য দিকে স্ত্রীলোক, সকলেই রোগী।

সুধাংশু আজ তিন মাস এখানে পড়িয়া আছে। রক্ত উঠা বন্ধ হইয়াছে। সন্ধ্যায় এখনো জ্বর হয়,—চক্ষু কোটরগত, দেহে কঙ্কালের উপরে একখানি চামড়ার আবরণ। বুকখানা ঠেলিয়া উঁচু হইয়া উঠিয়াছে। থক্—থক্—থক্। মাথা ঘুরিয়া যায়—সর্ব্বাঙ্গ ঘামিয়া উঠে, সুধাংশু সমস্ত দিন বিছানায় পড়িয়া থাকে।

সুলেখা আসিয়াছে তিন দিন। সুধাংশুর হৃদযন্ত্র তিন দিন হইতে একটু দ্রুত চলিতেছে।

সুধাংশু সকালে একটু একটু ঘুরিয়া বেড়ায়। হাসপাতালই তাহার

পৃথিবী। এই পৃথিবীর বাহিরে যে একটা বৃহত্তর পৃথিবী আছে তাহা তাহার প্রায় ভুল হইয়া গিয়াছে।

যক্ষ্মার বীজাণু এতগুলি নরনারীকে একত্র আনিয়া মিলাইয়াছে!

দেয়ালের ওপার হইতে মেয়েদের কথাবার্তার টুকরা এপারে ভাসিয়া আসে। বাহিরের ফুলের বাগান হইতে কখনো একটা মৃদু গন্ধের প্রবাহ বহিয়া যায়। সুধাংশু মনে করে, হায়রে দেয়াল!

সুধাংশু দুর্ব্বল। তদুপরি বিশ্রাম তাহার ব্যবস্থা।

—ডাক্তারবাবু, একটু চলাফেরা না করলে ত আর শুয়ে শুয়ে থাকা যায় না।

—সকালে বাগানে বেড়াচ্ছেন; তার বেশি এখন চলবে না।

২

পার্টিশনের অপর পার্শ্ব।

—ডাক্তারবাবু, আমার বিছানাটা দয়া করে এখান থেকে সরিয়ে দেবেন? সুলেখা বলে।

—কেন?

—দেয়ালের ওপাশ থেকে রাত্রে একটা পুরুষের মাথা যেন উঁচু হয়ে ওঠে—হয় ত স্বপ্ন হবে—কিন্তু রোজই দেখছি।

ডাক্তারবাবু শুনিয়া হাসেন, বলেন, ও কিছু না, দুর্ব্বলতাটা কেটে গেলেই আর কেউ মাথা দেখাবে না।

৩

সাত দিন পরে।

রাত্রি ৩টা বাজিয়া গিয়াছে। সুধাংশু এবং সুলেখা বারান্দার এক কোণে বসিয়া।

এতদিন পরে আবার সুধাংশুর কাসিতে রক্ত দেখা দিয়াছে।

—সুলেখা, আমরা মিলেছি যুদ্ধক্ষেত্রে।

—কিসের যুদ্ধ?

—যক্ষ্মার সঙ্গে মানুষের। এ রক্তপাত কি ব্যর্থ হবে?

—হয়ত হবে, কিন্তু আজ আর যুদ্ধ নয়। আমরা রক্তপথে যাত্রা করেই মিলেছি—এই পথকে আজ নমস্কার করি।

—কিন্তু তোমার সীঁথিঁতে যে রক্ত-রেখা জ্বল জ্বল করছে—পথ যে বড় ভয়ানক।

সুলেখা চমকিয়া উঠিয়া বলে—ঐ চীনে সিঁদুরের মূল্য আধ পয়সাও না। বল ত এখুনি ধুয়ে ফেলি।

—তুমি কি বিবাহকে সম্মান কর না?

—আজকের দিনে ঐ জীর্ণ সংস্কারটার কথা বলে আমার মন খারাপ করে দিও না। আমি ত সংস্কারের প্রাচীরেই মানুষ হয়েছিলাম। কিন্তু হঠাৎ স্বামী হলেন সাহিত্যিক, বাড়িতে বসল মাসিক পত্রের আড্ডা। তারপর একদল কবির আমদানি হল—স্বামী রইলেন মাসিক নিয়ে, তারা এল আমার দিকে। বুঝিয়ে দিল, মানুষ বিবাহের চেয়ে বড়। এক বছর না ঘুরতেই হল যক্ষ্মা। সামলাতে পারি নি। স্বামী আমায় ত্যাগ করেছেন, কবিরা সরে পড়েছে—আমি আজ একা—এই বিশ্ব সংসারে একেবারে একা।

সুলেখা সুধাংশুর পায়ের কাছে বসিয়া পড়ে। বলে, আজ তুমি আমাকে নাও। আমি এগার জনকে আত্মদান করেছি—কেউ নেয় নি। আমার ফুসফুসের পরিচয় তারা জেনে ফেলেছিল। হতভাগারা হৃৎপিণ্ডটাকে তুচ্ছ করল।

—কি, চুপ করে রইলে যে ?

সুধাংশু চুপ করিয়াই থাকে। কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ মুক্ত আকাশে হাসে, নীচে বাগান হইতে হাস্না হানার উগ্র গন্ধ নেশা ধরাইয়া দেয়—সেই চাঁদের আলোয়, ফুলের গন্ধে, সুধাংশু এবং সুলেখা বসিয়া বসিয়া ফুসফুস হইতে রক্ত ছিটাইতে থাকে।

সুধাংশু বিহ্বল হইয়া উঠিয়াছে—তাহার কথা বলিবার ক্ষমতা নাই।

সুলেখার চোখ জলে ভরিয়া উঠে ; টপ টপ করিয়া তাহা সুধাংশুর পায়ের উপর ঝরিয়া পড়ে। সুধাংশু পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া পা দুখানি ঢাকিয়া দেয়।

সুলেখা অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে—ওগো আমার নিবেদন কি ব্যর্থ হবে ?

সুধাংশু গম্ভীর ভাবে বলে, খুব সম্ভব।

—কেন ?

—আমিই তোমার স্বামী, আজ এক বছর ইনফেকশন নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

—তুমি ? কি সর্ব্বনাশ, অন্ধকারের পরিচয়, অন্ধকারে ঢাকা রইল না ! যক্ষ্মার চেহারা—কেউ কাউকে চেনে না, ফিসফাস ভাষা, মৃদু স্বর, মৃদু কাসি। কিন্তু তোমাকে আমি মিথ্যা পরিচয় দিয়েছি—আমাকে ক্ষমা কোরো। আমি তোমার স্ত্রী অনিলা নই, আমি তোমার কবি-বন্ধু তরুণ সেনের স্ত্রী—সুলেখা।

সুধাংশু আবেগ ভরে তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়া উঠে, তুমি আমায় বাঁচালে সুলেখা, তুমি আমায় বাঁচালে।

প্রবন্ধ বিভাগ

আর্ট ফর আর্টস্ সেক্

কথা উঠিয়াছে, আর্ট আর্টের জন্য চর্চ্চা করিতে হইবে না সাংসারিক উন্নতির জন্য চর্চ্চা করিতে হইবে? যাঁহারা বলেন আর্টের নিজের কোনো সত্তা নাই, তাঁহারা ভুল বলেন। আবার যাঁহারা বলেন আর্টই আর্টের পরিচয় তাঁহারাও ভুল বলেন। আমরা বলি, আর্ট সাংসারিক উন্নতিরও সোপান নহে, আর্টেও আর্টের পরিচয় নাই। ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য বলিতেছি। শ্রীকৃষ্ণ বলেন, কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে। অর্থাৎ কর্ম্মের জন্যই কর্ম্ম করিবে। শ্রীকৃষ্ণকে ভাষান্তরিত করিলেই "আর্ট ফর আর্টস্ সেক্" কথাটি পাওয়া। গীতা আমাদের ধর্ম্মপুস্তক, গীতার নির্দ্দেশ অমান্য করা চলে না। কিন্তু ফল না চাহিয়া কর্ম্ম করিতে হইবে ইহা দেশপ্রেমিক, মানেন না। তাঁহারা বলেন যাহাই করিব তাহাতেই দেশের কাজ কিছু অগ্রসর হওয়া চাই। এমন কি যদি কাঁদিতে হয় তাহা হইলেও তুলসী তলায় বসিয়া কাঁদা উচিত। ইহাতে কাঁদাও হয়, গাছও কিঞ্চিত জল পায়। সুতরাং যাঁহারা আর্ট ফর আর্টস্ সেক্-এর বিরোধী তাঁহারা হিন্দু নহেন।

কিন্তু আমরা মনে করি দুইটি বিরোধী দল একই বস্তুর দুইটি দিক লইয়া তর্ক করিতেছেন। কোনো এক দল একসঙ্গে দুইটি দিক দেখিতে পাইতেছে না। মনে করা যাউক আর্টিষ্ট এমন একটি চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন যাহা দেখিতে সুন্দর কিন্তু সংসারের কোনো কাজে লাগেনা। ঠিক যেন গোলাপ ফুল। দেখিতে ভাল, গন্ধ আছে, কিন্তু ভাজিয়া

খাওয়া যায় না, পিষিলেও তেল বাহির হয় না। এখন এরূপ চিত্রকে অনুমোদন করিব কিনা। অর্থাৎ ইহাকে দেশের মধ্যে প্রচার করিব কিনা। প্রচার করিব। এবং প্রচার করিবার পর যদি কেহ বলেন, "ইহা আর্ট ফর আর্টস্ সেক, অতএব ইহা আমরা মানিব না," তাহা হইলে তাহার উত্তরে বলিব, এই চিত্র প্রচার দ্বারা বহু লোকের অন্ন সংস্থান হইয়াছে, বিনা পয়সায় প্রচার হয় নাই। হাজার লোক ইহা কিনিয়া না হয় একটু খুশী হইয়াছে, ইহার বেশি কেহ কিছু লাভ করে নাই, কিন্তু যত লোকের পরিশ্রমে ইহার প্রচার হইয়াছে তাহাদের লাভটা কি ধর্ত্তব্যই নহে? এইটুকু স্বীকার করিলে, আর্ট যে জন্যই হউক, তাহাতেই যে দেশের কিছু লাভ হয় একথা না মানিয়া উপায় নাই। * * *

সম্পাদকীয়

সম্পাদকীয় বিভাগে বিশেষ কিছুই বলিবার নাই। সত্য সত্যই যাহা বলা উচিত তাহা তৃতীয় বর্ষে বলিব। প্রথম দুই বৎসর একটু বিশ্রাম করিতে চাই। তবে বিশ্রাম করিতে করিতে যাহা বলা যায় তাহাই বলিব। আমাদের শেষ কথা হইবে কৃষি বিষয়ে—কিন্তু বর্ত্তমানে সিনেমা সম্বন্ধে কিছু না বলিলে চলিবে না। আমরা হিন্দু, মায়ের নাম স্মরণ করিয়াই কার্য্য আরম্ভ করিব। সিনে-মা শব্দটি মাতৃ-গর্ভ এবং সেই কারণেই ইহা আমাদের যাত্রারম্ভে আশীর্ব্বাদের মত কার্য্য করিবে। আমরা দেখাইব ডগলাস ফেয়ার ব্যাঙ্ক্‌স্-এর ব্যাঙ্কে যত টাকা আছে তাহা ন্যান্‌সি ক্যারলের টাকার সহিত তুলনীয় নহে। ইহা আমরা প্রমাণ করিব। পাঠকগণ নিরাশ হইবেন না। সিক্রেট অব মাডাম

ব্রাঁশ বইতে যে শিশুটি অভিনয় করিয়াছে সে এক বৎসর বয়সে কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিবে, এবং আজীবন পেনশন পাইবে। গ্রেটা গার্ব্বোর পরিত্যক্ত গাউন ভারতবর্ষের এক ধনী ব্যক্তি ক্রয় করিবেন বলিয়া গুজব শুনা যাইতেছে। মার্লেনে ডীট্রিশ গত জানুয়ারি মাসে তিন দিন হোটেলে খাইয়াছেন। ফ্রেডরিক মার্চ রাত্রিতে নিশ্চিন্তমনে ঘুমাইয়া থাকেন। মে ওয়েষ্ট অর্দ্ধ মাইল হাঁটিয়া বেড়াইয়াছেন। চার্লি চ্যাপলিনের মাসিক আয় এক ডলার বৃদ্ধি পাইয়াছে। জ্যানেট গেনর ভারতবর্ষের নাম শুনিয়াছেন। আইরীন ডানের বিবাহ হইয়াছে, তিনি শীঘ্রই দাঁত scraping করাইবেন।

আমরা এই জাতীয় সংবাদ প্রতিমাসে সচিত্র ছাপিব। এ সংখ্যায় আমাদের পত্রিকার সংক্ষিপ্ত নমুনা দিলাম; আশা করি পাঠকগণ আমাদের কথার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন।

সন্ধ্যা গাঢ় হইয়া আসিতেছে। আর দেরী করা উচিত হয় না। আমাকে এখনি মুখে রঙ এবং দাড়ি লাগাইয়া নীল চশমা পরিয়া দাঁতের মাজন বিক্রয়ের জন্য পথে বাহির হইতে হইবে। আরো দিনকত এ কার্য্যটি করিব, তাহার পর, আশা করিতেছি মাসিক খানা শীঘ্রই দাঁড়াইয়া যাইবে। ইতি

শ্রীপরাশর শর্ম্মা

"Did your friend completely recover from his accident ?" "No, complications set in" "Really ? how ?" "He married the nurse."

"পড়ে ফার্সী বেচে তেল্
দেখো তক্‌দির্‌কা খেল"

নব্য গৌড়ের অর্ব্বাচীন অচল-আয়তন-এর অন্তেবাসীকে প্রশ্ন করা গিয়াছিল—"মশায়ের কি করা হয় ?" তিনি উত্তর দিয়াছিলেন—"আজ্ঞে, বী-এ পরীক্ষা দিয়া থাকি।"

"কি করেন ?"—এই প্রশ্নের উত্তরে আমিও বলিতে পারি—"আজ্ঞে, বেকারি করিয়া থাকি।"

এই গেল গল্পাণু'র ভূমিকা।

শহরে গিয়াছিলাম—বংশী-বদন কটন মিল্‌স্‌-এ একটা চাক্রী থালি আছে—এই খবর পাইয়া। গিয়া খবর পাইলাম, চাক্রী-ই বটে, তবে 'আছে' নহে, 'ছিল'।

বাড়ি ফিরিতেছিলাম। বাড়িতে আছেন সবাই, নাই শুধু ভাত।

পাঞ্জাবির দুই পকেটে দুইটি পয়সা যুযুৎসু রাজ্যদ্বয়ের মতো নিষ্ফল আক্রোশে glum (গুম) হইয়া রহিয়াছে—মাঝখানে আমি buffer state-এর মতো দাঁড়াইয়া আছি কি না—তাই। যাহাই হৌক—শেষ পর্য্যন্ত উহাদের মিলন ঘটাইবার জন্যই বোধ হয়—দুই পয়সার মুড়ি কিনিয়া খাইয়া ফেলিলাম। দাউ দাউ করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠিল—পেটে। কোনো Fire Insurance Company-র কর্ত্তৃপক্ষই নাকি এ-জাতীয় case-কে বীমা-যোগ্য বলিয়া বিবেচনা করেন না।

যাহা হউক—অর্দ্ধ-ঘটি জলের সাহায্যে আগুন নিবাইলাম। আগুন নিবিল সত্য, জ্বালা কমিল না।

*   *   *

কোনো বড় লোকের বাড়িই হইবে। তিন চারিটা কুকুর পরম আনন্দে ভাত-মাছ গিলিতেছে, চিবাইবার ফুরসৎ-ও নাই। নিতান্ত আঁস্তাকুড় বলিয়াই উহাদের দলপুষ্টির উদীয়মান ইচ্ছাটি দমাইয়া ফেলিলাম।

*   *   *

বছর দুই কাটিয়া গিয়াছে—কিন্তু একটা সমস্যার জবাব মিলিতেছে না:—কোন্ দুষ্কৃতি-বলে কুকুরগুলি কুকুর-জন্ম পাইল, আর কোন সুকৃতির ফলে চৌরাশি-লক্ষ-যোনি-ভ্রমণ-অন্তে আমি সুদুর্লভ মানব-জন্ম পাইয়াছি? কোন্ পত্রিকা পড়িলে ইহার জবাব পাওয়া যাইবে?

—দণ্ডপাণি উপাধ্যায়

Wife (to husband at 2 a.m.): "This is the last I will stand. From now on, every time you get drunk, I shall refrain from speaking to you for a week."

Husband: "Make it a month, dear. You know I'm not a heavy drinker."

পুরাতন পঞ্জিকা ঃ একশত বৎসর পরে

মরিয়াও স্বস্তি নাই, কি জানি কখন
গবেষণা-চশমিত তাঁহার নয়ন
পুরাতন নথি ঘেঁটে করে আবিষ্কার
এত খানি জল ছিল এত দুধে কার।
এই ধর জানিতাম শ্রীরামমোহন
উপনিষদের গাভী করিয়া দোহন
ধর্ম্মিলেন * ব্রাহ্মধর্ম্ম, তিনি নব্য ব্যাস
কে জানিত তার মাঝে ছিল এত ড্যাশ!
একবার যদি তাঁর কুষ্ঠী খানা পাই
ফুটপাথে বসা কোনো গণকে দেখাই—
হয়তো দেখিব আছে যশোহানি তাঁর
মৃত্যুর শতাব্দী পরে। এর চেয়ে আর
বড় কি প্রমাণ আছে, বল দেখি মন,
মরিলে যে ফুরায় না মনুষ্য-জীবন!

---

* "Michael thou shoulds't be living at this hour. Poets have need of thee!" তোমার নজীর না থাকিলে কি ক্রিয়া কর্ম্মের উপর এমন নিরঙ্কুশ হইতে পারিতাম? বিশেষত, এটা Radio-activityর যুগ, এক পদার্থ অন্ত পদার্থে (অপদার্থে?) রূপান্তরিত হইতেছে, শব্দ তো দূরের কথা। তুমি বাঁচিয়া থাকো, তোমার উপরে হস্তক্ষেপ করিলে আমরা ব্রজেনদার উপরে হস্ত প্রক্ষেপ করিব, কিন্তু অন্ত অতি-হস্তের (super-hand) জামিন হইতে পারিব না।

কল্পনায় দেখিতেছি, নন্দন সভায়
অমর বাঙালী সবে উদ্বিগ্নের প্রায়
চেয়ে আছে সশঙ্কিত পরিষদ পানে
গ্রন্থাগারিকের দিকে, হ'ল তার মানে।
সংবাদ-পত্রের রাজ্যে হে পরশুরাম
তব হস্তে ধ্বস্ত হল কত না সুনাম।
সাহিত্য-পরিষদের তুমি হিট্‌লার ;
মাথায় খাড়াই হবে ছয় ফীট যার ;
গবেষণা-সাহিত্যের পিরামিড সম
আকৃতি ও প্রকৃতিতে, তোমা নমো নমো
হয়তো শুনিব স্বর্গে রথ হ'তে নামি
হয়ে গেছে সুপ্রমাণ, ছিলাম না আমি।
পাছে অপ্রমাণ হই সেই ভয়ে এই
গুণ তব গাহিলাম সরস পদ্যেই,
কিছু গুণ গাহিলাম বাকি ব'ল উহ্যে
ন'ম তাঁর সুপ্রসিদ্ধ ব্রজেন বাঁড়ুয্যে

"কিছুই মনে থাকছে না, এ কথা আজ ডাক্তারকে বলেছি।" "ডাক্তার কি বল্লেন ?"' 'তাঁর ফীটা অগ্রিম চেয়ে নিলেন।"

—

নিবেদন

শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস পুনরায় শনিবারের চিঠির পরিচালনাভার গ্রহণ করিলেন। গত দুই বৎসর 'চিঠির' সম্পূর্ণ ভার আমার একার উপর পড়ায় আমাকে যে সকল অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল সজনীবাবু পুনরায় ইহাতে যোগদান করায় সেই সব অসুবিধা দূর হইল। এখন হইতে 'চিঠি' যাহাতে সকল বিষয়ে চিত্তাকর্ষক হয় আমরা সেজন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছি।

শনিবারের চিঠির পরিচালনা-অফিসের নূতন ঠিকানা হইয়াছে। টাকা কড়ি এবং গ্রাহক-সম্পর্কিত যাবতীয় চিঠি দাস এণ্ড কোং বি-৩ ভারত ভবন, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ (ভিক্টোরিয়া হাউসের নিকট) কলিকাতা, এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। সম্পাদকীয় অফিস ২৫।২ মোহনবাগান রো, ঠিকানাতেই রহিল।

শ্রীপরিমল গোস্বামী

সংবাদ-সাহিত্য

পৃথিবী এককালে বাষ্পাকার ছিল। লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া সেই বাষ্প জমাট বাঁধিয়া প্রথমত জল, তারপর জল হইতে বহু রূপান্তরের পথে বর্তমানের এই জটিল রূপ। একটিমাত্র কোষদ্বারা গঠিত প্রাণী আজ বহু-কোষে অভিব্যক্ত হইয়া অবশেষে বিশ্বকোষ এবং মহাকোষে আসিয়া ঠেকিয়াছে ; অপরং কিং বা ভবিষ্যতি!

—

বিশ্বপৃথিবীর অভিব্যক্তির এই ধারাটি বৈজ্ঞানিকেরা আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, যাহা ছিল অত্যন্ত সরল, তাহাই পরিণামে অত্যন্ত জটিল হইয়া পড়িয়াছে, এবং এই পরিণামের পথে চলার নামই অভিব্যক্তি। ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ একটি প্রশ্ন মনে আসিল। এই যে প্রতি মাসেই বাংলা দেশে নূতন নূতন পত্রিকা বাহির হইতেছে, ইহার বীজ এতদিন কোথায় লুকাইয়া ছিল? ইহা কি কোনো নিয়মিত অভিব্যক্তির ধারা বাহিয়া বর্তমান অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে না কেবলমাত্র আরম্ভ হইয়া কোনো-কিছুর সূচনা করিতেছে? ইহার উত্তর নাই।

—

বর্তমান ফেব্রুয়ারি মাসেও এই শহরে একখানি মাসিক ও অন্তত দুইখানি সাপ্তাহিক নূতন প্রকাশিত হইল। খুব কমই মনে হইতেছে। কারণ বাঙালী মাত্রেরই বলিবার মত যত কথা আছে তাহার তুলনায় ইহা কিছুই নহে। কোটি কোটি কণ্ঠের কলরব ত কেবল হাওয়ায়

একটু তরঙ্গ তুলিয়াই মিলাইয়া যাইতে পারে না। তাহা পত্রে পত্রে মুদ্রিত করিয়া না যাইতে পারিলে ভবিষ্যতের ইতিহাস রচনা হইবে কিসের দ্বারা? বেশি নহে, দুইশত বৎসর পূর্ব্বে যদি বাংলা দেশে পত্রিকা বাহির করিবার রীতি প্রচলিত থাকিত তাহা হইলে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বাহির করিবার জন্য এরূপ গলদঘর্ম্ম হইয়া মরিতে হইত না।

পুরাকালে মানুষের ভাষা পাষাণে খোদিত হইয়াছে, কিন্তু সে পাষাণ পথে পথে ফেরি করিবার উপায় ছিল না, তাহা ডাকে পাঠানো যাইত না, তাহার পুনর্মুদ্রন হইত না। দৈনিক, সাপ্তাহিক বা মাসিক পাষাণ-লিপি ছিল না। যাহা প্রস্তুত হইত তাহা এক বারের জন্য এবং চিরকালের জন্যই প্রস্তুত হইত। সে যুগের প্রকাশ ছিল কাল-নিরপেক্ষ। কিন্তু বর্ত্তমানে আমরা কালাতীতকে বিশ্বাস করি না, আমরা বর্ত্তমানকে লইয়াই ব্যস্ত। অদ্যকার দিনে যদি পাথুরে পত্রিকা বাহির করিতে হইত তাহা হইলে এক বাংলাদেশের দাবী মিটাইতে হিমালয়ের মত পর্ব্বতও প্রথম মাসেই ফুরাইয়া যাইত। আর যদি বর্ত্তমান-সাহিত্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের উক্তি ঠিক হয়, তাহা হইলে ত পাথরে কিছু খোদাই করিবারই আবশ্যকতা হইত না, লক্ষ লক্ষ প্রস্তর-খণ্ড সাহিত্যিকগণ পরস্পরের শিরে নিক্ষেপ করিত, এবং তাহারই নাম হইত আধুনিক সাহিত্য।

—

আমরা কিন্তু আধুনিক সাহিত্যকে কেবল মাত্র মাথা ফাটাইবার কাজে নিযুক্ত বলিয়া মনে করি না। ইহার উদ্দেশ্য অন্যপ্রকার। মানুষ যাহা বলে তাহাই ভাষা এবং তাহাই সাহিত্য। মানুষ নহে, বাঙালী

বাঙালী ভাল করিয়াই বুঝিয়াছে, তাহার বাগযন্ত্র হইতে যাহা কিছু বাহির হয় তাহাই inspired. সুতরাং কোনোরকমে গোটা কুড়ি টাকা সংগ্রহ করিয়া রীম পাঁচেক কাগজ কিনিয়া ফেলিতে পারিলেই মার্ দিয়া! অলিতে গলিতে, গৃহে গৃহে বাঙালী তাহার বাণী ছাপাইয়া ফেলিতেছে—না ছাপাইলে তাহা যে কেবল বায়ুমণ্ডলে তরঙ্গ তুলিয়া অনন্ত শূন্যে মিলাইয়া যায় ইহার ক্ষতিপূরণ করে কে ?

—

তাই বাঙালী বহু ঠকিয়া চতুর হইয়াছে। চতুরতার অর্থই—স্বাতন্ত্র্যবোধ জাগরিত হওয়া। প্রত্যেক লিখন-পঠনক্ষম বাঙালী সর্ব্ববিষয়ে এক একটি স্বতন্ত্র সত্তা। যত বাঙালী তত inspiration—এবং তত মাসিক পত্র। অতঃপর হয়ত বঙ্গশিশু মাতৃগর্ভ হইতে পাণ্ডুরোগের সহিত মাসিক পত্রের পাণ্ডুলিপি লইয়াই ভূমিষ্ঠ হইবে।

—

বুক্ অব জেনেসিস্-এর গল্প মনে পড়িতেছে। ব্যাবেলবাসী স্বর্গ ডিঙাইবার যে দুঃসাহসিক মতলব আঁটিয়াছিল বিধাতা বাগ্‌বিভ্রম ঘটাইয়া তাহা ব্যর্থ করিয়া দেন। আমাদের বিশ্বাস কিন্তু অন্যরূপ। খুব সম্ভব ব্যাবেলে প্রবাসী-বাঙালীর একটা দল ছিল, এবং তাহারা তথায় মাসিকপত্র বাহির করিয়াছিল। বাংলাদেশে এতদিনে এই দুর্দ্দশা আরম্ভ হইয়াছে। এখানে প্রত্যেকেই নিজ নিজ দুর্ব্বোধ্য ভাষায় কলরব করিতেছে, প্রত্যেকেই মনে করিতেছে বাণী ছড়াইবার কাল সমাগত।

—

এই দুর্দ্দশায় পৌঁছিবার জন্য কোনো স্বর্গে উঠিবার দুঃসাধ্য চেষ্টা করিতে হয় নাই, কোনো ভগবানকেও কোনো কারণে ভাষাগত গোলমাল সৃষ্টি করিবার জন্য স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিতে হয় নাই, বাঙালী যাহা করিয়াছে তাহা সে নিজগুণেই করিয়াছে। এখন কেবল বাকী রহিল নিজেদের ফোটোগ্রাফ বাজারে বাহির করা। বাণী মূলবান, রূপও মূল্যবান। এ দিকটায় এখনো কাহারো দৃষ্টি পড়ে নাই কেন বুঝা যায় না। আশা করি শীঘ্রই বাণীর সঙ্গে রূপ যুক্ত হইয়া রূপ-বাণীরূপ পূর্ণতা লাভ করিয়া বাংলাদেশ ধন্য হইবে।

—

আমাদের এই বিভাগের "সংবাদ-সাহিত্য" নামটির জন্য নিজে-দিগকেই ধন্যবাদ দিতেছি। ইহা যদি "সাহিত্য-সংবাদ" হইত তাহা হইলে কি মুস্কিলেই না পড়িতাম! কারণ বঙ্গ-সাহিত্যের কোনো সংবাদ নাই, মৃত্যু-সংবাদের জেরটানাতেও কিছু লাভ নাই, তাই উল্টা পথ ধরিয়াছি।

গীতা-মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য বলা হইয়াছে, বেদান্ত, গোধেনু; গীতা, দুগ্ধ; ভোক্তা, সুধীজন। আধুনিক গোষ্ঠী-সাহিত্য বেদান্তেরই ভিন্নরূপ। ইহাই সাহিত্যের গোষ্ঠরূপ। শিং বাঁকাইয়া, পুচ্ছ তুলিয়া সাহিত্য-ধেনু গৃহস্থকে উৎপীড়িত করিতেছে, শ্রীকৃষ্ণ বেদান্ত-ধেনু দোহন করিয়া যেমন সুধীজনের জন্য গীতা-দুগ্ধ বাহির করিয়াছিলেন, আমরাও তেমনি আধুনিক সাহিত্য-ধেনুর দোহন কার্য্যে লাগিয়াছি। কিন্তু এ ধেনু জাত-ধেনু নয়, তাই আমাদের দুগ্ধ সাহিত্য-নিষ্কাসিত অকৃত্রিম দুগ্ধরস নহে, ইহা যৌগিক বা

synthetic দুগ্ধ। অর্থাৎ সাহিত্যের সংবাদ আমরা বহন করি না, সংবাদের পায়েই আমরা সাহিত্যের ঘুঙর বাঁধিয়া দিই। ইহা যথাস্থানে যথারীতি বাজে এবং আশানুরূপ ফল প্রসব করে।

ফেব্রুয়ারিতে 'উন্মোচন' নামক নূতন মাসিকপত্র বাহির হইয়াছে। নামটি বড় ভয়ানক। পাপ মোচনের কথা মনে আসে। এদিকে পাতায় পাতায় আশীর্ব্বাদের ছাপ। দেখিয়া মুক্তি সুদূরপরাহত নহে বলিয়াই ত মনে হইতেছে। কিন্তু মাসিকপত্র বাহির করিতে আশীর্ব্বাদ কেন? সোজা লেখা চাহিলেই হইত। কিন্তু ইহাতে আশীর্ব্বাদকারীর কোনো দোষ নাই। এদেশে যিনি একবার লেখায় নাম করিয়াছেন, তাঁহার উপরে সমগ্র দেশের দাবী। লিখিতেই হইবে। মন ভাল না, তথাপি লেখ; শরীর অসুস্থ, হউক, লেখা চাই; লিখিবার ক্ষমতা নষ্ট হইয়াছে, কিছু যায় আসে না, লেখ। এই ভাবে লিখিতে লিখিতে যখন মৃত্যু আসন্ন, কথা বলিবার ক্ষমতা লুপ্ত, তখনো উৎসাহী মাসিক-চালক কানের কাছে টাকার থলি বাজাইতে থাকে।

—

মৃতপ্রায় লেখক টাকার শব্দে চোখ তোলেন, বলেন আশীর্ব্বাদ দেব? প্রার্থনাকারী বলে, ঠাকুর যাহা হয় দাও, কম্পোজিটর বেকার বসিয়া আছে। আশীর্ব্বাদী রচনার ইহাই ইতিহাস। রস নিষ্কাসিত হইয়া গেলেই আশীর্ব্বাদের ছোবড়া লইয়া কাড়াকাড়ি পড়িয়া যায়। আরো মজা এই, যাহাদের রস কোনোকালেই ছিল না, তাহারাও এই সুযোগে আশীর্ব্বাদকের শ্রেণীতে উন্নীত হইয়াছে।

আশীর্ব্বাদের পন্থাটি আবিষ্কার না করিলে রবীন্দ্রনাথ হয়ত এতদিন বাঁচিতেন না। কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি, মাসিকপত্র বাহির করিয়া এই আশীর্ব্বাদ ভিক্ষার কি সার্থকতা আছে? রবীন্দ্রনাথ ত পৃথিবীর সকল প্রতিষ্ঠানকেই আশীর্ব্বাদ করিয়া রাখিয়াছেন, সেইটুকু স্মরণ করিয়া কাজে নামিলেই হয়! তাঁহার উপর অত্যাচার করিয়া আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিলে ত ভক্তের উপযুক্ত হয় না! অনেকে আবার এই আশীর্ব্বাদের জন্য টাকা দিতেও রাজি। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের আশীর্ব্বাদে আর সর্ব্বসিদ্ধি কবচে কোনো ভেদ নাই!

—

কিন্তু আশীর্ব্বাদ লইতেই হইবে! ট্রেনের একটি দরজা খোলা পাইলে যেমন যাবতীয় যাত্রী সেখানেই ভীড় করে—কদাপি অন্য দরজা খুলিতে চায় না, মাসিকপত্রের জন্য আশীর্ব্বাদ ভিক্ষার বেলাতেও ঠিক সেইরূপ ব্যাপার ঘটিতেছে। রবীন্দ্রনাথকে প্রাণান্ত করিতে করিতেও তাঁহার আশীর্ব্বাদ চাই—না হইলে ফ্যাশন হইতেছে না। কিন্তু আশীর্ব্বাদেও যে মাসিক পত্র চলে তাহা এক বাংলাদেশই প্রমাণ করিল। ফলে সাহিত্যের যাহা দুর্দ্দশা হইতেছে এক শতাব্দীর চাবুকেও হয়ত তাহা মোচন হইবে না।

শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী বলিতেছেন—"তোমরা আমার কাছে চেয়েছ আশীর্ব্বাদ। আশীর্ব্বাদ করবার আমার অধিকার আছে, কারণ প্রথমতঃ,—তোমাদের মতে আমি একজন প্রবীণ সাহিত্যিক।" আশীর্ব্বাদ দিবার সময় প্রবীণ সাহিত্যিকগণও যে এরূপ গর্ব্ব অনুভব করিয়া থাকেন, তাহা ত আমরা জানিতাম না! তরুণ সাহিত্যিক-

নিজে নিজকে তরুণ বলিয়া আহ্লাদে আটখানা হয় এইটুকু জানা ছিল, এখন হইতে প্রবীণ সাহিত্যিকও নৃত্য সুরু করিলেন জানিয়া ধন্য হইলাম!

—

চৌধুরী মহাশয় বলিয়াছেন—

> প্রতি সাহিত্যিককেই নিজ চেষ্টায় আত্ম-বলে সাহিত্য গড়ে তুলতে হবে, অপরের উপুড় হস্ত বা চিৎহস্তের সাহায্যে নয়। প্রতি সাহিত্যিকই একলা।—দশে মিলি করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ—এমন কথা কোনো সাহিত্যিকের মুখেই শোভা পায় না।

কিন্তু এই পুরাতন কথাটাই এতকাল পরে নূতন করিয়া বলিবার দরকার হইল কেন কিছুতেই বুঝিতেছি না। প্রবাসী-বঙ্গ সাহিত্য-সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথও ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন। কথাটা চৌধুরী মহাশয়েরও ভাল লাগিয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে আমাদের একটা গল্প মনে পড়িতেছে। বলা বাহুল্য গল্পটি গুলিখোরের আড্ডা হইতে প্রচারিত। ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া তিনটা বাজিল। এক গুলিখোর বলিয়া উঠিল "তিনটে বাজলো।" তাহার বন্ধু পাশেই ছিল—সে বলিল—"দুশ্‌ শালা, ওতো তিনবারই একটা বাজলো!"—এই তিনবার একটা বাজাকেই যে তিনটা বাজা বলে ইহাও কি চৌধুরী মহাশয়কে শিখাইতে হইবে? প্রতি সাহিত্যিকই যে একলা ইহা কিরূপ আবিষ্কার?

—

কেহই প্রতিজ্ঞা করিয়া বলেন নাই যে মহাভারত এক ব্যক্তির রচনা। অথচ সকলেই প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিয়া থাকেন যে মহাভারত

সাহিত্য। এক ব্যক্তির রচনা হইলে তিনিও যেমন একলা, আর যদি একাধিক ব্যক্তির রচনা হয় তাঁহারাও তেমনি একলা কিন্তু এরূপ না বলিয়া চৌধুরী মহাশয় যদি বলিতেন যাহারা একলা তাহারাই সাহিত্যিক, তাহা হইলে লজিক ভুল হইত বটে কিন্তু কথাটা নূতন হইত। বীরবলের রসিকতা আর নাই, থাকিলে তিনি সহজেই দিনকে রাত করিতে পারিতেন। রসিকতা আসে না বলিয়াই রবীন্দ্রনাথের প্রতিধ্বনি করিতে হইয়াছে!

—

রবীন্দ্রনাথের "চার অধ্যায়" নামক সদ্য প্রকাশিত উপন্যাসের নানারূপ সমালোচনা হইতেছে। তন্মধ্যে একটি সমালোচনা উল্লেখ-যোগ্য। রামানন্দবাবু মাঘের প্রবাসীতে বলিয়াছেন—

> "যখন রবীন্দ্রনাথ কলিকাতায় গল্পটি পড়া শেষ করেন, তখন শ্রোতাদের মন এরূপ অভিভূত হইয়াছিল যে কেহ কোন মন্তব্য প্রকাশ করেন নাই। একা আবার পড়িয়া মনের অবস্থা সেইরূপই হইল। * * যখন পড়া শেষ করিলাম, তখনকার মনের অবস্থা প্রকাশ করিবার মত কথা খুঁজিয়া পাইতেছি না।"

আমাদের অবস্থাও সেইরূপ, কিন্তু শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় কথা খুঁজিয়া পাইয়াছেন।

—

তিনি আশীর্ব্বাদ প্রবন্ধে বলিতেছেন—

> * * নূতনত্বের সাক্ষাৎ আমরা কিশোর লেখকের লেখাতেও পেতে পারি, বৃদ্ধ লেখকের লেখাতেও পেতে পারি। একটি উদাহরণ দিই। রবীন্দ্রনাথের সদ্য প্রকাশিত

> গল্প "চার অধ্যায়" কি প্রবীণ-সাহিত্য না তরুণ-সাহিত্য? অনেকে প্রথম বয়সেও মৃত, শেষ বয়সেও তাই। কেউ কেউ আবার অল্প বয়সেও বাচাল, এবং বেশী বয়সেও বাচাল হন। অবশ্য এ উভয়ের কেউই সাহিত্যিক নন।

ইহা পড়িয়া কি বলিব কথা খুঁজিয়া পাইতেছি না।

—

বীরবল "চার অধ্যায়" লইয়া রবীন্দ্রনাথের উপর এরূপ মার-অধ্যায়ী হইলেন কেন বুঝিতেছি না। অথবা নিজের রসিকতার জালে নিজেই আটকাইয়া পড়িয়াছেন! এরূপ pun বড় মারাত্মক। ভাবিয়া দেখিলাম, প্রবাসী সম্পাদক মহাশয়ই ঠিক বলিয়াছেন, কথা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আমরাও বহুদিন হইতেই বলিয়া আসিতেছি, অজাত কবি, নীরব কবি, এবং অকবির মধ্যে নীরব কবিই শ্রেষ্ঠ।

—

নূতন মাসিকপত্র-চালকের আর একটি লক্ষণ এই যে পৃষ্ঠা পূর্ণ করিবার জন্য যে-কোনো ব্যক্তির পৃষ্ঠ-পোষকতা ইহারা মহানন্দে বরণ করিয়া লন। সম্প্রতি আশীর্ব্বাদের অনুরূপ আর একটি জঞ্জাল মাসিকের পৃষ্ঠায় দেখা যাইতেছে। ইহার রচয়িতা এবং পত্রস্থকারী এতদুভয়েরই রুচি-জ্ঞানের সীমা নাই। লজ্জা ত বহুদিন হইতেই লজ্জায় পলাইয়াছে—কাণ্ডজ্ঞানও অন্তর্হিত। এক দিকে আশীর্ব্বাদ, অন্য দিকে ব্যক্তিগত চিঠি। কবে ইহারা নিজেদের জমাখরচ ও ধোপার হিসাব, সাহিত্য বলিয়া চালাইবেন তাহা দেখিবার অপেক্ষায় রহিলাম।

—

'রঙ্গী-ভঙ্গী-তর্কী'—রচনার শিরোনাম দেখিলেই সন্দেহ হয় লেখকের মাথায় ছিট আছে, পরক্ষণেই যখন চোখে পড়ে, লেখক আর কেহ নয় স্বয়ং দিলীপকুমার রায়—তখন আর কোনো সংশয় থাকে না।

৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায় যে রসিকব্যক্তি ছিলেন তাহার কিছু নজির হাসির গানে রাখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার চরম রসিকতা বোধ হয়—পগ্না জগা। উত্তরাধিকার সূত্রে সেও রসিক হইবে মনস্থ করিয়াছে। কিন্তু আধুনিক তরুণ-সাহিত্যিকের হাতে পড়িয়া রসিকতার সুর এত চড়িয়া গিয়াছে যে সে-আসরে সহজ ভব্য রসিকতা আর জমে না। বাপ্‌কে শালা না বলিলে কেহ হাসে না। তাই বুদ্ধিমান জগাই ফরাসী ভাষায় pun করিয়া বলিতেছে—হালা ডি এল্ রায়!

ব্যস! আর যায় কোথা! তরুণ মহলে হাসির হট্টগোল পড়িয়া গিয়াছে। বীরবল নিশ্চয় বীরবলী ভঙ্গিতে বলিতেছেন—সাবাস! আর যে হতভাগ্য গণিতের ছাত্র, মাপ জোক করিয়া দিলীপের ছন্দের ভুল ধরিতে বসিয়াছিল, সে বাসায় গিয়া মরিয়া আছে।

হায় ৺ ডি এল রায়! তোমার এই চরম রসিকতাটিকে পৃথিবীতে না আনিলে কি চলিত না? বিজ্ঞ ব্যক্তি হইয়া তুমি কেন এমন দুষ্কার্য্য করিলে?

—

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথা ভাল; বারবার পুনরাবৃত্তিতেও দোষ নাই। কিন্তু মিষ্টার টমাসের ছবি? উহাও কি সমপর্য্যায়ভুক্ত? দেখিলে হৃদয়ে আধ্যাত্মিক রসের উদয় হয়?

গত দুই বৎসর যাবৎ মাসিক বসুমতীর প্রতি সংখ্যায় একই

নারীমূর্ত্তির বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গী দেখিয়া দেখিয়া অতি বড় নিঘিন্নে দর্শকেরও দর্শনলালসা অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। সম্পাদক মহাশয় এবার একটু মুখ বদলের ব্যবস্থা করুন না। না হয় ফোটোগ্রাফ নাই হইল; ছবিতে স্তন থাকিলেই আমাদের আর কোনো নালিশ থাকিবে না।

—

প্রবাসী ওঁরাও-ভকতের গান তর্জ্জমা করিয়া দিয়াছেন—'মহিষের জীবন আর মানুষের জীবন একই জীবন। মহিষ শাবকের জীবন আর মানুষের জীবন একই জীবন। এইরূপ গোরু বাছুর ইত্যাদি।'

অসভ্য আদিম ওঁরাও-ভকত যাহা অনেক দিন আগে বুঝিয়াছিল, বাঙালী এত দিনে তাহা শিক্ষা করিতেছে। শিক্ষাগুরু এক দিকে ইংরেজ, অপর দিকে কংগ্রেস।

—

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়—

—'কে. জানে কোথায় বসি বিধাতা লেখেন বিধি লিপি।' ঠিকানা ত সাবিত্রীবাবুর জানা আছে। সেখানে বিধাতার হংসপুচ্ছের ঠেলায় মূক বাচাল হইতেছে, পঙ্গু গিরি-লঙ্ঘনের অভিযান করিতেছে; সাবিত্রীপ্রসন্নেরও পুরুষত্ব জাগিয়াছে। সেখানে—

কিন্তু যাক—

সাবিত্রীবাবু এবার একটি বিবাহ করুন।

—

আশীর্ব্বাদ-সাহিত্যের কথা বলিয়াছি, কিন্তু শেষ হয় নাই; আবার কতগুলি কথা মনে পড়িল। যৌবনে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন, "ইহাদের কর আশীর্ব্বাদ।" ইহা শিশুদের উদ্দেশ্যে

লেখা। সেই সব শিশু রবীন্দ্রনাথের বৃদ্ধির সঙ্গে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া প্রৌঢ়ত্বে উপনীত হইয়াছে, কিন্তু কবির চোখে এখনো তাহারা শিশু। সেই অতীত যুগের শিশু আজও তাহার দাবী ছাড়িতেছে না। কেহ ময়দার কল খুলিয়া, কেহ কাপড়ের কল খুলিয়া, কেহবা মাসিকপত্র বাহির করিয়া কবির আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিয়া ফিরিতেছে। কবি এবং অন্যান্য যাঁহারা আশীর্ব্বাদের কারবার খুলিয়াছেন তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিবার মত কেহই জীবিত নাই ইহাই দুঃখ।

—

একখানি ছবি কল্পনা করিতেছি। মাঝখানে রবীন্দ্রনাথ, উভয় পার্শ্বে অন্যান্য শ্রদ্ধেয় আশীর্ব্বাদক এবং শুভাকাঙ্ক্ষী উপবিষ্ট। নীচে লেখা আছে—"(এখন) ইহাদের কর আশীর্ব্বাদ।"

—

অবস্থা এইরূপই দাঁড়াইয়াছে। যিনি এতকাল বঙ্গদেশের লেখকগণকে এবং কলকারখানার মালিকগণকে সার্টিফিকেট দিয়া আসিলেন, তাঁহার নিজের জন্য এতদিন পরে সেই সকল সার্টিফিকেটের প্রয়োজন হইয়াছে। আমরা তাঁহাকে চিনিলাম না বলিয়া আমাদিগকে তিনি যতই মন্দ বলুন, আমরা সার্টিফিকেট পাইয়া তাঁহাকে চিনিব এরূপ দুর্দ্দশা যেন আমাদের কোনোদিন না হয়। রবীন্দ্রনাথকে আমরা বাস্তবিকই চিনি নাই। "তোমায় চিনি বলে মোরা করেছি গরব লোকের মাঝে।"—এখন সে গর্ব্ব চূর্ণ হইয়াছে।

বাংলাদেশ তাঁহাকে চেনে নাই, ইহা আর প্রমাণ করিতে হইবে না। বর্ত্তমানে পাঞ্জাব তাঁহাকে চিনিবার চেষ্টা করিতেছে বলিয়া মনে

হইল। ৪ই ফেব্রুয়ারি হইতে 5th Punjab Students' Conference-এ রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কে এবং তাঁহার মূল্যই বা কি, ইহা না জানিলে টিকিট বিক্রয় হইবে না আশঙ্কায় কন্ফারেন্স হইতে একখানি সচিত্র বিজ্ঞাপন বিলি করা হয়। এই বিজ্ঞাপনে মহাত্মা গান্ধী, জন বোয়ার হইতে তারকনাথ দাস, হরিসিং গৌর প্রভৃতি অনেক মহাপুরুষেরই সার্টিফিকেট ছাপা হইয়াছে।

মোট নয়টি সার্টিফিকেট আছে!

১। * * I owe much to Rabindranath Tagore * *
M. K. GANDHI.

২। Rabindranath Tagore is India bringing to Europe a new divine symbol, not the Cross, but the Lotus. * * *
JOHN BOJER.

৩। Dr. Rabindranath Tagore has long been acclaimed as the world's greatest living poet. * *
SONYA RUTH DAS.

৪। * * * Rishi Rabindranath made a very substantial contribution to the cause of Indian freedom. * * *
TARAK NATH DAS.

৫। * * * The voice of Tagore has been the voice of a Messiah preaching in the wilderness * *
(SIR) HARI SINGH GOUR

৬ * * Creative energy, incessant and wide-spreading etc
E. B. HAVELL.

৭। Tagore the teacher takes rank with Tagore the poet and philosopher. (Rev.) J. H. HOLMES,

৮। In a few centuries mankind will realise that Rabindranath Tagore means very much the same to India as Homer to Europe. * *
H. KEYSERLING

৯। * * * the songs of Tagore are resounding in our hearts as a beautiful call for liberation.
P. S. KOGAN.

টিকিটের মূল্য পাঁচ টাকা হইতে চারি আনা। ইহার পরেও যদি কেহ বলে, পাঞ্জাব রবীন্দ্রনাথকে চেনে নাই, তাহা হইলে তাহাকে ধিক।

মাঘ সংখ্যা ভারতবর্ষে নন্দকিশোর দাসের 'রস-কলিকা' নামক প্রবন্ধের ভূমিকায় লেখা আছে—

> খুঁজিতে খুঁজিতে বৈষ্ণবীয় রসশাস্ত্রের একখানা বাঙ্গালা পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। যতদূর জানি, পুঁথিখানি অজ্ঞাত। অজ্ঞাত এই হিসাবে যে, গ্রন্থখানি ছাপা ত হয়ই নাই, ইহার বিবরণও অন্য কোনও পত্রিকায় এ যাবৎ প্রকাশিত হয় নাই।

গোলমালে পড়িলাম। সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় (৮ম ভাগ ১৮৭ পৃঃ) যে পাণ্ডুলিপির কথা বর্ণিত হইয়াছে তাহা কিসের পাণ্ডুলিপি?

ভারতবর্ষের এক কবির 'তেরে' পর্য্যন্ত উন্নতি হইয়াছে—আরো কয়েক ধাপ শীঘ্রই হইবে বলিয়া আশা করিতেছি।

তে— সোনালী ধানেতে···
গেলো বছরেতে···
দুখেতে পরাণ ফাটে···
তোমারে ছাড়িয়া মাঠেতে আমার···
তোমার বুকেতে···
বেড়ার ফাঁকেতে···
চাষীর প্রাণেতে
জ্যোছনা আলোতে···

রে— খড়গুলি সব বুধিরে খাওয়াবো···
তোমারে সাজাবো···
তোমারে না দেখি···
তোমারে ছাড়িয়া মাঠেতে···
তবুও তোমারে···
তোমারেই ভালবাসি···
তোমারে ছাড়িয়া থাকিতে পারি না···
রাতেরে করিছে ভোর···
নীরব বধূরে···

কবিতা চেষ্টা না করিয়া তবলার বোল বাজাইতে অভ্যাস করিলে দ্রুত উন্নতির সম্ভাবনা।

—

"আজকাল" পত্রিকায় একটি গায়ক গায়িকা তালিকা দেখিলাম। লম্বা তালিকা—

গায়ক	গায়িকা
নরেশচন্দ্র রায় ১ বার	আঙ্গুরবালা ১ বার
কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় ১ বার	ইন্দুবালা ২ বার
কৃষ্ণচন্দ্র দে ২ বার	রাধারাণী ৩ বার
উমাপদ ভট্টাচার্য্য ১ বার	ফুল্লনলিনী ১ বার
শৈলেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জি ১ বার	আশালতা ১ বার
ধীরেন দাস ২ বার	আভাবতী ১ বার
হরিদাস ব্যানার্জ্জি ১ বার	হরিমতি ১ বার
পঙ্কজ মল্লিক ১ বার	প্রভাবতী ১ বার
শৈলেশ দত্তগুপ্ত ১ বার	কমলবালা ২ বার

ইত্যাদি ইত্যাদি

বসিয়া বসিয়া গণিল কে ?

স্ত্রীজাতি পৃথিবীতে সন্তানপালন ছাড়া যে আর কোনো মহৎ কাজই করিতে পারে না, ইহা প্রতিদিন প্রমাণ করিয়া লাভ কি ? জানি একথার উত্তরে অনেকে কতকগুলি ব্যতিক্রমের নজির দেখাইয়া তর্ক করিতে আসিবেন। ব্যতিক্রম কোথায় নাই ? সুতরাং সে কথা না তোলাই ভাল। স্ত্রী, পুরুষের অনুকরণে অনেক কিছুই করিয়াছে, এমন কি কবিতাও লিখিয়াছে কিন্তু অনুকরণ কখনো সজীব হয় না, অধিকাংশ সময়েই তাহাতে বিকার দেখা দেয়—এবং স্ত্রীজাতির প্রতি স্বাভাবিক করুণা-বশে পুরুষ তাহা সহ্য করিয়া থাকে।

মাঝে মাঝে ভারতবর্ষের কৃপায় আমরা এইরূপ কয়েকজন স্ত্রী-কবিকে দেখিতেছি। স্ত্রীলোক একমাত্র পোষাক ছাড়া যে আর কিছুতে—(এমন কি আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও) অতি আধুনিক হইতে পারে না ইহা অন্তত বাঙালী স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে। যাহা হইবার নয়, তাহাই হইতে হইবে বলিয়া ইচ্ছা করা হয়ত অন্যায় নহে, কিন্তু ইহাই সত্য যে হওয়া যায় না। ঘরের বধূকে রাস্তায় চলিতে দেখিয়া যেমন একদল লোক বলিয়াছিল যে উহারা আধুনিক হইয়াছে—এইরূপ কবিতা লেখা দেখিয়াও কেহ কেহ সেরূপ মনে করিয়া থাকিতে পারে। যাহারা এরূপ মনে করে তাহারা আধুনিকতার অর্থ জানে না।

—

আধুনিক হইতে যে সাহস দরকার বাঙালী স্ত্রীলোকের সে সাহস নাই। হয়ত আধুনিক হইবার সখ মনের মধ্যে কখনো কখনো উঁকি ঝুঁকি মারিয়াছে—হয়ত কখনো সে কল্পনা করিয়াছে, মেয়েদের পার্টিতে প্রেম করিবার মত একটি পুরুষ আসিয়া পড়িলে মন্দ হয় না—হয়ত ইহা লইয়া অক্ষর গুণিয়া গুণিয়া একটা ছড়াও লিখিয়া ফেলিয়াছে, কিন্তু ইহার মধ্যে আধুনিকতার সেই উগ্র ঝাঁজ কৈ? একপাল পুরুষের মধ্যে ঠাকুরঝি কাহার জন্য ফুলের তোড়া বাঁধিতেছে, কাহাকে খুশী করিবার জন্য সে বিবি হইয়াছে, এবং কোন্ যুক্তিতে চলিলে বহু প্রণয়ীর মধ্যে স্বামী হিসাবে একজন জুটিতেও পারে, বৌদি এসব তথ্য আলোচনা করিয়াছেন। আমরা কিন্তু লেখিকার মনের মধ্যে যে বৌদিটি রহিয়াছেন তাঁহাকে কিছু বলিবার কথা খুঁজিয়া পাইতেছি না।

ছদ্মবেশী সিরোলিনের বিজ্ঞাপন সহ্য করিতেছি সুতরাং বীণা লাইব্রেরির অবনীনাথ রায় মহাশয়ের বিজ্ঞাপনও হয়ত সহ্য করিতে পারিব। কিন্তু মানুষের কোন্ অবস্থায় এরূপ দুর্ম্মতি ঘটে তাহা আমরা কিছুতেই বুঝিতে পারিলাম না। গ্রন্থকারের নাম গ্রহণ করিয়া একজন মহিলার বিজ্ঞাপন প্রচারার্থ গায়ে পড়িয়া অপর একজন মহিলাকে অপদস্থ করিবার এই হীন প্রয়াস নিশ্চয়ই প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য-সম্মেলনের প্রভাবে ঘটে নাই। অবনীবাবু কচি খোকাটি নহেন, তিনি নিশ্চয়ই এটুকু বুঝিতে পারেন যে তাঁহার সাহিত্য-বিচার সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রামাণ্য নহে। তিনি ইহাও বুঝেন যে নিজেকে গ্রন্থকার হিসাবে পরিচিত করাইলেও লোকে তাঁহার কথা হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া ছাড়া তাহার অন্য কোনো মূল্য নাও দিতে পারে। মীরাটে থাকিলেও বঙ্গদেশে কত লক্ষ গ্রন্থকার আছে তাহাও তাঁহার নিশ্চয়ই অজানা নাই। তবু তিনি এরূপ করিলেন কেন? এ প্রশ্নের উত্তর তিনি নিজে না দিলে অপর কেহ দিতে পারিবে না।

—

আনন্দবাজার পত্রিকায় তিনি এই মহৎ কার্য্যটি করিয়াছেন—

<u>সাহিত্যক্ষেত্রে দুইজন আশালতা দেবী</u>

মহাশয়, আপনার সর্ব্বত্র-পঠিত দৈনিকে আমার নালিশটুকু পত্রস্থ করিলে বাধিত হইব।

ভাগলপুরের সুলেখিকা শ্রীযুক্তা আশালতা দেবী সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিতা। তিনি "মানসী" "অমিতার প্রেম" "অভিমান" প্রভৃতি উপন্যাস, ছোট গল্প এবং বহু

প্রবন্ধ লিখিয়া যশোলাভ করিয়াছেন। কিন্তু কিছুদিন আগে নাথ ব্রাদার্স "হে বন্ধু বিদায়" নামক একখানি উপন্যাস ছাপেন। এখানকার লাইব্রেরীতে আমরা উক্ত উপন্যাস-খানি আনাইয়া দেখি যে, উহা নিতান্ত কাঁচা হাতের লেখা। পরে ভাগলপুরের আশালতা দেবী জানান যে, উক্ত পুস্তক তাঁহার লেখা নহে। সম্প্রতি কাত্যায়নী বুক ষ্টল 'বিরহের অন্তরালে' নামক আর একখানি বই প্রকাশ করিয়াছেন। এখানিও ভাগলপুরের আশালতা দেবীর লেখা নহে। সর্ব্ব-সাধারণের ভ্রম অপসারণের জন্য ইহা প্রকাশ করা প্রয়োজন মনে করি। নয় ত আমাদের মত অন্য ক্রেতারাও বই কিনিয়া ঠকিবেন। ভাগলপুরের আশালতা দেবী ইহাতে ক্ষতিগ্রস্তও হইতেছেন।

গ্রন্থকার হিসাবে আমি নিজের পক্ষ হইতেও এই কথা বলা প্রয়োজন মনে করিতেছি।

শ্রীঅবনীনাথ রায়, বীণা লাইব্রেরী, মীরাট

---

* মীরাট লাইব্রেরির পক্ষ হইতে কি না জানি না, অবনীবাবু একটি গুরুতর কর্ত্তব্যের ভার স্বেচ্ছায় নিজ স্কন্ধে তুলিয়া লইয়াছেন। লেখা মনের মত না হইলেই তিনি লেখককে (কিংবা বিশেষ করিয়া লেখিকাকে) চিঠি লিখিয়া জানিতে চাহেন ইহা তাঁহার নিজের লেখা কি না। ইতিপূর্ব্বে অপরাজিতা দেবীর লেখাগুলি অপরাজিতা দেবীর না রাধারাণী দেবীর তাহা জানিবার জন্য কিছুদিন শিলংএর পথে পথেও ঘুরিয়াছেন! বড় মুস্কিল! ভাগলপুরের আশালতা

দেবীর ক্ষতিও অবনীবাবুর সহ্য হয় না, অপর পক্ষে "হে বন্ধু বিদায়"-এর লেখিকা আশালতা দেবীর বই বাজারে বিক্রয় হয় ইহাও সহ্য হয় না। অবনীবাবু করিবেন কি? নিজে ত গ্রন্থকার বলিয়া নিজের পরিচয় দিয়াছেন, কি গ্রন্থ লিখিয়াছেন তাহাই আপাতত বিক্রয়ের চেষ্টা দেখিলে ভাল হয় না কি?

অবনীবাবুর কর্ত্তব্য গুরুতর তাহা বুঝিতেছি। তাঁহার চক্ষুলজ্জা এবং কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান যে কিরূপ লঘুতর তাহাও বুঝিতেছি, কিন্তু উদ্দেশ্যটি এখনো বুঝিতে পারিতেছি না। আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক উপরে লিখিয়া দিয়াছেন, "মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।"—কথাটি খুবই ভাল, কিন্তু উহা ছাপাইবার জন্য দায়ী কে? কম্পোজিটার নিশ্চয়ই নহে। কোনো গ্রন্থে specific কোনো অনিষ্টকর বিষয় থাকিলে সর্ব্বসাধারণকে তাহার বিরুদ্ধে সতর্ক করিয়া দেওয়া যায়; কিন্তু "নিতান্ত কাঁচা হাত" বলিয়া খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়া তাহার বিক্রয় বন্ধ করিবার অধিকার কাহারো নাই। অবশ্য মুদ্রণ খরচ প্রকাশককে মনিঅর্ডার করিয়া দিলে হয়ত এরূপ বলিবার কিছু অধিকার জন্মে। আইন না জানিয়া ওকালতি?

বাঙালী জীবনের উদ্দেশ্যের ঠিক নাই। কেহ কাব্যতীর্থ পাস করিয়া ইলেক্‌ট্রিক্যাল মিস্ত্রী হয়, কেহ বী-এস্-সী পড়িয়া স্কুলের হেড পণ্ডিত হয়, কেহ বা আর্ট স্কুল হইতে পাস করিয়া মুদির দোকান

দেয়। গল্পে আছে, জনৈক ব্যক্তি একদা ডায়েরি লিখিতে আরম্ভ করে। তাহার ডায়েরির প্রথম দুই পৃষ্ঠা উদ্ধৃত করিতেছি—

১লা জানুয়ারি—সৎকার্য্য করিব সঙ্কল্প করিলাম।

২রা জানুয়ারি—সঙ্কল্প টিকিল না।

উপরের দুইটি উদাহরণে প্রথমটায় আমরা কয়েকটি জীবন দেখিলাম, দ্বিতীয়টায় দুইটি দিন দেখিলাম। এইবার, কাগজের এক সংখ্যাতেই কিরূপে উদ্দেশ্যের গোলমাল হইয়া যায় তাহা দেখাইতেছি।

—

স্বদেশ নামক মাসিক, বর্ত্তমানে মাসে চারি কিস্তিতে প্রকাশিত হইতেছে। অর্থাৎ মাসিক সাপ্তাহিকে রূপান্তরিত হইয়াছে। প্রথম সংখ্যায় সম্পাদক লিখিতেছেন—

> বাংলার মর্ম্মের বাণী স্বদেশের বলিবার কথা; বাংলার নবনীত কোমল হরিত দুর্ব্বায়, গঙ্গার তরল রজতধারায়, পদ্মার কূলে কূলে, আম-কদলী (?) ছায়া শীতল পল্লীর স্নিগ্ধ কল্যাণশ্রীতে যে কথা মুখরিত হইতেছে, স্বদেশের বলিবার কথা তাই। সেকথা রাজনীতির কচায়ন নয়, হিন্দুমুসলমানের ক্ষুদ্র স্বার্থের হানাহানি নয়, বিদেশী গিল্টি করা স্বরাজের ব্যর্থ ধুয়া নয়। সে কথা সমগ্র মানবজীবনের পূর্ণতার কথা, সুসমঞ্জস কল্যাণের গায়ত্রী, মানবে দেবত্বের ওঙ্কারনাদ।

প্রথম পৃষ্ঠায় উদ্দেশ্য বিষয়ে আর সন্দেহ থাকে না।

—

কিন্তু নবম পৃষ্ঠায়—

> —যাকৃগে—তাড়াতাড়ি শেষ করে ফেলি শোন। সেই ছেলেটি ক্রমে জুতো রেখে আমার কাছে সরে এল। আমি

যেন ঘুমিয়ে আছি। সে কাছে এল। হাঁটু দুটোকে ফোল্ড
ক'রে নিয়ে আমার দেহের উপর সে ঝুঁকে পড়েছে—পড়ে,
দুই চোখ দিয়ে আমার শরীরটাকে গিলছে।

অর্থাৎ নবম পৃষ্ঠাতেই আমরা ফোল্ডিং হাঁটুর সাক্ষাৎ পাইলাম।

জানি শেষ পর্য্যন্ত ভাসাইয়া দেওয়া ছাড়া তরুণদের অন্য গতি নাই। মেঝে এবং ফরাস ভাসাইতে ভাসাইতে জীবনটাকে যতদূর ঠেলিয়া লওয়া যায়! শুনিয়াছি পেঁচি-মাতাল নাকি মদ দেখিলেই নেশাগ্রস্ত হয়, কিন্তু কথার মাদকতায় ভাসাইয়া দেওয়া এই প্রথম শুনিতেছি। শিখণ্ডী-কবি বলিতেছেন,

দিনটা আজ নরম মেঘে ভিজে
কহিলে তুমি, কহিলে তুমি কি যে!
এই তো কথা, ভাসায়ে দিই নিজে
আবেশ বশে, কথায় মাদকতা! (Hic—)

পরিচয়ের আভিজাত্য বুঝি আর টেকে না।

না টিকিবার আরো লক্ষণ আছে। শুনিয়াছি অভিজাত সম্প্রদায় সাধারণ গৃহস্থের মত বাজার খুঁজিয়া সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড মাল শস্তায় কিনিয়া ব্যবহার করে না। করিলে আভিজাত্য নষ্ট হয়। কিন্তু পরিচয় এবারে চোর-বাজারের পুরাতন মালে ঘর সাজাইয়াছেন। ১৩৪০ সালের ভাদ্র সংখ্যা শনিবারের চিঠিতে যে কবিতাটি উদ্ধৃত করিয়া টিপ্পনি করা হইয়াছিল সেই কবিতাটি ১৩৪১ সালের মাঘের পরিচয়ে স্থান পাইয়াছে। শিখণ্ডী-কবি রচিত "প্রকৃতির ছায়ে

বনভোজন”এর কথা বলিতেছি। খুব সম্ভব নামটা বদলাইয়া দেওয়া হইয়াছে, পূর্ব্ব নাম আমাদের স্মরণ নাই।

—

কবিতাটি নানা দিক দিয়াই মূল্যবান, বিশেষত পরিচয়ে ইহার মূল্য আরো বেশি। কারণ—

যদিচ মামুলি তবুও ট্রেনে
মিলিব উভয়ে—কি বলো তুমি ?
মা-কে তো ভোলাবে বুলাকে এনে ?

সুধীন দত্ত মহাশয় কিসে ভুলিলেন ?

—

পরিচয়ের একই সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এবং উক্ত শিখণ্ডী-কবি—উভয়ে মিলিয়া রবীন্দ্রনাথের travesty করিয়াছেন। কাহাকেও আনিয়া কাহাকেও ভুলাইতে হয় নাই।—শম্ভু ভোলানাথের ভ্রান্তি ক্ষমার্হ কিন্তু সুধীন দত্ত মহাশয় কিসে ভুলিলেন ?

—

আমরা চুরির পৃষ্ঠ-পোষকতা করি না, চোরের ত নহেই। চোরের পৃষ্ঠের উপরে সাধারণের একটা চিরন্তন নৈতিক দাবী আছে; সাধারণকে তাহা হইতে বঞ্চিত করা অন্যায়। কিন্তু এক্ষেত্রে পৃষ্ঠপোষকতার কথা উঠে কোন সূত্রে! চোর চুরি করে পেট-পোষণের জন্য; শুনিয়াছি পেটে খেলে পিঠে সয়; কাজেই তাহার পৃষ্ঠ-পোষণ অনাবশ্যক; শুধু অনাবশ্যক নয়, অন্যায়ও বটে, কারণ ইহাতে পেট ও পিঠের মধ্যে সামঞ্জস্য নষ্ট হয়।

—

কিন্তু আমরা সাহিত্যিক-চুরির (সাহিত্যিক-চোরের নয়) পরম পৃষ্ঠ-পোষক; তার কারণ, সাহিত্যিক চুরিতে কদাচিৎ পেট-পোষণের কাজ চলে। কাজেই আমরা সমালোচক ও সাধারণের উদ্যত বাহু হইতে সাহিত্যিক-চুরি অপরাধীকে রক্ষা করিব।

—

আমরা যে শুধু সাহিত্যিক চুরি পছন্দ করি তাহা নয়, সাহিত্যিক চুরির একটি আধ্যাত্মিক ও নৈতিক (অর্থ ও পরমার্থ) আবশ্যকতা অনুভব করি। বাংলাদেশে যাহাতে সাহিত্যিক চুরি সংক্রামক হইয়া উঠে তাঁহার জন্য আমরা অতঃপর কায়মনোবাক্যে প্রচার আরম্ভ করিব।

—

জনৈক পাঠক জানাইয়াছেন, শ্রীপুষ্পরাণী সিংহ নানক জনৈকা লেখিকা সম্প্রতি এইরূপ একটি চুরি করিয়াছেন। আমরা উহা দেখি নাই, কিন্তু শুনিবামাত্র বিশ্বাস করিয়াছি। তাঁহাকে আমরা ইহার জন্য অভিনন্দিত করিতেছি। তিনি নব চৌর-কবিদলের অগ্রণী; পুরুষের পক্ষে ইহা গৌরবের, নারীর পক্ষে গর্ব্বের বিষয়। আশা করি তিনি ভবিষ্যতে নবতর উপায়ে অধিকতর পারদর্শিতার সহিত এই দুরূহ শিল্পে আরো বেশি কৃতিত্ব অর্জ্জন করিবেন।

—

কেবল একটি অনুরোধ আছে। তাঁহার রুচির প্রশংসা করিতে পারিলাম না, হাত এখনো কাঁচা। অখ্যাতনামা কবির সর্ব্বহারা নামক কবিতা চুরি না করিলেই ভাল হইত। সর্ব্বহারার মধ্যে চুরির মত কি থাকিতে পারে? বোধ করি নামটাই (নাম দুই প্রকার সুনাম ও দুর্নাম) তাহার একমাত্র সম্বল ছিল; তাহা চুরি না করিলেই ছিল ভাল।

—

চুরি করিতে হইলে ধনীর গৃহেই সিঁধ দেওয়া উচিত; সে জন্য রবীন্দ্রনাথ আছেন, বঙ্কিমচন্দ্র মধুসূদন আছেন; বিদেশী বহু বিখ্যাত লেখক আছেন। ছোট ঘরে কেন?

—

হায় আমাদের রুচির কি অধোগতি! আজকাল তস্করেও ছেঁড়া নেকড়ার বেশি অন্য কোনো পদার্থ চুরি করিতে চাহে না! আধুনিক যুগে মৃত্যুর পক্ষে একটি দু'আনা দামের বন্দুকের গুলি যথেষ্ট! আমরা তো অস্ত্রহ্রাসের ঘোর বিপক্ষে! মরিতে হয়

অজাগর কামানের গোলাতে মরিব, যাহার একটি গোলা-ক্ষেপের ব্যয় বহু সহস্র পাউণ্ড! যদি চুরি করিতে হয় শেকসপীয়র আছেন (তাঁহার কপি-রাইট নাই, আমার মনে হয় কপিরাইট অন্যান্য সম্পত্তির মত বংশগত হওয়া উচিত, কারণ প্রতিভা উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া যায় না শেলি-রবীন্দ্রনাথ আছেন। হে ভবিষ্যতের চৌর-কবির দল, তোমরা চুরি করিও, হে সরস্বতীর নব সাধক সম্প্রদায়, নিজেদের কদর্য্য রচনা না ছাপিয়া চুরি করিয়া পরের লেখা ছাপিও, কেবল এই অনুরোধ, যেন সে লেখা পাঠ্য হয়, সুন্দর হয়, তোমাদের সুরুচির পরিচায়ক হয়; এবং পাঠকের কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়া চৌর-অমরতা লাভ করিতে পার।
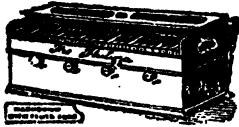
শ্রীপরিমল গোস্বামী এম-এ কর্ত্তৃক সম্পাদিত। ২৫।২ মোহনবাগান রো, শনিরঞ্জন প্রেস হইতে শ্রীপ্রবোধ নান কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৬ষ্ঠ সংখ্যা] চৈত্র, ১৩৪১ [৭ম বর্ষ

বর্ষশেষ

(শনিবারের চিঠির নহে)

বাংলা দেশের আর একটি বৎসর শেষ হইল। কিন্তু ইহাতে নূতনত্ব কিছুই নাই, বৎসর যাওয়া এবং বৎসর আসা পৃথিবীর জন্মাবধি ঘটিতেছে। পৃথিবী এবং অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহ নিয়মিত ঘুরিয়া চলিতেছে, পৃথিবীবাসী প্রাণীবৃন্দ বংশ হইতে বংশান্তরে পদনিক্ষেপ করিয়া অগ্রসর হইয়া চলিতেছে।

কেহ বলেন অগ্রসর হইতেছে তাহার প্রমাণ কি?—হয়ত পিছাইয়া যাওয়াকেই আমরা অগ্রসর হওয়া বলিয়া ভুল করিতেছি।

এরূপ আধ্যাত্মিক প্রশ্নের উত্তর দিবার প্রবৃত্তি নাই। বহুকাল ধরিয়া কোনো দিকে নিয়মিত চলাকেই আমরা সম্মুখে চলা বলিব। কেননা ভৌতিক জগতে এক শাণ্টিং ইঞ্জিন ছাড়া পশ্চাতে চলিতে আর কাহাকেও বড় একটা দেখা যায় না। সুতরাং মোটামুটি

ভাবে বিশ্বজগৎ এবং বাঙালীজাতি অগ্রসর হইয়া চলিতেছে এরূপ ধরিয়া লইতে কাহারো আপত্তি হইবে না।

কিন্তু আমরা চলিতেছি কোথায় এবং কেন? ইহা আমরা কেহ বুঝি না; বুঝিবার কোনো উপায় আছে বলিয়াও মনে হয় না। মনে হয় মানুষের চলার ইতিহাস, ধারাবাহিক ভাবে চলিবার চেষ্টার ইতিহাস। আমরা ইহারই জন্য প্রাণপণ করিতেছি। ভবিষ্যৎ মানুষ এই ধারা বাহিয়া মানব-বংশকে কোনো এক পরিণামে উত্তীর্ণ করিবে; মানবজীবনের সার্থকতা কি, সেই দিন তাহা উপলব্ধি করা যাইবে; কিন্তু তাহা কি, আজিকার দিনে তাহার আভাসও মিলিতেছে না।

যুগের সহিত যুগ গাঁথিয়া, কার্য্যের পূর্ব্বে কারণকে স্থাপন করিয়া, ব্যক্তের সহিত অব্যক্তের সম্বন্ধ আবিষ্কার করিয়া চলিয়াছি। যে সকল যুগ বর্ত্তমান হইতে মধ্যপথে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে, তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া, তাহাকে বিধিমত কর্ষিত করিয়া, তৎপূর্ব্ব এবং তৎপরবর্ত্তী যুগের সহিত তাহার সম্বন্ধ নিরূপণের অমানুষিক চেষ্টা করিতেছি। (ইহারই নাম প্রাত্নতত্ত্বিক গবেষণা।)

অভিব্যক্তির ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা করিয়া যাওয়াই হয়ত সকল যুগের মানুষের অন্তর্নিহিত ধর্ম্ম। যেখানে যুগধারা যোগভ্রষ্ট হইয়াছে তাহা কোনো মানুষের অবহেলায় ঘটে নাই, প্রকৃতির বিপর্য্যয়ে ঘটিয়াছে। ধারাবাহিকতার মাঝে মাঝে, অংশবিশেষের চিহ্ন নাই; এই চিহ্ন খুঁজিয়া পাইলে মানুষের তৃপ্তি। না পাইলে যেন অগ্রসর হওয়ায় কোনো সার্থকতা থাকে না। যাঁহারা বলেন অতীতটাকে উড়াইয়া দিয়া আজ হইতে নূতন জীবন আরম্ভ কর, তাঁহারা হয়ত ভুলিয়া যা. যে মানুষের স্বধর্ম্ম তাহা নহে। ছিন্নমালা পুনরায় গাঁথিবার জন্য প্রত্নতত্ত্বের গবেষণাই মানব ধর্ম্ম। যেন সমস্ত গ্রন্থিগুলি বাঁধিতে

পারিলেই চলার পথে সে নিশ্চিন্ত। কিন্তু না পারিলেও তাহাকে চলিতে হইবে, কেননা চলায় তাহার হাত নাই। প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য নিয়মে প্রত্যেকটি শিশু, কৈশোর-যৌবন অতিক্রম করিয়া বৃদ্ধত্বে উপনীত হইতেছে এবং যথাসময়ে ইহলীলা সাঙ্গ করিতেছে। আবির্ভাব এবং তিরোভাব ইহাতে মানুষের হাত কোথায়? সমস্ত প্রাণী-জগৎ এই দুর্ব্বার নিয়মের অধীন। কে আমাদিগকে পরিচালনা করিতেছে (শনিবারের চিঠির পরিচালককেও) জানি না। আমরা চলিবার পথে মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করিতেছি বটে—"কোথায় চলিতেছি?"—কিন্তু সেজন্য ক্ষণকালের জন্যও চলা থামাইতে পারিতেছি না।

এই চলার পথে এক যুগ আর এক যুগকে এই প্রশ্নটি হস্তান্তর করিয়া যাইতেছে। যত দিন মানুষ থাকিবে তত দিন ঐ প্রশ্ন থাকিবে—শেষ-প্রশ্নের সময় আসে নাই—উহা শেষ মানুষের শেষ নিঃশ্বাসের সহিত উচ্চারিত হইবে। তাহার পর আর এ পৃথিবীতে মানুষ থাকিবে না। (শরচ্চন্দ্র ততদিন বাঁচিয়া থাকুন)।

প্রশ্ন হস্তান্তরিত হয়, কিন্তু তৎসঙ্গে একটি যুগও আর একটি যুগের হাতে গিয়া পড়ে। বৎসরকে বৎসরান্তরে, যুগকে যুগান্তরে পৌঁছাইয়া দেওয়াই মানুষের প্রথা। বিশ্বমানব একটি বৎসরকে পরবর্ত্তী বৎসরে বহন করিয়া লইয়া যায়, কিন্তু এক তারিখে নহে। চৈত্রশেষে আমাদের বাঙালীদের এক বর্ষ শেষ হইল, এইবার নববর্ষ আরম্ভ হইবে। কিন্তু ১৩৪১ সাল, বাঙালীর কোন কীর্ত্তি এবং কৃতিত্বে সমৃদ্ধ হইয়াছে? দৃষ্টিপাত করিলে কিছু দেখা যায় না, হাত বাড়াইলে কিছু স্পর্শ করা যায় না। অর্থাৎ কৃতিত্ব বা কীর্ত্তির ভাগে শূন্য—বাঙালী তাহার অপকীর্ত্তিতে বৎসরকে ভারাক্রান্ত করিয়াছে—সেই বোঝা সে এখন ১৩৪২ সালের ঘাড়ে চাপাইয়া দিতে আসিয়াছে

তিহাসিক ধারা বজায় রাখিবার পক্ষে ইহা শুধুই একটা "সাময়িক" ভার—তাহার অধিক গৌরব ইহার কিছু নাই। হয়ত এই কীর্ত্তির বোঝা বহন করিতে করিতে একদিন আমরা সত্যকার বর্ষের দ্বারে আসিয়া পৌঁছিব, কিন্তু আজিকার এই গভীর অন্ধকারে শুধুই স্বপ্ন মাত্র।

———

বাদল রাতে

আজ সারারাত বাদলের ধারা বিশ্রাম নাহি মানে।

ঝম্ ঝম্ ঝম্ ঝর ঝর ঝর ঝরে গগনের কোটি নির্ঝর,
নিখিল মুখরি' উঠে একস্বর উদাস আকুল তানে।
নিদ্রাবিহীন নিশীথ শয়নে শুনিয়া সে ধ্বনি—কি জানি কেমনে
মন ছুটে যায় ধারাবারিসনে কে জানে সে কোন্ দেশে?
কোন্ বনতলে গহন আঁধারে, সুবিজন পথে কোন্ জলধারে,
কত গিরি মরু প্রান্তর পারে— সে কাহার উদ্দেশে?
যেন মনে হয় ভরা জ্যোৎস্নায় সুধার সাগর জেগেছে কোথায়,—
দুলিছে ফুলিছে—আপন কথায় আপনি উঠিছে মাতি;
যে সুখে সে হ'ল উতলা অধীর সে সুখ বিলাবে বিরস বধির
ধরার ধূলায়—তাই জলধির ঘুম নাই সারারাতি।
যেন সে ডাকিছে দূরে বহুদূরে, কোথা হ'তে কে তা' জানে!
কোন্ সাগরের কল গর্জ্জন আজি পশিতেছে কানে!

অকূল সিন্ধু ডাকেরে আজিকে, উতলা সিন্ধু ডাকে !
ডাকে অবিরাম, ডাকে অনিবার ! ডাকে দ্বারে দ্বারে বন্দীজনার—
নিখিলের প্রতি-সলিলকণার নিদ্রিত আত্মাকে !
তা'রি অশরীরী আহ্বান আসে সিন্ধু সুরভি ছড়ায়ে বাতাসে,
পুলকে উলসি উঠে উল্লাসে নিখিল বসুন্ধরা ।
শুক্লা শশীর আলো করি চুরি গগনে গগনে ঝরে ফুলঝুরি
ধরণীর বুকে প্রাণের মাধুরী কূলে কূলে তাই ভরা ।
তারি ডাক শুনে শ্রাবণের মেঘে যত জল ছিল ছুটে এল বেগে,
বন্যার স্রোতে নদী উঠে জেগে উদ্দাম—তারি ডাকে ।
রুদ্ধ দুয়ারে শুনি কান পেতে দূর গিরিশিরে উঠিয়াছে মেতে
শত নির্ঝর নিভৃত নিশীথে পাষাণ পথের পাকে !
কোনোখানে কেহ রহিবেনা স্থির কেহ রহিবেনা বাকী ।
আজি জয়ভেরী মহাজলধির নিখিলে ফিরিছে ডাকি !

ওরে, গৃহকোণে আপনার মনে কে আছিস্ হেন রাতে ?
আহ্বান আজি উঠিয়াছে বাজি' দেবতার দামামাতে ।
ঊর্দ্ধগগনে নব নব বেশে—কে কোথা ফিরিছ আজি দেশে দেশে ?
কে কোথা ঘুমাও অলস আবেশে কোন্ সরসীর বুকে ?
গিরিকন্দরে শিলাবন্ধনে কে কোথা কাঁদিছ কলক্রন্দনে ?
ভাঙো ভাঙো কারা—জয় বন্দনে জলধির, চলো সুখে ।
কে কোথায় তৃণপল্লবকোলে জলিছে দুলিছে বায়ুহিল্লোলে ;
কনক-কলসে কঙ্কণরোলে কে কোথা ঘুমাও আজি ?
ওগো জাগো,—আর নাই অবসর, ঝরিছে বাদল ঝর ঝর ঝর,
শ্যামল করিয়া মরু প্রান্তর উৎসবে চলো সাজি ।
আজি নিশিরাতে পরাণ বিবশ,—কেমনে বুঝাব হায় !
দেহ হ'তে প্রতি শোণিত কণিকা ছুটে চলে যেতে চায় !

———

মধুসূদন বালককাল হইতেই উদার এবং স্নব; স্নব-এর প্রতিশব্দ বোধকরি বাংলায় নাই, কারণ দেশে এতই আছে।

* * *

"আমি অবশ্যই মহাকবি হইতে পারি, আঃ কেবল যদি একবার বিলাত যাওয়া সম্ভব হয়।" মধু বিলাত গমনের সরল পথ আবিষ্কার করিলেন, গির্জ্জার মধ্য দিয়া। তিনি তৎকালীন প্রসিদ্ধ পাদ্রী কৃষ্ণমোহন বাঁড়ুয্যের নিকটে যাতায়াত সুরু করিলেন। মধু একসঙ্গে খৃষ্টধর্ম্ম ও বিলাত সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন, বাঁড়ুয্যে মহাশয় নিজে ভূতপূর্ব্ব হিন্দু, কাজেই অভূতপূর্ব্ব খৃষ্টানের মনস্তত্ত্ব বুঝিয়া পেকস্নিফের (Pecksniff) মত ঘরের কড়িকাঠে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বলিলেন, ধর্ম্ম-বিশ্বাস ও সাংসারিক উন্নতির উপায়কে তিনি একসঙ্গে জড়াইতে রাজি নহেন। মধু কি উত্তর দিয়াছিলেন লিখিত নাই, কিন্তু বলিতে পারিতেন, সিজারের প্রাপ্য সিজারকে দিবার আজ্ঞা তো স্বয়ং খৃষ্টের। বাঁড়ুয্যে মহাশয় ধর্ম্ম ও অর্থকে একত্র করেন না (অবশ্য নিজের কথা স্বতন্ত্র) কিন্তু ধর্ম্মের বিকল্পে যে কারাদণ্ড তাহা বেশ জানেন। একবার একটি দরিদ্র হিন্দুবালক তাঁহার নিকটে ভিক্ষার জন্য গিয়াছিল, তিনি বলিয়াছিলেন, ভিক্ষা কর কেন, খৃষ্টান হও, সুবিধা হইবে, নতুবা তোমাকে জেলে পাঠাইব। বাঁড়ুয্যে মহাশয় পণ্টিয়াস্ পাইলেট না পেকস্নিফ? বোধ করি শেষোক্ত ব্যক্তির সঙ্গেই তাহার মিল বেশি, কেবল নৈতিক দাড়িটি ব্যতীত।

কয়েকদিন পরে মধুসূদন বাড়ী হইতে উধাও হইলেন। অনুসন্ধানে জানা গেল পাদ্রীরা তাঁহাকে কেল্লায় লুকাইয়া রাখিয়াছে, পাছে আলোক-আসন্ন বালকের মনকে আবার অন্ধকার আক্রমণ করে। খৃষ্টধর্ম্মের দীনতার পক্ষে দুর্গের দুর্গমত্ব আবশ্যক, যেমন আবশ্যক কচি লতার রক্ষার পক্ষে বেড়ার আবেষ্টন। নৈতিক শক্তিও শক্তি কিন্তু তাহার

সহিত কামান জুড়িয়া দিলে তাহা একেবারে অব্যর্থ। প্রেম প্রচারের জন্যই বারুদের সৃষ্টি।

গৌরদাস মধুসূদনের সহিত কেল্লায় দেখা করিতে গেলেন। মধু নবধর্ম্মের বিষয় অনেক আলোচনা করিলেন, কুসংস্কারের ক্রোড় হইতে কেমন করিয়া হঠাৎ তাঁহার কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ হইল, তাহাও বলিলেন, কিন্তু মূঢ় গৌরদাস আলোকের চিহ্নমাত্র মধুসূদনের কোনো-খানে দেখিতে পাইলেন না, না তাঁহার মুখে, না তাঁহার ভবিষ্যতে!

তারপরে ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারি মধুসূদনের দীক্ষা হইল। দীক্ষাস্থলে আর্চ-ডীকন ডিলট্রি উপস্থিত, শুকনাসা ও অস্থিবহুল মুখমণ্ডল লইয়া; কড়িকাঠে নিবদ্ধদৃষ্টি পেকস্নিফ বাঁড়ুয্যে মহাশয় উপস্থিত; আর দুই চারজন সহৃদয় ইংরেজ সপরিবারে উপস্থিত। মধুসূদন সগর্ব্বে দণ্ডায়মান সকলের মনোযোগের কেন্দ্রে ও নূতন পোষাকের পারিপাট্যে।

মধুসূদনের স্বলিখিত সঙ্গীত আরম্ভ হইল।

Long sunk in superstition's night,
By sin and Satan driven,—

* * *

I hasten'd to Eternity
O'er Error's dreadful sea!

মধু উপস্থিত ব্যক্তিদের উপরে তাঁহার গানের প্রভাব লক্ষ্য করিতে লাগিলেন; আন্তরিকতা অপেক্ষা অন্ত্যানুপ্রাসের প্রতি তাঁহার বেশি দৃষ্টি। এ দীক্ষা-সঙ্গীতের অর্থ সম্বন্ধে আর যাহার মনেই দ্বিধা থাকুক, বাঁড়ুয্যে মহাশয়ের ছিল না! তিনি স্পষ্ট বুঝিলেন—I hasten'd to Eternity, O'er Error's dreadful seaটা নিরেট রূপক;

Eternity অর্থ ইংলণ্ড, আর dreadful sea টা আধিভৌতিক সমুদ্র, তবে সেটা বঙ্গোপসাগর না ঝঞ্ঝাসঙ্কুল বিস্কে-উপসাগর ! এই সঙ্গীতের তালে তালে অদূর ভবিতব্যের অশ্রুত কণ্ঠ হইতে ধ্বনিত হইতে লাগিল—"আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায় তাই ভাবি মনে।" বাঁড়ুয্যে কড়িকাঠের অভিধান অনুসন্ধান করিয়া তাহা ভাবিতে লাগিলেন।

মধুসূদন খৃষ্টান হইলেন কেন ? বিলাত যাইবার জন্য—অসম্ভব নয় ; অবাঞ্ছনীয় বিবাহ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য খুব সম্ভব। কিন্তু আরো একটা কারণ আছে, মনে হয়। জাহাজ দেখিলে যাঁর ইংলণ্ডের কথা মনে হইত, সমুদ্র যাঁর কানে ইংলণ্ডের বাণী বলিত, যাঁহার শ্রেষ্ঠ কবির আদর্শ মিল্টন ; বায়রনের জীবনী পড়িয়া যাঁহার মনে হয় বড় কবি হইবেন, ইংলণ্ড যাইতে পারিলেই যাঁহার সর্ব্বার্থ সিদ্ধ হয়, তিনি যে মিল্টন-বায়রন-ইংলণ্ডের ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া খানিকটা পরিমাণে তাঁহাদের সহিত একাত্মকতা অনুভব করিবেন, ইহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই। কবির মনে অজ্ঞাতসারে ইহা ছিল না কে বলিতে পারে।

বিশপ্‌স্ কলেজের নিকটে গঙ্গার তীরে একটি যুবক। যুবকের পরিধানে নূতনতম ফ্যাশানের সাহেবী পোষাক। যুবক নিঃসঙ্গ, নীরব। একখানি জাহাজ সমুদ্রের দিকে যাইতেছে—যুবকের লক্ষ্য সেই দিকে। সে ভাবিতেছে, এ জাহাজ যায় কোথায় ? বোধ করি সেই ইংলণ্ডে! ডেকের উপরে সাহেব, মেম পদচারণা করিতেছে ; যুবক ভাবিতেছে, ইহারা কত সুখী! সে জাহাজের নাম পড়িতে চেষ্টা করিল, Land পর্য্যন্ত চোখে পড়িল, আসন্ন অন্ধকারে বাকি অক্ষর পড়া গেল না। যুবক দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল—"আঃ আমি যদি ইংলণ্ড যাইতে পারিতাম।" যুবকের নাম মাইকেল এম্, এস্, ডাট্, এস্কোয়ার। বিশপস্ কলেজের ছাত্র।

মধুসূদন দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলেন, জাহাজ গঙ্গার বাঁকে অদৃশ্য হইয়া গেল; নদীর পরপার অস্পষ্ট হইয়া আসিল। তিনি খৃষ্টান হইয়া বিলাতের পথে কতটুকু অগ্রসর হইয়াছেন? জর্ডান ও টেম্‌স যেখানে ছিল সেখানেই আছে, তিনি কেবল মাত্র গঙ্গাপার হইয়াছেন। বিলাত নিকটে আসিল না, ভারতবর্ষ বহু দূরে গিয়া পড়িল; ইংরেজ নিকটে আসিল না, হিন্দুরা বহুদূরে গিয়া পড়িল; আত্মীয় স্বজন দূরে গেল, পাদ্রীরা নিকটে আসিল না। মাঝে মাঝে পেকস্নিফ বাঁড়ুয্যে মহাশয় আসেন, কিন্তু তাঁহার দৃষ্টি বাইবেল ও কড়িকাঠের মধ্যে নিঃশেষে বিভক্ত, অন্য দিকে তাঁহার মন দিবার অবকাশ থাকে না। কাজেই মধুসূদন এখন হিন্দু পিতার অর্থে বিশপ্‌স্‌ কলেজের ছাত্র হইয়া খৃষ্টানধর্ম্ম ও ঋণের চর্চ্চা করিতেছেন।

মধুসূদন নিজের কক্ষে ফিরিয়া আসিলেন। মনটা ভাল ছিল না। কলেজে একটা গণ্ডগোল চলিতেছিল। দেশীয় খৃষ্টানদের পরিধেয় পোষাক অকৃত্রিম খৃষ্টানদের পোষাক হইতে ভিন্ন। তিনি এই কুসংস্কারের প্রতিবাদকল্পে বৈদেশিকদের পোষাক পরিধান করাতে একটা উপদ্রবের সৃষ্টি হইয়াছিল। তিনি ঘরের জানলা খুলিয়া বাহিরের দিকে তাকাইলেন। শানাইএর সুরে পূরবীর রেশ। খানসামাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কিসের বাঁশী। সে দেশীয় খৃষ্টান দেখিয়া অত্যন্ত উপেক্ষার স্বরে বলিল—কিছু না সাহেব, হিঁদুদের দুর্গাপূজার বিসর্জ্জনের বাজনা। অকৃত্রিম বিদেশী পোষাকপরা কৃত্রিম হিন্দু-হৃদয়ের মধ্যে ছাঁৎ করিয়া উঠিল। তিনি অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া সেই বাঁশীর করুণ আলাপ শুনিলেন। এক কানে শানাইএর সুর অন্য কানে ব্যঙ্গ কণ্ঠে ধ্বনিত হইতে লাগিল—

I've broken Affection's tenderest ties

For my blest Saviour's sake !

মধুসূদনের ইচ্ছা সেই গান আর একটু শোনেন, কিন্তু মাইকেল সশব্দে জানলা বন্ধ করিয়া একটানে বাইবেল খুলিয়া বসিলেন—বাইবেলের পাতার ফাঁক হইতে কোলের উপর খুলিয়া পড়িয়া গেল—একখানা মোটা অঙ্কের বিল, অপরিশোধিত।

সেদিন আহারের সময়ে এক গোলযোগ ঘটিল। মধুসূদন মদ্য চাহিলেন কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তীদিগকে দিয়া মদ ফুরাইয়া গিয়াছে। মধু বলিলেন, মদ চাই-ই ; ভাণ্ডারী বলিল, মদ নাই-ই। তখন তিনি ক্রোধে গেলাস প্লেট আছড়াইয়া ভাঙিয়া ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। কয়েকবার পদচারণা করিয়া পুস্তকের আলমারির নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বায়রনের গ্রন্থাবলী টানিয়া লইতে গিয়া দেখেন, সে স্থান শূন্য। বইখানা কয়েকদিন হইল অন্যত্র গিয়াছে—পুরাতন পুস্তকের দোকানে। বিরক্ত হইয়া জানালা খুলিয়া দিলেন—কানে আসিল সেই শব্দ, দশমীর চাঁদের আলোয় বিসর্জ্জনের বাদ্য। চাঁদের আলো তির্য্যক ভাবে আসিয়া পড়িল টেবিলের উপরে, শূন্য বোতলের উপরে—শূন্য মদের বোতল। মধুসূদন দীর্ঘ নিশ্বাসের সহিত উঠিয়া পুনরায় পদচারণা করিতে লাগিলেন। বিসর্জ্জনের বাদ্য ও শূন্য মদের বোতল।

কলিকাতার একটি অট্টালিকার কক্ষে বসিয়া গৌরদাস বাবু একখানা চিঠি পড়িতেছিলেন। খামখানা পিয়নের করলাঞ্ছিত, অনেক দূরের পথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে। চিঠিতে এই জাতীয় ভাব ছিল :

আমার ক্যাপটিব লেডি প্রকাশে মাদ্রাজের সাহিত্য জগতে হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে। যোগ্য সমালোচকেরা বলিতেছেন, ইহাতে এমন সব অংশ আছে, যাহা স্কট বায়রনের পক্ষেও গৌরবের হইত। গৌরদাস

হাসিলেন। মধু ঠিক তেমনি আছে। আবার পত্র, 'প্রশংসা যত আসিয়াছে, টাকা তত নয়।' গৌরদাসের বিস্ময়ের কারণ নাই। 'ক্যাপটিব লেডির মুদ্রাঙ্কণে অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি আমার সহিত দেখা করিতে আসিতেছেন, বারিষ্টার, অধ্যাপক, সম্পাদক এবং ছাপাখানার মালিক।' গৌরদাস বুঝিলেন শেষোক্তের উদ্দেশ্য কি! পত্র বলে, "দেখো শীঘ্রই আমার একখানা বই ইংলণ্ডে প্রকাশিত হইবে।" গৌরদাস ভাবেন মধু এখনো বিলাত যাইবার আশা ছাড়েন নাই। আবার পড়িতে লাগিলেন—'দেখ, আমার একটি কন্যা জন্মিয়াছে, কি ভাবে বাংলায় এ সংবাদ পিতাকে লিখিতে হয় জানি না, কারণ বাংলা ভুলিয়া গিয়াছি।' গৌরদাস কল্পনায় যেন মধুর সগর্ব্ব হাসি দেখিতে পাইলেন। পত্র বলিতেছে—'একজন পূরাদস্তুর সাহিত্যিক হওয়ার পক্ষে মাসিক কয়েকশত টাকার একটি চাকুরি আবশ্যক। আমি শীঘ্রই একখানা মহাকাব্য লিখিব।' গৌরদাসের বিদ্রূপ করিবার মত মনের অবস্থা হইলে ভাবিতে পারিতেন, খণ্ডকাব্য লিখিতে যাহার মাসিক কয়েক শ' দরকার, মহাকাব্যে তাহার দরকার নিশ্চয় কয়েক হাজার! পত্রের শেষে ছিল মধুর মর্ম্মকথা—'পুস্তক বিক্রয়ের টাকা পাঠাইয়ো—ছাপাখানার দৈত্য দানবের অত্যাচার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে।'

মাদ্রাজের একটি কক্ষে মধুসূদন গৌরদাসের প্রেরিত পত্র ও সংবাদ পত্রের খণ্ড পাঠ করিতেছিলেন। হরকরা ক্যাপটিব লেডির তীব্র সমালোচনা করিয়াছে। মধু ভাবিতেছিলেন—প্রশংসা কেউ স্বেচ্ছায় দেয় না, আচ্ছা আমি জোর করিয়া আদায় করিব। জনসাধারণের মতামত সাহিত্য বিষয়ে গ্রাহ্য নয়। কেবল যদি একটু সময় পাই—কিন্তু ছাপাখানার তাগাদা!

গৌরদাসের পত্রের মধ্যে বেথুন সাহেবের উপদেশ! বাংলায়

লিখিতে হইবে! ইহা তো হরকরার গালিগালাজ নয় যে মধুসূদনের জেদ উপস্থিত হইবে! আচ্ছা গৌরদাসকে রামায়ণ, মহাভারত, পাঠাইতে লেখা যাক্! কিন্তু অবশেষে বাংলার মহাকাব্য······দরজায় পুনরায় আঘাত। ক্যাপটিব লেডির প্রশংসা, না বিল! মধুসূদন বাংলাদেশ হইতে আটশত মাইল দূরে বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন আবার কি ফিরিয়া যাইতে হইবে বাংলাদেশে ও বাংলা ভাষায়। এক হিসাবে তো ইংলণ্ডের কাছে আসিয়াছেন—সমুদ্রতীরে। মধুসূদন বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন—

মহাকাব্য কতদূর!
ইংলণ্ড কতদূর!

আহারে বর্ব্বরতা

রন্ধননৈপুণ্য ও আস্বাদ-জ্ঞানের জন্য বাঙালীর একটা গর্ব্ব আছে। আমরা আদিম যুগের মানুষের মত অপক্ক ও অসিদ্ধ খাই না এবং বর্ত্তমান যুগের বহু অসভ্যজাতি অপেক্ষা রন্ধন-কলায় আমরা পারদর্শী একথা আমরা সর্ব্বদাই বলিয়া থাকি। মুখ্যতঃ লজ্জানিবারণই বস্ত্র-ব্যবহারের উদ্দেশ্য হইলেও বয়নশিল্প যেমন নানাদিকে নানা প্রকারে উন্নতিলাভ করিয়াছে, সেইরূপ ক্ষুন্নিবৃত্তিই আহারের মুখ্য উদ্দেশ্য হইলেও নানা দেশে নানা প্রকারে রন্ধনকলা উন্নতিলাভ করিয়াছে। সুতরাং অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় এবিষয়েও জাতিগত সভ্যতা ও সংস্কৃতির নিদর্শনরূপে রন্ধন-কলার উৎকর্ষ সাধনের মূল্য আছে। কিন্তু বস্ত্র যখন

লজ্জা নিবারণ না করিয়া বরং অধিকতর লজ্জা দেয় তখন শুধু বয়ন-কলার দোহাই দিয়া তাহার সমর্থন করা যায় না; তেমনি রন্ধন ও আহার যদি শরীর পুষ্ট না করিয়া রুগ্ন ও অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলে তাহা হইলে শুধু রন্ধননৈপুণ্যের প্রশংসা দ্বারা সে ক্ষতির পূরণ হইবে না। আমরা শরীরের পক্ষে প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতার দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া শুধু রসনা-পরিতৃপ্তির জন্য অত্যধিক তৈল, ঘৃত, লঙ্কা ও অন্যান্য মসলা ব্যবহার করিয়া খাদ্যদ্রব্যকে কিরূপ দুষ্পাচ্য ও অপকারী করিয়া তুলি তাহা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অভিজ্ঞ চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যতত্ত্ববিদ্‌গণ আমাদিগকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু সমাজের অন্যান্য ত্রুটির ন্যায় এই ত্রুটিও আমাদের এমন মজ্জাগত ও সংস্কারগত হইয়া পড়িয়াছে যে ইহা সংশোধনের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা আমাদের নাই। রন্ধন-নৈপুণ্য ব্যতীত আরো দুইটি বিষয়ে আমরা অতিশয় অসাবধানতার পরিচয় দিয়া থাকি। প্রথমতঃ আহারের যে নির্দ্দিষ্ট সময় থাকা কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়ে আমরা উদাসীন। দ্বিতীয়তঃ আহারের পরিমাণ সম্বন্ধেও আমাদের কোন সংযম নাই। এই দোষগুলি শুধু ব্যক্তিগত নয়, আমাদের জাতিগত। এই দুইটি অভ্যাস সম্বন্ধে দুএকটি কথা বলাই আমার উদ্দেশ্য।

অফিসের কেরানী, হাইকোর্টের জজ, পাটের দালাল, গ্রামের চাষী, মোটর-চালক, উকিল, ডাক্তার প্রভৃতি সকলেই যে ঠিক এক সময়ে আহার করিতে পারে ইহা আমরা কল্পনাও করিতে পারি না। আমি, খোকা, খুকী, গৃহিণী, মা, পিসিমা, ঠাকুমা, কাকা, মেসোমশাই সকলেই এক সময়ে খাইব, এই প্রস্তাব করিলে আমাকে সকলে পাগল বলিবে। সমাজের ও দেশের নানাপ্রকার ব্যবস্থার জন্য হয়ত এখন এরূপ হওয়া সম্ভব নহে। কিন্তু প্রত্যেকের পক্ষে নিজের আহারের

এক একটি সময় স্থির করিয়া লইয়া তদনুসারে চলা মোটেই অসম্ভব নয়। অথচ যাহার যখন খুসী এবং যখন সুবিধা তখন আহার করিব, ইহাই আমাদের অভ্যাসে পরিণত হইয়াছে। সময়মত আহার করাটাও যেন জেলের কয়েদীর নিয়ম-পালনের ন্যায় বিরক্তিকর। যাহার অফিসের সময় রক্ষার জন্য প্রত্যহ দশটায় আহার করিতে হয়, তিনিও রবিবারে বা ছুটি পাইলেই এগারটা বারটা একটা বা দুইটা (বা তৎপরেও) যখন খুসী খাইবেন। অসময়ে খাওয়াটাই ছুটির দিন উপভোগ করিবার যেন একটা অপরিহার্য্য অঙ্গ।

সংসারের ব্যবস্থাও অনুরূপ। যে বাড়ীতে দশ জন লোক, সে বাড়ীতে প্রথমে ছোট ছেলেপুলে, তৎপরে স্কুল কলেজের যাত্রী, তৎপরে হয়ত উকিলবাবু, তৎপরে মেয়েরা, তৎপরে গৃহিণী, তৎপরে বিধবা মা বা পিসিমা, তৎপরে ঠাকুর চাকর—ক্রমান্বয়ে আহার করিতে বসিবেন। ফলে নয়টা হইতে দুইটা পর্য্যন্ত শুধু মাধ্যাহ্নিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিতেই অতিবাহিত হইয়া যায়।

রাত্রি একটার গাড়ীতে কোন আত্মীয় আসিলেন। তখন আহারের সময় নয়। আহার যদি নিতান্ত করিতেই হয়, তবে অল্প লঘু আহারই যথেষ্ট। কিন্তু গৃহস্থ তখনই অন্ততঃ তিন চারি ভাগে রন্ধন করিয়া তাঁহাকে না খাওয়াইলে তাঁহার আতিথেয়তার ত্রুটি হইবে। হয়ত সেই অসময়ে আহারের ফলে আগন্তুক অসুস্থ হইয়াও পড়িতে পারেন। তাহাতেও ক্ষতি নাই।

বাড়ীতে রন্ধন শেষ হইয়া গিয়াছে। এমন সময়ে কোন আত্মীয় একটা বড় মাছ পাঠাইয়া দিলেন। সুতরাং টাট্‌কা মাছের কালিয়ার লোভ সংবরণ করা অসম্ভব হইয়া উঠিল। ফলে বাড়ীশুদ্ধ লোকের আহারের সময় দুই ঘণ্টা পিছাইয়া গেল।

কলিকাতা ব্যতীত অন্য কোথায়ও নিমন্ত্রিতদিগের আহারের সময় বলিয়া কিছু নাই। শ্রাদ্ধাদির আহার দ্বিপ্রহর হইতে সন্ধ্যা ছয়টা পর্য্যন্ত যে কোন সময়ে হইতে পারে। বিবাহোপলক্ষে আহার রাত্রি আটটা হইতে তিনটা পর্য্যন্ত যে কোন সময়ে হইতে পারে। এজন্য নিমন্ত্রিতদিগকে পূর্ব্ব হইতে কোন সঠিক সংবাদ দেওয়া সম্ভব নয়, সুতরাং রীতি নাই।

বাড়ী হইতে একবার বাহির হইলে আহারের সময় সম্বন্ধে আমাদের স্বাধীনতা চতুর্গুণ বাড়িয়া যায়। ট্রেনে, ষ্টীমারে, নৌকায় ত সময় বলিয়া একটা কিছুর অস্তিত্বই স্বীকৃত হয় না। যখন ইচ্ছা খাইলেই হইল। কোন হোটেলে থাকিলে, সেখানে নির্দ্দিষ্ট সময়ে—আহার পাই-বার পক্ষে কোন অসুবিধা না থাকিলেও আমরা অসময়ে আহার করাটাই বেশি অনুমোদন করি। দার্জ্জিলিং-এ একটি ভাল হোটেলে অনেক বাঙালী থাকিতে চান না, তার কারণ সেখানে সময়মত খাইতে হয়। এরূপ ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ তাঁহারা সহ্য করিতে পারেন না।

এই তো গেল আহারের সময়ানুবর্ত্তিতার অভাবের কথা। আহারের পরিমাণ সম্বন্ধেও আমাদের যে জাতিগত সংস্কার রহিয়াছে, তাহাও সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিচায়ক কি না সে বিষয়ে সন্দেহের হেতু আছে। অধিক আহার করা এবং অধিক আহার করিবার শক্তি থাকা আমাদের কাছে—অতিশয় প্রশংসার বিষয় ইহা অনেকেই স্বীকার করিবেন। যাহারা পুষ্টিকর খাদ্য পায় না অথবা দিনে একবার বা দুইবারের অধিক শুধু ডাল ভাত বা তৎসহ একটা তরকারীর বেশি যাহাদের সংস্থান নাই, তাহারা পরিমাণে বেশি খাইবেই। আমাদের দেশের অধিকাংশ দরিদ্র পল্লীবাসীর এই অবস্থা। কিন্তু যাঁহারা পুষ্টিকর খাদ্য আহার করেন

এবং দিনে চারিবার বা পাঁচবার আহার করিবার সুযোগ পান, তাঁহারাও অধিক পরিমাণ আহারটাকে অতিশয় প্রশংসার চক্ষেই দেখিয়া থাকেন। আমাদের হিতের জন্যই বিধাতা আমাদের পাকস্থলীটাকে কঠিন না করিয়া অতি কোমল স্থিতিস্থাপক পদার্থে নিম্মাণ করিয়াছেন, কিন্তু আমরা তাহা না বুঝিয়া সেটাকে খাদ্যদ্বারা যথাসম্ভব সম্প্রসারিত করিয়া উহাকে দুর্ব্বল ও রুগ্ন করিয়া ফেলি। এই যে বেশি খাওয়ার অভ্যাস ও ইচ্ছা ইহা শুধু রসনাতৃপ্তিজনিত ব্যক্তিগত দোষ নহে। ইহার পশ্চাতে আমাদের জাতির একটি মজ্জাগত সংস্কার বর্ত্তমান। বল, বুদ্ধি প্রভৃতিব ন্যায় অধিক আহার করিবার শক্তিও (অর্থাৎ চাউলপূর্ণ বস্তার ন্যায় পাকস্থলীর পূর্ত্তি) আমাদের নিকট অতিশয় প্রশংসা ও গৌরবের বিষয়।

আমার পরিচিত এক ব্যক্তির একবার খুব জ্বর হয়। জ্বর ছাড়িয়া গেলে ডাক্তার একেবারেই ভাত ব্যবস্থা না করিয়া রোগীকে রুটি খাইতে বলেন। পরদিন আসিয়া শুনিলেন রোগী ছত্রিশখানা সাধারণ আকারের আটার রুটি পথ্য করিয়াছেন! ডাক্তারবাবু তাঁহাকে ঐরূপ লঘু পথ্যের পরিবর্ত্তে ভাত খাওয়াই বেশি উপকারী বলিয়া গেলেন।

যাঁহাদের সহিত স্নেহের সম্পর্ক, তাঁহারা বেশি করিয়া খাওয়াইয়া এরূপ তৃপ্তিলাভ করেন, যে অনেক সময়ে শুধু তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করিবার জন্যই আমাদিগকে অতিভোজন করিতে হয়। আহার্য্যের তালিকা না দিয়া, অথবা গোপন করিয়া, একটার পর একটা করিয়া আহার্য্য আনিয়া অনুরোধ উপরোধ করিয়া খাওয়ান শুধু যে স্নেহের নিদর্শন, তাহা নহে, এরূপ না করিলে নিতান্ত অসামাজিক ও অভদ্র বলিয়া পরিচিত হইতে হয়। নানারূপ সুখাদ্য আদরের সহিত খাওয়ান—ইহাতে দূষনীয়

কিছুই থাকিতে পারে না, কিন্তু পরিমাণজ্ঞানশূন্য হইয়া স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া কেবল পাকস্থলীর সম্প্রসারণ কখনই সুরুচি ও সভ্যতার অনুমোদিত হইতে পারে না।

এক ধনী ব্যক্তি ব্রাহ্মণভোজন করাইতেছিলেন। আকণ্ঠ ভোজনের পর সকলেই যখন আসনত্যাগ করিবেন, তখন তিনি বলিলেন যে যিনি এখন পাঁচটি মিষ্টান্ন ভোজন করিতে পারিবেন, তাঁহাকে তিনি পাঁচটাকা পুরস্কার দিবেন। দেখা গেল দশজনের বেশি পুরস্কার প্রার্থী হইলেন না। ইহার পর ধনী পুনরায় ঘোষণা করিলেন, এই দশজনের মধ্যে যিনি আরো পাঁচটি মিষ্টান্ন ভোজন করিতে পারিবেন, তিনি দশটাকা পুরস্কার পাইবেন। এই পুরস্কার পাঁচজনে পাইলেন। পুনরায় ঘোষিত হইল এই পাঁচজনের মধ্যে যিনি আরো পাঁচটি মিষ্টান্ন ভক্ষণ করিতে পারিবেন, তিনি পাঁচটাকা পুরস্কার পাইবেন। মাত্র একজন এই পুরস্কার লাভ করিয়া শেষ মিষ্টান্নটি কণ্ঠাগ্রে করিয়া ভোজন-সভা ত্যাগ করিলেন। এই গল্পটি নিতান্তই গল্প নহে। কারণ অনেক ছাত্রাবাসে যে ভোজন-প্রতিযোগিতা হইয়া থাকে, কার্য্যত তাহা উক্ত গল্পেরই অনুরূপ। বন্ধুগণ কর্ত্তৃক উৎসাহিত হইয়া ক্রমাগত ভাত, ডাল বা মিষ্টান্নদ্বারা পাকস্থলী-পূরণ করিয়া আনন্দলাভ করা এবং পানোন্মত্ত অবস্থায় পৃষ্ঠদেশে লৌহ-শলাকা বিদ্ধ করিয়া চড়কগাছে পাক খাওয়ার আনন্দের মধ্যে মনোবৃত্তি-গত পার্থক্য বেশী নহে।

আমার পরিচিত এক মহাশয়-ব্যক্তি ছাত্রজীবনে খেজুরের রস ভালবাসিতেন। আকণ্ঠ পান করিয়াও তাঁহার তৃপ্তি হইত না। সেইজন্য তিনি একবার আকণ্ঠ পান করিয়া সেটুকু বমন করিয়া ফেলিয়া দিয়া পুনরায় পান করিতেন। এইরূপে ক্রমাগত এক বা দুই কলসী পরিমিত রস পান না করা পর্য্যন্ত তিনি বিরত হইতেন না।

অত্যধিক আহার যে আমাদের নিকট কত প্রশংসনীয় তাহা স্বাস্থ্যবান্ বা দীর্ঘজীবী বৃদ্ধদের বাক্য হইতে প্রতীয়মান হয়। তাঁহারা প্রায়ই বলেন, আমি বয়সের কালে একটা আস্ত পাঁঠা খাইতে পারিতাম, আমি একবার নিমন্ত্রণে পূর্ণ আহারের পরেও পঞ্চাশটা সন্দেশ খাইয়াছিলাম, আমি পাঁচটা ইলিশ মাছ একা খাইতে পারিতাম, আমি এক সময়ে আহার শেষ হইবার পর দুই হাঁড়ি দধি খাইয়াছি, আমি তিরিশটা বোম্বাই আম বৈকালে খাইয়া পুনরায় রাত্রিতে যথারীতি আহার করিয়াছি, ইত্যাদি ইত্যাদি। এইরূপ আহার করিয়াও হয়ত অন্যান্য নানা কারণে স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখা ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে অসম্ভব হয় নাই, কিন্তু এইরূপ দুরন্ত লোভ ও স্বেচ্ছাচারের ফলে কত শত ব্যক্তি চিরজীবনের জন্য হজম-শক্তি হারাইয়া ও নানাপ্রকার দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া জীবন্মৃত হইয়া আছেন, অথবা জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছেন, তাহার সংবাদ রাখা আমরা প্রয়োজন মনে করি না।

আধমণি কৈলাসের কথা আমরা সকলেই শুনিয়াছি। তাঁহার নাকি আধমণ পর্য্যন্ত ভোজনদ্রব্য গলাধঃকরণ করিবার অসামান্য ক্ষমতা ছিল। পূর্ণ আধমণ না হইলেও তাঁহার যে অসাধারণ ভোজন-শক্তি ছিল এবিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই শক্তিটিকে ব্যাধি না বলিয়া এই শক্তির অধিকারীকে প্রশংসা ও খ্যাতির দ্বারা পুরস্কৃত করিবার মনোবৃত্তি আমাদের জাতির মজ্জাগত। কেহ কেহ হয়ত বলিবেন যে আমরা আহারের প্রশংসা করি না ; যে স্বাস্থ্য থাকিলে অধিক আহারের ক্ষমতা থাকে, আহার উপলক্ষ্য করিয়া আমরা সেই স্বাস্থ্যকে এবং সেই স্বাস্থ্যের অধিকারীকেই প্রশংসা করিয়া থাকি। সুতরাং আমাদের আহারের পরিমাণের প্রশংসার পশ্চাতে নিগূঢ়ভাবে

বল ও স্বাস্থ্যের প্রশংসাই নিহিত, কিন্তু একথা সত্য নহে। যাঁহারা অত্যধিক আহার করেন, তাঁহাদের অধিকাংশই রুগ্ন না হইলেও এরূপ বলবান্ বা স্বাস্থ্যবান্ নহেন, যাহাতে দেখিলেই তাঁহাদের স্বাস্থ্য প্রশংসনীয় বলিয়া মনে হইবে। উপরোক্ত আধমণি কৈলাস বিশেষ বলবান্ বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন না। যে সকল বলশালী ব্যক্তি নিজের বল ও স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য অধিক পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করেন তাঁহাদের প্রশংসা ও খ্যাতি এবং আধমণি কৈলাসের খ্যাতি এক কারণে নহে। কয়েকদিন পূর্ব্বে এক বাড়ীতে বৈকালিক জলযোগের জন্য আহূত হইয়াছিলাম। সেখানে এক বন্ধু আঙুর, আপেল, খেজুর, আম প্রভৃতি ফল, সন্দেশ, রসগোল্লা, রাবড়ী প্রভৃতি মিষ্টান্ন, তাহার উপর দধি প্রভৃতি নানাপ্রকার খাদ্য যাহা খাইলেন, তাহা যে-কোন বলবান্ ও স্বাস্থ্যবান্ লোকের প্রায় সমস্ত দিনের পক্ষে যথেষ্ট। অথচ তিনি ভোজনান্তে বলিলেন, আজ রাত্রে গুরুভোজন করিব না, চারিটা মাছের ঝোল ভাত অবশ্য খাইতেই হইবে! ইনি রুগ্ন না হইলেও তেমন বলবান্ নহেন। এবং তাঁহার এই অতি-ভোজন বল ও স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য নহে—শুধু অভ্যাস বশতঃ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

বেশি খাওয়া এবং বেশি খাওয়ান যে আমাদের নিকট অতিশয় তৃপ্তিকর, তাহা প্রচলিত অনেক রীতি এবং ছড়া ও গল্পেও প্রকাশ পাইয়া থাকে। কোথায়ও নিমন্ত্রণ হইলে আমরা স্বতঃসিদ্ধ সত্যের মত ধরিয়া লই যে সেখানে অতিভোজন হইবে। সেইজন্য কেহ কেহ পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত হইয়া থাকেন। কেহ নিমন্ত্রণের সময়ের পূর্ব্বে এক বেলা আহারই করেন না, কেহ কোন পাচক ঔষধ খান, কেহ নিমন্ত্রণের পর বাড়ী ফিরিয়া বমন করিয়াও ফেলেন; তবু নিমন্ত্রণ-রক্ষা করা চাই। স্নেহ-সম্পর্কিত নারীগণের "এটা খাও, ওটা খাও, আমার মাথা খাও"

ইত্যাদি অনুরোধ অতি-পরিচিত। এরূপ না করিলে তাঁহাদের কিছুতেই তৃপ্তি হয় না। স্নেহ-প্রকাশের অন্যান্য অসংখ্য পন্থা আছে, এ পন্থাটা বর্জ্জন করিলে যে অসামাজিক হইতে হইবে, তাহার কোন অর্থ নাই। সুপক্ক, সুস্বাদু নানাবিধ আহার্য্য সম্মুখে আনিয়া দিয়া যাহার যেরূপ রুচি, ক্ষুধা ও শক্তি, তদনুসারে আহার্য্য তুলিয়া লইবার ভার যে খাইতেছে তাহার উপরই ন্যস্ত করা কর্ত্তব্য। আমরা কখন কখন বলি বটে "আপ্-রুচি খানা", কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা করি কি?

খাইতে বসিয়া পাকস্থলী সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে কোমরের কাপড়ের 'এক ঢিল, দুই ঢিল' ইত্যাদি দিবার রীতি হাস্যকর হইলেও অতিশয় সুপ্রচলিত। খাইবার পর আসন ত্যাগ করিবার সময় উত্থান শক্তির অপ্রতুলতা কিঞ্চিৎ স্থূলকায় ব্যক্তিদের নিকট দৈনন্দিন ব্যাপার। এ সমস্তই অতি-ভোজনপ্রিয়তার নিদর্শন, তৎসম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ কোথায়?

নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগকে যথাসাধ্য আকণ্ঠ ভোজন করাইবার জন্য পরিবেশককে যে উপদেশ দেওয়া হইয়া থাকে—

"হাঁ হাঁ দত্যাৎ হুঁ হুঁ দত্যাৎ দত্যাচ্চ করকম্পনে।
শিরসশ্চালনে দত্যান্নদত্যাদ্ ব্যাঘ্রঝম্পনে॥"

তাহা একেবারেই অতিরঞ্জিত নহে। কোন কোন স্থলে অবশ্য ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়, কিন্তু সে ব্যতিক্রম নিমন্ত্রিতদিগের স্বাস্থ্যরক্ষার্থে নহে, অন্য কারণে।

অত্যধিক আহার করিয়া, আকণ্ঠ উদর পূর্ণ করিয়াও অনেক সময়ে আমাদের আহারের আকাঙ্ক্ষা মেটে না। এই সম্বন্ধে একটি সুপ্রচলিত গল্প বলিয়াই এই প্রসঙ্গের শেষ করিব। এক শ্রাদ্ধ বাড়ীতে কয়েকজন

নিমন্ত্রিত ব্যক্তিকে স্থানাভাব বশতঃ পৃথক্‌ভাবে বহির্বাটিতে আসন দেওয়া হইয়াছিল। ইঁহাদের মধ্যে একজন ইহাতে অতিশয় ক্ষুণ্ণ হইলেন, কারণ তাঁহার ধারণা জন্মিল যে যাঁহারা ভিতরবাটীতে বসিয়াছেন, তাহারা নিশ্চয়ই ইঁহাদের অপেক্ষা বেশি যত্ন পাইবেন। সেইজন্য তিনি আহারের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত প্রত্যেকটি জিনিষই চাহিয়া লইয়া খাইলেন, যাহাতে কিছুতেই যেন ভিতরবাটীর ব্যক্তিগণ অপেক্ষা কোন বিষয়ে তাঁহার কম না থাকে। এইরূপে ক্রমাগত নানা আহার্য্যে উদরপূর্ণ করিয়া শেষ মিষ্টান্নটি কণ্ঠাগ্রে করিয়া উর্দ্ধমুখে বাহিরে আসিতেই একটি শায়িত গাভীতে পদস্পর্শ হইল। মুখ নীচু করিবার উপায় নাই, সুতরাং হাত দিয়া গাভীর উদরদেশ অনুভব করিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'কে হে বাপু, খেয়ে এসেই শুয়ে পড়েছ, তুমি বুঝি ভিতর-বাড়ীতে বসেছিলে!'

পেটুক ও লোভী সব দেশে সব সমাজেই আছে এবং থাকিবে। দেশের প্রত্যেক ব্যক্তিই জ্ঞানী ও সংযমী হইবে ইহাও কেহ আশা করে না। কিন্তু দেশের আপামর সাধারণ, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সকলেই একটি কুপ্রথা ও কদভ্যাসের দাস হইয়া থাকিবে, ইহা কখনই বাঞ্ছনীয় হইতে পারে না।

"এতখানি বাড়াবাড়ি মোটে ভাল নয়,"
পুষ্পিতা লতারে হেরি, অপুষ্পিতা কয়!

—

জীবন-যাত্রা

বঙ্গের চত্বরে
এসেছিল একদিন
'টিকৃস্‌-এর ঘূর্ণি-বায়ু :
স্ব (দেশ)-হিতৈষণা-
ব্রতী নায়কের দল
চেতাইল সুপ্ত স্নায়ু।
সবুজিম যউবন-
সলিল-তরঙ্গের
ধাক্কা রুধিবে কার সাধ্য—
" 'Bonne' দে কেবল, মাগো"—
চেঁচায় তরুণ-যূথ
বর্জ্জিয়া পানীয় ও খাদ্য।
নোকরি ছাড়িয়া কেহ
চক্রে সূত্র কাটে
সুতার তন্তু সম সূক্ষ্ম।
Bar-বনিতা শ্রেফ
তালাকিয়া পুনঃ কেউ
গাউন শুকায়ে ভোলে দুঃখ।
চক্র-পন্থী দুই-
চারি মনু-সন্তান
ভণে এ তো অদ্ভুত মজারে—
সুতাই কাটিনু মোরা,
সুতা, হায়, নাহি কাটে
বঙ্গের পণ্যের বাজারে।

দেশ-নেতা উকিলের
উৎকট ঘূৎকারে
পীঠের পোড়োরা দিল সাড়া চট্,—
ঠিক কথা—স্বদেশের
কাজ কভু মুলতুবি
থাকিবে? Education...tommy-rot!

* * *

ছেঁড়া কাঁথা-কম্বল
শুধু সম্বল করি'
ব্রতী অনাড়ম্বর লক্ষ,
দেশ-মাতৃকা-পায়ে
রুধির ঢালিয়া দিল
সহাস্যে ছিঁড়ি নিজ বক্ষ।
কর্ম্মী ও কর্ম্মের
নাহি ওর, শূন্যের
গড্ডল মিলিল পরার্দ্ধ—
লেকিন ক্ষুদ্র "এক"?
হায়, কে আনিয়া দিবে
পাত্তা "এক"-এর তিল-অর্দ্ধ!

* * *

পড়োর দল বাণীর hall
ছাড়িয়া ধায় নেতার ছায়।
দু'দিন পর নেতার ঘর
রুদ্ধ-দ্বার টিকিটি তার
নিরুদ্দেশ। ছেলেরা শেষ
করিল ঠিক্ ভূমিতে kick
করিয়া, চল্, যাত্রা-দল
খুলিয়া দি— তা' ছাড়া কিবা
করাই যায়! বঙ্গে, হায়,

আর তো ভাই কিচ্ছু নাই
যাত্রা গান অপিচ পান-
তামাক ভিন্ মনের বীণ
ছ্যায় আওয়াজ? সাজ রে সাজ
পান-তামাক— বুজায়ে ফাঁক॥

—দণ্ডপাণি উপাধ্যায়

"প্রাথমিক শিক্ষার আদর্শ" *

শ্রীযুক্ত অনাথনাথ বসু [বি-এ (কলিকাতা) এম-এ (লণ্ডন) টীচার্স ডিপ্লোমা (লণ্ডন) টীচার্স সার্টিফিকেট (উইনেটকা, আমেরিকা)] নানা সাময়িক পত্রে শিক্ষা বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিয়া থাকেন। প্রবন্ধগুলি 'বিস্তারিতভাবে পঠিত হয় কিনা জানি না। "প্রাথমিক শিক্ষার আদর্শ" নামক তাঁহার একখানি ২১ পৃষ্ঠার পুস্তিকা আছে, সেখানাও উপযুক্তরূপে প্রচারিত হইয়াছে কিনা জানা নাই। বইখানা হাতের কাছে আছে, পড়িয়া ফেলিলাম। প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে অনেক কথাই মনে আসিতেছে।

পৃথিবীতে বেকার সমস্যা আছে, এবং থাকিবে। ছোট-বড়, উচ্চ নীচ, ভাল-মন্দের পার্থক্য আছে এবং থাকিবে। জীবন ধারণের এবং সুখে জীবন ধারণের সমস্যা কখনো বাড়িবে কখনো কমিবে, কিন্তু এই সুলভ দার্শনিকতার সুযোগ লইয়া আমরা কি কোনো কিছুরই চেষ্টা

* প্রকাশক—শ্রীপঞ্চানন বসু, ই-৭৫ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা

করিব না? মন্দ যখন থাকিবে তখন থাকুক, শিক্ষায় যখন বেকার সমস্যা ঘুচিতেছে না তখন কি হইবে শিক্ষা-সংস্কারে—ইত্যাদিরূপ সান্ত্বনায় কি আমরা তৃপ্ত হইয়া রহিব?

কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এরূপ সান্ত্বনাও আমাদের নাই। শিক্ষা সম্বন্ধে এরূপ একটি যুক্তি খাড়া করিতেও মনের যতখানি সক্রিয়তা প্রয়োজন হয় তাহাও আমাদের নাই। অর্থাৎ আমাদের বর্ত্তমান প্রাথমিক শিক্ষাপদ্ধতি যে আমাদের পক্ষে কতখানি মারাত্মক তাহা বুঝিবার বা অনুভব করিবার মত ক্ষমতা আমাদের নাই।

এরূপ অবস্থায় অনাথনাথ বসু মহাশয়ের প্রবন্ধ বা পুস্তিকা দেশের মধ্যে যে আশানুরূপ চাঞ্চল্য জাগাইবে না তাহা বলাই বাহুল্য। চাঞ্চল্য না জাগাইলেও যিনি এই বিরাট জড়ধর্ম্মী সুপ্ত দেশে চঞ্চলতা জাগাইবার প্রয়াস পাইতেছেন তাঁহাকে যেন আমরা অন্তত কিছু মূল্য দিতে কার্পণ্য না করি। এদেশে সহসা কিছু হইবে না, কিন্তু নিতান্তপক্ষে অভাব-বোধটাও যদি জাগে তাহা হইলেও অনেকখানি কাজ হইল বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

অনাথবাবুর একটি মাত্র কথা উদ্ধৃত করিতেছি। তিনি বলিতেছেন—

> (শিশুদের) বর্ণপরিচয় হইতেছে বটে, কিন্তু সে পরিচয় আনন্দরসে জীর্ণ না হওয়ায় তাহা জীবনে কার্য্যকরী হইয়া উঠিতেছে না।

হইবে কি উপায়ে? বাংলাদেশের প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক বা মধ্যইংরেজী স্কুলের শিক্ষক শিশুদিগকে যে বই পড়ায় সেই বই সম্বন্ধেই তাহার পূরা জ্ঞান থাকে না—কাজেই প্রকাণ্ড বেত, সামান্য বেতন এবং অজ্ঞতা যুক্ত হইয়া যে রস সৃষ্টি হয় তাহাকে বীভৎস রস ছাড়া আর কি

বলা যাইতে পারে ? পাঁচ সাত টাকা বেতনের মজুর কখনো শিশু-শিক্ষার ভার লইতে পারে ?

কিন্তু অনাথবাবু দেশসম্বন্ধে হয়ত এতখানি হতাশ নহেন সেই জন্যই সংস্কারের কথা তুলিয়াছেন। আমরাও সংস্কারে বিশ্বাসী কিন্তু দেশের শিশুশিক্ষার প্রচলিত রূপ দেখিয়া হতাশ হইয়া পড়ি। আমাদের দেশের অস্থিচর্ম্মসার লোলুপ পুরোহিতের মত লোলুপ শিক্ষক কখনো বিদ্যা-মন্দিরে আনন্দ পরিবেশন করিতে পারিবে না। এই জাতীয় শিক্ষককে একেবারে দূর করিয়া দিতে না পারিলে শিশুশিক্ষার নূতন বিধি প্রচলন করাও সম্ভব হইবে না। নূতন করিয়া গড়াকেই যদি অনাথবাবু 'সংস্কার' নামে অভিহিত করিয়া থাকেন তাহা হইলে আমাদের আপত্তি নাই। যে নামই দেওয়া হউক, যাহা আছে তাহাকে নষ্ট করিতেই হইবে। প্রাথমিক শিক্ষা আমাদের দেশে এরূপ বীভৎসরূপে বিকৃত বলিয়াই উচ্চ শিক্ষাক্ষেত্রে যে বিসদৃশ অন্যায় অনুষ্ঠিত হইতেছে তাহা কাহারো চোখে পড়ে না। আমরা বহু প্রফেসরকে জানি যাঁহারা ছাত্রদের পক্ষে ঘোর অনিষ্টকর জানিয়াও নোটবই ছাপাইয়া ছাত্রদের কাছে বিক্রয় করেন। কলেজের মাহিনা খাইয়া যে পরিশ্রম ক্লাসের জন্য করা উচিত, তাহা না করিয়া, তাহা পুস্তক প্রকাশকের জন্য করেন। অনেক প্রফেসর বা স্কুল-শিক্ষক আছেন যাহারা সকাল বিকাল বীমার দালালি বা অন্য কোনো দালালি করিয়া থাকেন, এবং সুযোগ পাইলেই ছাত্রের অভিভাবককে বীমাপত্র বা অন্য কিছু ক্রয় করিবার জন্য বিব্রত করিয়া তুলেন। স্কুলে এমনও শুনিয়াছি, অভিভাবক শিক্ষকের নিকট হইতে বীমা না করিলে ছাত্র পাস করিতে পারে না। শিক্ষাদানও ব্যবসার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে বলিয়াই এই দুর্দ্দৈব। যেখানে যেটুকু বিক্রয় করা যায়! প্রাইভেট

ট্যুইশন নামক একটি ব্যবসা বহুদিন হইতেই শিক্ষকদের ভিতর প্রচলিত আছে। এক শিক্ষকের বহু ছাত্র। মফঃস্বলে এক পুরোহিতের ঘণ্টায় দশটি কালীপূজার মতই ইহা একটি অর্থলাভের ফন্দীমাত্র। ইহাতে ছাত্রের ক্ষতি এবং শিক্ষকতার অপমান। অথচ ইহাকে আজও কেহ অন্যায় মনে করিতে পারেন নাই!

সুতরাং শিক্ষার আদর্শ কি তাহা জানা সত্ত্বেও (যদিও ইহারা তাহা জানেন না) শিক্ষকদের ভিতর হইতে এই ব্যবসাদারি মনোভাব দূর হওয়া প্রয়োজন, না হইলে সংস্কার হইবে না। মফঃস্বলে টিকাদারকে স্কুলের শিক্ষক হইতে দেখিয়াছি, হাতুড়ে ডাক্তার বা পোষ্টমাষ্টারকেও দেখিয়াছি। এমন অনেক শিক্ষক আছে তাহারা একেবারেই গণ্ডমূর্খ; তাহারা লেখা পড়া জানে বলিলে লেখাপড়াকেই অপমান করা হয়। জানে শুধু বেত মারিতে।

কিন্তু ইহা ত শুধু এই সব শিক্ষক নামধারী ডাকাতদেরই একমাত্র দোষ নহে। তাহারা যে অন্যায় করিতেছে এ বোধ তাহাদের নাই। যাহারা তাহাদের নিকট ছাত্র পাঠাইতেছে তাহাদেরও সে বোধ নাই। দেশের এই জড়ত্ব দূর করিবার কাজই বর্ত্তমানের কাজ। তাড়াতাড়ি সংস্কার করিবার উপায় নাই, ধীরে ধীরে কতদিনে হইবে তাহাও জানা যায় না—সুতরাং এই অক্ষম দেশে অনাথবাবুর 'শিক্ষার আদর্শের' মত মূল্যবান পুস্তিকার মূল্য কে দিবে? যদি আদর্শ জানিবার আগ্রহটাও দেশে দেখা দিত তাহা হইলেও অন্তত কিছু আশা করিবার কারণ ঘটিত। কিন্তু যাহাদের মধ্যে আগ্রহ জাগা উচিত বলিয়া মনে হয় তাহারা প্রেমের গল্প ফেলিয়া কোনো প্রবন্ধপুস্তক পড়ে না।

টেলিগ্রাফ-অপারেটর

ক—ষ্টেশনের প্ল্যাটফরমের উপর পা বাড়িয়েই দেখি বন্ধু খ—তাঁর গাড়ী নিয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। গাড়ীতে ব'সে একটা জরুরি কথা মনে পড়েছিল, প—সহরে তখনি খবরটা দেওয়া দরকার। কাজেই ক—তে পৌছেই প—তে একটা তার করে' দেবার জন্যে ষ্টেশনের টেলিগ্রাফ অফিসে গেলাম। কিন্তু মুস্কিল হ'ল এই যে এখানে লেখার সাজ-সরঞ্জাম বলে' কিছুই ছিল না।

অনেক কষ্টে বহু খোঁজাখুঁজির পর একটা ভোঁতা কলম আর একটা ধূলোয় ভর্ত্তি দোয়াতের মধ্যে খানিকটা ফ্যাকাসে রঙের চট্‌চটে জিনিষ আবিষ্কার করলাম। প্রবল চেষ্টার সহিত আমার তারের কয়েকটা কথা তাই দিয়েই ফরমটার উপর ধেব্‌ড়ে দিলাম। একটি রুগ্ন গোছের স্ত্রীলোক অপ্রীতিকর মুখ-ভঙ্গীর সহিত সংবাদটা হাতে নিয়ে আমায় কত দিতে হবে—জানিয়ে দিলে। দামটা চুকিয়ে বাঁচলাম।

কর্ত্তব্যটা করতে পেরেছি মনে করে' খুসী হ'য়ে বেরিয়ে আসতে যাচ্চি, হঠাৎ চোখে পড়ল অফিসের একধারে একটি টেবিলে ব'সে একজন তরুণী "মর্স-কী"র উপর হাত চালাচ্ছে। চোখাচোখি হবামাত্র যেন সে একটু গর্ব্ব-ভরেই আমার দিকে পিছন ফিরে বসল। হাঁ, বয়স ত তার কাঁচাই বটে! মাথার চুলও যে মেঘের মতন কালো! আর সুন্দরী, হাঁ—সুন্দরীই বা তাকে বল্‌ব না কেন? আব্‌ছা-অন্ধকার-রঙের পোষাকের আবেষ্টনের মধ্যে সুঠাম দেহটির কমনীয় আভাস! রাঙা গাল দু'টির পাশে কয়েকটি চূর্ণ কুন্তল আর গোলাপী রঙের ঘাড়টিতে একটি ছোট তিল ঠিক যেন চাঁদে কলঙ্ক! অকস্মাৎ ঐ তিলটির উপর একটি চুম এঁকে দেবার জন্য আমার মনে এক দুর্নিবার উন্মত্ত আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠল!

সে হয়ত ফিরে তাকাতেও পারে, এই আশা নিয়ে বয়োবৃদ্ধা রমণীটিকে টেলিগ্রাফ সংক্রান্ত কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করলাম, উত্তরে যে কতখানি সহৃদয়তা প্রকাশ পেল—তাও আর প্রকাশ করে' না বলাই ভাল! অপর জন অবশ্য একটু নড়েও বস্‌ল না।

এর পর যদি কেউ মনে করেন যে পরের দিন আমি আর টেলিগ্রাফ আফিসে যাই নি, তাহলে জানব, তিনি আমাকে মোটেই চেনেন নি।

এবার তাকে একাই পেলাম—মুখ ফেরাতেও সে বাধ্য হ'ল! আর সত্যই, সে মুখ দেখে আমার আর বল্‌বার কিছুই রইল না, এবং আমি বল্‌ছি, আপনাদেরও কিছু বলবার থাকবে না!

সেদিন অযথা কয়েকটি ষ্ট্যাম্প কিনলাম, কতকগুলি বেদরকারি তার পাঠালাম এবং তদধিক অর্থহীন প্রশ্ন তাকে জিজ্ঞাসা করলাম। মোটের উপর আগাগোড়া আশ্চর্য্যভাবে একটি গাধার মত ব্যবহার করে' এলাম।

ধীব, গম্ভীর, ভদ্র অথচ চালাক মেয়ের মত আমার সব কথারই জবাব দিলে,—ফলে রোজই আমার আসা-যাওয়া সুরু হ'ল, কখনও দিনে দু'বারও, কারণ আমি জানতাম কখন তাকে একলা পাব। আসবার সঙ্গত কারণস্বরূপ—প্রত্যহ রাজ্যের অপরিচিত বন্ধুগণের উদ্দেশে অসংখ্য পত্র লেখা আর কল্পিত ব্যবসাদারদের নামে বে-অর্ডারি মালের তারযোগে তাগাদা দেওয়াই হ'ল আমার কাজ। ক্রমশঃ সহরে রটে গেল যে আমার মাথা খারাপ হয়েছে।

প্রতিদিনই মনে করতাম আজই তার কাছে মনের কথা বলব, কিন্তু তার সংযত হাব-ভাব দেখলেই "সুন্দরী, আমি তোমায় ভাল বাসি," এই কথা ক'টি আমার পেটে এসেও মুখে আস্‌ত না—অগত্যা শেষ পর্য্যন্ত আম্‌তা আম্‌তা ক'রে বলতেই হ'ত—

"দয়া করে' চার আনার টিকিট দিন ত—"

অবস্থাটা ক্রমশঃ অসহ্য হ'য়ে উঠল, অথচ ফেরবার দিনও ঘনিয়ে এল। প্রতিজ্ঞা করলাম একটা হেস্ত-নেস্ত করবই করব। সেদিন অফিসের মধ্যে গিয়ে এইরূপ একটি সংবাদ লিখলাম :—

বন্ধু চ—, ক—স্টেশনের টেলিগ্রাফ অপারেটরকে দেখনি বোধ হয়! জ্যোৎস্নার মত সোনালি তার গায়ের রং, ভোমরার মত কালো তার চোখের তারা; সুরবাহারের মীড়ের মত মিষ্টি তার গলার আওয়াজ! আমি তার প্রেমে পাগল হয়েছি, অথচ সে কথা মুখ ফুটে তাকে বলতে পারছি না, কি করি, বলতে পারো?

কম্পিত হস্তে টেলিগ্রামটা তার হাতে দিলাম। অন্ততঃ এটুকু আশা করেছিলাম যে তার মুখের গোলাপী রং আরও একটু ঘোর হ'য়ে উঠবে!

—কিছুমাত্র না!

মুখের কোন জায়গায় একটুও পরিবর্ত্তন দেখা দিল না, তারের কথাগুলি শুনে নিয়ে শুধু বললে,—

"পাঁচ টাকা পড়বে।"

এর চেয়ে শান্তস্বরে কেউ কখনো কথা বলে নি!

কিন্তু পকেট হাতড়ে দেখি পাঁচ টাকা ত দূরের কথা, পাচ পয়সাও নেই! পকেট-বুক থেকে একখানি পাঁচশ' টাকার নোট বার ক'রে তার হাতে দিলাম।

নোটটা হাতে নিয়ে অতি যত্নের সহিত সে পরীক্ষা ক'রে দেখলে! পরীক্ষার ফল ভালই হ'ল বোধ হয়, কারণ মুখখানি তার হাসিতে ভরে' উঠল। সে হাসি আর থামে না, হাসির পর হাসির মালা তার দু'চোখ দিয়ে সে আমায় পরিয়ে দিতে লাগল,—আর সেই অবসরে আমি দেখতে পেলাম—কি দেখতে পেলাম? দু'পাটি নিখুঁত সুন্দর দাঁত, কুন্দফুলের মত!

তারপর সুন্দরী আর একবার তেমনি ক'রে আমার চোখেমুখে তার হাসির আলো ছড়িয়ে দিয়ে, একবার বামে, আর একবার দক্ষিণে মাথাটি নেড়ে, দু'কানের দুল দুলিয়ে—কণ্ঠে সঙ্গীত ফুটিয়ে আমায় বললে, কি বললে শুনবেন?

—আপনি কি বাকিটা ফেরত চান?

———

ফরাসী গল্পের ভাব অবলম্বনে।

সেকালিনী

চৈত্র মাসেতে হায় প্রবাসীর পাতাতে
শ্রীমতী অপরাজিতা নানা ছুতা নাতাতে
কবিগুরু রবিদা'কে হাত মুখ নাড়িয়া
দেখিতেছি ফেলেছেন একেবারে পাড়িয়া !
যদিও বয়স তাঁর সত্তর পারায়ে
বুদ্ধিটা একেবারে যায় নি ত হারায়ে !
নাৎনীর কাছে তাই নানা রসে রসিয়া
হার মেনে কর-জোড়ে পড়েছেন বসিয়া।
'শিভাল্‌রি' এরে যদি নাহি চাহ বলিতে
বলিও না !—সব কিছু হতে পারে কলিতে !

কিন্তু শ্রীমতী তুমি ভাবিও না তা' বলে
ভুলাইবে আমারেও আবোলে বা তাবোলে,
আমার বয়স আজও তিরিশের কোঠাতে
সুরু করিয়াছি সবে কিঞ্চিৎ মোটাতে !
বুদ্ধিও হয়ত বা নয় খুব তীক্ষ্ণ,
তবুও বুঝিতে এটা হয়নি তো বিঘ্ন—
এ-কালিনী নহ নহ, তুমি সেকালিনী গো
স্বামী-সহধর্ম্মিনী, তনয়-পালিনী গো !

অবশ্য এ-কালের হাব-ভাব ফ্যাশনে
আয়ত্ত করিয়াছ প্রাণপণ প্যাশনে !
কবিতা লিখিতে চাও—যোগ দাও তর্কে
ফুলুরি হয়ত খাও বিঁধে বিঁধে 'ফর্কে' ;
স্কার্ট-পাড়-শাড়ী তব নানাবিধ কোঁচেতে
রমণীয় ভাবে আঁটা কমনীয় ব্রোচেতে !
চা-পানি বানাতে পার জাপানীয় কাঁচেতে
খদ্দরি ব্লাউস্ পর লণ্ডনি ধাঁচেতে ।
এরোপ্লেনে যদি চড়, পাঁজি দেখে চড় গো
মনে সদা ভয়-ভয়, সদা পড়-পড় গো !
হয়ত বা ড্রাইভারে বল নাক 'থাম্ থাম্'
মনে মনে অবিরত জপিতেছ রাম নাম ।

এ-কালিনী হতে যদি পাকা-পাকি ওজনে
বিলাসে, ব্যসনে, বেগে, বিহারে বা ভোজনে ;
তাহাদের মত যদি থাকিত সে 'ড্যাশ'টা
যার বলে তারা এই পৃথিবীর ব্যাসটা
বেদ-ব্যাসের কোন বিধান না জানিয়াই ।
পার হয়ে যেতে চায়, নানা বাধা মানিয়াই ।
গোল্লায় যেতে পারে—যেতে চায় 'মার্সে'
উদাসিনী বসে থাকে অচেনার পার্শ্বে ।

রবিবারে ভালবাসে প্রাণ দিয়া যাহারে
সোমবারে হাসিমুখে ত্যাগ করে তাহারে !

এ-কালিনী হতে যদি চিন্তার জগতে
রবিদা'র পাওনাটা মিটাইতে নগদে।
পুরাতন নজীরের জের টেনে আনিয়া
সেকালের সেই পচা-কাহিনীকে টানিয়া
দেখাতে না একালের-সেকালের মিল গো,
এ-কালিনী শোনে যদি হয়ে যাবে নীল গো।

এ-কালিনী সেকালের তোয়াক্কা রাখে না
মিল যদি থাকে থাক্, সেটা গায়ে মাখে না!
অন্ততঃ তাই নিয়ে বাজায় না ঢাকটা
এ-কালের গর্ব্বেই উঁচু তার নাকটা!
"আমি ত সেকেলে নই!"—এই তার গর্ব্ব
তুমি সেটা শেষকালে করে দিলে খর্ব্ব!
সেকালের মত যদি একালের জগতই
'প্রগতি' বলিছ কেন? বল তবে 'অগতি'!
সেকালের দোহাইটা মিছে পেড়ে, উতলে,
এ-কালিনী শালীনতা লুটাইলে ভূতলে!
মনে হয় তাই তুমি একালিনী নহ গো
সেকালের গৌরব আজও বুকে বহ গো!

এ-কালিনী সকলেরে করেন না বিধি যে,
অধিকাংশই হায় পিসি, মাসী, দিদি যে!
এবং বাঁচোয়া সেটা! অন্ততঃ আমাদের
অর্থাৎ Dick-Tom, যদু-রামা-শামাদের

এ-কালিনী রমণীরে সিনেমা বা নাটকে,
যুদ্ধের শিবিরে বা রাশিয়ার ফাটকে
দেখিয়া তৃপ্ত হব,—দিব হাত তালিও ;
ঘরেতে কিন্তু চাই সেই পুরাকালীয়
রাগে অনুরাগে ভরা অঙ্গন-লক্ষ্মী
আধুনিক ডিম্বেতে সনাতন পক্ষী !

সুতরাং এই তব অতীত-প্রশস্তি
আনিয়া দিয়াছে মনে শান্তি ও স্বস্তি
খুসী আছি এই ভেবে আমাদের দেশেতে
দিদিমারা বেঁচে আছে নাৎনীর বেশেতে।

"বনফুল"

পৃথিবীর পাগলামি

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সত্তরলক্ষ লোক কর্ম্মহীন !...তবুও, প্রতি ব্লকে বেআইনী মদের দোকানের ('Speak easies') এবং হাজার হাজার নৃত্যশালায়, শত শত নাইট ক্লাবে, ধূসর উষোদয় পর্য্যন্ত, জ্যাজ্ ব্যাণ্ডের উদ্দাম ধ্বনির অভাব নেই।

ব্রড্ওয়ের, টাইম স্কোয়ারে এইরূপ কোলাহলপূর্ণ রাত্রিতে একটু ভ্রমণ করা যাক্। এক থিয়েটারের টিকিট ঘরের কাছে খাঁচায়

পোরা একটা চিতা বাঘ ঘুরছে; একটা ভালুক; সাদায় কালোয় মেশান এক 'তাপির' (গণ্ডার জাতীয় জানোয়ার); এসব জানোয়ারের সঙ্গে প্রোগ্রামের কোন সম্বন্ধ যদিও নেই, তবুও এদের এখানে রাখার উদ্দেশ্য, যারা সে রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করছেন, তাঁদের দ্রুতগতিটাকে একটু থামিয়ে ঐ দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা। থিয়েটারের শো বিকেল চারটে থেকে রাত বারটা পর্য্যন্ত, মাঝে কোন ইণ্টারভালই নেই। সবচেয়ে শস্তার সীট হচ্ছে কুড়ি সেণ্টের (অর্থাৎ প্রায় চৌদ্দ আনা; এবং সব চেয়ে দামী, দেড় ডলার (প্রায় সাড়ে ছ টাকা)। যখন খুসী এখানে প্রবেশ করা যায় এবং যতক্ষণ খুসী থাকাও যায়; ইচ্ছে করলে, পূরো আট ঘণ্টা বসে থেকে একই প্রোগ্রাম তিনবার দেখা যায়—অবশ্য, যদি কারও আট ঘণ্টা একাদিক্রমে ক্রমাগত জ্যাজের আওয়াজ শুনে বসে থাকার সাহস থাকে। জ্যাজে. রকমারী ছন্দ আছে একথা স্বীকার করলেও, কেবল একঘেয়ে রকমের কর্কশতা যেন সামনে ক্রমাগত ধাক্কা মারে। E. W. Howe বলেন, "জ্যাজ-ব্যাণ্ড যারা বাজায়, তাদের প্রত্যেকেই মাতলামি ও গুণ্ডামির এক এক অবতার।"

যাহোক, কয়েক মিনিট পরেই, লেখক পল হোয়াইটম্যানের সঙ্গে গল্প করবার সুযোগ পেলেন। তিনি বললেন, "জ্যাজ মিউজিক্ নাকি মরণপথগামী, অনেকের তো এই ধারণা, অথচ শত শত বার এই মরণোন্মুখ সঙ্গীত মরতে মরতেও পুনর্জন্ম পেয়েছে।—এর স্বপক্ষে? বিপক্ষে? আধুনিক সঙ্গীত? আবশ্যকতা? ভিতরকার পরিবর্ত্তনের প্রয়োজনীয়তা? এসব প্রশ্নের উত্তর কি আমি জানি?—কুড়িবছর আগে, সানফ্রান্‌সিস্‌কোতে আমি 'আল্টোতে' (কর্ণেটের মত) কখনও ক্লাসিকাল সঙ্গীত ছাড়া অন্য কিছু বাজাইনি।

পরে, এক অর্কেষ্ট্রাতে, তেরো জন যন্ত্রীর মধ্যে আমি দ্বাদশ নম্বরের বেহালাবাদক হয়েছিলুম। কিন্তু একাজে আমার পেট ভরা দায় হয়ে উঠেছিল, কাজেই সুযোগ বা সুবিধে পেলেই কিছু কিছু সঙ্গীত রচনা করব, এ খেয়াল আমার ছিল। কিন্তু হঠাৎ অল্পকিছুদিন বাদে আমার চাকরী যায়। তখন বাধ্য হয়ে আমায় এই মতলব করতে হয় যে নিজেই এক অর্কেষ্ট্রার পত্তন করব। দুর্দ্দশায় পতিত কতকগুলি সঙ্গীর অভাব হল না। আমাদের 'মিউজিক্' কেনবার অবস্থা ছিল না, কাজে কাজেই আমাকে রচনা করতে হত সবই, আমার অর্কেষ্ট্রার জন্যে। ছন্দজ্ঞান আমার ছিল, আমি সে সব পুরোন সঙ্গীতের আঁচ নিয়ে শব্দ বসাতে লাগলুম; এবং সে কারণেই বোধ হয় কোটি কোটি লোক আধুনিক ছন্দ জিনিষটাকে বুঝতে আরম্ভ করেছে, নৈলে 'জ্যাজ্‌সঙ্গীত' আজ যতদূর উন্নত হতে পেরেছে, তা হবার অবসর পেত না।"

নামজাদা হোয়াইটম্যান বলতে আরম্ভ করলেন, "বড়ই আশ্চর্য্য যে অনেক আমেরিকান ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল্ ম্যাগনেট্ এবং তথা অর্থজগতের কর্ত্তারা, এই জ্যাজ্‌সঙ্গীত খুসী হয়েই শোনেন, এমনকি তাঁরা বলতেও কসুর করেন না যে, এ সঙ্গীত তাঁদের মনকে বেশ ভাল-রকমেই নাচায়। এবং যদিও তাঁরা আধুনিক সঙ্গীতের ঠিক গোঁড়া ভক্ত ন'ন্, তবু রাজ্যশাসন কার্য্যের বড় বড় পাণ্ডাদের প্রায় সকলেরই মধ্যে এর মিত্রের অভাব নেই।" অন্যান্য অনেক আমেরিকান, লেখককে যা গল্প করে শুনিয়েছেন, সে সব কথায় প্রতিধ্বনি করে ইনি আরো বললেন, "চার্লস জী. ডজ্-এর উদাহরণ ধরা থাক। ইনি এত রকম যন্ত্র বাজাতে পারেন যে বলার নয়। ইনি তাঁর জীবনী আরম্ভ করেন, যৌবনে ফ্লুট বাজিয়ে; নিজের ক্ষমতার পরিচয়

দেখিয়ে ইনি উন্নততর অবস্থায় উপনীত হন। এমন কি, ইনি ম্যারিয়েটার (ওহিয়োতে) মিউনিসিপাল অর্কেষ্ট্রাতেও বাজিয়েছেন। কিছু বিলম্বে ইনি পিয়ানো বাজাতে শেখেন, হার্মনি জিনিষটা কি তা দস্তুরমত শিক্ষা করেন এবং পরে নিজেই সঙ্গীত রচনা আরম্ভ করেন। বিখ্যাত ভায়লিনিষ্ট, ফ্রিজ্ ক্রাইজ্‌লার ডজ্ রচিত Melody in A তাঁর repertoireএ ব্যবহার করেন। ইস্পাতের 'রাজা' Charles M. Schwabও বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞদের মধ্যে একজন; ইনি তাঁর যৌবনে, নিজে পিয়ানো ও বেহালা শেখাতেন।

আমেরিকার কর্ত্তারা তাহলে সব সঙ্গীত-ধুরন্ধর! তা যদি হয়, তবে তাঁরা কি জগতের কনসার্টে প্রথম বেহালাবাদকের স্থান অধিকার করবার সামর্থ্য রাখেন? আজকাল চারিদিকে যে বিপ্লব চলছে তার গোলমালের মধ্যে, তাঁরা কি তাঁদের গলাবাজী করবার স্পর্দ্ধা রাখেন? আমেরিকায় যদি কেউ অর্থনৈতিক প্রশ্নের, গুণ্ডামী বা ডাকাতী কার্য্যের, জীবন ধারণের ষ্ট্যাণ্ডার্ডের, অথবা খালি price index এর সম্বন্ধে অফিসিয়াল জ্ঞাতব্য বিষয় জানতে চান, তাঁর তাতে ঠকবার আশঙ্কা নেই কেননা, আর যাই হোকনা আমেরিকার প্রধান ঝোঁক হচ্ছে, 'ষ্ট্যাটিস্‌টিক্‌স্' এবং জীবনসত্ত্বার পরিচয় প্রদানে: সংখ্যা অথবা ডলার। প্রায় সকলক্ষেত্রেই এই সব সংখ্যা সত্যসংখ্যার সঙ্গে মিল খায়, কারণ আধুনিক যা কিছু প্রণালী, তা দিয়েই এ সব সংগৃহীত।

এই statistical service থেকেই জানতে পারা যায় যে, গৃহ-নির্ম্মাণোপযোগী সব চেয়ে দামী জমি মানহাট্টানে পাওয়া যায়, যেখানে এক centimeter square জমির দাম এক ডলার; যে নিউ ইয়র্কের সেণ্ট্রাল পার্কে প্রতি রাত্রের তেত্রিশহাজার পাঁচ শ লোক শুতে আসে; যে বিরেনব্বই ফুট উচ্চে অবস্থিত উপরে-চলা রেলগাড়ী

থেকে দেড়খানা মানুষ ও সওয়া একখানা স্ত্রীলোক প্রতিদিন ইচ্ছে করে ঝাঁপ দেয়; যে নিউইয়র্কে এগার হাজার দুশোচল্লিশ জন লোক, যাকে racketeering বলা হয়, তারই উপর নির্ভর করে বেঁচে আছে। অর্থাৎ এদের কাজই হচ্ছে বড় বড় ব্যবসাদারদের গুপ্তকথা প্রকাশ করবার ভয় দেখিয়ে সেলামী আদায় করা; যে নিউইয়র্কে এমন একটা পাড়া আছে যেখানে একদিন অন্তর একজন পুলিসম্যান ও অন্য একজন লোক খুন হয় এবং যেখানে গড়পড়তায় প্রতি রাতে সতেরটা চুরি ডাকাতী হয়। কেবল সংখ্যা আর সংখ্যা, অমানুষিক সব সংখ্যা···যদিও এটা স্বীকার করতে হবে যে, এই সংখ্যা সকল মানুষকে চিন্তা করবার বেশ একটু খোরাক দেয়। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এই সংখ্যা-তালিকা যে সব রক্তমাংসের শরীরের সম্বন্ধেই এই সব সংবাদ যোগাড় করে তারা কি ভাবে এ বিষয়ে? তারা এটাকে কিরকম ভাবে মনে গ্রহণ করে?

* * *

'রক্তবর্ণ' আলোক! পাঁচ শ গজ দূরত্বের পরিসরে, ছটা শ্রেণীতে সমস্ত 'অটো'ই দাঁড়িয়ে এবং ইঞ্জিনের ঘসঘস শব্দ ও শোফারদের বিরক্তিব্যঞ্জক শপথ বাণীর শব্দ কানে বাজে।

সবুজবর্ণ আলোক! অম্নি আরম্ভ হয় ভীষণ ছুট সকলেরই; যেন সকলেই শিকারে চলেছে এবং শিকারের পশ্চাদ্ধাবনই তার অঙ্গ। গোলমালের মধ্যে চারিদিকে চীৎকার এবং ভেজা ও উজ্জ্বল পীচের রাস্তার ওপর কেবল রবারের পিছলান···এই।

যাহোক সেই বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে লেখক ৫৮ ষ্ট্রীটে অবস্থিত Petes Bar এ উপস্থিত হলেন। এক বৃদ্ধ ব্যক্তি বলছেন, "সফলতা! তার মানে কি?"

তাঁর 'girlie' দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে বল্লেন, "আমি তো ঐ জিনিষটাই জানতে চাই।"

এবং Petes Elektrola তাদের বাধা দিয়ে চীৎকার করে বলে উঠলেন, "সকলেরই কর্ত্তব্য হচ্ছে, এটা নিজে নিজেই অনুশীলন করা।"...

সেখানে, চেষ্টনাট্-রংএর কস্‌টিউম-পরা লালমুখো একটি ভদ্রলোক ছিলেন। লেখক সেদিকে দৃষ্টিপাত করেই বুঝতে পারলেন যে, তিনি হচ্ছেন Mike o' Grady, একজন Cop (অর্থাৎ পুলিসম্যান)। লেখকের সঙ্গে তাঁর জানাশোনা ছিল, তাই তিনি গোয়েন্দা মশায়কে কিছু 'পান' করার নিমন্ত্রণ করলেন। লেখক জানতেন যে, Mike, ঠিক আগের দিনেই আরো একটি যুবককে ভূমিসাৎ করেছেন, এবং সে কারণেই তাঁর জানার ইচ্ছা ছিল যে, যুবককে হত্যা করে গোয়েন্দামশায়ের মনের অবস্থা কেমন।

* * *

Mike o' Grady 'জিন' পান কর্ত্তে চাইলেন, এবং বল্লেন, "আমি এখন কাজে নেই। তাছাড়া,—আমি বেশী পানও করিনে।"

লেখক কথা পাড়লেন এই বলে, "আমি শুনেছি, সামান্য কিছুকাল আগে আপনি এক মারামারির ভেতর পড়েছিলেন..."

"হ্যাঁ, তা সত্যি। দু একবার পড়েছি বটে।"

"আচ্ছা, মানুষ খুন করে কি আপনার মনে কখনও একটু চাঞ্চল্য আসেনি?"

"আমার? নিশ্চয়ই। গত কালও আমি এক ব্যক্তিকে ভূমিশায়ী করেছি।"

"কেমন করে এ ব্যাপার ঘটল?"

"একটা রাহাজানিতে ('Hold p')।"

"কিন্তু, কি ভাবে ?"

"তার এই আকাঙ্ক্ষাই ছিল এবং তাকে তাই দেওয়াও হল। হাসপাতালে যাবার পথেই সে মারা গেল।"

"কিন্তু, কেমন করে এ ঘটল যে আপনি ঠিক ঘটনার সময়েই সেখানে উপস্থিত হলেন ?"

"দৈব। আমি রেস্তরাঁতে বসে ছিলুম, দেখলুম সে ক্যাশিয়ারের ওপর লাফিয়ে পড়ল। কিন্তু, সে কি করতে যাচ্ছে, এ ব্যাপার ভাল রকমে বোঝবার পূর্ব্বেই আমি তাকে গুলি করলুম।"

'বাস্তবিকই ?"

"নিশ্চয়ই, আমার গুলি তাকে স্পর্শ করেছিল।"

"আপনি তাহলে বলতে চান যে সে যখন ডাকাতী করতে যাচ্ছিল, আপনি তখন দৈবক্রমে সেই আস্তানায় হাজির ছিলেন ?"

"সত্যিই। আমার স্ত্রী ও আমি, আমরা দুজনে মনে করেছিলুম যে, সকাল সকাল খাব এবং খাওয়ার পর একটা 'মাটিনে' (matinee)তে যাব, কিন্তু..."

"ঘটনার স্থানে, আপনার স্ত্রী উপস্থিত ছিলেন তবে ?"

"নিশ্চয়ই, আমরা সর্ব্বদাই এক সঙ্গে ভোজন করি।"

"হু-হুঁ। ক্যাশিয়ারকে তাহলে সে ভয় দেখিয়েছিল !"

"হ্যাঁ, আর ঠিক সেই সময়েই আমি আমার রিভলভারের ঘোড়া টিপি।"

"কোন মানুষকে খুন করা, বাস্তবিকই ভয়ঙ্কর রকম কঠিন, না ?"

"হুঁ, আর, লোকটা আমার কাছ থেকে এমন কি দশ পা দূরেও ছিল না।"

"আচ্ছা, আপনি কি তাকে খুন করার বদলে ভয় দেখিয়ে, তার হাত দুটো মাথার ওপর তোলাতে পারতেন না?"

"সময় ছিল না বন্ধু, তার ইচ্ছা ছিল দ্রুতগতি কাজ হাসিল করা। আমি যদি অপেক্ষা করতুম তাহলে ক্যাশিয়ারের দশা তারই মত হ'ত।"

Mike o' Grady, Barএর ওপর ঝুঁকে 'জিন' পান করতে লাগলেন; ইনি এক বিরাটকায় ভারী ওজনের লোক, এবং তাঁর চোখের দৃষ্টি অতি স্বচ্ছ।

লেখক আবার তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "লোকটা তার রিভলভার বার করবার পূর্ব্বে কি করছিল?"

"কিছুই না।"

"লোকটা বাইরে থেকে এসেছিল, না আগেই এসে বসেছিল?"

"সে একটা টেবিল নিয়ে বসেছিল।"

"আপনার কাছ থেকে দূরে?"

"না, খুব নিকটেই। মাটিনের জন্যে, আমরা ভোজন করছিলুম সকাল সকালই, তখন এখানে প্রায় কেউই ছিল না। আমাদের কাছাকাছি দুটি মহিলা তখনও বসে ছিলেন; আমি তাদের নাম ধাম ভাল রকমেই জানতে পেরেছি, যদিও তারা নিজেরাই তা এত ভাল রকম জানে কিনা সন্দেহ।"

"আপনার স্ত্রী এ ঘটনার পর কি করছিলেন?"

"আমার স্ত্রী? কি আবার করবে?"

"তা হলেও, যখন লোকটাকে আপনি ভূমিশায়ী করলেন, তখন আপনার মনে নিশ্চয়ই কোন রকম একটা ভাব জেগেছিল; আপনার তার জন্যে কিছু করাও উচিত ছিল।"

"কে বল্লে, আমি কিছু করিনি? আমি তথ্খুনি তার কাছে গিয়ে তার হাত থেকে রিভলভারটি ছিনিয়ে নিয়েছিলুম। সেটা একটা পুরোন আরমি রিভলভার ৪৮ কোল্ট এবং সমস্ত কার্ত্তুজগুলিই তার ভিতরে ভরা ছিল। লোকটা তখনও মরেনি, তার মৃত্যু হয়েছিল হাসপাতালেই।"

"মরবার আগে সে কিছু বলেনি?"

"বলেনি আবার! অনেক কথাই বলেছিল, কিন্তু আমার অত সব মনে নেই। খবরের কাগজওয়ালারা আজ সে সব প্রকাশ করবে 'খন্।"

"তার স্ত্রী বা কোন সন্তানাদি ছিল না?"

"না, বাচ্ছা রিপোর্টার আমায় বলে গেল যে তার এসবের বালাই কিছু ছিল না। তবে তার কোন এক বান্ধবী ছিল এই মাত্র। এদের প্রায় সকলেরই একটা করে বান্ধবী থাকে।"

"রিপোর্টার কেমন করে আপনাকে এত সব খবর দিল?"

"তার আর আশ্চর্য্য কি, আমি তাকে টেলিফোন করেছিলুম। আমার ধারণা, আপনিও তাকে চেনেন, আশ্চর্য্যরকমের ছেলে। যখন আমি আমার রিপোর্ট দিচ্ছিলুম, ঠিক সেই সময়েই সে কমিসারিয়েটে এসেছিল; এসেই আমাকে ডাকে। তখন বেলা দেড়টা, আমি আমার শালী এলার সঙ্গে সবে 'স্পেক্টাকল্' দেখে ফিরে এসেছি, আমার স্ত্রী আমার সঙ্গে ছিল না। থিয়েটারে 'Lilliom' পরীদের ব্যাপার বা ঐ রকম একটা কিছুর পালা হচ্ছিল। আমার ধারণা ছিল যে সেখানে গানবাজনাও ছিল, কিন্তু……"

"মৃত ব্যক্তির মুখাকৃতি কি এখনও আপনার মনে পড়ে?"

"যুবকের? কৈ না।"

"বাঃ তা'র বাইরের ব্যাপার অর্থাৎ ধরণ ধারণ, আচার ব্যবহার কিছুই আপনার মনে নেই ?"

"নিশ্চয় আছে, লোকটার বয়স কম ছিল, যুবকই বলা চলতে পারে ; মুখখানা তার দাড়ীতে পূর্ণ ছিল, ক্ষৌরকার্য্যের বিশেষ আবশ্যকই তার ছিল। 'ক্যাশের' দিকে ধাওয়া করবার আগে সে আমার কাছেই একটা দেশলাইয়ের কাঠির জন্য এসেছিল অথচ ঠিক তার টেবিলেরই উপর একটা দেশালায়ের বাক্স ছিল। আমার কাছে দেশালাই ছিল না, আমি সেদিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়ে বল্লুম, 'তোমার টেবিলের ওপর রয়েছে যে।' আমার কথায় সে পাগলের মত মুখ কুঁচকে, একটা অর্দ্ধদগ্ধ সিগারেট ধরালে এবং তারপরেই, তার 'কোল্ট' বার করে ক্যাশের দিকে ধাওয়া করলে। আমিও সঙ্গে সঙ্গে তাকে ভূতলশায়ী করলুম।"

"লোকটার নাম কি ?"

"আঃ সেটা খবরের কাগজেই ছিল, কিন্তু আমার ছেলে ফ্রেডি (বয়স বারো, ভারী 'স্মার্ট') প্রতি কাগজেই আমার ফোটো ছিল বলে, কাগজ থেকে সে সব টুকরো কেটে ফেলে দিয়েছে, এবং মনে হয়, কাগজগুলোও এতক্ষণে আস্তাকুঁড়ে। এসব বাস্তবিকই বড়ই মুখ্যুমির কাজ, না ?"

এক ভদ্রলোক মাইককে খুঁজতে এলেন এবং লেখকও সেখান থেকে বিদায় হলেন। লেখকের মনে ক্রমাগতই বাজতে লাগল, "মানুষ খুন করলে কেমন লাগে···" (How it feels to kill a man···)

সামনে আলোকিত বিরাট বিজ্ঞাপনের প্যানেল।

প্রতি অর্দ্ধমিনিট অন্তর ব্রড্ওয়ের সমস্ত গণ্ডগোল ছাড়িয়ে সিংহনাদ হচ্ছে :—

"সতর্কতাই বুদ্ধিমানের কাজ। রাস্তা পেরুতে বরং পাঁচ মিনিট নষ্ট করে প্রাণ বাঁচাও, কারণ জীবন সুন্দর।"

সত্যই কি এ জীবনটা সুন্দর?

* * *

দুঃখের সঙ্গেই ট্যাক্সী ওয়ালষ্ট্রীটের উপর দিয়ে গড়িয়ে চলেছিল। সামনেই দেখা যাচ্ছে, সাদাসিধে ধরনের এক বাড়ী, যার নীচু দরজার ওপরে লেখা আছে, জে, পি, মর্গ্যান্ এণ্ড কোং। কিন্তু মর্গ্যান কারু সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করেন না! তিনি প্রেসকে দ্রুত চালিয়ে নিয়ে চলেন, যেমন তাঁর বাপ চালাতেন। প্রেসকে তাঁর বাপ, "Plutocracyর bleeding dog" নামেই অভিহিত করতেন…।

স্বেচ্ছায় তিনি কয়েকটি বিষয় ছাড়া বিশেষ কিছু বলেন না, যথা প্রাত্নতত্ত্বিক প্রশ্ন, আমেরিকান গির্জ্জার ইতিহাস, ইত্যাদি। এসব প্রশ্নের প্রতি তাঁর যে টান, তাই তাঁকে যে জ্ঞান দিয়েছে তাকে কোনক্রমেই সাধারণ জ্ঞান বলা চলে না। তিনি সর্ব্বদাই পোপের সঙ্গে চিঠিপত্র লেখালেখি করেন এবং যখন রোমে যান, কখনও পোপের সঙ্গে দেখা করতে ভোলেন না। Pius XI তাঁকে এক ছোট লাইব্রেরীতে অভ্যর্থনা করেন এবং সেখানেই দুজনের নানান রকমের ঐতিহাসিক ঘটনার আলোচনা হয়; Copte (ইজিপশিয়ান জাতি-বিশেষ) দের শাস্ত্র গ্রন্থ, দলীল ইত্যাদিই তাঁদের মনোযোগ বেশীরকম আকৃষ্ট করে।

এগিয়ে চলা যাক। কিন্তু রক্তবর্ণ আলোক, সুতরাং থামো; বাঁয়ে থেকে ডাইনে মানুষের লম্বা লম্বা সারি। অনেক মুখই চিন্তাগ্রস্ত, অনেক মুখেই হতাশা প্রতিফলিত। ট্যাক্সী আরো খানিকটে এগিয়ে চল্‌ল তারপরই সব গাড়ী থেকে নামতে বাধ্য হল, কারণ সামনেই এক

বিরাট সবুজ লরী এক লিমুজিনের গায়ে ধাক্কা মেরেছে। চারিদিকে ভাঙা বোতলের কুচোয় ভর্ত্তি; বোতলগুলি জলে পূর্ণ ছিল; সত্যিই বোতলে জল সংরক্ষিত ছিল। চাপ পরিমাণ মত না হওয়ায় আকাশচুম্বী অট্টালিকাসমূহের উপরতলায় জল ওঠে না এবং সেই কারণেই, ঠাণ্ডায় জমে যাওয়া সব ঝর্ণা থেকে জল লোকে ছোট ছোট বোতলে কেনে; এক বোতল জলের দাম হচ্ছে দশ সেণ্ট (অর্থাৎ প্রায় ছয় আনা)।

নিউইয়র্কের গ্রীক দেবমন্দিরস্বরূপ ষ্টক্ একস্‌চেঞ্জে প্রবেশ করা হল। দালাল বল্লে, "আজ কিছুই নেই।" পরক্ষণেই সে এই আস্তানার composition সম্বন্ধে বিশদ ব্যাখ্যা করে বললে যে, অর্থবাজারের এই ক্রাইসিস্, এই ভঙ্গুরতা ('krach') সত্ত্বেও এখানকার প্রতি বৈঠকের মূল্য সর্ব্বদাই তিন লাখ চল্লিশ হাজার ডলার। আরো বললে, "ওয়াল ষ্ট্রীটের যেখানে আটষট্টি নম্বরের বাড়ী আছে, ওখানেই ১৭৯০ সালে এক পুরোন গাছ ছিল। সেই বৃক্ষতলে, নিউইয়র্কের প্রথম দালালরা, সংখ্যায় বারোজন মাত্র, জড়ো হত। তাদের সেই সম্মিলন, আজকের দিনের 'বুর্গের' মতই স্বাধীন ছিল। সভ্যদের মধ্যে চুক্তির দ্বারাই তার গঠন হয় এবং তা ঠিক্ এই যুক্তসাম্রাজ্যের মধ্যে একটা ছোট রাজ্য স্বরূপ। এর আইন-কানুন বড়ই কড়া রকমের, কারণ এ সব অতি প্রাচীন।"

সব স্থানের মতই এখানে চীৎকার। কিন্তু তবুও এখানের একটা কথাও বোঝা যায় না, দালালরা তাদের সব সংখ্যার অন্য নামকরণ করেছে। এখানে কেউ হাজার বার 'quarter' কথার পুনরুল্লেখ করে না, 'odr' বলেই সন্তুষ্ট; 'three'র বদলে সকলেই 'i' বলে। যতদূর সম্ভব স্বরবর্ণের প্রতিই সকলের নজর। শত শত অক্ষর

ছেঁটে-ফেলে, শেষের সংখ্যাগুলো নিয়েই চলবার চেষ্টা; সব রকম দামেরই এখানে একটা করে ছোট নাম আছে, যা ছাপা তালিকার সঙ্গে ঠিক খাপ খায়। ব্যাঙ্কার পুনর্ব্বার বললেন বটে যে, আজ আর কিছুই নেই, কিন্তু তবুও সংগ্রাম এখানে এত ভীষণ যে, মনে হয় বুঝি সব দম আটকে মারা যায়।

এখানকার 'প্যাসেজে'র গোলক ধাঁধাঁয় লক্ষ লক্ষ লোক তাদের জীবনধারণের জন্য সর্ব্বদাই যুদ্ধ করছে—যেন এক বিরাট মৌচাক। এখানেই কোটি কোটি ডলারের হস্তান্তর হয় এবং দিনের পর দিন, এখানকার পাশবিক অবস্থা ভোগ করতে লোকে এখানেই ছুটে আসে।

দূরে, ব্রডওয়ের কোণে, ছোট এক গির্জ্জা মুখ ভার করে দাঁড়িয়ে আছে এবং তার দুর্ব্বল চূড়া আকাশ পানে উঠে একটু আলোকিত হ'তে চাইছে, কিন্তু তার চারদিকের সব অত্যুচ্চ ব্যাঙ্কগুলি তাকে ঢেকে তার থেকে সমস্ত আলোকই অপহরণ করে নিচ্ছে।

'অর্থের' এই রাস্তা এত ছোট আর এত সরু যে, দম বন্ধ হয়ে আসে। পিছন পানে দৃষ্টি আর একবার ঘুরে আসে, কিন্তু "আজ কিছুই নেই" সকলেই একবাক্যে ঘোষণা করেছে।

টাইমস্ স্কোয়ারে লেখকদের গাড়ী অপেক্ষা করছিল। সেখানে নবাগত সংবাদ সমূহ, এক গজ উঁচু বড় বড় অক্ষরে সংবাদপত্রদের বাড়ীগুলির চারিদিক দিয়ে ছুটছিল, এবং পড়ে বোঝা যাচ্ছিল, "Stocks decline again"; ষ্টকের দাম আবার কমতে আরম্ভ হয়েছে; শেষ দুঘণ্টার মধ্যে ত্রিশ লক্ষ ডলারের লোকসান···।"

*   *   *

পরদিনই ওয়াশিংটনে, Eugine Meyer জুনিয়ারের সামনে আপীল। ইনি ফেডারেল রিজার্ভ বোর্ডের কর্ত্তা এবং নিজ দেশের

'ফিনান্সিয়াল ইকনমি'রও পরিচালনকর্ত্তা। নিজদেশ কেন প্রায় সমস্ত দুনিয়ারই আর্থিক অবস্থার পরিচালনা ইনিই করেন।

এঁর বাপ E. Meyer সিনিয়র ষোল বছর বয়সে ফ্রান্স থেকে নিউইয়র্কে 'এমিগ্রেট' করেন; সেখান থেকে পানামায় যান এবং পরে লস্ এঞ্জেলেসে গিয়ে এক শক্তিশালী ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের পত্তন করেন। এঁর পুত্র নিউইয়র্কে এক প্রাইভেট ব্যাঙ্ক গঠন করেন। ১৯১৭ সালে, সকল রকম রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষায়, পৃথিবী ব্যাপী প্রাধান্তের সকল রকম অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপে শিক্ষিত হয়ে ইনি ওয়াশিংটনে আসেন।

ক্রাইসিস্ সম্বন্ধে ইনি কি বলেন?—"যেমন কোন ধারণাই হোক না কেন, সমস্ত বিশ্বই যে তাকে এক মনে বরণ করে নেবে, এ আমি বিশ্বাস করিনে। পৃথিবীব্যাপি যে এই আর্থিক দুরবস্থা আজ এ সম্বন্ধে কিছু বলতে হলে আমি বলব যে, আমাদের ধারে কারবার করার পদ্ধতিটা একটা মস্ত রকম দায়িত্ব বহন করছে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই; 'ক্রেডিট' জিনিষটাকে আমি "ড্রাগে"র সঙ্গেই তুলনা করব। যাঁরা এই ক্রেডিটের শক্তি, এর বিপদ জানেন, তাঁদের হাতে এটা সর্ব্বপ্রধান সহায়দাতা ত্রাণকর্ত্তার মত। কিন্তু ঠিক নেশার মত, এর অসদ্ব্যবহার, এর অবহেলা, এর অভ্যাস ও এর অতিব্যবহার দ্বারা মানুষের মনে অতীব নীচতার সৃষ্টি করে, এবং সে হিসাবে, ক্রেডিটের তুল্য সর্ব্বোপায় ধ্বংসকারী আর কিছুই নেই।"

সভাপতি মশাই বলে যেতে লাগলেন, "Trade boomsএর সর্ব্বোচ্চ চূড়া ও trade depressionsএর সর্ব্বনিম্ন খাদ সমান করা হয়ত সম্ভব হত, হয়ত এ কাজটা খুবই সরল হত, যদি আমরা এক স্থায়ী (stable) জগতে বাস করতুম। কিন্তু ঠিক যখন আমরা

পৃথিবীর এক সীমা stabilise করেছি, পৃথিবীর অন্য সীমা তখন ইতিমধ্যে ঠিক এর উল্টো আকার ধারণ করে বসে আছে।...ক্ষোভের কথা যে, পৃথিবী কখনই নর্ম্মাল নয়।"

সেই রাত্রেই, একই কন্‌সার্টে লেখক আবার মেয়ার জুনিয়ারকে দেখতে পান। তিনি আধুনিক সঙ্গীত উপভোগ করছিলেন। লেখক সেখানে শুনেছেন যে তিনি তাঁর স্ত্রীর মতই, মনেপ্রাণে চৈনিক আর্টের সংগ্রহকারক। আমেরিকার অতি বিশ্বাসী আশাবাদীদের মধ্যেও তিনি একজন।

* * *

(ক্রমশঃ)

চিঠি

"শনিবারের চিঠি" সম্পাদক মহাশয়,

আশা করি লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, সম্প্রতি কয়েকখানি কাগজে একটি চিত্তাকর্ষক ঘটনা প্রকাশিত হইয়াছে। ঘটনাটি এই, জনৈক ভদ্রলোক এবং জনৈকা মহিলা বাস্‌-এ যাইতেছিলেন (এরূপ ঘটনা নূতন নহে), কিন্তু কোনো কারণে মহিলাটির একপাটি জুতা ভদ্রলোকের পিঠে গিয়া পড়ে, (ইহা নূতন) এবং যেহেতু হিন্দুধর্ম্মে টলারেশন থাকিলেও অনেক হিন্দুর টলারেশন নাই, সেইহেতু অনতিবিলম্বে ভদ্রলোকের একপাটি জুতাও মহিলাটির পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করিয়া ধন্য হয় (ইহাও নূতন)। পাদুকা এবং পিঠ মিলিত হইয়া পাদ-পীঠ রচিত হয় কিনা আপনারা বলিতে পারেন, যেহেতু

আপনাদের অভিজ্ঞতা বহুমুখী—অন্তত বহির্মুখী ত বটেই, অপর পক্ষে আমাদের মত সাধারণ লোকের কোনো বিষয়ে অভিজ্ঞতা নাই বলিলেই চলে। কিন্তু প্রত্যক্ষ দর্শনকে যদি অভিজ্ঞতা বলা যায় তাহা হইলে আমি যাহা বলিতে যাইতেছি তাহাও অভিজ্ঞতাপ্রসূত বলিয়া ধরিয়া লইতে পারেন।

আপনারা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, পাদুকাঘটিত ব্যাপারটি সম্বন্ধে কাহারও কোনো মতভেদ নাই, অর্থাৎ সকলেরই মতে উক্ত ঘটনা নিশ্চিত ঘটিয়াছিল; কিন্তু কি কারণে ঘটিয়াছিল ইহা লইয়া মতভেদ ঘটিয়াছে। কেহ বলেন, ভদ্রলোকটি বাস্‌-এর ঝাঁকানিতে হঠাৎ মহিলার গায়ের উপর পড়িয়া যান; কেহ বলেন ভদ্রলোক মহিলার গায়ে চুরুটের ছাই ভাঙিয়া তাহা ফুৎকারে উড়াইয়া দিতে গিয়াছিলেন। প্রথমটি সত্য হইলে মহিলার কোনো অপরাধ নাই, অর্থাৎ যদি থাকে তাহা হইলে তিনি জড়-প্রকৃতির সঙ্গে সম-অপরাধী। প্রকৃতি এবং পুরুষ সম্পর্কে সাংখ্যের বর্ণনাটা যদি সত্য বলিয়া মানেন, তাহা হইলে স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছেন, পাদুকার প্রতিদানে পাদুকা ব্যবহার করিয়া পুরুষ তাঁহার সাংখ্যকীর্ত্তিত উদাসীনতা ভঙ্গ করিয়াছেন। বাস্‌-এর ঝাঁকানি এবং পুরুষের পতন যেমন প্রকৃতিপ্রসূত, পুরুষের পৃষ্ঠে পাদুকাও তেমনি প্রকৃতিপ্রসূত। উভয়-ক্ষেত্রেই (অর্থাৎ প্রথম ক্ষেত্রের মত দ্বিতীয় ক্ষেত্রেও) পুরুষ যদি উদাসীন হইয়া থাকিতেন তাহা হইলে সাংখ্যের মর্য্যাদা রক্ষা হইত।

দ্বিতীয়টি সত্য হইলেও মহিলার দোষ নাই। সিগারেটের ছাই যদি কাহারো গায়ে গিয়া পড়ে তাহা হইলে ক্ষমা চাহিলেই চুকিয়া যায়। কিন্তু ছাই দেখিলেই যদি উড়াইতে ইচ্ছা হয়, যদি মনে পড়ে "যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখ তাই, পাইলে পাইতে

পার অমূল্য রতন”, তাহা হইলে ত তাহা প্রশংসার যোগ্য হয় না। পাশে বসিয়া যদি চুরুট খাইবার ধৃষ্টতা হয়, তাহা হইলেই যে গায়ে হাত দিবার ধৃষ্টতাটুকুও হইবেই এরূপ কোনো কথা নাই। কিন্তু ট্রামে বা বাস্-এ চুরুট খাওয়া আইনত বা সামাজিক প্রথাগত কোনো ধৃষ্টতা হয় না, তবে অপরিচিত মহিলার মুখে ধোঁয়া ছাড়িয়া চুরুট খাওয়াটা অশোভন হয়। কর্ম্মক্লান্ত ধূমপানঅভ্যস্ত পুরুষের পক্ষে ট্রামে বা বাস্-এ বসিয়া ধূমপান না করার মত সংযম না থাকাই স্বাভাবিক; সেক্ষেত্রে ট্রাম বা বাস্-এ মহিলার প্রবেশ তাহার নিকট একটা উৎপাত বলিয়াই মনে হয়। কোনো মহিলা আসিলেই আসন ছাড়িয়া দিতে হয়—ইহা যে শুধু বাহিরের ভদ্রতামাত্র তাহা নহে, কোনো মহিলা দাঁড়াইয়া আছেন এরূপ দৃশ্য উপবিষ্ট পুরুষের পক্ষে ঔদাসিন্যের সহিত সহ্য করা সম্ভব হয়না।

কিন্তু তথাপি মহিলাগণ ট্রামে বা বাস্-এ উঠিবেন কারণ না উঠিয়া উপায় নাই। বৃদ্ধের দল বা অনেক সময়ে কোনো কোনো যুবকও ইহা লইয়া মেয়েদের ঠাট্টা করিয়া থাকেন। কিন্তু উপায় কি? মহিলারা সদাসর্ব্বদা ট্যাক্সিতে যাতায়াত করিবেন এরূপ অসঙ্গত বাসনা কোনো বৃদ্ধ বা যুবকের থাকিবে কেন? বাঙালী মেয়েরা অল্পদিন হইল বাহিরে চলাফেরা করিতে আরম্ভ করিয়াছে—এরূপ ব্যাপারে পুরুষেরাও অভ্যস্ত নহে, মেয়েরাও নহে। কাজেই সময়ে সংঘর্ষ অনিবার্য্য।

অনেক গুণ্ডা, মেয়েদিগকে পথে ঘাটে অপমানিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছে এবং সেরূপ ক্ষেত্রে মেয়েরা জুতার সদ্ব্যবহার দ্বারা আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছে এরূপ দৃষ্টান্ত এদেশে আছে। মেয়েদের এই বীরত্বের কাহিনী খবরের কাগজসমূহে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা পাইয়াছে। সুতরাং মেয়েদের ধারণা এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহা ঠিক ধারণা

যে গুণ্ডাদিগকে, বিশেষ করিয়া ভদ্রবেশধারী গুণ্ডাদিগকে জুতা মারিলে জব্দ করা যায়। উপরোক্ত ঘটনাটিরও মূলে হয়ত এইরূপ কোনো ধারণা ছিল। মহিলাটি হয়ত কিছুই অন্যায় করেন নাই। কিংবা হয়ত ভুল করিয়া অন্যায়ই করিয়াছেন। এই দুইটির একটি সত্য। কিন্তু আমি পুরুষের পক্ষ হইয়া ইহাই বলিতে চাই যে মহিলার গায়ে পুরুষের কোনো কারণেই হাত তোলা উচিত হয় নাই। এতদিন পুরুষের পিঠে ঝাঁটা পড়িয়াছে তথাপি পুরুষ প্রতিশোধ লয় নাই, এখন পুরুষই হাতের ঝাঁটা কাড়িয়া লইয়া পায়ে জুতা পরাইয়াছে। সুতরাং ঝাঁটার স্থানে যদি জুতার আদেশ হয় তাহা হইলে সামাজিক ব্যাকরণ উল্টাইয়া আমরা সে জুতা অমান্য করিব কেন? পুরুষটি যদি মনে করিতেন ঐ জুতা তাঁহাকে নহে তাঁহার ভিতরকার (কল্পিত?) গুণ্ডাকেই মারা হইতেছে, তাহা হইলে কি তাহাতে তিনি কিছুই সান্ত্বনা পাইতেন না?

কিন্তু বোধ হয় পাইতেন না। কেননা আমরা আমাদের অন্তরের পশুটাকে মারিতে চাহি না। তাহাকে কেহ জুতা মারুক ইহাও চাহি না। দেবতা যখন আমাদের পশুটাকে গ্রহণ করিতে চাহিয়াছিলেন তখন আমরা বাজার হইতে পশু কিনিয়া তাঁহাকে উপহার দিয়াছি, নিজের ভিতরকার পশুটাকে দিই নাই।

কিন্তু সে যাহাই হউক না কেন, এরূপ সামান্য কারণে এরূপ একটা কেলেঙ্কারী ঘটিবে ইহা কল্পনা করিতেও লজ্জিত হইতেছি। লজ্জা হইবারই কথা, কেননা এরূপ কোনো ঘটনাই ঘটে নাই, আমি সেই গাড়িতে উপস্থিত ছিলাম। ইতি

শ্রীপরাশর শর্ম্মা

সাধু

ফাল্গুন সংখ্যার "কবি" ও এই সংখ্যার "সাধু" ও "শিল্পী" জনৈক ভ্রমণকারীর লেখা। লেখক পুরাতত্ত্ব এবং ভূতত্ত্ব গবেষণা উপলক্ষে বিস্তারিত ভাবে ভারতভ্রমণ করিয়াছেন। তিনি এই ভ্রমণসময়ে যে সমস্ত অদ্ভুত ঘটনা বা ব্যক্তির সংস্পর্শে আসিয়াছেন তাহার কাহিনী ধারাবাহিক ভাবে শনিবারের চিঠিতে প্রকাশ করিবেন।

শ. চি. স.

চায়ের দোকানে চা খাইতেছি, এমন সময়ে একজন প্রৌঢ় গেরুয়াধারী সাধু দোকানে নিঃশব্দে প্রবেশ করিয়া এক কাপ চায়ের ফরমাস দিলেন। চা লইয়া একটি কৌটা হইতে প্রায় আধ ভরি আফিম বাহির করিয়া খাইয়া ফেলিলেন। দেখিয়া বড় ভক্তি হইল। হাত যোড় করিয়া প্রভুকে নমস্কার করিলাম! সাধু-বাবা চোখ মুদিয়া ছিলেন, বোধ হয় দেখিতে পান নাই। আফিমের নেশাটি ঘোর হইয়া আসিলে নিজেই আলাপ আরম্ভ করিলেন। বলিলেন, "ভায়া, যা ভাবছ তা নয়। আগে এক ভরি করে খেতাম। গান্ধী মহাত্মা বারণ করেছেন, তাতেই ছ' আনায় দাঁড় করিয়েছি।"

সাধু-বাবার সঙ্গে আলাপ জমিয়া গেল। ক্রমে জানিলাম তাঁহার নাম বালাগিরি অঘোরী। উপযুক্ত লোক। ভারতবর্ষের বহুস্থান ঘুরিয়া ঘুরিয়া রং ঘোর তামাটে হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সম্পত্তির মধ্যে একটি ঝুলিতে দুএক প্রস্থ কাপড়, মাথায় পাগড়ী, গায়ে গেরুয়া রঙের আলখাল্লা এবং হাতে এক মোটা লাঠি। সেটি বড় প্রিয়। সহজে ছাড়েন না। ব্যবসায়, চিকিৎসা। চায়ের আড্ডায়, রাস্তায়, মন্দিরে যেখানেই একটি ভারী শিকার দেখিতে পান সেখানেই তাহাকে

বলেন, "তোমার অসুখ হইয়াছে।" সংসারের অধিকাংশ লোকই মনে করে তাহার শরীরে একটা না একটা ব্যাধি আছে; সাধুর মুখে সেই কথা শুনিয়া তাহাদের সহজেই প্রত্যয় হয়। তাহার পর পেস্তা, বাদাম, কিসমিস সহযোগে একটি উপাদেয় ঔষধ তৈয়ারী করিয়া সাধু তাহাদের খাইতে দেন। রোগীর শরীরের যে উপকার হয় তাহাতে সন্দেহ নাই, সঙ্গে সঙ্গে বালাগিরির ঝুলিতেও কিছু আমদানী হয়।

লোকটির স্বভাব কিন্তু ভাল। সন্ধ্যা হইলেই সারাদিনের রোজগার খরচ করিয়া ফেলিত। গুরুর আদেশে রাতে হাতে পয়সা রাখা নাকি নিষেধ। চিকিৎসাবিদ্যার দ্বারা কোন দিন চার আনা, কোন দিন বা দুই টাকাও রোজগার করিত। তাহার সবটাই দান-ধ্যানে এবং আফিমের পিছনে রাত্রের মধ্যে নিঃশেষ হইয়া যাইত। আবার সকাল হইতে সাধুকে রোজগারের ভাবনা ভাবিতে হইত। বহুদিন অদ্ধভক্ষ্যোধনুর্গুণ অবস্থায় কাটাইয়া সংসারের লোকের উপর সাধুর কেমন একটা বাঁকা নজর হইয়া গিয়াছিল। সহজে তাহারা পয়সাকড়ি দিবে না, রোগ তাপের অছিলায় কিছু কামাইয়া লইতে হইবে, এইরূপ একটা বদ্ধ ধারণা সাধুর অন্তঃকরণে বহুবিধ দুঃখ ও লাঞ্ছনার মধ্য দিয়া বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল। বালাগিরির সঙ্গে আলাপ হইবার দুচার দিনের মধ্যেই সে একদিন চুপি চুপি আমাদের বলিল, "ভায়া, তোমাদের কাছে লুকিয়ে লাভ নেই। এমনি করেই খাই। সব শালাই এই রকম। তোমরা ভাই আর পিছনে লেগো না। অনেক ঘুরে এলুম, কিছুদিন স্বস্তিতে থাকতে দাও।"

বালাগিরি বেশ গল্প করিতে পারিত। বিশেষ করিয়া আফিমের নেশা যখন জমিয়া আসিত। একদিন মানস সরোবরের গল্প হইল। বালাগিরি বলিল, "সে কি বলবো ভাই। সে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার।

বহু কষ্টে ত' মানস-সরোবরে পৌছান গেল। যা ঠাণ্ডা! পায়ের আঙুল শীতে ফাটবার যোগাড় হয়েছে। কিন্তু কি করি, তীর্থস্নান ত করতেই হবে। মানসের জলে নেবে যাই ডুব দিয়েছি অমনি কানের ভিতর যেন একটা ভোঁ-করে আওয়াজ লেগে গেলো। মাথাটা ঘুরে গেল। একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে মাথা তুলে দেখি—জয় গুরু—কোথায় মানস সরোবরে চান করছিলাম, না একেবারে কাশী দশাশ্বমেধ ঘাটে উপস্থিত।”

আমরাও বুঝিলাম গল্পের দফা আজ মাটি, আফিম বোধ হয় ছয় আনার জায়গায় দশ আনায় উঠিয়াছে। যাই হোক, এমনি করিয়া বালাগিরি রোজ রোজ একটা গল্প করিত। কবে কাবুলের বাদশা তাহাদের পনেরো জন সাধুকে রাজভোগ খাওয়াইয়াছিলেন, কেমন করিয়া অমরনাথে দুইটি শ্বেত পারাবত আকাশের দিক হইতে নিমেষের মধ্যে উড়িয়া আসিয়া পাথর হইয়া গেল, আবার গলিয়া জল হইল—এমনি সব প্রাকৃত, অপ্রাকৃত অনেক কিছু।

এমনি ভাবেই দিন যায়। একদিন সহরে এক নামজাদা সাধু আসিলেন। বিশ্বের গুরু না হইলেও তাঁর চেলা চামুণ্ডার সংখ্যা কম ছিল না। চামুণ্ডার চেয়ে চামুণ্ডীর সংখ্যাই বেশী। যাই হোক, আমরা ঠিক করিলাম সাধু-সঙ্গ করা ভাল। কিন্তু একা যাইতে ভরসা হইল না; কি জানি যদি একটা হাতাহাতি ব্যাপার হইয়া যায়। সঙ্গে একজন রাশভারি লোক থাকা প্রয়োজন। কাহাকেই বা লই! বালাগিরিকে বলিতেই রাজি হইয়া গেল।

মাথায় এক বিরাট পাগড়ী বাঁধিয়া, সন্ধ্যায় বালাগিরির আফিমের নেশাটি যখন বেশ ধরিয়াছে তখন আমরা দল বাঁধিয়া রওনা হইলাম। সাধুর দর্শন লাভ হইল বটে, কিন্তু তিনি হয়ত আমাদের কথাবার্তায় কিছু

ইঙ্গিত পাইয়া থাকিবেন, অল্পক্ষণের মধ্যেই উঠিয়া চলিয়া গেলেন। আমরা যতক্ষণ গুরুদেবের সহিত কথা বলিতেছিলাম, ততক্ষণ বালাগিরি চক্ষু মুদিয়া, স্থির ভাবে আসন করিয়া বসিয়া ছিল। গুরুদেব চলিয়া গেলে তাঁহার শিষ্যেরা আমাদের সহিত সাধন ভজনের গল্প আরম্ভ করিলেন। আমাদের চেয়ে বালাগিরির উপরেই তাঁহাদের সবিশেষ অনুরাগ দেখা গেল। কোন্ সম্প্রদায়ের সাধু, কতদিন এই মার্গ অবলম্বন করিয়াছেন, এই সকল কথাবার্ত্তার পর তাঁহারা বালাগিরিকে স্বীয় সাধনার ইতিহাস কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন।

বালাগিরি বরাবর চোখ মুদিয়া কাষ্ঠমূর্ত্তির মত বসিয়াছিল। এই প্রশ্নের উত্তরে সে বলিল, "উঁট চরাতাম!" আমরাও কথাটার অর্থ প্রথমে ধরিতে পারি নাই। একটু ব্যাখ্যা করিতে বলায় বালাগিরি বিশদভাবে ইহার ব্যাখ্যা করিল। বলিল, কানপুরের নিকট কোন অঘোরীর আশ্রমে সে প্রথমে শিষ্য হয়। তাহার পর সাধন ভজনের একটা পথ চাহিলে গুরু তাঁহাকে আশ্রমের উট চরাইতে বলিলেন। তখন বালাগিরি সাত বৎসর ধরিয়া খালি উটই চরাইল।

সভাস্থ সকলেই তখন গুঞ্জন করিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "অহো, কি গুরুভক্তি! এরূপ ধৈর্য্য না হইলে কি সাধনার পথে যাওয়া যায়?" যাহাই হউক, উটই চরান, আর ঘাসই কাটুন, আমরা আর কিছু আলাপ আপ্যায়নের পর বালাগিরিকে লইয়া উঠিয়া পড়িলাম। পথে তাহাকে বলিলাম, "দাদা, করেছিলে কি? নেশার মাথায় আর কিছুক্ষণ জমালেই ওরা যে সব ধরে ফেলতো।" বালাগিরি বলিল, "ভায়া হে, ওরকম লোক ঢের দেখেছি। ওরাও মানুষ চরিয়ে খায়, আমি না হয় উট চরিয়ে খাই। তাতে তাদেরই বা কি, আমারই বা কি।"

এমনি ভাবে কয়েক মাস কাটিয়া গেল। ক্রমে শীতের পর গ্রীষ্মকাল আসিয়া পড়িল। বালাগিরির সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা হইত। কখনও কোনও মৃগী-রোগীর চিকিৎসা করিতে যাইতেছে, কখনও বা বাতব্যাধির। যাই হোক, চৈত্রের শেষ নাগাদ সে বৎসর বদরিকাশ্রম যাইব স্থির করিলাম, বালাগিরি শুনিয়াই লাফাইয়া উঠিল। বলিল, "ভাই, আর ভাল লাগে না। ঘেন্না ধরে গেছে। যত আহাম্মককে চরিয়ে খাওয়া আর পারা যায় না। চল এবার একবার মহাদেবের শ্রীচরণ দর্শন করে আসি। জয় গুরু।"

যাঁহা বলা তাঁহা কাজ। সঙ্গে লটবহর ত কিছুই নাই। সাধু আমাদের সঙ্গে বাহির হইয়া পড়িল। তাহার পর বদরিকাশ্রমে পৌঁছিলাম। সেখান হইতে গঙ্গোত্তরী, যমুনোত্তরী সব সারিয়া কেমন একটা নেশার মত দাঁড়াইয়া গেল। সঙ্গের সাথীরা একে একে সবাই সঙ্গ ছাড়িলেন; কেহ বা দুই মাস, কেহ বা তিন মাসেই ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। রহিল কেবল বালাগিরি অঘোরী।

আমিও তখন কাপড়-চোপড় ময়লা হইবার ভয়ে গেরুয়া ধরিয়াছি। অল্প কাপড়েই চলিয়া যাইত; তাহার উপর আর একটা লাভও ছিল। যত্র তত্র ভোজনও জুটিয়া যাইত। শুইবার স্থানের ত বালাই নাই। আজ এ আখড়া, কাল ও গ্রাম! কোনদিন পাহাড়ে যাহারা ভেড়া চরায় তাহাদের সঙ্গে, কোনদিন বা নদীর ধারে কোনও হনুমানজীর মন্দিরে রাত কাটিয়া যাইত।

এমনি করিয়া এক বছরের উপর ঘুরিয়া গেল। কাটিতেছিলও ভাল। পথে আমরা জন ছয়েক নাগা সন্ন্যাসীর সঙ্গ পাইলাম। তাঁহারাও তীর্থে তীর্থে ঘোরেন, আমরা দুই বাঙালী প্রাণীও তাই। এদিকে বর্ষা নামিয়া আসিল, পথ চলাও ক্রমশঃ দুষ্কর হইয়া উঠিল। সেবার বর্ষার

প্রায় গোড়ার দিকেই আমরা জ্বালামুখী তীর্থের দিকে যাইতেছি, এমন সময়ে এক বিপদ ঘটিল। চারিদিকে অবিশ্রান্ত জলধারায় পাহাড়ের গায়ে ছোট ছোট ঝোপ-জঙ্গল অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছিল। তাহার উপর পাথরের গায়ে সবুজ শৈবালরাশিতে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল। এমনি একটা পথে চলিতে চলিতে হঠাৎ একদিন আমি পা পিছলাইয়া প্রায় পনেরো হাত নীচে খাদে পড়িয়া গেলাম।

প্রথমটা কিছু বুঝিতে পারি নাই। সমস্ত বোধশক্তি কেমন আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল। পাহাড়ের নীচে রহিয়াছি ইহা বেশ বুঝিতে পারিতেছিলাম। উপর হইতে লোকেরা আমাকে উঁকি মারিয়া দেখিতেছে, ক্রমে পাগড়ী বাঁধিয়া নামিয়া আসিয়া আমাকে লইয়া গেল। সবই দেখিতেছিলাম, বুঝিতেছিলাম। কিন্তু ঘটনাটা যে আমাকে কেন্দ্র করিয়া ঘটিতেছে, ইহা ঠিক প্রত্যয় হইতেছিল না।

তাহার পর আর বহুদিনের কথা ভাল করিয়া মনে নাই। যখন জ্ঞান হইল তখন দেখিলাম কুল্লুর হাঁসপাতালে শুইয়া আছি এবং পাশে সেই কয়েকজন নাগা সন্ন্যাসী ও বালাগিরি অঘোরী। বালাগিরির নিকট সব কথা শুনিলাম। কেমন করিয়া পাহাড়ী ওষুধ পত্র দিয়া ক্ষত স্থান বাঁধিয়া দীর্ঘ পনের দিন ধরিয়া সকলে আমাকে হাতে হাতে লইয়া আসিয়াছে, কেমন করিয়া দারুণ শীতের মধ্যে নাগারা নিজেদের সমস্ত কম্বল দিয়া আমার শুশ্রূষা করিয়াছে, নিজেরা সেঁকো-বিষ খাইয়া ঠাণ্ডা কাটাইয়াছে, এই সব কথা। এমনি করিয়া অবশেষে তাহারা কুল্লুর হাসপাতালে আমাকে আনিয়া ভর্ত্তি করিয়া দেয়। হাসপাতালের অধ্যক্ষদের সঙ্গে নাকি বালাগিরি কোম্পানীর ইতিমধ্যে তুমুল কলহ হইয়া গিয়াছিল। নাগারা যখন-তখন আসিত বলিয়া তাঁহারা আপত্তি করেন। তাহাতে নাগারা ডাক্তারদের চিমটা লইয়া তাড়া করিয়াছিল।

ফলে শেষে ব্যবস্থা হয় যে রোগীকে বারান্দায় রাখা হইবে ও নাগারা যখন তখন আসিতে পারিবে।

এমনি করিয়া দীর্ঘ তিন মাস হাঁসপাতালে কাটাইলাম। নাগারাও রোজ আসিত, বালাগিরি ত ছিলই। তাহার গল্পের কামাই ছিল না। হিমালয়ের সম্বন্ধে প্রাকৃত—অপ্রাকৃত কত গল্পই যে শুনিয়াছি তাহার ইয়ত্তা নাই। অবশেষে আরোগ্যলাভ করিয়া হাঁসপাতাল হইতে ছুটি পাইলাম। বালাগিরি ও নাগারা তখন কোথা হইতে পয়সা সংগ্রহ করিয়া আমাকে কলিকাতার একটি টিকিট কিনিয়া দিল ও সঙ্গে নগদ পাঁচটি টাকা দিল। সেই নাগাদের সঙ্গে শেষ দেখা। পথের মধ্যে তাহাদের সঙ্গে আলাপ হইয়াছিল। কিন্তু কোনদিন তাহারা খুব ঘনিষ্ঠভাবে আত্মীয় করিয়া লয় নাই। অবশেষে বিপদের মধ্যেই বুঝিতে পারিলাম ইহারা না জানাইয়াও আমাকে কিরূপ পরমাত্মীয় করিয়া লইয়াছে। বন্ধুর মত তাহাদের পাইয়াছিলাম বটে, গ্রীষ্মের পরে স্নিগ্ধ বারিধারার মতই তাহারা আমাকে শীতল করিয়া দিয়া গিয়াছিল বটে, কিন্তু বর্ষা শেষের মেঘেরই মত তাহারা আবার নিঃশব্দে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

বালাগিরিও তাই। তাহার সহিত আর একরকম দেখাও হয় নাই, হয়ত সেও সংসারের বহু লোকের মত আমাকে এতদিনে ভুলিয়া গিয়াছে।

একেবারে যে দেখা হয় নাই তাহা নহে। কয়েক বৎসর পরে বোলপুরে একবার রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন দেখিতে গিয়াছি। বৈশাখের মাঝামাঝি। বোলপুর সহরের ভিতর একটি গঞ্জিকার দোকানে বালাগিরির মত এক ব্যক্তি কি কিনিতেছে দেখিলাম। প্রথমটা ঠিক চিনিতে পারি নাই। আমি আশ্চর্য্য হইয়া দেখিতেছি, যেন আরও

কিছু বৃদ্ধ হইয়াছে, লাঠিটা কিন্তু বদল হইয়া গিয়াছে। আমি তাকাইয়া আছি দেখিয়া বলিল, "হাঁ বালাগিরিই বটে ; ভায়া কোথা থেকে ?" সাইক্ল্ হইতে নামিয়া পড়িলাম। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম সে রাত্রে শান্তিনিকেতনের পথে এক নাগা সন্ন্যাসীর মন্দিরে আড্ডা পড়িয়াছে। সন্ধ্যায় যাইব প্রতিশ্রুতি দিয়া বাজারে চলিয়া গেলাম।

সন্ধ্যার পূর্ব্বেই কিন্তু ভীষণ দুর্য্যোগ আরম্ভ হইল। দারুণ ঝড়ের মধ্যে ঘন ঘন বজ্রপাত ও ভীষণ শিল পড়িতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে মাঠ সাদা হইয়া গেল। তেমন শিলপড়া কখন দেখি নাই। সে সন্ধ্যায় বালাগিরির সঙ্গে আর দেখা হয় নাই। তার পরদিন সন্ধান করিয়া জানিলাম সাধু রাত্রেই চলিয়া গিয়াছে। কোথায় কেহ তাহা বলিতে পারিল না।

তাহার পরেও একবার হাবড়ায় যাইতে যাইতে হঠাৎ পুলের উপর মনে হইল বালাগিরি যাইতেছে ; কিন্তু ঠিক কিনা বলিতে পারি না। মাঝে মাঝে মনে হয়, সাধু যেমন আমার হৃদয়ে অনেকখানি স্থান জুড়িয়া আছে, তাহার প্রাণেও কি আমার কোনও স্থান নাই ? হয়ত নাই। তাহার মনের উপর কোন স্থায়ী চিহ্ন রাখিতে পারিব এমন কোনও সুকৃতি আমি করি নাই। বহুদিনব্যাপী দারিদ্র্যদুঃখের ভিতর দিয়া সংসার তাহার মনে ভালবাসার সব রসটুকু নিঃশেষে শুকাইয়া দিয়াছিল। সেখানে কাহারও স্মৃতি যে দীর্ঘদিন বাসা বাঁধিতে পারিবে তাহা মনে হয় না। অথচ পরের বেগার খাটিতে বালাগিরির কখনও কামাই ছিল না। উপকার সে সকলের করিত বটে, কিন্তু রেলগাড়ী যেমন করিয়া যাত্রী বহিয়া লইয়া যায় তেমনি করিয়াই করিত। পরের তাহাতে যতই লাভ হউক না কেন, বালাগিরির নিজের তাহাতে কোন আনন্দও ছিল না, কিছু আপত্তিও ছিল না।

শিল্পী

পুরীতে সামান্য একটি পল্লীর মধ্যে কয়েকঘর পাথুরিয়া বাস করে। ইহারা এখন জগন্নাথদেবের ছোট ছোট মূর্ত্তি গড়িয়া যায়, অথবা ঘরবাড়ী তৈয়ারীর জন্য পাথর কাটিয়া দিনে বারো আনা চৌদ্দ আনা রোজগার করে। ইহাদেরই মধ্যে একজনের নাম ছিল রামমহারাণা।

অল্প বয়স, দেখিতে সুশ্রী, মাথার চুল লম্বা করিয়া রাখিত। গান গাহিতে ভাল বাসিত, একটু আধটু যাত্রাও করিত। রামের সহিত আমার পরিচয় হঠাৎ হইয়াছিল। কণারকের মন্দিরে একবার অনেক সৌখীন ভদ্রলোক কিছু মূর্ত্তির নকল গড়াইবার জন্য রামকে সঙ্গে লইয়া যান। সেইখানেই রামের সহিত আমার প্রথম আলাপ হয়। রামের হাতের দক্ষতা দেখিয়া খুব আশ্চর্য্য হইয়াছিলাম। নরুণের মত কয়েকটি যন্ত্র লইয়া আশ্চর্য্য ক্ষিপ্রতার সহিত রাম অল্পক্ষণের মধ্যেই একটি পাথরের ঢেলাকে সজীব করিয়া তুলিত। অথচ এ জিনিষের আদর ছিল না। লোকে হয় জগন্নাথের মূর্ত্তি চাহিত, নয়ত পুরীর মন্দিরে নরনারীর কামভাবের যে সকল মূর্ত্তি আছে, চুপি চুপি তাহারই প্রতিকৃতি গড়াইয়া লইত।

রামের কিছু অর্থাগম এই দিক দিয়া হইত। শিল্পশাস্ত্রের বিদ্যা আহরণ করিবার জন্য রামের বাড়ী প্রায়ই যাইতাম, এবং সেও আমাকে স্নেহ করিয়া দাদা বলিয়া ডাকিত। যতই আলাপ হইতে লাগিল ততই বুঝিলাম, রাম যথার্থই একজন গুণী লোক। অশ্লীল মূর্ত্তি বিক্রয় করিয়া খায় বটে, কিন্তু সে শুধু খাইতে পায়

বলিয়াই। নয়ত তাহার প্রাণ সত্য সত্যই শিল্পের জন্যই কাঙাল ছিল।

নিজে শিল্পীর ছেলে; ছোট বয়স হইতে ছেনি ও হাতুড়ী ধরিতে শিখিয়াছে, বাপ পিতামহ যেমন করিয়া পুরীর বা ভুবনেশ্বরের মন্দির রচনা করিয়া গিয়াছিলেন তাহারই কৌশল বংশপরম্পরায় সেও কিছু শিখিয়াছে বটে; কিন্তু অন্যদেশের শিল্পের মধ্যেই যথার্থ যাহা সুন্দর তাহা সহজেই তাহাকে আকৃষ্ট করিত। একদিন বিলাতী কয়েকখানি মূর্ত্তির চিত্র দেখাইতেই রাম আনন্দে লাফাইয়া উঠিল। বলিল, "দাদা আমাকে একবার কলকাতায় নিয়ে চল, আমি এইরকম মূর্ত্তি গড়া শিখব।" তাহাকে বলিলাম, তোমরা যে শিল্প জান, তাহাই বা কম কিসে? তুমি কেন পরের শিল্প শিখিবে? রাম দুঃখ করিয়া বলিল, "কেউ চায় না যে দাদা। দেখুন না বড় লোকেরা কতকগুলো খারাপ বিলাতী ছবি পাঁচ টাকা দিয়ে কিনবে, আর আমার মূর্ত্তি কেনার সময়ে দশ আনা দেবে কি, ন' আনা দেবে, এই নিয়ে ঝগড়া করবে। বলে ন' আনাই তোর ঢের, ও আর করতে কতক্ষণ সময় লেগেছে!"

রাম মহারাণার হৃদয়ে সমাজের এই তাচ্ছিল্য সর্ব্বদাই কাঁটার মত বিঁধিত। নিজের শিল্প যে ভাল, এবিষয়ে তাহার কোন সন্দেহ ছিল না। কিন্তু বিদেশী শিল্প যে খারাপ এমন ধারণা তাহার কোন দিন হয় নাই। কেবল সহরের ভদ্রলোকেরা দেশী বা বিদেশী শিল্পের বিন্দুবিসর্গ না বুঝিয়াও অতি খেলো ধরণের বিদেশী ছবি মহা আড়ম্বরের সহিত ঘরে টাঙাইয়া রাখিত, এইটাই সে বরদাস্ত করিতে পারিত না। বড় লোকদের উপর এইজন্য তাহার কেমন একটা রাগ হইয়া গিয়াছিল।

অথচ মানুষের ভালবাসার জন্য ও একটু সম্মানের জন্য রাম কতই না কাঙাল ছিল। একদিন সন্ধ্যায় আমাদের বাড়ী আসিয়া রাম হঠাৎ এক হারমনিয়ম চাহিয়া বসিল। কোথায় পাই? অবশেষে এক প্রতিবেশীর বাড়ী হইতে হারমনিয়ম সংগ্রহ হইল এবং রাম সেই অন্ধকার সন্ধ্যার নিস্তব্ধতা বিদীর্ণ করিয়া বহু গিটকারী সহযোগে নানাবিধ দুর্ব্বোধ্য তান আবৃত্তি করিয়া গেল। এমনি করিয়া, মাঝে মাঝে রামের উৎপাত সহ্য করিতে হইত।

কিন্তু ভদ্রসমাজে মিশিলেই ত ভদ্রলোকেরা খাইতে দেয় না। রামের অর্থাগমের চেষ্টা করা দরকার। কলিকাতায় কয়েকজন বন্ধু রামের গড়া মূর্ত্তি দেখিয়া তাহা কিনিবার বাসনা প্রকাশ করিলেন। রাম মূর্ত্তি গড়িয়া আমার কাছে রাখিয়া যাইত, আমিও সুযোগ বুঝিয়া বন্ধুবান্ধবদের ঘাড়ে তাহা চাপাইতাম। তবে আমদানী এমন করিয়া বেশী হইত না। কখনও বা হইত, কখনও বা এক পয়সাও জুটিত না। রামের কিন্তু উহার ফলে কাজের উৎসাহ দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল। সে ভুবনেশ্বরের পুরাতন মন্দিরের গায়ে যে সকল অপূর্ব্ব মূর্ত্তি ও লতাপাতার সাজ আছে তাহারই প্রতিলিপি গড়িতে লাগিল। অল্পদিনের মধ্যেই আমার ঘরে একটা যাদুঘরের মত সামগ্রী জমিয়া উঠিল। রাম মাঝে মাঝে বলিত, "দাদা, হাতে কাজ এলে কিরকম মনে হয় জানেন? সমস্ত পুরী সহরটার ঘর বাড়ী যেখানে যা কিছু আছে, সব আমার কাজ দিয়ে ভরে দিতে পারি।" তাহার উৎসাহ দেখিয়া আমার ভালও লাগিত, দুঃখও হইত। কে বা ইহাদের আদর করিবে, কেই বা ইহাদের বাঁচাইয়া রাখিবে?

একদিন অপরাহ্নে ঘরে বসিয়া কাজ করিতেছি এমন সময়ে শুষ্ক মুখে রাম মহারাণা আসিয়া হাজির হইল। তাহার মুখ দেখিয়া

কেমন সন্দিগ্ধ হইলাম। কিছু না বলিয়া সে তাহার গড়া মূর্ত্তিগুলি ফিরিয়া চাহিল। তাহার দুএকদিন পূর্ব্বে রাম টাকার জন্য একবার আসিয়াছিল, কিন্তু কোন মূর্ত্তি বিক্রয় না হওয়ায় তাহাকে কিছু দিতে পারি নাই। আজ তাহার মুখের ভাব দেখিয়া কিছু জিজ্ঞাসা করিতে ভরসা হইল না। মূর্ত্তিগুলি ভিতরের আলমারী হইতে আনিয়া রামের হাতে দিলাম।

রাম নিঃশব্দে সেগুলি লইল, এবং পর মুহূর্ত্তেই মাটির উপর আছাড় দিয়া সেগুলি টুকরা টুকরা করিয়া ভাঙিয়া ফেলিল। তাহার পর সেগুলি কুড়াইয়া দূরে ফণীমনসার ঝোপের মধ্যে ফেলিয়া দিল। তাহার কাণ্ড দেখিয়া আমি কিছু বলিতে পারিলাম না; সেও যে-ভাবে আসিয়াছিল তেমনি ভাবেই ফিরিয়া গেল। পরদিন সন্ধ্যার সময়ে রাম মহারাণার বাড়ী উপস্থিত হইলাম। দেখি সে ঘরের দাওয়ায় বসিয়া নিবিষ্টমনে একটি মূর্ত্তি খোদাই করিতেছে। আমাকে দেখিয়া প্রথমে সে লজ্জায় কোন কথা বলে নাই। তারপর আমি যখন কালকার কাণ্ডটার কথা পাড়িলাম তখন সে হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। অনেকক্ষণ বাদে বুঝিতে পারিলাম কে তাহার এক ভাইকে কাজের জন্য কিছু টাকা দাদন দিয়াছিল; এবং সেই ব্যাপার লইয়া সে নাকি কাল তাহাকে অপমান করে। এই ব্যাপারে মর্ম্মাহত হইয়া সে নিজের সব মূর্ত্তিগুলি ভাঙিয়া দিয়াছে। দুঃখ করিয়া রাম বলিল, কেউ আমাদের কাজ চায় না। যে সিঁড়ির পাথর কাটে সেও বারো আনা পায়, আমি মূর্ত্তি গড়লেও বারো আনা পাই।" সেই দুঃখেই রাম ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছিল। সমাজের কাছে কোন ভালবাসা, কোনো আদর সে পায় নাই। তাহার উপর রামের লোভ ছিল বটে, কিন্তু দেশের লোক তাহাকে খাইতে পর্য্যন্ত দেয় নাই। নিজের কথা ঠিক রাখিতে পারে

নাই বলিয়া, নিষ্ঠুরভাবে তাহারা বাড়ী বহিয়া অপমান পর্য্যন্ত করিয়া গিয়াছে।

সেই আমার রামের সঙ্গে শেষ দেখা। তাহার পর বহুদিন ভ্রমণের নেশায় দেশে দেশে ঘুরিয়াছি। কয়েক বৎসর পরে যখন পুনরায় ফিরিয়া গেলাম তখন শুনিলাম রাম মহারাণার মৃত্যু হইয়াছে। পাথুরিয়া-পল্লীর একজন কারিগরের কাছে শুনিলাম যে রাম উপর্য্যুপরি তিন দিন অনবরত গঞ্জিকা পান করিয়া একরকম আত্মহত্যাই করিয়াছে। রামের বাড়ীতে তাহার বিধবা স্ত্রী সকালে দাওয়ায় গোবর লেপিতেছিল, সে আমাকে দেখিয়া ঘোমটা টানিয়া প্রণাম করিল বটে, কিন্তু কি হইয়াছিল, একথা জিজ্ঞাসা করিতে আমার আর কথা সরিল না।

ব্যাধি

বয়স আমার পঁচিশ—কেহ বলেন বয়সের দোষ, কেহ বলেন এ দেশেরই দোষ। আমি বাংলা দেশকে ভালবাসি—দেশের দোষ আমি দেখিতে পাই না। গরম দেশের দোষ দিলে ত সকলকে ইউরোপে গিয়া থাকিতে হয়, কিন্তু সেখানেই কি লোকেরা সুখে আছে?

বন্ধু বলেন, বিবাহ করিলেই তোমার সব রোগ সারিয়া যাইবে। আমার রোগটা কি? আমার বাড়ির পাশে মুকুন্দ ঘোষ নাই তবুও আমি সমস্ত দিন সমস্ত আকাশ-বাতাসে একটি মৃদু সঙ্গীত শুনিতে

পাই। সে সঙ্গীতের কি শেষ নাই?—মনে হয় আমার হৃৎস্পন্দন দ্রুততর হইতেছে, আমার চেহারা উন্মাদের মত হইয়াছে—কিন্তু ভগবান যদি তাঁহার এই অনন্ত সৌন্দর্য্যভরা ধরণীর বুকে আমাকে পাঠাইলেন তাহা হইলে সঙ্গীতের শেষ দিলেন না কেন? যখন ভোরের প্রথম আলো আসিয়া ধরণীর শির চুম্বন করে তখন সমস্ত দেহমনে যে শিহরণ জাগে সে কি পুলক শিহরণ? মন কিছুতেই বসে না—আমার মনে হয়—কিন্তু স্পষ্ট করিয়া কি মনে হয় তাহা আমি নিজেই বুঝি না। সমস্ত রাত্রি ঘুমাইতে পারি না। পাশের বাড়িতে যে তরুণীটি সমস্ত রাত্রি জাগিয়া বসিয়া থাকে—তাহারই সঙ্গে আমিও রাত্রি জাগি। মনে হয় বিমলার সঙ্গে আমার জীবন এক সুরে বাঁধা। এমনি করিয়া আজ সুদীর্ঘ তিনমাস কাটিয়াছে। ব্যবধান মাত্র পঞ্চাশ হাত।—আমাদের পথ এক হইয়া কবে মিলিবে জানি না—কিন্তু আমাদের লক্ষ্য যে এক এবিষয়ে এখন আর আমার সন্দেহ নাই। মনে হয় এই পঞ্চাশ হাতের ব্যবধান আমাদের অনন্ত কালের ব্যবধান। এই পঞ্চাশ হাত প্রশস্ত নদীর দুই তীরে আমরা দুই যাত্রী ধীর স্থির গতিতে অগ্রসর হইয়া চলিতেছি—মাঝখানে রহিয়াছে সামাজিক বিধি-বিধান নিষেধ-নিবৃত্তির অলঙ্ঘ্য বাধা। এই বাধা মধুর বাধা—ইহা অলঙ্ঘ্য বলিয়াই ইহাতে এত সুখ এত আনন্দ।

এখন রাত্রি তিনটা। করিবার কিছুই নাই, কিন্তু ভাবিবার অনেক আছে। বিমলাও ভাবিতেছে।—কিন্তু এই যে মাথা ঘুরিয়া উঠিল—ওঃ একি সমস্ত পৃথিবী আমার পায়ের নীচে হইতে সরিয়া যাইতেছে—সঙ্গীতের মৃদু গুঞ্জন কানের মধ্যে অত্যন্ত প্রখর হইয়া উঠিল—আর বসিয়া থাকিতে পারিতেছি না—ওঃ—

* * *

বেলা আটটায় ঘুম ভাঙিয়াছে। পাশে ডাক্তার বসিয়া। ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিলেন, কুইনিন কাল ক'গ্রেন খেয়েছিলেন ? আমি বলিলাম, কেন, ত্রিশ গ্রেন, তাইত ব্যবস্থা ছিল !

—Singing in the ear কি এখনো চলছে ?

—হাঁ এখনো।

—তাহলে মাত্রা কমাতে হবে ; ও বাড়ির মিস্ বিমলাও বেশি কুইনিন সহ্য করতে পারছে না, আপনারই মত রাত জাগছে।

প্রসঙ্গ কথা

গতপূর্ব্ব মাসে আমরা পত্রিকাপ্রকাশে আশীর্ব্বাদ সংগ্রহের ইতিহাস সম্পর্কে কিছু আলোচনা করিয়াছিলাম। আমাদের ধারণা ছিল, যাঁহারা আশীর্ব্বাদ দেন তাঁহারা ভাল লেখা অন্যত্র বেচিয়া বিনামূল্যে আশীর্ব্বাদ দিয়া থাকেন। "উন্মোচন" নামক নবপ্রকাশিত মাসিকে অনেকগুলি আশীর্ব্বাদ দেখিয়া আমাদের উক্তরূপ ধারণা হইয়াছিল। কিন্তু উন্মোচন জানাইয়াছেন, এবং কিঞ্চিৎ গর্ব্বের সঙ্গেই জানাইয়াছেন যে তাঁহারা লেখা চাহিতে যান নাই, আশীর্ব্বাদই চাহিতে গিয়াছিলেন।

* * *

এ কথায় উন্মোচনকে প্রশংসা না করিয়া পারিলাম না, কেননা উন্মোচন অন্য কিছুর পরিচয় না দিলেও হিন্দুত্বের পরিচয় দিয়া আমাদিগকে লজ্জিত করিয়াছেন। এমন কি জিজ্ঞাসাও করিয়াছেন,

কোথাও যাত্রাকালে অথবা কোনো কার্য্যারম্ভে আমরা গুরুজনকে প্রণাম ইত্যাদি করি কিনা। আমাদের ইহার উত্তর দিবার উপায় নাই, কিন্তু উন্মোচনকে পাল্টা জিজ্ঞাসা করিতেছি তাঁহাদের গুরুস্থানীয় কাহারা এবং গুরুর সংখ্যা কত ?

* * *

তিনজন আশীর্ব্বাদকের নাম দেখিয়া এরূপ প্রশ্ন উঠিল। একজন ত স্পষ্টই লিখিয়াছেন, "অবসর পেলে আপনাদের অনুরোধ রক্ষা করা কঠিন হবে না। ইতিমধ্যে আমার শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।" এই শুভেচ্ছা (আশীর্ব্বাদেরই ভিন্নরূপ) প্রদানকারী "ইতিমধ্যে" শব্দটি ব্যবহার করিয়া আমাদিগকে বিপদে ফেলিয়া গিয়াছেন। ইঁহার কাছে অন্যকিছু নহে, লেখাই যে চাওয়া হইয়াছিল এবং তিনি তৎপরিবর্ত্তে "ইতিমধ্যে শুভেচ্ছা" দিয়াছেন আমরা এইরূপই ভাবিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। এখন অবশ্য উন্মোচন সে কথা অস্বীকার করাতে আমরা লজ্জা অনুভব করিতেছি !

* * *

কিন্তু দুইজনের কাছে যে আশীর্ব্বাদ চাওয়া হইয়াছিল, এ বিষয়ে অবশ্য আমাদের সন্দেহ নাই। সুতরাং জিজ্ঞাসা করি, উন্মোচনের গুরু কি বহুবচন ? আমরা কিন্তু গুরুবিষয়ে একবচনের সমর্থক, এবং এবিষয়ে আমাদের বচনও এক। অর্থাৎ আমরা বরাবর এই এক কথাই বলিব যে মাসিকপত্র পরিচালনে আশীর্ব্বাদের মহোৎসব আমরা পছন্দ করি না। কারণ বাংলাদেশে কাগজ-পরিচালনা ক্ষেত্রে উহা অত্যন্ত নিকৃষ্ট শ্রেণীর (জেস্‌চার নহে) ম্যানারিজ্‌ম্‌-এ পর্য্যবেশিত হইয়াছে। যাঁহারা পছন্দ করেন তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র।

* * *

সিনেমাগৃহ, কাপড়ের কল, কালীর কারখানা, প্রসাধন দ্রব্য, খাবারের দোকান প্রভৃতি যে-আশীর্ব্বাদ বিজ্ঞাপন-হিসাবে ব্যবহার করে, সাহিত্যবিষয়ক মাসিকপত্রও যদি সেই ব্যবসাদারি বিজ্ঞাপন "আশীর্ব্বাদ" নামে চালাইতে চেষ্টা করে তাহা হইলে তাহাকে কি বলিব? উন্মাদ রোগের ঔষধের সার্টিফিকেট এবং এই জাতীয় আশীর্ব্বাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য অন্তত আমাদের চোখে পড়ে না। বাংলাদেশে একই ধেনু হইতে যাবতীয় দ্রব্যের জন্য আশীর্ব্বাদ বা সার্টিফিকেট দোহন করা হইতেছে ইহা শুধু অশোভন নহে অসঙ্গত। কিন্তু ইহার অসঙ্গতি কাহারো চোখে পড়ে না। সার্টিফিকেটের মূল্য যে বর্ত্তমান বাজারে এক কানাকড়িও নহে, বরঞ্চ ইহা যে সর্ব্বত্রই একটা বিদ্রূপের বিষয়, সার্টিফিকেট বা আশীর্ব্বাদ-গ্রহণকারী তাহা দেখিতে পান না।

* * *

উন্মোচন আমাদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন (এবং সম্ভবত নিজেদিগকেও এইরূপই বুঝাইয়াছেন) যে গুরুজনকে প্রণাম করা এবঙ আশীর্ব্বাদী-লেখা গ্রহণ করা এক। আমরা বুঝি বা না বুঝি তাঁহারা যদি এরূপ বুঝিয়া থাকেন তাহা হইলে সুখের বিষয়। হাতের চুলকানিকে যদি তাঁহাদের নিকট পায়ের ধূলা বলিয়াই মনে হয় তাহা হইলে আমাদের বলিবার কিছুই নাই।

* * *

আশীর্ব্বাদ ও সার্টিফিকেট আমরা একই অর্থে ব্যবহার করিতেছি। কারণ এ দুইটাই বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞাপনের মূল্য-নিরূপণ করিতে চাহিনা কিন্তু এই বিজ্ঞাপনকে যাঁহারা সেন্টিমেণ্টের গন্ধ মাখাইয়া আশীর্ব্বাদ নামে চালাইতে চাহেন তাঁহাদের নিকট জিজ্ঞাসা করি, তাঁহারা কি সত্যই ইহার আধ্যাত্মিক মূল্যে বিশ্বাস করেন?

* * *

আশীর্ব্বাদের কথা ছাড়িয়া বিশুদ্ধ সার্টিফিকেটের ক্ষেত্রে আসা যাউক। যাঁহারা আশীর্ব্বাদ দেওয়ায় উন্মুখ, তাঁহাদের লেখনী হইতে কি জাতীয় সার্টিফিকেট বাহির হয় তাহা প্রত্যেকরই একটু ভাবিয়া দেখা উচিত। খাবারের দোকানের মিষ্টান্ন সম্বন্ধে সার্টিফিকেট দেখিলাম। যিনি সার্টিফিকেট দিয়াছেন তিনি যদি উহাতে লিখিতেন "আমাকে আজ যে খাবারের নমুনাগুলি দেওয়া হইয়াছে তাহা উৎকৃষ্ট।"—তাহা হইলে আর কিছু না হউক দেশ প্রতারণার হাত হইতে বাঁচিত। উপরোক্ত সার্টিফিকেট গ্রহণ করিয়া পরদিন হইতে যদি ঐ দোকানদার ভেজাল খাদ্য বিক্রয় করিতে থাকে তখন কি আর সার্টিফায়ারের আর্কফলাটিও দৃষ্টিগোচর হইবে?

* * *

যিনি এই জাতীয় প্রশংসাপত্র লেখেন, তিনি নিজেও তাহার মূল্য বোঝেন, এবং এই সার্টিফিকেট লেখার মূলে কোন্ রিপু কাজ করে তাহাও আমরা বুঝি। কিন্তু ইহার হাত হইতে নিরীহ জনসাধারণকে বাঁচাইবার কোনো উপায় আমরা ভাবিয়া পাই না।

* * *

বৃদ্ধত্বের সঙ্গে আশীর্ব্বাদ এবং সার্টিফিকেট দিবার প্রবৃত্তিও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ব্যবসাদার সুযোগ বুঝিয়া এই জাতীয় গুরু-পদ-লোলুপ বৃদ্ধদের কাছে সার্টিফিকেট প্রার্থনা করে এবং বৃদ্ধদের দ্বারা সে প্রার্থনা অবিলম্বে পূরিত হয়।

* * *

সার্টিফিকেট দিবার লোভে রসিকের রসিকত্ব ঘুচিয়া যায়, বিবেচকের বিবেচনা শক্তি নষ্ট হইয়া যায়, এবং সকলের উর্দ্ধে গুরু বা উপদেষ্টারূপ উচ্চাসনে বসিবার আকাঙ্ক্ষা অতিশয় হীনভাবে আত্মপ্রকাশ করে।

শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও এই দলে নাম লিখাইয়াছেন। কিন্তু সার্টিফিকেট দিবার মত কি হাতের কাছে আর কিছুই ছিল না?

* * *

তাহা না থাকুক, অন্য কিছুর সার্টিফিকেট তিনি নাই দিলেন। কিন্তু যে বইখানা অসভ্য ইতরামি করিবার উদ্দেশ্যেই লিখিত যাহা ভদ্রলোকের স্পর্শের অযোগ্য এইরূপ বইএর প্রশংসাপত্র তিনি লিখিয়াছেন! যে বইতে "মাইরি দাঁড়িয়ে মুততে কি আরাম" জাতীয় ভাষায় লেখা তাহারই সার্টিফিকেট শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত হইতে বাহির হইল! তিনি ইহাতে ইনটেলেকচুয়াল touches দেখিতে পাইয়াছেন। Urinationএর ভিতর intellect কোথায় তাহা কেদারবাবু বুঝাইয়া দিবেন কি? যেরূপ দেখা যাইতেছে তাহাতে অন্তত সাহিত্যক্ষেত্রে এই জাতীয় খ্যাতিলোলুপ নির্লজ্জ বৃদ্ধদের সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া না চলিলে উপায় নাই।

* * *

কতকগুলি মোকদ্দমা লইয়া আমরা আলোচনা করি নাই কেন ইহা লইয়া অনেকে আলোচনা করিয়াছেন বলিয়া নিশ্চিত প্রমাণ পাইয়াছি। আলোচনাটি বিশেষ করিয়া শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকারের মোকদ্দমা-সম্পর্কে। আমরা নীরব থাকিবার জন্য নলিনীরঞ্জনের নিকট হইতে টাকা খাইয়াছি এবিষয়ে দেখিতেছি তাঁহাদের সন্দেহ নাই, কেবল কত টাকা খাইয়াছি, ইহা তাঁহারা নিশ্চয় করিয়া জানেন না!

* * *

তাঁহারা যে দয়া করিয়া আমাদের সম্পর্কে এতটা ভাবিয়াছেন সে জন্য আমরা বিশেষ আনন্দিত, কিন্তু আমাদের প্রতি মমতাবশত নলিনীরঞ্জনের প্রতি তাঁহারা একটু অবিচার করিয়াছেন। ইহা কেন

করিলেন তাহা বুঝিনা। কেন তাঁহারা দয়া করিয়া মনে করিলেন যে নলিনীরঞ্জন অত্যন্ত নির্ব্বোধ? যে সংবাদ খবরের কাগজের কৃপায় বাংলার ঘরে ঘরে, ভারতের সর্ব্বত্র এবং ভারতের বাহিরেও প্রচারিত হইয়াছে, সেই সংবাদ পাছে শনিবারের চিঠিতে প্রকাশ হয় ইহাই কি নলিনীরঞ্জনের একমাত্র ভয়?

* * *

শনিবারের চিঠি সম্বন্ধে আলোচনাকারীদের যে অন্ধভক্তি আছে সেজন্য আমরা মনে মনে অবশ্যই পুলক অনুভব করি, কিন্তু ভক্তির মাত্রা বেশি হইয়া পড়িলে অনেক সময় ভক্তিভাজনকে বিপদগ্রস্ত হইতে হয় বলিয়াই সেই ভক্তিতে একটু আঘাত দিলাম.; আশা করি তৎসত্ত্বেও আমাদের ক্ষমতা সম্বন্ধে তাঁহাদের বিশ্বাস অবিচলিত থাকিবে। আমরা এখনো মনে করি, আলোচনাকারীগণ যদি নলিনীরঞ্জনের মেয়রের পদপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত জীবনী আলোচনা করিয়া বুঝিতে পারেন যে তিনি (তাঁহারা যতটা মনে করেন) ততটা নির্ব্বোধ নহেন, তাহা হইলে তাঁহারা ইহাও বুঝিতে পারিবেন যে বাজারে টাকা হঠাৎ খুব শস্তা হইয়া উঠে নাই, এবং শনিবারের চিঠির বৈশিষ্ট্যও ঠিক আছে।

আর একটি কথা। একটি সৎকার্য্য, তাহাও পয়সা না খাইয়া করা যায় না, এরূপ কল্পনা পৃথিবীর মধ্যে যে জাতি করিতে পারে তাহার নাম বাঙালী জাতি।

বিড়াল ইঁদুরে কয়, "ভয় কি রে ধন
তোদের বাঁচাব মোরা, তোরা হরিজন।"

প্রতিবাদের ফলাফল

অবশেষে গোয়ালন্দ !

বাষ্পীয় শকট থেকে নামা গেল ; কুলিরা ভীড় জমাল। অর্দ্ধ মাইল দূরে, ঘাটে—বাষ্পীয় পোত হুঙ্কার দিচ্ছে, সুটকেস্ হাতে নিয়ে ছুটি ষ্টীমারের দিকে।

*   *   *

রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে স্মরণ করলাম আমার রমণীকে। সে আর কারো নয় ; নিতান্ত আমার—আমার বান্ধবী, সঙ্গী, সখী, পরামর্শ-দাত্রী। এ যুগেও সে লাল শাঁখা পরে, হাতের নোয়া সোনা দিয়ে বাঁধায় না। তার হাত লিকলিকে নয়—সে 'লতেব' নয়। কাউকে সে উৎসাহ দেয় না—অনেক সময় আমাকেও না। সাহিত্য- রসিকা হলেও সাহিত্য পথের কাঁটার ভয় শ্রীমতীর আছে। আসবার সময় মাথার দিব্যি দিয়ে বলেছিল,—

"রমনার বাটে তুমি যেয়ো না যেয়ো না
উয়ারিতে কারো বাড়ি খেয়ো না খেয়ো না।"

তার সেই মিনতি-ছলছল চোখ মনে পড়লো। তার কালো ডাগর চোখ আমিই শুধু দেখেছি—লোকে যা বলে বলুক। মনে মনে কবিতার আবেগ এল,—

দেখেছি তার কালো হরিণ চোখ।

*   *   *

বন্ধুর বাড়ীতেই ওঠা গেল। বন্ধু আধুনিক হলেও সেকেলে-সাহিত্যিক সুতরাং কি করে পদ্মাপারের মাটিতে সজীব আছেন—তাই

ভাবি। ও মাটিতে কেউ ছোঁয়াচে রোগের হাত থেকে বাঁচতে পারে? যাকৃগে। প্রেয়সীর প্রার্থনা অগ্রাহ্য করেই রম্‌না ও উয়ারীর মাঠে বাটে বন্ধুর সঙ্গে বেড়ালাম—ঢাকেশ্বরী মাকে দর্শন করলাম—করজোড়ে প্রার্থনা করলাম,—"মা! মা!" ইত্যাদি।

সন্ধ্যা গড়িয়ে যায়, কৈ এপর্য্যন্ত কিছুই আমার নজরে পড়্‌লো না। তবে—তবে?

বন্ধু বললেন—"পুলিস পার্কগুলোর দ্বার সমস্ত দিন রাত্রি বন্ধ রাখে, তা না হলে—।" ধন্য পুলিস!

* * *

তবু ভরিল না চিত্ত।

বন্ধুসহ গৃহে ফেরা গেল চা পানের জন্য; বৈঠক্‌খানা ততক্ষণ জম্‌ জম্‌ করছে। বন্ধু আমাকে সবার সঙ্গে 'ইণ্ট্রোডিউস' করে দিলে।

সে দিনের বাজারে 'কাউঠার' দাম বেশী কি কম ছিল এই থেকে আরম্ভ করে আলোচনা 'cultural conquest of East Bengal"এ এসে পৌঁছল যখন, তখন ঘরটার গরম ১০৫ ডিগ্রী ফারেনহাইট নিশ্চয় হয়েছিল, কারণ অট্টহাসি ও বক্তৃতার শব্দতরঙ্গ যেরকম প্রচণ্ড ভাবে ইথার-সমুদ্রে আলোড়িত হচ্ছিল—তাতে আকাশে রেডিও চাঞ্চল্য না হয়ে যায়নি। অর্থাৎ যা ভাবছেন আপনারা ঠিক তাই—lungs থাকেতো পদ্মাপারের লোকেরই আছে।

বন্ধু ও আমি প্রায় নির্ব্বাক—মাঝে মাঝে হাঁ-হুঁ-করছি আর ভাবছি এরা শুধু যে মনুষ্য তা নয়, প্রভিনশিয়াল্‌ও বটে।

একজন, যার মস্তিষ্কের ঔজ্জ্বল্য তার মূর্ত্তিতেই প্রকাশ, যা বল্‌লে তার তাৎপর্য্য এই যে পদ্মাপারের লোকেরা বাংলার মাড়োয়ারী। আমি বললাম—সেটাতো গেল কমার্‌শ্যাল্‌ কন্‌কোয়েষ্ট।

জবাব হ'ল—"ঐ একই কথা মশয় !"

তারপর যে বক্তৃতা সুরু হল তার মর্ম্মকথা এই যে, আজ যদি কল্‌কাতায় পূর্ব্ববঙ্গের লোক না থাক্‌তো তবে দেশের সাহিত্য কোথায় থাক্‌তো !—কোথায় বিজ্ঞান ? কোথায় দর্শন ? কল্‌কাতার 'কাল্‌চারাল্‌ লাইফ্‌' পূর্ব্ববঙ্গের লোকেরাই তো বাঁচিয়ে রেখেছে !

ওঁদের কথার তাৎপর্য্যটা আমি দিলাম, ভাষা দিতে পারলাম না ; সেজন্য আমি লজ্জিত। কি করবো—ঠিক বুঝতে পারলাম না—বোঝবার মধ্যে কেবল "মশয়" আর "ছ্যাখ্‌তেয়াছেন্‌," কিন্তু তাতে রস-বোধের অভাব হয়নি।

বক্তৃতা চলেইছে—বিষয়, বঙ্গ সাহিত্য ও ভাষা ; বক্তা বললেন, কিন্তু কি বললেন ? তাঁর কথার তাৎপর্য্য এই যে পদ্মাপারের মাটিতেই প্রথম বঙ্গ সাহিত্যের উৎপত্তি এবং প্রসার, অতএব ভাষা সম্বন্ধে একটা "র‍্যাডিকল্‌ চেন্‌জ্য" আনতে হলে তাতে একমাত্র তাঁদের অধিকার। আমি প্রতিবাদ করে বললাম—কিন্তু কি বললাম কিছুই মনে নেই—প্রতিবাদ করার অভিজ্ঞতা আমার ছিল না।

তিনমাস পরে মেডিক্যাল স্কুল হাঁসপাতাল থেকে বেরুলাম। একখানা হাতে কম্পাউণ্ড ফ্র্যাকচার হয়েছিল, হাতখানা স্বাভাবিক ভাবে জোড়া লাগেনি, বেঁকে আছে। পা দুখানা ঠিক আছে ; এখন ওরই উপর ভরসা। একা এসেছিলাম, সস্ত্রীক ফিরে চলেছি—

* * *

আবার সেই গোয়ালন্দ ! বাষ্পীয় পোত থেকে নামা গেল ; কুলীরা আগেই ভীড় জমিয়েছে—অর্দ্ধমাইল দূরে বাষ্পীয় শকট বাঁশী বাজাচ্ছে—স্ত্রীকে নিয়ে ছুটি গাড়ির দিকে—এবারে মালপত্র কুলির মাথায়।

—প্রসেন

নামানি

সে যেন সঞ্চিত ধন অদৃষ্ট যক্ষের !
পুত্র যেন তৃতীয় পক্ষের
বৃদ্ধ বিধাতার।
সুতরাং তার
দেশ যেন স্বর্গভূমি। যদিও তা মর্ত্ত্যেতে বিরাজে,
ধন ধান্য পুষ্পে ভরা বসুন্ধরা মাঝে
শ্রেষ্ঠতম তবু তাহা ;
বুলবুল, পিউ-কাঁহা,
পিক, দহিয়াল,
কুঞ্জে কুঞ্জে মুখরিয়া বকুল, পিয়াল,
হারায়ে সম্বিৎ,
ক্রমাগত গাহিছে সঙ্গীত !
পুঞ্জে পুঞ্জে অলি
ক্রমাগত পুষ্প 'পরে পড়িতেছে ঢলি
কিছু না মানিয়া
আশ্চর্য্য ! অভূতপূর্ব্ব !—কবিকণ্ঠ কহে বাখানিয়া
মাতৃবক্ষে সে দেশেতে বিশেষ করিয়া
স্নেহ দিয়াছেন বিধি ভরিয়া ভরিয়া !
সে দেশের ভাই,
নাহি তারো কোনো তুলনাই !

সে দেশের নদীনদ সাপ ছুছুন্দর
সমস্ত সুন্দর !
তা লয়ে 'কোরাস্' ধরি উদ্বেলিত হৃদয়ে উদ্বাহু
ভগ্ন-কণ্ঠ হল কত শর্ম্মা, সেন, সাহু !
বিশীর্ণ যদিও দেহ—কিন্তু ওগো সেই অনুপাতে
অন্তর যে পূর্ণ তার নানা অজুহাতে !
চক্ষু দিয়া গ্রাস করে ছাপার অক্ষরে
এবং বিশ্বাস করি পায় সে মোক্ষরে
মানে সে 'মোক্ষম্'
ম্যালেরিয়া, T.B. দেহে, মন তার নহে ত অক্ষম !
বিচিত্র সাধনা !
লক্ষ্মীরে কামনা করে ভারতীর করি' আরাধনা,
ভারতীও অপরূপা, সাদাসিধা নহে বীণাপাণি,
নহে তা, কমল-বন-বাণী ।
হস্তে নাহি বীণা ;
ছিন্নমস্তা মূর্ত্তি তার—মাথামুণ্ড হীনা !
আপন শোণিত পিয়া
তাথিয়া তাথিয়া
নৃত্য করে উন্মাদিনী ; তারি চারি পাশে
লক্ষ্মীরে কামনা করি ভারতীর অর্ঘ্য বহি আসে
মুগ্ধ লুব্ধ ভক্তবৃন্দ যত
আবৃত্তি করিয়া নিত্য পুঁথিগত মন্ত্র শত শত !
নাহি তার মহিমার সীমা
জানে তাহা যে কোনো পিসীমা !

'মেকলে' পারেনি তাহা কিছুতে কমাতে
মিস্ মেয়ো, পারেনি দমাতে !
সঙ্গে সঙ্গে উত্তর সে করিয়া প্রদান
করেছে প্রমাণ
তাহারা মহজ্জাতি !—আর্য্য-গর্ব্ব উত্তরাধিকারী
সাক্ষী তার আছে সারি সারি
অতীতের বনিয়াদে পোঁতা
সকলের থোঁতা মুখ হয়ে গেছে ভোঁতা !
অন্তরে ঐশ্বর্য্য তার—বাহিরে সে যদিও কাঙালী !
নাম কি বাঙালী ?

*　　*

সে যেন সাঁতারু বীর নিতান্ত নির্ভীক
অপার জলধি বক্ষে সাঁতারিয়া চলিয়াছে ঠিক্ ।
চলিয়াছে সোজা
পৃষ্ঠে বহি গুরুতর বোঝা
বিরাট সংসার !
ছেলে মেয়ে বউ বোন মাসি, পিসি, সব সারে সার
সানন্দে বসিয়া আছে দুলায়ে চরণ,
সাঁতারু চলেছে সোজা তুচ্ছ করি জীবন মরণ !
কেহ তার দেয়না রেহাই !
আসে রোগ, আসে 'বিল', আসেন বেহাই
মাঝে মাঝে নামে অকস্মাৎ
মনিবের রুদ্র পদাঘাত ।
নামে বারম্বার

যুযুধান্ কৃষ্টা প্রিয়ার
তীক্ষ্ণ বাক্যবাণ;
কোন দিকে নাহি দিয়া কান
উত্তাল তরঙ্গমালা, গর্জ্জমান মহাঝঞ্ঝাবাত
না করিয়া কিছু দৃক্‌পাত
সাঁতারু চলেছে সোজা—মুখে নাহি বাণী।
নাম কি কেরানী?

*   *

যে মালা পরায় প্রিয়া নিজ প্রিয়তমে
সোহাগে সরমে,
সে মালার
সেই মালাকার।
অন্তরালে থাকি নিজে দুইখানি অচেনা অন্তর
পরিচয় বন্ধনেতে বাঁধে নিরন্তর!
যেন সে 'হাইফেন'
কবি ও কাগজ মাঝে যেন 'ফাউনটেন'!
একের মনের বার্ত্তা অপরের বুকে
বহি আনে সুখে!
শুষ্ক ভূগোলেতে যেন যোজক, প্রণালী,
যুক্ত করি চলিয়াছে খালি
দেশে দেশে, সাগরে সাগরে
ক্রেতা আর বিক্রেতায়; নাগরী, নাগরে!
যদি আসে কাছে
মনে হবে, আছে আছে আছে

এ জগতে আছে একজন
যার কাছে খোলা চলে মন !
আকাশের চাঁদ পেড়ে দিতে পারে হাতে
যদি পায় তাতে
কিছু কমিশন !
সবুজে করিতে পারে অনায়াসে লাল !
নাম কি দালাল ?

* *

তবু চাই তাকে
করিতে পারে না কিছু তবু তারে ডাকে !
আছে ইতিহাস :
বহু অর্থ করিয়া বিনাশ,
বহু লজ্জা, বহু ঘৃণা, বহু প্রেম করিয়া হজম ;
দিবা নিশি করি বহু শ্রম
লভিল সে যাহা,
কি যে বস্তু তাহা
বলিল না কখনো খুলিয়া !
রহস্যের আবরণ দিয়া
আপনারে রাখিল ঢাকিয়া !
সতত সবার চিত্ত উৎসুক সদাই
বলে, 'তাকে চাই !'
গল্প যেন প্রকাশ্য ক্রমশঃ,
আমসি আচার যেন যতবারই চোষ
কিছুতেই তৃপ্তি হয় নাক' ;

কিছু হইলেই তাই বলে তারে, "ডাকো !"
এবং ডাকিলে সেও আইসে ছুটিয়া
প্রাপ্য তার টাকা কটি নিয়া,
লিখে যায় চালায়ে কলম
সার্টিফিকেট কভু, কখনো বা মিকশ্চার, মলম,
উঁচু করি বিজ্ঞ নাক তার
—নাম কি ডাক্তার ?

* *

পৃথিবী যে রঙ্গমঞ্চ—একথা সে বুঝেছে প্রচুর
ইংরেজ-বিদ্বেষী আজ, কল্য তাই রায়-বাহাদুর !
নিত্য নব অভিনয় সখ
রাম বা রাবণ কভু, কভু মন্ত্রী, কভু বিদূষক !
সে যেন বুঝেছে ভূমা
উচ্চ-নীচ, ভাল মন্দ, চড়্ কিম্বা চুমা
আসল নকল
তার কাছে সমান সকল।
কিন্তু নয় আইনষ্টাইন
(যদিও সে নানাবিধ জ্ঞানের 'মাইন')
ভেদ-বুদ্ধি আছে কিছু চিতে।
টাকাতে ও খোলামকুচিতে
আছে যে তফাৎ
সে কথাটা ভুলিতে সে পারে না হঠাৎ।
'মাইনাস্' ওইটুকু সমদৃষ্টি সব তাতে তা'র
সত্য মিথ্যা তার কাছে স্পষ্ট একাকার।

মিথ্যা, গ্রাস্ কিছু টাকা, হ'য়ে যায় সত্যের সমান ;
নিত্য তাহা করিছে প্রমাণ।
কভু হস্ত জোড় করি কখনও বা উঁচাইয়া কিল
—নাম কি উকীল ?

* *

প্রিয়ার নয়ন কোণে যেন সে পিঁচুটি !
কারণ বিছুটি
লাগায়েছে মকর-কেতন,
অথচ পকেটে নাই তেমন বেতন !
নাই সেই রজত-নিক্কণি
যার জোরে হওয়া যায় নয়নের মণি
কোন রমণীর !
কিম্বা যদি—বীর
হইত সে, যৌবনের আবেগে অধীর,
আনিত লুণ্ঠন করি কোন রূপসীর
সমস্ত হৃদয় !
কিন্তু হায়, বিধাতা নিদয়।
দেহ তার কিছুতেই হলনা সবল,
লম্বা চুল, জুলফি, গোঁফ ব্যর্থ সকল !
ফ্রয়েডি মুখস্থ বুলি হল অনর্থক
ভেজেনা তাহাতে চিপিটক !
তাই
পিচুটির মত আছে লাগিয়া সদাই
কিছুতে না দমে'
বার বার পুছে ফেলে—পুন এসে জমে
যৌবনের 'প্যারডি' সে, অথচ করুণ,
নাম কি তরুণ ?

"বনফুল"

পেডিগ্রী মেয়ার

(মেয়র নহে)

মনটা ভাল ছিল না। থাকিবার কথাও নয়।

কর্পোরেশনে একটি চাকরীর জন্য আবেদন করিয়াছিলাম। ভিতরে সংবাদ লইয়া জানিয়াছিলাম—প্রার্থীদের মধ্যে আমারই যোগ্যতা সকলের চেয়ে বেশী, এবং একথা বিভাগীয় কর্ত্তাও স্বীকার করিয়াছেন। অতএব দীর্ঘদিনের বেকার জীবিকার অবসান ঘটিল মনে করিয়া মনে মনে আশান্বিত হইয়া উঠিয়াছিলাম।

কিন্তু হইল না। শুনিলাম সার্ভিস-কমিটিতে ডাক্তার রায় বলিয়াছেন—"অবনত জাতিদের প্রতি আমরা যুগ যুগ ধরিয়া যে অত্যাচার করিয়াছি—তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতেই হইবে। তাহাদের দাবীই সর্ব্বাগ্রগণ্য হইবে। অপর প্রার্থীর যোগ্যতা যেমনই হউক—"

অতএব প্রায়শ্চিত্ত করিতেই হইল।

মনটা বড়ই খারাপ হইয়া গেল। প্রায় লাগিয়া গিয়াছিল—সামান্যের জন্য ফস্কাইয়া গেল। সেকেণ্ড ক্লাস ট্রামে চাপিয়া বাড়ী ফিরিতে ফিরিতে ভাবিতে লাগিলাম—বিজ্ঞানের সাহায্যে আধুনিক যুগে মানুষ এত কাণ্ড করিতেছে—অসম্ভব সম্ভব হইতে চলিল,—আলকেমি, টেলিভিসন, রেডিও, ডেথ-রে, এমনকি মৃতের পুনর্জ্জীবন দানের সম্ভাবনা পর্য্যন্ত বিজ্ঞাপন দাবী করিতেছে;—আর জন্মিবার পূর্ব্বেই মানুষ যাহাতে ইচ্ছামত জাতি বা বংশ বাছিয়া লইতে পারে—মাত্র এইটুকুর ব্যবস্থা বিজ্ঞান করিতে পারে না? স্থির করিলাম—

এ বিষয়ে স্যর অলিভার লজের সহিত অবিলম্বে পত্রালাপ করিতে হইবে।

সহরতলির স্বল্পালোকিত পথে অন্যমনস্কভাবে চলিতেছিলাম। একবার মনে হইল—এ বড় অন্যায়, উচ্চবর্ণে জন্মিয়াছি, মাত্র এই অপরাধে যোগ্যতা সত্ত্বেও আমার দাবী উপেক্ষিত হইবে? তা' ছাড়া বেকার যুবকের সংখ্যা ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চবর্ণের মধ্যেই সর্ব্বাপেক্ষা ভয়াবহ—একথাও তো সেন্‌সাস্ রিপোর্টেই প্রকাশ। তবে—? মনকে এই বলিয়া সান্ত্বনা দিলাম—হয়ত ইহাই ঠিক্; সমগ্র জাতির কল্যাণের জন্য দেশপূজ্য নেতাগণ এই যে অভিনব ব্যবস্থা করিয়াছেন ইহাকে নত শিরে মানিয়া লওয়াই উচিত। বৃহত্তর মানব সমাজের মঙ্গলের নিকট ব্যক্তিগত বা শ্রেণীবিশেষের সুবিধা অসুবিধার কথা উঠিতেই পারে না। যাঁহারা বিরাট ভারতীয় জাতির মুক্তিযজ্ঞের হোতা তোমার আমার কথা ভাবিবারই বা তাঁহাদের অবসর কোথায়? মহামানবতার যে রূপ তাঁহারা ধ্যাননেত্রে প্রত্যক্ষ করিতেছেন, সেখানে জাতি, শ্রেণী বা ব্যষ্টির স্থান থাকিতে পারে না। • •

মেথর বস্তির কাছে আসিয়া চিন্তায় বাধা পড়িল। একটা কলরব হইতেছে। দেখিলাম দশবারোটি ছেলের চারিদিকে পঁচিশ ত্রিশ জন মেথর জড় হইয়াছে। ছেলেদের মধ্যে একজন হাতমুখ নাড়িয়া তাদের কি বুঝাইতেছে। তাহারা কিছু বুঝিতেছে কিনা বোঝা যাইতেছে না; কিন্তু বেশ একটা চাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হইতেছে। কাছে গিয়া দেখিলাম—বক্তা আর কেহ নয়, আমাদের গণেশ। আমাকে দেখিয়াই বলিল—"এইযে দাদা, আপনি এসে পড়েচেন ভালই হয়েছে। এদের একটু বুঝিয়ে দিন তো—"। লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, তাহার শ্রোতৃবর্গের অধিকাংশের মুখেই অবিশ্বাসের হাসি। বুঝিলাম,

াণেশ যাহা বলিতেছে—তাহা ইহারা তামাসা মনে করিয়াছে। বলিলাম-
গণেশবাবু, ব্যাপার কি ? থিয়েটারের রিহার্সাল ছেড়ে তোমরা
এগুলি মূর্ত্তি মেথর-বস্তিতে জুটেছ কেন ?"

গণেশকে আমাদের ওদিকে সকলেই চেনে। সে নন্‌কোঅপারেশ-
নের সময় কলেজ ছাড়িয়াছে; সিভিল ডিসওবিডিয়েন্সে কন্‌ট্রাব্যাণ্ড
ল্ট. বিক্রয় করিয়াছে। পাড়ার ছেলেরা তাহাকে একটা অবতার-
বশেষ মনে করে। অনুমান করিলাম, এবার হরিজনের পালা। সে
লিল—"সেই কথাই তো এতক্ষণ এদের বোঝাচ্ছিলুম। কালথেকে
কালে এদের বদলে আমরা বাঁক নিয়ে ময়লা সাফ করতে বেরুব।
া' এরা বিশ্বাস করচে না; এটা যে জাতির মঙ্গলের জন্যে কত
য়োজন—সে তো আপনি জানেন। তাই আমরা ঠিক করেচি।—"।

গণেশ অনেক সময়েই আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কথা বলে; কিন্তু তাহার
কথায় আমি একেবারে হতভম্ব হইয়া গেলাম। হঠাৎ ইহাদের
য়লা সাফ করিবার প্রয়োজন ঘটিল কিসে? বলিলাম—
গণেশ বাবু, একটু বুঝিয়ে বল। তোমরা ভদ্রলোকের ছেলেরা
ঠাৎ ময়লা সাফ করতে যাবে—ব্যাপার কি? আর তোমরা তা'
ারবেই বা কেন? এরা বংশানুক্রমে সে কাজ করে আসছে—এরাই
া পারে।"

একজন বৃদ্ধ মেথর আমার কথা সমর্থন করিয়া বলিল—
বলুন তো বাবু। বাবুর নেখা পড়া শিকে মাথা খারাপ হয়েচে।
কাজ আপনাদের করতে দিলে আমাদের পাপ হবে না?"

গণেশ ভয়ানক উত্তেজিত হইয়া উঠিল। বলিল—"এই করেই
াতটার সর্ব্বনাশ হতে বসেছে। যুগ যুগান্তর ধরে আমরা এই পদদলিত
পীড়িত মানুষগুলির ওপরে যে অমানুষিক অত্যাচার করে এসেছি—

তার প্রায়শ্চিত্ত আমাদের করতেই হবে ;—নইলে নিস্তার নেই। আর তা সুরুও হয়ে গিয়েছে। মহাত্মাজীতো বলেইছেন—বিহারের ভূমিকম্প হরিজনদের প্রতি অত্যাচারেরই ফল—"।

ব্যাপারটা কতকটা বুঝিতে পারিলাম। কিন্তু সবটা পরিষ্কার হইল না। জিজ্ঞাসা করিলাম—"তা প্রায়শ্চিত্তটা কি রকম করতে চাও?"

গণেশ তখনো শান্ত হয় নাই। বলিল—"কেন, সে তো দাশগুপ্ত মশায়ই পথ দেখিয়ে দিয়েচেন। যে উচ্চবর্ণ এতদিন এদের অস্পৃশ্য করে রেখেছিল—তাদেরই নেমে আসতে হবে এদের কাজে। তাইতো আমরা ঠিক করেছি—কাল থেকে আমরাই এদের বদলে ময়লা সাফ করতে বেরুব।।

আমি অন্য ছেলেগুলির দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"আর তোমরা—তোমরাও সকলেই তাই করবে স্থির করেছ?" তাহারা সমস্বরে জানাইল—তাহারা সকলেই এই ব্রত গ্রহণ করিয়াছে। জাতির কলঙ্ক প্রক্ষালন করিতে যদি এইটুকুই তাহারা করিতে না পারিল, তবে মানুষ হইয়া জন্মিয়াছে কেন?

আমরও সে বিষয়ে কিঞ্চিৎ সন্দেহ জন্মিল। যাহা হউক একটা প্রশ্ন মনে জাগিতেছিল। জিজ্ঞাসা করিলাম—"তা গণেশবাবু, উচ্চবর্ণের ভদ্রলোকেরাই যদি মেথরদের কাজ করে দেয়—তবে ওরা করবে কি? ওদেরও তো একটা কাজ চাই?"

গণেশ বোধ হয় এ কথাটা একেবারেই ভাবে নাই। একটু থতমত খাইয়া গেল। কিন্তু পরক্ষণেই দ্বিগুণ জোরের সহিত বলিল—"তা জানি নে; জানবার প্রয়োজনও নেই। আমাদের দীর্ঘ দিনের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবার সুযোগ যদি ওরা আমাদের দেয়—তা' হলেই আমরা ওদের প্রতি যথেষ্ট কৃতজ্ঞ থাকবো। প্রয়োজন ওদের চেয়ে আমা-

দেরই বেশী। ভেবে দেখুন জগৎ জুড়ে একটা কতবড় সাড়া পড়ে যাবে—”।

বৃদ্ধ মেথর সহাস্যে কহিল—“তাইতে বলি, খবরের কাগজে নাম উঠবে—তার লেগেই—”

গণেশ তখনো থামে নাই। “সে যাই হোক দাদা আপনাকেও আমাদের দলে চাই। আপনাকে নইলে চলবে না।”

আমার মাথা ঘুরিয়া গেল। সভয়ে বলিলাম—“না না গণেশবাবু আমি না,—আমায় বাদ দিয়ে—”

গণেশ পুনরার উত্তেজিত হইয়া উঠিল। বক্তৃতার ভঙ্গিতে হাত নাড়িয়া বলিল—“আপনারা জাত নিয়েই গেলেন। ভুলে যাবেন না—কালের চক্র ঘুরে গিয়েছে। আপনারা উচ্চবর্ণেরা সব সুখ সুবিধা ভোগকরে এদের ওপর এতদিন যে অত্যাচার করে এসেছেন, সমাজ ব্যবস্থায় যে ভার-বৈষম্য সৃষ্টি করেছেন, তার প্রতিকার না করলে নিস্তার নেই ; তাই পাল্লা বদল করতেই হবে। আপনাদের জায়গা এদের ছেড়ে দিয়ে, এদের জায়গা নিতে হবে আপনাদের। তা ছাড়া জাতির মুক্তির অন্য পন্থা নেই।”

তাইতো! সমাজ-ব্যবস্থায় ভার-বৈষম্য ঘটিয়াছে—একথাটাতো ভাবিয়া দেখি নাই! মুগ্ধ হইয়া গেলাম। নাঃ, ছোকরা কলেজ ছাড়িয়া দিলে কি হইবে। বোঝে অনেক জিনিষ ; বলে আরও ভালো।···

কিন্তু তাই বলিয়া এই কাজে আমাকে নামাইতে চায়? সর্ব্বনাশ আর কি! সবিনয়ে কহিলাম—“ভাই গণেশ বাবু, তুমি যা বললে—তা তোমারই উপযুক্ত কথা। কিন্তু ভাই, আমার শরীরটা তত ভালো নয়, এই ঠাণ্ডায় ভোরে উঠে তোমাদের দলে যোগ দিতে পারবো না। কিছু মনে কোরো না।”

গণেশ অবজ্ঞার সহিত হাসিল। বলিল "আপনাদের কর্ম্ম নয় সে আমি আগেই জানতুম। তাই বলে আমাদের টলাতে পারবেন মনে করবেন না। আমাদের ব্রত আমরা একলাই—"

আর একটা বক্তৃতার দমক আসিতেছে দেখিয়া তাড়াতাড়ি সরিয়া পড়িলাম। দূর হইতে পিছন ফিরিয়া দেখিলাম, গণেশ পূর্ব্ববৎ আবার হাতমুখ নাড়িয়া বক্তৃতা সুরু করিয়াছে। তাহার সঙ্গীর দল মাঝে মাঝে উচ্চস্বরে সমর্থন করিতেছে—এবং তাহার শ্রোতৃবর্গ সহাস্যে মাথা নাড়িতেছে। সহসা অনুভব করিলাম—ইহাদেরই জন্ম সার্থক! দেশের কাজতো করিতেছে ইহারাই। কোনোও প্রকার কর্ম্মেই ঘৃণা নাই কোনো প্রকার ত্যাগেই পশ্চাৎপদ নয়।

সশ্রদ্ধ চিত্তে এই তরুণ দলের অপূর্ব্ব স্বার্থত্যাগ ও আদর্শের কথা ভাবিতে ভাবিতে পথ চলিয়াছিলাম। সমাজের বিভিন্ন স্তরে উচ্চবর্ণের সৃষ্ট কর্ম্ম বিভাগের দ্বারা যে ভার-বৈষম্য ঘটিয়াছে, তরুণ ভারত তাহার সমাধান করিবেই। গণেশ ঠিকই বলিয়াছে। সমাজের দাঁড়িপাল্লার বাটখারা বদল করিতেই হইবে। আমাদের স্থান উহাদের দিয়া উহাদের স্থান আমাদের লইতে হইবে। তবেই জাতির মুক্তি! কিন্তু—

সহাস সুর কাটিয়া গেল। তাই তো! একি হইল? ইহাতে বৈষম্যের সমাধান হইবে কি করিয়া? দুই পাল্লার বাটখারা পাল্টাইয়া দিলেই ভারসাম্য ঘটিবে কি? যে বৈষম্যের বিরুদ্ধে ইহারা য[illegible] ঘোষণা করিয়াছে—তাহাইতো উল্টাদিকে আরও প্রবল ভাবে প্র[illegible] হইবে। তাহাকে ঠেকাইবে কি করিয়া? তা' ছাড়া—বংশানুক্রমে [illegible] যে-কাজ করিয়া আসিতেছে—তাহাদের সেই বিষয়ে একটা জন্মগ[illegible] সংস্কার কি জন্মায় নাই? এ কথা তো—

চিন্তায় বাধা পড়িল। সম্মুখেই মিষ্টার নন্দীর বৈঠকখানা হই

[গপৎ উজ্জ্বল আলো ও সতেজ কলরব চক্ষে ও কর্ণে প্রতিহত হইল। ।াড্ডা বেশ পূরা দস্তুর জমিয়াছে। মনমরা ভাবটা কাটাইয়া লইবার ন্য ঢুকিয়া পড়িলাম।

মিষ্টার নন্দী চমৎকার লোক। এক সময়ে বিলাত যাইবার কথা ইয়াছিল, সেই অবধি বাড়ীতে ঢিলা পায়জামা পরেন, এবং সকলকেই মিষ্টার—অমুক' বলিয়া সম্বোধন করেন। কালচার্ড লোক, হাই ার্কেলে মেলামেশাও আছে। লোকে বলে ঘোড়দৌড়ে তাঁহার টিপ্‌স্ ।ব্যর্থ। এইজন্য, কেবল যে কালচার-অভিলাষী পাড়ার অনেকেই াহার ড্রয়িং রুমে সমবেত হন—তাহা নয়; আরও নানান ধরণের লাকেরই সমাগম হয়। আমাকে দেখিয়া খুসী হইয়া বলিলেন— আসুন, আসুন, মিষ্টার শর্ম্মা! তারপর, কি খবর? হল কিছু?"

আরো অনেকেই এ প্রশ্নের প্রতিধ্বনি করিলেন—"হ্যাঁ হ্যাঁ,—কি ল?—কি হল বলুন তো?

এতক্ষণ ভুলিয়া ছিলাম। শুভানুধ্যায়ীগণ অজ্ঞাতসারে বেদনায় ।ানটিতেই আঘাত করিলেন। শুষ্ক হাসিয়া কহিলাম—"হল না; ামি যথেষ্ট নীচু জাতের নই।"

সকলে নিস্তব্ধ হইয়া গেলেন। ও পাশে ঘোড়া সম্বন্ধে কি একটা ালোচনা চলিতেছিল—তাহাও থামিয়া গেল। মিনিট দুই পরে ষ্টার নন্দী মুখ হইতে সিগার নামাইয়া বলিলেন—"ভেরি সরি; াপনার হ'লে আমরা সকলেই খুসী হতুম। কিন্তু মিষ্টার শর্ম্মা, কিছু নে করবেন না,—এ আপনাদেরই যুগযুগান্তর সঞ্চিত পাপের শ্চিত্ত। ব্রাহ্মণেরা চিরদিন ধরে যে—।"

এই কথাটাই আরো দুইবার আজই শুনিয়াছি। বাল্যকালে এক হপাঠীর অজ্ঞাতসারে তাহার টিফিন-বক্সের খাবার খাইয়া সেটি

আবার যথাস্থানে রাখিয়া দিয়াছিলাম, এবং সে আমাকে সন্দেহ করিলে—প্রবলভাবে অস্বীকার করিয়াছিলাম। ইহা ব্যতীত আর কোনও পাপ করিয়াছি—স্মরণ হইল না। সবিনয়ে কহিলাম—"এ কথাটা আজকে আরও দুবার শুনেচি। কিন্তু পাপটা কি করেচি স্মরণ হচ্চে না। ভারতীয় সভ্যতায় যদি গুণ এবং কর্ম্ম অনুসারে মানুষের শ্রেণীবিভাগ হয়েই থাকে, তাতে ব্রাহ্মণদের বিশেষ করে অপরাধ কি? আর তারাই কি ভারতের ভাব-সাধনার ধারা উত্তরাধিকার সূত্রে বহন করবার ভার গ্রহণ করে নি? এ রকম জাতিভেদ তো ভালো, এর চেয়ে খারাপ জাতিভেদ যে জগতে আর্থিক বৈষম্যের জন্য হচ্চে, চামড়ার রঙের পার্থক্যের জন্যে হচ্চে, তার কি?"

মিষ্টার নন্দী হাসিলেন। "সেই মামুলি যুক্তি। মিষ্টার শর্ম্মা, ও সব দেশে একটা মুচির ছেলেও রক্‌ফেলার হবার স্বপ্ন দেখে। পারে আপনার দেশের মেথর কাল বামুন হয়ে যাবার স্বপ্ন দেখতে? তা ছাড়া—"

গণেশ ইতিমধ্যে আসিয়া জুটিয়াছিল। সে বলিল—"সব ঠিক ক'রে এলাম।—হ্যাঁ। তা ছাড়া চিরদিন এদের বঞ্চিত করে এসেছেন; এদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করে এসেছেন; আর নিজেরা সব সুখ সুবিধা ভোগ করে এসেছেন। দেখুন না, যে অপরাধে অপরের কঠিন শাস্তি হত, সেই অপরাধেই ব্রাহ্মণের শাস্তি হতই না,—না হয়ত খুব লঘু শাস্তি হত। এ বিষয়ে ইংরেজের আদালত আমাদের চোখ ফুটিয়ে দিয়েচে। সেখানে ব্রাহ্মণ, শূদ্র সব সমান।"

গণেশকে দেখিয়াই ভয় পাইয়া গিয়াছিলাম;—বুঝি আবার পাকড়াও করিতে আসিয়াছে। ভয়ে ভয়েই বলিলাম—"গণেশবাবু সেটা ব্রাহ্মণদের একারই কি দোষ? জগতের সর্ব্বত্রই চিরকালই

যাদের হাতে ক্ষমতা থাকে—তারা একটু সুবিধা ভোগ করে নেয়ই। পয়সাওয়ালা লোকও কত সময়েই তো শাস্তি এড়িয়ে যায়—কিম্বা কম শাস্তি পায়। ও কথা নয়। অনেক প্রতিকূল অবস্থার ভেতর দিয়ে ভারতীয় সভ্যতায় বিদ্যা আর জ্ঞানের বিশিষ্ট ধারাটিতো ব্রাহ্মণেরাই সযত্নে বাঁচিয়ে রেখে এসেচে। তাদের তো আমি বেশী অপরাধ দেখি নে। একটু গোঁড়ামি তাদের করতেই হয়েচে। প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে টিঁকে থাকতে হলে—"

মিষ্টার নন্দী মুখ হইতে সিগার নামাইয়া বলিলেন—"সে কথা আমি অস্বীকার করচিনে। কর্ম্মগত, বা অবস্থাগত জাতিভেদ একটা জগতে আছে; এবং চিরদিনই মানুষ সমাজে থাকবে। পৃথক কর্ম্ম এবং পৃথক জীবনযাত্রা-প্রণালী মানুষকে ভিন্ন ভিন্ন গণ্ডীতে আবদ্ধ করবে—একথা বুঝতে পারি। যদি এমন হত যে বিদ্যা, জ্ঞান, ধর্ম্ম ইত্যাদির চর্চ্চা যাঁরাই করবেন—তাঁরাই ব্রাহ্মণ হবেন—তা হলে আপত্তির বেশী কিছু ছিল না। কিন্তু তাঁরাই যে বিদ্যা, জ্ঞান ইত্যাদি একচেটিয়া করে রাখবেন—এর চেয়ে অন্যায় এবং অবিচার আর কি হতে পারে। তারপরে, এই জাতিভেদ যখন জন্মগত হয়ে দাঁড়াল—তখনি হল সর্ব্বনাশের বীজ বপন। ব্রাহ্মণের ছেলেই ব্রাহ্মণ হবে, আর শূদ্রের ছেলে চিরকালই শূদ্র থাকবে—এই ব্যবস্থা করেই আপনারা শুধু নিজেদের পায়েই কুড়ুল মারলেন না; জাতিটাকেও ডোবালেন। আজকে যদি আমরা সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই, তবে আর যাই করুন—আপনাদের ওপর অবিচার হচ্ছে বলে কাঁদবেন না। আপনারা যা করেছেন—তার প্রতিক্রিয়া এত সহজেই এড়িয়ে যাবেন—ভাববেন না।"

মিষ্টার নন্দী পুনরায় সিগারটা মুখে তুলিলেন। আমার সহস

কথা যোগাইল না। একটু ভাবিয়া বলিলাম—কিন্তু মিষ্টার নন্দী, প্রাচীন ভারতে অনেক নীচু জাতও কর্ম্মের দ্বারা ব্রাহ্মণ হয়েছেন দেখতে পাই। ব্যাসদেব জাবালি,—"

নন্দী হাসিলেন। বলিলেন—"ও সব পুরাণের কথা ছেড়ে দিন। ওর ঐতিহাসিকতা কোথায়?"

অতিশয় অপ্রস্তুত হইয়া গেলাম। কিন্তু পরাজয় স্বীকার করিতে বাধিল। ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলাম—"ঐতিহাসিক যুগেও হয়ত এমন দু একটা হয়েছে মনে পড়ছে না। তা ছাড়া আরও একটা বিষয়ও লক্ষ্য করবার যে ঐতিহাসিক যুগেও ভারতীয় ভাব-সাধনার মূর্ত্ত প্রতীক যাঁরা—উচ্চ বর্ণের মধ্যে তাঁদের আবির্ভাব যেমন দেখতে পাই—শঙ্কর, বুদ্ধ, মহাবীর, চৈতন্যদেব—"

কথাটা শেষ হইতে পাইল না। গণেশ বাধা দিয়া সবিদ্রূপে কহিল—"আপনি সুবিধামত ভুলে যাচ্ছেন দাদা, যে তথাকথিত নীচু জাতের ওপর ওঠবার সম্ভাবনা অঙ্কুরেই নষ্ট করা হত। যে রামচন্দ্র আদর্শ রাজা—তিনিও বেদপাঠের অপরাধে শূদ্রদের শিরশ্চেদ করেছিলেন!"

এতটুকু হইয়া গেলাম। ছিঃ, ছিঃ, সত্যইতো! আদর্শ পুত্র, আদর্শ ভ্রাতা, আদর্শ স্বামী, সর্ব্বোপরি আদর্শ প্রজারঞ্জক রাজা—রামচন্দ্র—তিনি গুহক চণ্ডালকে কোল দিয়াছিলেন,—শবরীর আমন্ত্রণ উপেক্ষা করেন নাই—তিনিই যখন এমন এমন কাণ্ড করিতে পারিয়াছেন—তখন—

নাঃ গণেশের কাছে হার স্বীকার করিতেই হইতেছে। আর কিছুই বলিবার মুখ রহিল না। মনটা বড়ই ছোট হইয়া গেল।

মিষ্টার নন্দী দাঁতে সিগার চাপিয়া সদয় কণ্ঠে কহিলেন—"যাকগে,

এসব কথা তুলে আপনার মনে আর কষ্ট দিতে চাইনে। বিশেষতঃ এই অবস্থায়। তারপরে, কি করবেন ঠিক করেচেন—বলুন। কোনো একটা দিক দিয়ে কিছু অর্থাগম হওয়া বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।"

নিজের দুর্দ্দশার কথা আবার মনে পড়িয়া গেল। হতাশ ভাবে বলিলাম—"দেখতেই তো পাচ্চেন ; কোনো দিকেই কিছু সুবিধা করে উঠতে পারছি না। অদৃষ্টে না থাকলে—।

নন্দী টেবিলের উপরে রেসিং গাইড, রেস টিপ্‌স্‌ প্রভৃতির পুস্তিকাগুলি দুই একবার নাড়াচাড়া করিয়া কহিলেন—"অদৃষ্ট অদৃষ্ট করচেন——Have you ever tried your luck? চলুন, কাল ভাইস্‌রয়েস্‌ কাপে ব্লুমফিল্ডের ওপর কিছু টাকা winএ ধরুন। অল্প কিছুই ধরবেন। It's a sure tip. ব্লুমফিল্ডের দিদিমা ১৯০৭এ ডার্ব্বি সুইপ নিয়েছিল। She is a pedigree mare,"

নির্জ্জন প্রসুপ্ত পল্লীপথে চলিতে চলিতে আবার মনে সংশয় ঘনাইয়া আসে। সমস্ত ভুলিয়া যাই। দধীচি, বাল্মীকি, বেদব্যাস, যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর, মনু, বশিষ্ঠের সহিত অন্ধকার ভেদ করিয়া পরবর্ত্তী যুগের বুদ্ধ, মহাবীর, কৌটিল্য, শঙ্কর, চৈতন্য, তুলসীদাস, কাশীরাম ভীড় করিয়া আসে।… আরও পরে, আধুনিক কালে, সাম্য স্বাধীনতার যুগে…রামমোহন, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ…ব্রাহ্মণ বঙ্কিম, ব্রাহ্মণ বিদ্যাসাগর, ভূদেব, রবীন্দ্রনাথ…

দূর হউক ছাই! কিছু অর্থাগমের উপায় না করিতে পারিলে আর চলিতেছে না। সপরিবারে অনশনে মরিতে হইবে। নাঃ, অদৃষ্টটা একবার যাচাই করিতেই হইবে। মায়ের রুলি দুগাছা বাঁধা দিয়া গোটা কুড়ি টাকা ব্লুম ফিল্ডের উপর ধরিবই। মিষ্টার নন্দীর ভুল হইবার কথা নয়। ঠিক টিপই দিয়াছেন। She is a pedigree mare!

শ্রী-কান্ত

২য় পর্ব্ব

১

সেদিন কচুরি-বাইএর চোখের জলে জীবনের যে অধ্যায়টি প
সমাপ্ত করিয়াছিলাম—আজ যে আবার তাহারই জের টানিয়া জী
কাঁথায় তালি লাগাইতে হইবে—একথা তখন ভাবি নাই। তা
লাগাইতে বসিয়া তাই আজ ভাবিতেছি, বার বার এই ছেঁড়া কাঁ
সবার সমুখে নাড়াচাড়া করিয়া কি লাভ হইয়াছে? ইহার দুর্গন্ধে ব
অপরের শ্বাস রুদ্ধ হইয়া থাকে তাহার জন্যই বা দায়ী কে? কিন্তু
প্রশ্ন যতই গুরুতর হোক এবং ইহার মীমাংসার ভার যাহারই উপর থা
আমার যে ইহা ব্যতীত আর উপায় ছিল না—সে কথা অন্য যে কে
ব্যক্তিকেই স্বীকার করিতে হইত যদি তিনি—তিনি না হইয়া আ
হইতেন। কিন্তু যাক সে কথা।

আজ মনে পড়ে জীবনটার মধ্যস্থলে যেন কে গুঁতা মারিয়া দুই ফা
করিয়া দিয়াছিল। ফাঁকের একদিকে ছিল আমার আহার বিহ
আমোদ প্রমোদ এবং আমি, অপরদিকে ছিল আমার আধি ব্যা
জরা মৃত্যু এবং কচুরি। অর্থাৎ আমার সুখের দিনে সে যেখানেই থা
যাহা ইচ্ছা করুক, আমার অবস্থা শোচনীয় হইলেও সে নাচের মুখ
ছাড়িয়া আপনিই ছুটিয়া আসিবে যমের পথ আগলাইতে—তা সে থ
পাক আর নাই পাক। জীবনটা একপ্রকার নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে কাটিতেছি
খাওয়া-শোওয়ার বাদ-বিচার ছিল না, বাড়াবাড়ি হইলেই মনে হ

আমার কচুরি আছে। তাই এখন ভাবি, হায় কচুরি! সেদিন তোমার বিগত যৌবনটার উপর এতখানি আস্থা না রাখিয়া যদি একেবারে সেই রাধামাধবের চির-যৌবন চতুষ্পদে আশ্রয় লইতাম, তবে আজ-কিন্তু যাক সে কথা।

কোথাও যেন আর ঘর-বার আপন-পর রহিল না। মনে হইল, ঐযে খেংরাপটীর বড় বড় কাপড়ের আড়ত—ওখানকার মাড়োয়ারী বণিকরা আমার প্রিয়তম, আর ট্রামরাস্তার দুইধারে যত বারান্দাওয়ালা বাড়ী—ওখানে যাহারা থাকে তাহারাও আমার প্রিয়তমা। যেখানে ইচ্ছা ঢুকিয়া পড়িতে পারি, কেহই গলা-ধাক্কা দিবে না, ঢুকিবামাত্র জামাই-আদর সুরু করিবে। ক্রমশ এককচুরি লক্ষকচুরির রূপে চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িবে। আমি যে প্রতি মুহূর্ত্তে খাইতেছি, শুইতেছি ও হাঁটিতেছি—দোতলার ছাদ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া ইহলীলা সাঙ্গ করিতেছি না—তাহাও ওই সংখ্যাতীত কচুরিগণের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া। তাই সেদিন তাহাদের ভাগ্য-পরীক্ষার উদ্দেশ্যে মেছোবাজার রাস্তার মোড়ে একপেট তেলে-ভাজা জিলিপী খাইয়া পথের ধারে অজ্ঞান হইয়া পড়িলাম এবং ক্যাম্বেল হাঁসপাতালে জ্ঞান হইবামাত্র পরিচর্য্যারত হরিজনটিকে কচুরিভ্রমে জড়াইয়া ধরিলাম।

হাঁসপাতাল হইতে বাহির হইয়া বুঝিলাম জিলিপীর সহিত আমার বুদ্ধি-সুদ্ধি সবই বাহির হইয়া গিয়াছে। শুধু এইটুকু মনে পড়ে যে বউবাজারের মোড় পর্য্যন্ত আসিয়া ক্লান্তিবশতঃ একটি সরবতের দোকানের সম্মুখে বরফের টবের উপর বসিয়া পড়িয়াছিলাম এবং মেরুদণ্ডের তলদেশ হইতে শীর্ষ অবধি একটি উর্দ্ধগামী শৈত্যের দুর্জ্জয় প্রকোপে মাথার সম্পূর্ণ ঘি-টা কুলপির মত জমিয়া গিয়াছিল। তাহার পর যে কি ঘটিয়াছিল তাহাও কিছুমাত্র স্মরণ নাই, তবে বোধকরি হঠাৎ

এক সময় বৈঠকখানা বাজারে বর্ম্মা-চালানী একপাল ভেড়ার খাঁচার মধ্যে কোনক্রমে ঢুকিয়া পড়িয়াছিলাম। কতদিন যাবৎ মা মা করিয়া কাতরকণ্ঠে তাহাকে ডাকিয়াছিলাম—তাহাও মনে পড়ে না। যখন চৈতন্য ফিরিয়া পাইলাম—দেখি সেই পিঁজরার মধ্যে জাহাজের ডেকের উপর তিনটি মেষ-শাবকের সহিত তাহাদের মাতার বাঁটে মুখ লাগাইয়া দুগ্ধ-পান করিতেছি,—জাহাজ তখন মাঝ-সমুদ্রে ভাসিতেছে। কতক্ষণ এইভাবে কাটিত বলা যায় না, কিন্তু মেষমাতা পিছনের পা-দু'টি আমার ললাটে ছুঁড়িয়া মারিতে অহল্যার পাষাণ-জন্ম ঘুচিল। স্তন্য-দায়িনীর পদধূলি মস্তকে বহন করিয়া যখন খাঁচার বাহিরে আসিলাম—তখন সন্ধ্যা আসন্ন। আকাশে মেঘের সমারোহ ঘোর হইয়া উঠিতেছে, সমুদ্র নিস্পন্দ নিশ্চল। প্রকৃতির থমথমে ভাব দেখিলে মনে হয় ঝড় উঠিল বলিয়া।

এ অবস্থায় কি করা উচিত দাঁড়াইয়া তাহাই ভাবিতেছি এমন সময় জাহাজের বাঁশী বাজিয়া উঠিল এবং একজন মোল্লা খালাসী দৌড়িয়া আসিয়া আমার গলদেশ ধারণ করিয়া কহিল—আরে কোর্ত্তা নীচে যাও, ছাইক্লোন হোতি পারে। মেষদুগ্ধ পান করিয়া আর মুখ মোছা হয় নাই, ঠোঁট দুইটা চট চট করিতেছিল। মোল্লাসাহেবের জামার আস্তিনে মুখটা মুছিয়া লইলাম, কিন্তু তাহাতেই বোধ করি অগ্নিতে ঘৃতাহুতি হইল। বিকট মুখ-ভঙ্গির সহিত এক ধাক্কা এবং একেবারে সিঁড়ির নীচে।

নিম্নে নিক্ষিপ্ত হইয়া যে বস্তুটির উপর পড়িলাম তাহা একটি রসগোল্লার হাঁড়ি, তৎক্ষণাৎ ফাটিয়া চতুর্দ্দিকে রস গড়াইয়া পড়িল। হাড়ির কাণাটা দক্ষিণ পদে আটকাইয়া গেল—তাহা ঝাড়িয়া ফেলিবার উদ্দেশ্যে পার্শ্বের কাপড়ের গাঁঠরি দুইবাহু দিয়া সবলে চাপিয়া ধরিলাম,

কিন্তু ধরিয়া বুঝিতে পারিলাম তাহা একটি স্থূলাঙ্গী স্ত্রীলোক—কাপড়ের গাঁঠ নহে। এদিকে রসগোল্লার হাঁড়ি কামড়াইয়া ধরিয়াছে, আশ্রয় ত্যাগ করিবারও উপায় নাই, অগত্যা স্ত্রীলোকটিকে কোনো উপায়ে ঠাণ্ডা করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম।

পার্শ্বের লোকটি তাহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিল—"টগর তোর নাগরটিকে নিয়ে একটু সরে দাঁড়া না ভাই, বড্ড ভ্যাড়ার গন্ধ উঠছে যে, একে ত তোর গন্ধেই ভূত পালায়;—একেবারে মাৎ করে দিলি যে।"

টগর বজ্রনির্ঘোষে ধমক দিয়া উঠিল; তাহাতে আমিও থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিলাম এবং হলফ করিয়া বলিতে পারি না, তখনই বস্ত্রে ভীতিজনিত কোনরূপ প্রক্রিয়া করিয়া ফেলিয়াছিলাম কি না। যাই হোক, শুনিতে পাইলাম আমার আশ্রয়দাত্রী ভয়াবহ স্বরে কহিতেছে—

"খবরদার নন্দ মিস্ত্রিরী, মুখ সামলে কথা কও বলছি। তুমি আমার সাতপাকের বর নয় যে ধম্‌কে কথা কইবে। ভদ্দরলোকের ছেলে বিপদে পড়ে ধরে ফেলেছে—তার হয়েছে কি শুনি? তুই সেদিন রাত্তিরবেলা শেয়ালের ডাক শুনে আমার বগলের মধ্যে ঢুকে পড়েছিলি কেন? তখন গন্ধ লাগেনি? এবার যদি গায়ের কাছে ঘেঁসেছে কোনদিন, লাথিমেরে মুখ ভোঁতা করে দেব। ছোটলোকের জন্ম কিনা!"

নন্দ মিস্ত্রীর পাল্টা জবাব আসিল—খবরদার শালী, বাপ তুলে কথা বলবি যদি তোরই একদিন কি আমারই একদিন।"

তাহার পর গজকচ্ছপের যুদ্ধ। আমি সর্ব্বক্ষণ গিরি-গোবর্দ্ধনের আড়ালে ব্রজবাসীর মত টগরের পশ্চাতে ঝুলিতে লাগিলাম এবং যে

সাইক্লোন আসিবার সম্ভাবনায় জাহাজসুদ্ধ লোক সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছে তাহারই একটি ছোটখাটো সংস্করণ আমার মাথার উপর বহিয়া যাইতেছে অনুভব করিলাম। একজন কাবুলিওয়ালা এতক্ষণ আমার জুতার নিষ্পিষ্ট রসগোল্লাগুলির সৎকার করিতেছিল, এই মহাসমরের রণবাদ্যে তাহার সীমান্ত-সৌর্য্য জাগিয়া উঠিল। টগর ও নন্দ যখন উভয়ে পরিশ্রান্ত এবং নন্দ পরাজিতপ্রায়, সীমান্তের মিত্র-শক্তি নন্দের পক্ষে যোগদান করিল। তাহার এক প্যাঁচেই টগর আমাকে পশ্চাতে লইয়া চিৎ হইয়া পড়িল—যথা ঘটোৎকচ কৌরব সমরে। এইবার ঠ্যালাটি বুঝিতে পারিলাম। দোতলা বাসের নীচে চাপা পড়িয়া ব্যাঙের কি অবস্থা হয় তাহা বোধ হয় অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন *; টগরাচ্ছন্ন মনপ্রাণ এইটুকু নিঃসন্দেহে বুঝিতেছিল যে—শেষ মুহূর্ত্ত উপস্থিত, ইষ্টনাম জপ করিবার সময় নাই। কিন্তু মিত্র-শক্তির বোধ হয় অনুকম্পা হইল, এতক্ষণ কালীঘাটের ছিন্ন-শির পাঁঠার ন্যায় আমার অসহায় পদদ্বয় টগরবপুর সানুপ্রান্তে নির্গত হইয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতেছিল, তাহারই একটি ধারণ করিয়া সে আমার চ্যাপ্টা দেহটিকে টানিয়া বাহির করিল এবং অবলীলাক্রমে সিঁড়ির পথে উর্দ্ধে নিক্ষেপ করিয়া দিল। ডেকের উপর কিছুক্ষণ মূঢ় অবস্থায় কাটিল। মনে হইল নিশ্চয় আমার নাড়িভুঁড়ি নির্গত হইয়া গিয়াছে, শত চেষ্টাতেও আর বাঁচিব না, কিন্তু পোড়া প্রাণ যদি এত সহজেই যাইত, বাংলার পাঠকসমাজ অনেক যন্ত্রণার হাত হইতে রেহাই পাইতেন। কিন্তু যাক্ সে কথা।

সমুদ্রের বাতাসে অর্দ্ধমৃত বৃশ্চিকের মত বাঁচিয়া উঠিলাম এবং

* আমরা প্রত্যক্ষ করি নাই। —শ. চি. স.

হামাগুড়ি দিয়া সেই খাঁচার উপর চাপিয়া বসিলাম। পাছে ঝড়ে উড়িয়া যাই এই ভয়ে কাছাটি খাঁচার হাতলে বেশ করিয়া বাঁধিয়া লইলাম এবং প্রতিমুহূর্ত্তে সাইক্লোন মহাপ্রভুর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। প্রভুকে পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই, শুনিয়াছিলাম তাঁহার কৃপায় জলচর খেচরে, খেচর জলচরে, এবং উভচর ত্রিচরে পরিণত হয়। অতএব আমিও যে শীঘ্রই এ তিন ভুবনের সৃষ্টি রহস্য ভেদ করিব তাহা নিঃসন্দেহে বুঝিলাম।

প্রভুর নাকি অনিষ্ট ঘটাইবার শক্তি অসীম। অতএব একবার দেখিতে বাসনা হইল। আমার এতগুলি বাঁকের উপর আর কতগুলি বাঁক তিনি ধরাইতে পারেন। আজ এই জাহাজ-ডুবির বিশ হাজার বছর পরে সমুদ্রাপসরণের ফলে যখন ডাঙায় উঠিব এবং কোন বিখ্যাত যাদুঘরের কাঠের ফ্রেমে বাঁধা হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিব, দেখিতে চাই তখনকার প্রাত্নতত্ত্বিকরা আমাকে কোন জন্তুর পর্য্যায়ে স্থান দেয়—অক্টোপাস, উটপক্ষী অথবা ওরাংওটাং। কাজেই বর্ত্তমানে খাঁচার উপর বসিয়া দৃঢ়রূপে কাছা ধরিয়া থাকা ব্যতীত উপায় ছিল না।

কিন্তু যাঁহার জন্য এত, অবশেষে তিনি আসিয়া পড়িলেন, আকাশ পাতাল বিদীর্ণ করিয়া তাঁহার আগমনীর ভয়ঙ্কর গর্জ্জন বাজিয়া উঠিল। ছেলেবেলায় সেই যে সাতশো রাক্ষসীর মৃত্যুযন্ত্রণায় চীৎকার করিতে করিতে ছুটিয়া আসার কথা শুনিয়াছিলাম—এই ঝড়ের গর্জ্জনের কাছে তাহা নিতান্ত মশার ভ্যান্ ভ্যান্ মনে হইল। টগরের চাপে প্রাণপাখী যখন ধুকিতেছিল তখনও দুর্গানাম জপ করি নাই, কাজেই এখন ত কোন কথা উঠিতেই পারে না। তাহার চেয়ে যে কয় মুহূর্ত্ত বাঁচিয়া আছি, জীবনের পেয়ালা পরিপূর্ণ করিয়া পান করাই শ্রেয়। মাথার উপর লক্ষ মাণিক জ্বালিয়া যে বিরাট দৈত্য ছুটিয়া

আসিতেছে এবং রূপকথার রাজকুমারীর মত এখনই যে আমাকে কোলে তুলিয়া ঘোড়া ছুটাইয়া দিবে, তাহাকেই নয়ন ভরিয়া দেখিতে লাগিলাম এবং রসসিক্ত জুতাটি খুলিয়া বাগবাজারের আস্বাদ গ্রহণ করিতে লাগিলাম। সেই সঙ্গে গুন্ গুন্ করিয়া কাফিসুরে একটি গানও ধরিলাম—

নাতনি, তোর জন্যে কেঁদে কেঁদে বাঁচিনে,—
নাতজামাই আসবে কতদিনে!

মাঝখানটায় মনে হইল আমরা ডুবিয়া গিয়াছি। কালো জলের ঢেউ আমার নিম্নদেশ স্পর্শ করিয়া বার বার আমাকে আদর করিয়া গেল। খাঁচার মধ্যে আমার বান্ধবগণ ভ্যা ভ্যা করিয়া ইহলীলা সাঙ্গ করিল, আমিই শুধু রহিয়া গেলাম তাহাদের জীবন সঙ্গীতের ধুয়া পুনরাবৃত্তি করিবার জন্য। আমার প্রিয়তম আমায় কোলে তুলিয়া ঘোড়া ছুটাইলেন না বটে, আমার মিষ্ট রসাকুল কণ্ঠতালুতে যে লবণজলের তিক্তপ্রয়োগ তিনি বার বার করিতে লাগিলেন—তাহাতে বড় অভিমান বোধ করিলাম। ইহা ত নিম্‌কি অথবা নোনতা বিস্কুট নহে, তবে মিষ্ট মুখের উপর এসব কেন? খাঁচাবদ্ধ কাছা ও তৎসহিত সম্পূর্ণ পরিধেয়টি প্রিয়ের কবলে ছাড়িয়া দিয়া, এক দৌড়ে ফাষ্টক্লাস ক্যাবিনের ল্যাভেটরির মধ্যে একটি কোণে ঝুপ করিয়া শুইয়া পড়িলাম।

২

সারারাত্রি পড়িয়া থাকিবার পর সকালে কিরূপে বাহিরে আসিব তাহাই ভাবিতেছি; এমন সময় একজন একচক্ষুমহিলা ল্যাভেটরির

দরজা ঠেলিয়া ভিতরে আসিলেন। বলা বাহুল্য, আমাকে তদবস্থায় দেখিয়া তিনি জিভ কাটিয়া অধোবদনে দাঁড়াইয়া রহিলেন। আমি লজ্জার মাথা খাইয়া বলিয়া ফেলিলাম—

"আপনার তবু সেমিজের উপর সাড়িটা আছে, আমাকে একটা দিয়ে দিতে পারেন, নচেৎ দু'জনেরই বিপদ।"

রমণীটি আমার দিকে পিছন ফিরিয়া কহিলেন—"তা নিতে পারেন, তবে আপনাকে একটু উপকার করতে হবে আমার।"

"কি ?"

"আমি নীচে থেকে আসছি, এখানে ডাক্তারবাবুর খোঁজে এসেছিলাম, অমনি মনে করলাম চানটা একেবারে সেরে যাই।" "তা, বেশত সেরে ফেলুন, আমি ততক্ষণ পাশ কাটিয়ে দাঁড়াচ্চি।" "না, আপনি বরঞ্চ আমার কাপড়টা পরে' নীচে চলে যান, রোহিণীদার কাছ থেকে আমার একখানা কাপড় চেয়ে নিয়ে আসুন, ওই কাছিগুলো যেখানে জমা করে' রেখেছে, তারই আড়ালে তিনি শুয়ে আছেন। বড্ড জ্বর, হুঁহুঁ কচ্চেন, গেলেই শুনতে পাবেন।"

মাত্র সেমিজটি লজ্জা-বস্ত্র রাখিয়া তিনি শাড়ীটা খুলিয়া দিলেন, আমি পশ্চাৎ হইতে তাহা টানিয়া লইয়া কোমরে জড়াইয়া লইলাম। বাহিরে আসিয়াই ডাক্তার-বাবুর সহিত দেখা। কহিলেন—'এক্স্‌কিউজ-মি স্যর, একজন মহিলা এইমাত্র বাথরুমে গেলেন না ?" "হাঁ, তিনি এখনও আছেন", বলিয়া আমি হাসিয়া প্রস্থান করিলাম। তিনি আমার পরনের লালপাড় শাড়ীর প্রতি হাঁ করিয়া তাকাইয়া রহিলেন। আমি রোহিণী-দার খোঁজে চলিলাম।

পরে জানিয়াছিলাম মেয়েটির নাম অভয়া। মানুষ বশ করিতে তাহার জোড়া নাই। কিইবা পরিচয়! সেই বাথরুমে কাপড় ছাড়া

এবং কাছির গাদার আড়ালে দুই একবার তাহার একচোখের একটুখানি হাসি। অথচ আমি একেবারে আস্ত গাধা বনিয়া গেলাম। যে কয়দিন জাহাজে ছিলাম, কয়বার খাইব, কতক্ষণ শুইব, কখন বাথরুমে যাইব—সব তাহার বাঁধাধরা নিয়মের মধ্যে। সেদিন শেষরাত্রে বিছানায় উঠিয়া বসিতে অভয়া তৎক্ষণাৎ মাথাটি ধরিয়া শোয়াইয়া দিল এবং কানের উপর হাত চাপড়াইয়া ঘুম পাড়াইয়া দিল। আর একদিন বাথরুমে যাইবার উদ্দেশ্যে জলের ঘটিটা হাতে করিয়াছি, অভয়া তখন খাইতেছিল—খাওয়া ছাড়িয়া উঠিয়া আসিল এবং আমার হাতের ঘটি কাড়িয়া লইয়া হাসিতে হাসিতে কহিল—

"বলেছি না, বিকেল চারটার সময়?"

অথচ তাহার সম্বন্ধে কিই বা জানিতাম! বর্মায় চলিয়াছে স্বামী খুঁজিবার জন্য। বিবাহের পর দিনই তাহার স্বামী তাহাকে ত্যাগ করিয়া রেঙ্গুন চলিয়া আসেন, আর খোঁজখবর করেন নাই। বাসরঘরে সে নাকি ঘুমের ঘোরে স্বামীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া কহিয়াছিল—"রোহিণীদা, আমার ব্লাউজটা খুলে দাওনা ভাই, বড্ড গরম লাগছে।" এই অপরাধ! ইহার জন্য যে ব্যক্তি স্ত্রীত্যাগ করিতে পারে, তাহার নিকট স্ত্রীত্ব দাবী করিয়া অভয়ার কি লাভ হইবে? সেদিন তাহার তারকাহীন বামচক্ষুটির প্রতি চাহিয়া সেই কথাই ভাবিতেছিলাম—রোহিনীদাকে বার্লি খাওয়াইয়া তাঁহার নাকের সিকনি ঝাড়িয়া দিতে তখন তাহার অপর চক্ষুটি ব্যাপৃত ছিল, কাজেই সে আমাকে দেখিতে পায় নাই।

জাহাজ হইতে নামিয়া প্রচণ্ড রৌদ্রে মনুষ্যবাসহীন সমুদ্রতীরে তপ্ত বালির উপর দাঁড়াইয়া যখন দেখিলাম—একপার্শ্বে এক ব্যাধিগ্রস্ত পুরুষ, অপর পার্শ্বে একজন একচক্ষু নারী, পার্শ্বে তাহাদের একগাদা

বোঁচকাবুঁচকি এবং এসব গন্তব্যস্থানে পৌঁছানের ভার আমারই উপর, তদুপরি এ সবের মূলে ঐ রমণীর একচোখের একটু হাসি, স্বতঃই প্রবৃত্তি হইল,—ছাতার প্রান্ত দিয়া উহার ঐ অবশিষ্ট চক্ষুটি শেষ করিয়া দিই, সব জ্বালা চুকিয়া যাক!—কিন্তু ঐ অর্দ্ধেক হাসির মধ্যে কি যে ছিল! কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই সে পোঁটলাপুঁটলিসমেত তাহার রোহিণীদা-কে আমার পৃষ্ঠে বাঁধিয়া দিল এবং সেই রৌদ্রের মধ্যদিয়া আমায় টানিয়া লইয়া চলিল।

চোখ ফাটিয়া জল আসিতে লাগিল, কহিলাম, "এত যখন করলে, গলায় চাট্টি-খানি ঘাস বেঁধে দিলেই পারতে এই ঠাণ্ডায় বেশ চিবুতে চিবুতে খাওয়া যেত!"

সে কিছুমাত্র অপ্রতিভ হইল না। পেটকাপড় হইতে একটু পাটালি ভাঙিয়া আমার মুখে দিল। কহিল—"জীবনে অনেক বোঝাইত বয়েছেন শ্রীকান্ত বাবু, কিন্তু এমন জীবন্ত বোঝা বইবার সুযোগ আর পাবেন না কখনো তা বলে রাখছি।"

একি নিষ্ঠুর পরিহাস। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় আমার কণ্ঠতালু ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইল। চোখের সমুখে তপ্ত বালিতে আগুন ধরিয়া গেল, চতুর্দ্দিকে শুধু ধোঁয়া আর ধোঁয়া। পৃষ্ঠের মোট লইয়া হঠাৎ এক সময় উপুড় হইয়া ভাঙিয়া পড়িলাম, মাটিতে মুখ দিয়া কহিলাম—হায় কচুরি,—আর আমি পারলাম না!

অভয়া আমার পিঠের বাঁধন খুলিয়া মুখের উপর ঝুঁকিয়া কহিল—

"বড্ড তেষ্টা পাচ্চে কি?

আমি ক্ষীণকণ্ঠে বলিলাম "হুঁ।"

—কিন্তু জল সে পাইবে কোথায়? অগত্যা রোহিণীদার পকেট হইতে মিকশ্চারের শিশিটা বাহির করিয়া সে তাহারই ফোঁটা কয়েক

আমার মুখে ঢালিয়া দিল। আমি চুক চুক করিয়া তাহা শুষিয়া লইয়া অভয়ার গলদেশ ধরিয়া কহিলাম—

"এবার তোমাদের পালা, তোমরা আমায় কাঁধে ক'রে নিয়ে চল।"

কিন্তু কেহই আমাদের মধ্যে উঠিয়া দাঁড়াইতে পারিল না। অগত্যা সেই ঠিক দুপুর বেলা তিন জনে পরস্পরকে জড়াইয়া ধরিয়া সেই শূন্য সমুদ্রতীরে পড়িয়া রহিলাম এবং এক একবার পরস্পর চিমটি কাটিয়া পরখ করিতে লাগিলাম—তিনজনেই বাঁচিয়া আছি কি না। কিন্তু এক যাত্রায় কখনো পৃথক ফল হয় না। যাক সে কথা।

(ক্রমশঃ)

শ্রীপূর্ণগ্রাস।

চৌকীদার হ'ল যবে গোবর্দ্ধন গোপ,
শালা তার সেই সূত্রে রাখিলেন গোঁফ !

ভ্রম-সংশোধন

বর্ত্তমান সংখ্যার ৭০৮ পৃষ্ঠায় ৬ষ্ঠ লাইনে "যে বইতে" স্থলে "যে বই" হইবে।

চলচ্চিত্র

ভারতের সামরিক জাতি

তফাৎ কেবল পোষাকে

বর্ষশেষ

হে কুমার হাস্যমুখে তোমার ধনুকে দাও টান

ঝনন ঝনন

সাত ভাই চম্পা

সাতের চোখে রবীন্দ্রনাথ
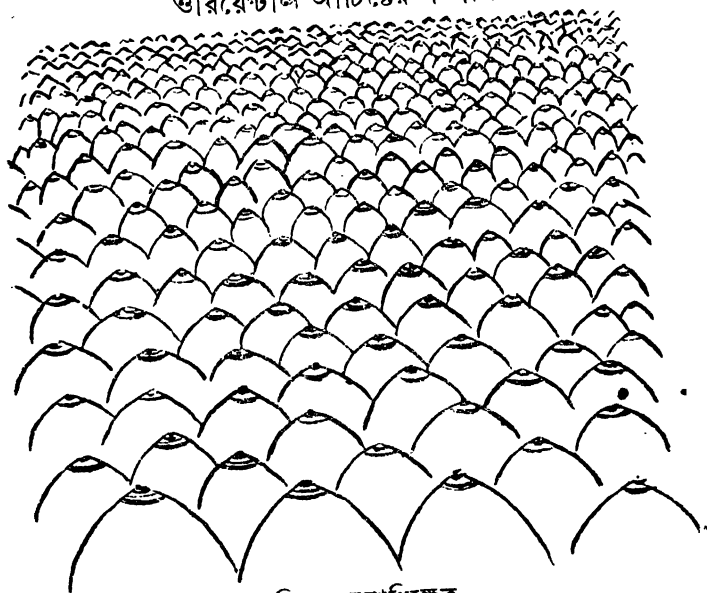
শিল্পের সমাধিক্ষেত্র

সংবাদ-সাহিত্য

গোঁড়ামী আমাদের মজ্জাগত। সুতরাং সমাজক্ষেত্রেই হউক বা মাসিকপত্রের ক্ষেত্রেই হউক একবার যে রীতি বা প্রথা চলিয়া গিয়াছে তাহাকে রদ করে এমন সাধ্য কাহারো পিতার নাই। কথাটা খুলিয়াই বলি। প্রবাসীর ৩৪ বৎসর শেষ হইল। এই চৌত্রিশ বৎসরে ৪০৮ মাসে প্রায় ৪০৮ সংখ্যা প্রবাসী বাহির হইয়াছে। প্রথম হইতে ধারাবাহিক ভাবে সমস্ত সংখ্যা দেখিবার সুযোগ হয় নাই, কিন্তু তবু অনুমান করি, উহাতে আজ পর্য্যন্ত যত স্তনের ছবি বাহির হইয়াছে তাহার সংখ্যা অন্তত দশ হাজার। কাহারো কৌতূহল হইলে গুনিয়া দেখিতে পারেন।

—

আশা করিয়াছিলাম বৈশাখ মাস হইতে প্রবাসী এ বিষয়ে অবহিত হইবেন। আশা করিয়াছিলাম বিংশ শতাব্দীর প্রায় মাঝামাঝি আসিয়া বাঙালী চিত্রকরগণ এইরূপ নানা ছুতানাতায়, কখনো বা সেন্টিমেণ্টাল নামের আড়ালে কখনো বা পৌরাণিক নামের আড়ালে নগ্ন স্ত্রীমূর্ত্তি আঁকা বন্ধ করিবেন। আশা করিয়াছিলাম বাংলার সর্ব্বপুরাতন শ্রেষ্ঠ মাসিকপত্রখানা এই সব চিত্রকর নামধারী বর্ব্বরদের ব্যর্থতার বোঝা আর বহন করিবেন না, কিন্তু সে আশা পূর্ণ হইল না। চৈত্রের শনিবারের চিঠি বাহির হইবার মুহূর্ত্তে বৈশাখের প্রবাসী আসিয়া পড়িল—খুলিয়া যাহা দেখিলাম তাহাতে স্তম্ভিত হইয়াছি।

—

জানি, স্তন বাদ দিয়া স্ত্রীলোকের ছবি কেহ আঁকিতে পারে না অথবা বাদ দিলেই যে তাহা ছবি হয় তাহাও নহে—কিন্তু ইহাও জানি যে ছবি আঁকা না গেলেও স্তন এবং নিতম্ব সকলেই আঁকিতে পারে। কারণ উহা আঁকিতে শিল্পী হইবার প্রয়োজন হয় না, একটু কৌশলী হইলেই হয়। অর্থাৎ হাত যদি একেবারেই না চলে তাহা হইলেও ক্ষতি নাই, কম্পাস ঘুরাইলেই মিমিটে তিন চারি জোড়া স্তন এবং এক জোড়া নিতম্ব আঁকা যাইতে পারে।

—

প্রবাসী ৩৪ বৎসর ধরিয়া এই ফাঁকির হাতে পড়িয়া রহিয়াছেন। "ওরিয়েন্টাল" আর্ট নামক ধাপ্পাবাজির (শতকরা ৯০ ধাপ্পাবাজী) আশ্রয়ে বহু কৌশলী আসিয়া তথায় ভীড় করিয়াছে। আর্টের সঙ্গে যেদিন "ওরিয়েন্টাল" বিশেষণ যুক্ত হইল সেই দিন হইতে আমরা কেবল ওরিয়েন্টাল স্তনই দেখিতেছি, আর কিছু বড় একটা দেখিতেছি না। স্তনরূপই যদি ওরিয়েন্টাল আর্টের একমাত্র রূপ হয় তাহা হইলে ইহার আর্ট নাম ঘুচাইয়া দেওয়া আবশ্যক।

—

স্তন-কলা ওস্তাদগণ কিছুতেই তৃপ্তি পাইতেছে না। এই 'কলা' নানা নামে প্রকাশিত হইতেছে। নাম না থাকিলে ইহার কোনো মূল্যই নাই, ওস্তাদেরা তাহা জানে। বৈশাখের প্রবাসীতে "লঙ্কাদহন কালে" এই নামের আশ্রয়ে এবারে শুধু স্তন নহে অধস্তন অংশও অঙ্কিত হইয়াছে। লঙ্কা দহন বাজে কথা। চারিদিকে যাহা দেখা যাইতেছে তাহা মেঘও হইতে পারে আগুনও হইতে পারে, জলও হইতে পারে। কিছু যায় আসে না। স্তন থাকিলেই আমরা ধন্য।

—

ইহার চেয়ে ফোটোগ্রাফ অনেক ভদ্র। কেননা তাহাতে যাহা যথার্থ তাহাই থাকে, এরূপ বাড়াবাড়ি থাকে না। পপুলার হওয়াই যদি প্রবাসীর একমাত্র উদ্দেশ্য হয় তাহা হইলে এই "স্তন-কলা" ত্যাগ করিয়া ফোটোগ্রাফ ছাপিতে থাকুন, এবং সিনেমার কৃপায় তাহার অভাবও হইবে না।

—

তবে এই চৌত্রিশ বৎসরের মধ্যে প্রবাসী একটি মাত্র ছবির জন্য প্রশংসা পাইতে পারেন। চৈত্র সংখ্যায় "নীল বালিকা" নামক একটি ছবি আছে। আমরা আনন্দের সঙ্গে সকলকে জানাইতেছি যে বালিকাটি যথার্থই নীল। এই ধরনের ছবিতে চিত্র-পরিচয় দিতে হয় না, কাহাকেও কোনো কৈফিয়ৎ দিতে হয় না, সব দিকেই সুবিধা।

—

রবীন্দ্রনাথ "সে-কালিনী"র উত্তর দিতে গিয়া derailed হইয়া পড়িয়াছেন। কবির পয়েণ্টস্‌ম্যান কি একেবারেই বিদায় লইয়াছে?

> একটু সবুর কর আরো কিছু বলে যাই
> কথার চরম পারে তারপরে চলে যাই।
> যে গিয়েছে তার লাগি খুঁচিয়োনা চেতনা
> ছায়ারে অতিথি ক'রে আসনটা পেত না।

* * *

একটা কিছু বলিতে গিয়া অন্য আর একটা কিছু বলিবার প্রবৃত্তি বয়সের সঙ্গে বাড়িবে, কেহই রোধ করিতে পারিবে না; কিন্তু অনাবৃষ্টি এবং অতিবর্ষণের মধ্যে একটু সামঞ্জস্যও কি আমরা আশা করিতে পারি না?

—

বাংলাদেশের মহিলা-কবিদের মধ্যে বর্ত্তমানে শ্রীযুক্তা রাধারাণী দেবী শ্রেষ্ঠ ইহাই আমাদের মত। কিন্তু শুধু একথা বলিলে বিশেষ কিছুই বলা হয় না, কেননা তুলনা করিবার মত আর কাহাকেও ত দেখি না। তাঁহার ভ্রষ্টলগ্ন পড়িলাম। সমবেদনা অনুভব করিতেছি, বস্তুত ইহা ছাড়া আর কি করিতে পারি?

তোমার আমার যাত্রা এক লক্ষ্যে আজি আর নহে,
—ভিন্ন মুখে চলেছি উভয়ে!
চলে বিপরীত মুখে দুইখানি জীবনের রথ,
—নির্ব্বাচিয়া নিজ নিজ পথ!
তবুও বিশুষ্ক আঁখি আজো মোর ভরে আসে জলে
একদা চেয়েছি যারে তারেই ফিরাতে হ'ল বলে'।
দুর্লভ বল্লভ মম দ্বারে এল অকিঞ্চন-বেশে,—
আমার প্রেমের মৃত্যু শেষে।

আমাদের নরেনদা কিন্তু অনেকদিন কবিতা লেখেন না।

—

ইংরেজিতে একটি গল্প আছে—

পিতা ও পুত্র ভোজ খাইতেছিলেন। হঠাৎ তাঁহার পুত্রের প্রতি কর্ত্তব্যবোধ জাগিয়া উঠিল। তিনি মনে করিলেন তাহাকে কিঞ্চিৎ সতর্ক করিয়া দেওয়া আবশ্যক। পিতা বলিলেন—প্রিয় পুত্র, ঐ যে দুটো মোমবাতি দেখছ—ঐ দুটোকে যখন চারটে মনে হবে তখন উঠে বাড়ি যেয়ো।

পুত্র বলিল, ধন্যবাদ পিতা, কিন্তু মোমবাতি দুটো নয় ওখানে একটা রয়েছে—সুতরাং আপনি যখন ইতিমধ্যেই

একটাকে দুটো দেখছেন—আপনারাই কি এখন উঠে বাড়ি যাওয়া উচিত নয়?

এইরূপ একটাকে দুইটা দেখা বা দুইটাকে চারিটা বলিয়া ভুল করার গল্প এদেশেও আছে। অনেকেই জানেন, জনৈক ফুটবল খেলোয়াড় খেলিবার সময় দুইটি বল দেখিতে পাইত এবং বিভ্রান্ত হইয়া কোনটা মারবো, কোনটা মারবো, করিয়া চীৎকার করিত।

—

বৈষ্ণবীয় শাক্ত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তিনজন চণ্ডীদাস দেখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আমাদের অনুরোধ, তিনি যেন এখন হইতে চণ্ডীদাসের সংখ্যা অযথা না বাড়াইয়া নিজের চক্ষু সম্বন্ধে অবহিত হন।

—

বাহিরে বৃদ্ধ হইলেও অনেকে অন্তরে তরুণ থাকিতে পারেন, অনেক বৃদ্ধের নিকট হইতে আমরা এইরূপ শুনিয়াছি। কিন্তু কোনো কোনো প্রবীণ যে অন্তরে এবং বাহিরে উভয় দিকেই "তরুণ" সাজিবার জন্য লালায়িত ইহা জানিয়া আনন্দিত হইলাম। তারুণ্যের লক্ষণ কি তাহা পূর্ব্বে বহুবার আলোচিত হইয়াছে সুতরাং এখানে আমরা উহার একটিমাত্র রূপ দেখাইয়া নিবৃত্ত হইব। একটি গল্পের অংশ (বঙ্গশ্রী)—

আদীশ্বর কহিল—এ আপনাদের কিসের দল বেরিয়েছে?

এখনো চড়কের দেরী আছে। আজ সবে ৫ই চোৎ।

তারুণ্যাক্রান্ত না হইলে এরূপ লেখা যায়? নর্ম্মাল মানুষ কখনো "ত" হইতে "ৎ"-তে নামিতে পারে? পুত্র পুৎ, রাত্রি রাৎ, বেত্র বেৎ হয়? না হইলে চৈত্র চোৎ হইল কেমন করিয়া? কিন্তু যাহাই হউক একটি বিষয়ে লেখকের সংযমের পরিচয় পাইলাম। লেখক "জাৎ"-তরুণ

হইলে তাঁহার হাতে "ওই. চোৎ" সংক্ষিপ্ত হইয়া "পাক্বোৎ" রূপ ধারণ করিত এবং সেক্ষেত্রে ভাষার উপর অত্যাচার আরো স্পষ্ট হইয়া উঠিত। লেখক তাহা করেন নাই।

—

শ্রীকাঞ্চনমালা দেবী কোন শতকের লোক জানি না। তিনি বঙ্গশ্রীতে যাহা লিখিয়াছেন তাহা কল্পনা করিয়া আমরা মুহুর্মুহু শিহরিয়া উঠিতেছি। তাঁহার পিতামহী কি রাক্ষসবংশীয়া ছিলেন? শ্রীযুক্তা কাঞ্চনমালা লিখিতেছেন—

> আমার পিতামহী তখন জীবিতা ছিলেন। আমার মাথার রক্তমাখা পটী দেখিয়া তিনি "হাউ মাউ খাউ" করিয়া উঠিলেন। মা আসিয়া খানিক্ষণ "থ" হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন; তারপর কোনো কথা না বলিয়া গুম্ গুম্ শব্দে আমার পৃষ্ঠে কিল বৃষ্টি করিতে লাগিলেন। ঠাকুর মা আবার "হাউ মাউ খাউ" করিয়া উঠিলেন।

আশা করি এই ঠাকুর-মা সত্য সত্যই রক্তপান করেন নাই!

—

সংবাদপত্রের একটা কর্ত্তব্য এই যে সে কোনো কারণেই দেশের ক্ষতি করিবে না, বরঞ্চ দেশের যাহাতে উপকার হয় তাহাই করিবে। কিন্তু বিশ্বস্তসূত্রে জানিতে পারিলাম, কিছুদিন হইল সংবাদ পত্রে দেশের ক্ষতিই হইতেছে। আমরা কয়েকখানা চিঠি পাইয়াছি, তাহাতে লেখকগণ এই অভিযোগ করিয়াছেন যে, যেহেতু মেয়র-মামলা, ভাওয়াল সন্ন্যাসী মামলা ও অন্যান্য চিত্তাকর্ষক মামলার খবর দৈনিক কাগজ সমূহে প্রতিদিন একই তারিখে এক সঙ্গে প্রকাশিত হইতেছে, এবং

প্রত্যেকটি সংবাদের কিস্তীই অত্যন্ত দীর্ঘ এবং অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হইতেছে; এবং যেহেতু, যাঁহারা স্নানাহার সমাধা করিয়া সাড়ে নয়টায় অফিসে ছোটেন তাঁহাদের পক্ষে এখন আর সময়মত অফিসে যাওয়া ঘটিতেছে না, সেই হেতু তাঁহারা মনে করেন, সংবাদপত্রসমূহ যদি অধিকসংখ্যক মনোহারী সংবাদের সুদীর্ঘ কিস্তিগুলি একই দিনে ছাপাইবার নীতি ত্যাগ না করেন তাহা হইলে তাঁহাদের চাকুরি যাইবে, তাঁহারা পুনরায় নূতন চাকুরি জুটাইতে পারিবেন না এবং তাহাতে দেশের অসন্তোষ বৃদ্ধি পাইবে।

—

আমাদের মনে হয় এইরূপ সংবাদের কপিরাইট বিক্রয়ের ব্যবস্থা হওয়া উচিত। কপিরাইট নিলামে বিক্রয় হইবে—এবং যিনি কিনিবেন তিনি নিজের কাগজে সংক্ষিপ্ত কিস্তিতে দীর্ঘকাল ধরিয়া তাহা প্রকাশ করিবেন। এরূপ করিলে কাগজের যে লাভ হইবে তাহা বলাই বাহুল্য কিন্তু ঐ সঙ্গে দেশেরও উপকার হইবে।

—

হর্ষ এবং বিষাদের সংমিশ্রণে দুর্য্যোধনের মৃত্যু হইয়াছিল কেন তাহার কারণ নির্ণয় করা সহজ নহে। হৃৎপিণ্ড দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে, যে কোনো উত্তেজনাতেই—(শুধু হর্ষে বা শুধু বিষাদেও) মৃত্যু হইতে পারে। কিন্তু হৃৎপিণ্ডের অবস্থা যদি ভাল থাকে তাহা হইলে হর্ষ এবং বিষাদ—neutralised হইয়া যাইবে—দেহের উপর কোনোই ক্রিয়া প্রকাশ করিবে না। সম্প্রতি আমাদেরও একটি ব্যাপারে যুগপৎ হর্ষ এবং বিষাদ উপস্থিত হইয়াছে কিন্তু মৃত্যু হয় নাই। এবং হয় নাই বলিয়াই গবেষণা করিবার প্রবৃত্তি হইল।

—

১২ই এপ্রিলের অমৃত বাজার পত্রিকায় লেখা হইয়াছে—

> We have every sympathy for the movement which has set on foot in Calcutta to purify the moral atmosphere of the c ountry by discouraging the publication of obscene literature and the exi-bition of immoral films.

কিন্তু অমৃতবাজার পত্রিকায় যে বিজ্ঞাপনগুলি প্রতিদিন বাহির হয় পত্রিকার সম্পাদকীয়-লেখক তাহা পাঠ করেন কি ?

—

Ultra voilet ray কি বাংলায় "পিঙ্গলোত্তর" ? এই পরিভাষা কে করিয়াছেন জানিনা। পৃথিবী কখন কাহার চোখে কিরূপ বর্ণ ধারণ করে তাহাও আমরা বুঝিনা—কিন্তু বর্ণান্ধের সংখ্যা যে ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে এবিষয়ে সন্দেহ নাই। কিংবা, হয়ত আমাদেরই ভুল। কোনো কোনো দেশে হয়ত পিঙ্গলবর্ণের বেগুনই ফলিয়া থাকে।

—

বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম উদয়ন সম্পাদক শ্রীযুক্ত অনিল দে মহাশয় কৃতিত্বের সহিত দুই বৎসর উদয়ন পরিচালনা করায় একটি সোনার মেডাল পাইয়াছেন। উক্ত মেডাল কে দিয়াছে তাহা আমরা জানি না। কিন্তু যিনিই দিয়া থাকুন, তাঁহাকেও সৎসাহসের জন্য একটি মেডাল দেওয়া আবশ্যক। পৃথিবীতে অন্য কোনো দেশের অন্য কোনো সম্পাদক পত্রিকা-সম্পাদনা করিয়া আজ পর্য্যন্ত কোনো মেডাল পাইয়াছেন কিনা তাহা জানিনা, বোধ হয় পান নাই, কেননা মেডাল পাওয়া বিশেষ শক্ত না হইলেও এই শঠতাপূর্ণ পৃথিবীতে মেডাল দিবার

লোক খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আমরা পরস্পর শুনিতে পাইলাম অনিলবাবু উদয়নের তৃতীয় বর্ষে একটি 'কাপ্' এবং চতুর্থ বর্ষে একটি 'শীল্ড' পুরস্কার পাইবেন।

—

আনন্দবাজারে একটি সংবাদ বাহির হইয়াছে—জনৈক বাঙালী পদব্রজে চন্দননগর গিয়াছেন। আমরা জানি প্রতিদিন সহস্র সহস্র বাঙালী পদব্রজে গৃহ হইতে গৃহান্তরে গলি হইতে গল্যান্তরে অথবা পাড়া হইতে পাড়ান্তরে গিয়া থাকেন কিন্তু হায়, তাহাদের প্রতি আনন্দবাজারের কোনো দরদ নাই!

—

স্যর রাজেন্দ্রনাথের জন্ম-বর্ষ নির্দ্দেশক, প্রত্যহ-স্মরণীয়, শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয় চৈত্রের বঙ্গলক্ষ্মীতে ("মহিলা সমাচার" প্রবন্ধে) "বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি বিতরণে মহিলা" নামক অধ্যায়ে বেলা দেবী, কল্যাণী চক্রবর্ত্তী, লাবণ্যলতা সেন প্রভৃতি নামের সঙ্গে শ্রীযুক্ত সুভদ্রা খাঁএর নাম জুড়িয়া দিয়াছেন। আমরা ইহার কারণ বুঝিতে পারিতেছি না। প্রফেসরের গোঁফ লাগাইয়া ছাত্র সাজার কথা শুনিতেছি, কিন্তু হঠাৎ একজন পুরুষের মেয়েদের দলে নাম লিখাইবার বাসনা হইল কেন? না ইহা ঘোষ মহাশয়ের মৌলিকত্ব?

—

"টলটল" "টলমল" প্রভৃতি শব্দগুলি লইয়া বাঙালী লেখক বড়ই মুস্কিলে পড়িয়াছেন। প্রেমেন্দ্র মিত্র "টলমল করিয়া চলেন"। পাথেয় নামক সাপ্তাহিকে দেখিতেছি—

> তাই কদিন ধ'রে দুই পক্ষের সংযুক্ত অধিবেশন হলেও
> মিটমাট 'হইলে হইতে পারে' অবস্থায় টল্‌টল্ করছে।

টীকা নিষ্প্রয়োজন।

—

প্রবন্ধের মধ্যে বিজ্ঞাপন

সাধারণের পাঠ্য সাময়িকপত্রে বা সংবাদপত্রে কোনো চিকিৎসা-ব্যবসায়ী চিকিৎসাবিজ্ঞান সম্বন্ধে জনসাধারণকে ডাক্তার বানাইবার উদ্দেশ্যে কোনোরূপ প্রবন্ধাদি লিখিবেন না, অন্ততঃ ঔষধের গুণাগুণ সম্বন্ধে কোনো কথাই লিখিবেন না,—চিকিৎসা-জগতে এই নিয়ম বহুকাল হইতে প্রচলিত আছে। এ পর্য্যন্ত এই নিয়মের বড় কেহ ব্যতিক্রম করেন নাই; যাঁহারা রোগাদি সম্বন্ধে কিছু লিখিয়াছেন তাঁহারা সাধারণের যাহা জ্ঞাতব্য তাহাই সাধারণভাবে লিখিয়াছেন। কিন্তু সম্প্রতি দেখা যাইতেছে যে কয়েকটি ঔষধ সম্বন্ধে এবং বিশেষ করিয়া 'সিরোলিন রচি'র যক্ষ্মারোগ আরোগ্যের অদ্ভুত ক্ষমতা সম্বন্ধে কয়েকজন চিকিৎসক সাধারণ পত্রিকায় মুক্তপ্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। যদি তাহাতে সত্যকথা লেখা থাকিত তবুও তাহা অব্যবসায়ীর কাজ বলিয়া বিবেচিত হইত, কিন্তু তাহাও নহে,—যাহা কিছু লেখা হইতেছে তাহা অবিমিশ্র মিথ্যা। ঔষধবিক্রেতারা যে সকল বিজ্ঞাপন প্রকাশিত করে তাহাতে কেবল সত্য কথাই অতি-রঞ্জিত করিয়া লেখে। কিন্তু এই সকল প্রবন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা সত্যের একেবারে বিপরীত কথা,—যাহাকে ইংরেজীতে বলে "misrepresentation and misstatement of facts."। এ পর্য্যন্ত ইহার কেহ প্রতিবাদ পর্য্যন্ত করেন নাই, কিন্তু সম্প্রতি দেখা যাইতেছে যে আপনারা জনসাধারণের পক্ষ হইতে ইহার প্রথম প্রতিবাদ বাহির করিয়াছেন, এবং একজন কৃতবিদ্য চিকিৎসকও আপনাদের কাগজেই তাহা সমর্থন করিয়াছেন। যাহাতে জনসাধারণের ভ্রান্ত

ধারণা দূর করা যাইতে পারে সেজন্য সাধারণ পত্রিকার মারফতেই সত্য প্রকাশিত করা ছাড়া অন্য উপায় নাই, সেজন্য চিকিৎসক হইয়াও আপনাদের পত্রিকাতে ইহা লিখিতে বাধ্য হইলাম।

ঐ সকল প্রবন্ধের দ্বারা জনসাধারণের কিরূপ অনিষ্ট করা হইয়াছে তাহা দেখুন। সম্প্রতি একটি যক্ষ্মারোগী আমার নিকট চিকিৎসিত হইতে আসিয়াছিল। আমি তাঁহার জন্য নানাবিধ ব্যবস্থা করিবার পর তাঁহার আত্মীয় আমাকে আড়ালে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—ইহা তো টি-বি? তবে আপনি আজকালকার নূতন আবিষ্কৃত ঔষধ দিতেছেন না কেন? আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—কি নূতন ঔষধ? তিনি বলিলেন,—কেন সিরোলিন রচি! আজকাল সকলেই এ-কথা জানে আর আপনি জানেন না? টি-বি স্যানিটেরিয়মে ঐ-ঔষধ ছাড়া আর কোনো ঔষধই আজকাল দেওয়া হয় না তাহা কি আপনি পড়েন নাই? আমরা সাধারণ কাগজে পর্য্যন্ত এ কথা দেখিতেছি, আর আপনারা এখনও সেই সেকেলে চিকিৎসা চালাইতেছেন? আমি তাঁহার কথায় অবাক হইয়া গেলাম। তাঁহাকে বলিলাম কি কি কাগজে তিনি উহা পড়িয়াছেন জানিতে পারিলে আমি উপকৃত হইব। তিনি তৎপর দিন এক তাড়া কাগজ আনিয়া হাজির করিলেন,—দেখিলাম সকল কাগজেই—ইহা প্রবন্ধাকারে লেখা এবং তাহার অধিকাংশই পাস করা চিকিৎসকের নামে লেখা। ইহা যে মিথ্যা কথা তাহা তাঁহাকে বোঝানো আমার পক্ষে অতিশয় কঠিন হইয়া দাঁড়াইল।

'সিরোলিন রচি' বস্তুটি কি জানেন? পূর্ব্বে যাহার নাম ছিল 'সিরাপ থিয়োকল' তাহারই বর্ত্তমান নাম ঐ রাখা হইয়াছে। ইহা নূতন জিনিষ নয়। থিয়োকলের সহিত সিরাপ মিশাইয়া ইহা মুখরোচক করিয়া প্রস্তুত করা হয়। এই থিয়োকল পূর্ব্বে অনেকেই যক্ষ্মা রোগে

ব্যবহার করিতেন, আজকাল বড় কেহ করেন না। পূর্ব্বে চিকিৎসকগণের ধারণা ছিল যে কোনোরূপ তেজী এণ্টিসেপ্টিক্ প্রয়োগ করিতে পারিলে টি-বি মরিয়া যাইবে। সেই জন্যই প্রথমে কার্ব্বলিক হইতে প্রস্তুত ক্রিয়োজোট নামক ঔষধ ব্যবহৃত হইতে লাগিল। পরে উহা অতি দুর্গন্ধ বলিয়া তাহা হইতে 'গুয়েকল' ও পরে উহা হইতে 'থিয়োকল' (ডাক্তারী নাম Potas. guaiacol sulphonate) প্রস্তুত হইল। কিন্তু শীঘ্রই সকলে বুঝিলেন যে ওই সকল ক্ষীণ প্রচেষ্টা কিছু কাজের নয়, টি-বি মারিতে যে পরিমাণ এণ্টিসেপ্টিক আবশ্যক তাহাতে রোগী পর্য্যন্ত মারা যাইবে। সেইজন্য এণ্টিসেপ্টিক চিকিৎসা বর্ত্তমানে একরূপ বর্জ্জিতই হইয়াছে। পরে আরো জানা গিয়াছে যে থিয়োকল খাইলে কিছুই ফল হয় না, উহা যে অবস্থায় খাওয়া যায় ঠিক সেই অবস্থাতেই উহা অবিকৃত ভাবে শরীর হইতে বাহির হইয়া যায়, উহার কিছুই হজম হয় না।

এই obsolete থিয়োকলের সিরাপের নামই 'সিরোলিন রচি'। কোনো চিকিৎসককে যক্ষ্মা রোগে সিরোলিন রচি দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে দেখি নাই। কোনো স্যানিটেরিয়মের রিপোর্টে ইহার উল্লেখ দেখি নাই। ইহা সুইজারল্যাণ্ডে প্রস্তুত বলিয়া হয়তো সেই দেশের স্যানিটেরিয়মে দেশপ্রীতির জন্য কেহ কেহ উহা ব্যবহার করিয়া থাকিতে পারেন তাহা আমাদের জানা নাই। কিন্তু পৃথিবীর অন্য কোনো স্যানিটারিয়মে উহা ব্যবহৃত হইতেছে এ কথা শুনি নাই। উহা খাইতে সুস্বাদু বটে, মিকশ্চার মিষ্ট করিবার জন্য কোনো কোনো চিকিৎসক মধ্যে মধ্যে ইহা ব্যবহার করিয়া থাকেন এ-কথাও সত্য বটে, সর্দ্দি কাশি ও নিউমোনিয়া প্রভৃতিতে অন্যান্য পাঁচটা ঔষধের সহিত ইহা দিলে কোনো ক্ষতি

নাই সে কথাও সত্য বটে, কোনো কোনো পেটের পীড়ায় ইহাতে উপকার হয় বটে, কিন্তু ইহা যে যক্ষ্মার জ্বর বন্ধ করিতে পারে, বা শরীরের ওজন বাড়াইতে পারে, বা রোগের অন্যান্য উপসর্গ দূর করিতে পারে এ কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়।

যে সকল ডাক্তার ঐ ভুল কথাগুলি লিখিয়াছেন, তাঁহাদের খুবই অন্যায় হইলেও সমস্ত দোষ কেবল তাঁহাদের নয়। তাঁহারা স্বপ্রবৃত্ত হইয়া কখনই এ সকল কথা লেখেন নাই, হয়তো রচি কোম্পানির প্রতিনিধির আজ্ঞায় ঐরূপ লিখিতে বাধ্য হইয়াছেন। তাঁহারা উক্ত কোম্পানির নিকট হয়তো কোনো না কোনো প্রকারে বিত্ত অর্জ্জন করিয়া থাকেন এবং প্রভু যখন কিছু করিতে আদেশ করেন তখন তাহা অন্যায় হইলেও না করিলে অন্ন সংস্থান হয় না। কাগজওয়ালারাও যে ইহার জন্য খুব বেশী দোষী এ কথা বলা যায় না, কারণ কোম্পানি লোভ দেখান যে বিজ্ঞাপন হিসাবে ছাপিলে যাহা প্রাপ্য হইবে প্রবন্ধ হিসাবে ছাপিলে তাহার চতুর্গুণ-প্রাপ্য হইবে। * কাগজওয়ালারা ভাবে, রোগের ঔষধ তো বটে, খাইলে কিছু না কিছু উপকার তো হয়ই, যা লেখে তাই ছাপাইয়া দিই। আমি জনৈক কাগজওয়ালার মুখে স্বকর্ণে শুনিয়াছি যে রচি কোম্পানি এইরূপ প্রস্তাব করিয়া থাকে :- কোম্পানির প্রতিনিধির একজন টাইপিষ্ট আছে, কোনো কাগজওয়ালা বিজ্ঞাপন লইতে গেলেই তাহাকে সাহেব জিজ্ঞাসা করে এই কাগজ কেমন কাটে জানো? সে যেমন উত্তর দেয় সেই অনুসারে সাহেব নিজেই বিজ্ঞাপনের মূল্য ধার্য্য করিয়া দিয়া বলে বিজ্ঞাপন

---

* শুনিয়াছি অনেক ক্ষেত্রে ইহা সত্য নহে, বিজ্ঞাপনের সাধারণ দরেই প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। শ. চি. স

হইলে ৩৲ টাকা, প্রবন্ধ হইলে ১২৲ টাকা, কোনটিতে রাজী আছ বল? অন্যান্য কোম্পানি নিজেদের ঔষধ লইয়া কেবল ডাক্তারদের কাছেই ক্যান্‌ভাস্ করিতে যায় কিন্তু ইহারা তাহাও যায় না, কারণ ইহারা জানিয়াছে ডাক্তারদের দ্বারা ইহার তেমন কাটতি হইবে না। এমন কথাও নাকি তাহারা বলে—"If we can capture the public we do not care for the doctors"। এই না কি তাহাদের পলিসি।

সিরোলিন রচির বাজারে খুব কাটতি হইতেছে এ কথা সত্য; কিন্তু এ কাটতি কত দিন চলিবে? লোকে অধিক দিন প্রতারিত হইয়া থাকে না,—শীঘ্রই ভুল ভাঙিয়া যায়। সিরোলিন খাইলেই যক্ষ্মা হইতে রক্ষা পাইবে এ কথা বলার মত পাপ আর নাই। ইহাতে মিথ্যা আশ্বাস দিয়া রোগীকে মৃত্যুর পথে অগ্রসর করিয়া দেওয়া হয়। অন্য দেশ হইলে রোচি কোম্পানির এ কথা প্রচার করিতে সাহস হইত না, এবং নিজের দেশেও তাহারা সাধারণ পত্রে এরূপ প্রবন্ধ লিখাইতে হয়ত সাহস করে না, কেননা তাহারা জানে যে এরূপ করিলে তৎক্ষণাৎ দণ্ডিত হইতে হইবে। সম্প্রতি কোনো জার্ম্মান কোম্পানি আমেরিকাতে এস্‌পিরিন সম্বন্ধে সাধারণ স্থানে এই বিজ্ঞাপন দিয়াছিল—"ইহাতে সকল রকমের ব্যথা আরোগ্য হয়" কথাটা একেবারে মিথ্যা নয়, তথাপি অতিরঞ্জন করিয়া বলার অপরাধে তাহাদের শাস্তি হইল। কিন্তু আমাদের দেশে মিথ্যা কথা বলার কোনো শাস্তি নাই, যার যাহা ইচ্ছা সে তাহাই বলে। তথাপি অদূর ভবিষ্যতে শাস্তি আপনিই উপস্থিত হইবে এ কথা নিশ্চয়। রচি কোম্পানির আরো কয়েকপ্রকার ভাল ভাল ঔষধ আছে। লোকে যখন দেখিবে সিরোলিন সম্বন্ধে যাহা বলা হয় তাহা সত্য নয়, তখন উহাদের কোনো ঔষধেই আর বিশ্বাস থাকিবে না।

যে ঔষধ বাস্তবিকই উপকারী বিশেষতঃ যে ঔষধ যক্ষ্মারোগে উপকারী, তাহার জন্য ঢাক পিটাইবার আবশ্যক হয় না। ম্যালেরিয়ার কয়েকটি নূতন ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে, কোনো সাধারণ পত্রে তাহার জন্য ঢাক পিটানো হয় নাই, অথচ ইতিমধ্যে সুদূর পল্লীবাসীরাও তাহা জানিয়া গিয়াছে।

আরো এক কথা। চিকিৎসকের লেখা প্রবন্ধ হইলেই তাহা বিশ্বাসযোগ্য নয়। যাহা বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ তাহাতে প্রতি কথায় নজির (data) দেওয়া থাকিবে, বিনা নজিরে কোনো কথাই ধর্তব্য নয়,—কোনো মহাপুরুষ বলিলেও নয়। চিকিৎসক যদি বলিতেন যে অমুক অমুক তারিখে এতগুলি রোগীকে সিরোলিন খাইতে দিয়াছিলাম, তাহাদের পূর্ব্বে এত জ্বর ছিল আর সিরোলিন খাইয়া তাহা এই পরিমাণে কমিয়াছে, ইহা আমার নিজের অভিজ্ঞতা হইতে বলিতেছি তাহা হইলে বিশ্বাস করিতাম। তিনি যদি বলিতেন অমুক অমুক স্যানিটেরিয়মে অমুক অমুক শালে এতগুলি রোগীকে সিরোলিন দেওয়া হইয়াছে, তন্মধ্যে এতগুলি মরিয়াছে ও এতগুলি বাঁচিয়াছে, তবে সে কথা বিশ্বাস করিতাম। কিন্তু কোনো চিকিৎসক এরূপ নির্দ্দিষ্ট করিয়া কিছু লেখেন নাই, সকলেই উড়ো উড়ো ভাবে লিখিয়াছেন। সুতরাং বিজ্ঞাপন দেখিলে যেমন তাহা অগ্রাহ্য করি, এই সকল প্রবন্ধ দেখিলে জনসাধারণ তাহা সেইরূপই অগ্রাহ্য করিবেন। বড়ই দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে চিকিৎসক হইয়াও কেহ কেহ সামান্য লোভে পড়িয়া এইরূপ উঞ্ছবৃত্তি অবলম্বন করিতেছেন।

শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য্য
ডি-টি-এম্